সম্পাদক শ্রীসুধীরঞ্জন দাস   বর্ষ ২১ সংখ্যা ১   শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭১

যখনই যেখানে বাজারে প্রতিযোগিতা দেখা দেয়, জিনিসের ভালমন্দই হয় প্রস্তুতকারকের খ্যাতি বা অখ্যাতির কারণ—কেননা, ক্রেতারা সর্বদাই সে জিনিসের গুণাগুণ পরখ করে থাকেন এবং খুঁত ধরতেও তাঁদের জুড়ি আর নেই। কিন্তু একবার যদি কোনো জিনিস উৎকর্ষের জোরে দাঁড়িয়ে যায় এবং সে উৎকর্ষ যদি ঠায় বজায় থাকে, তাহলে ভারতের মত বাজারেও—ক্রেতারা যেখানে বেশীর ভাগই সস্তা খোঁজেন—সে জিনিসকে হটানো শক্ত।

দশ বছরের ওপর সেন-র‍্যালে (ভারতের সেন অ্যাণ্ড পণ্ডিত এবং নটিংহ্যামের সুবিখ্যাত র‍্যালে ইণ্ডাষ্ট্রিজ—এই দুয়ের সার্থক সহযোগিতায় গঠিত প্রতিষ্ঠান) সুপরিচিত র‍্যালে, রাজ, হাম্বার আর রবিনহুড সাইকেলের উৎপাদন সমানে বাড়িয়ে চলেছেন। কিন্তু তবু এইসব সাইকেলের চাহিদা কিছুতেই যেন মিটছে না।

এই সাইকেলগুলি ছাড়াও ভারত আর অন্যান্য আফ্রো-এশিয়ার বাজারের জন্যে সেন-র‍্যালে প্রতিষ্ঠান সাইকেলের জন্যে ইউনিয়ন সাজ-সরঞ্জাম আর উইটকপ সীট তৈরি ক'রে থাকেন।

SRC-84A BEN

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

এই উপন্যাসের নায়ক অনন্ত নদীর বুকে ভাসমান নৌকার বাসিন্দা; অতীতের ভয়াবহ পাপ মুছে ফেলার জন্য নিরন্তর তীরের সন্ধান যাকে আরো ভয়াবহ ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়েছে। দেশ ও কাল তার কাছে অন্ধ। শক্তিমান লেখক বরেন গঙ্গোপাধ্যায় আধুনিক মানুষের যে অসহায় আলেখ্য এই উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন, বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিক প্রবাহে তা নূতন চিন্তার সূচনা করবে। **সাড়ে তিন টাকা**

ভারতের নৃত্যকলা

গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়

নৃত্যকলা বিষয়ে প্রথম সুচিন্তিত গবেষণামূলক গ্রন্থ। প্রথিতযশা নৃত্যশিল্পী গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়ের গভীর শিল্পজ্ঞানসমৃদ্ধ এই অনন্য গ্রন্থ নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যে নৃত্যকলার আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথম উল্লেখযোগ্য সংযোজন। **বারো টাকা**

ইংলিশ চ্যানেল

কৃষ্ণা দত্ত

লণ্ডনের পটভূমিকায় একটি অনন্য সাধারণ উপন্যাস। লেখিকার সুদীর্ঘ লণ্ডনবাসের অভিজ্ঞতা বহু আলোচিত এই উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিতপ্রায়। **সাত টাকা**

নবপত্র প্রকাশন। ৫৯ পটুয়াটোলা লেন। কলিকাতা-৯

IISCO

ওয়াটারপ্রুফ ক্যাজুয়াল (১১) ৬.৯৫
ওয়াটারপ্রুফ ক্যাজুয়াল (১২) ৬.৯৫
ওয়াটারপ্রুফ অক্সফোর্ড ৬.৭৫
বরষার
পথে
ভরসা
দিলবাহার ৭.৭৫
ওয়াটারপ্রুফ নিউকাট ৫.৭৫
বৃষ্টি ধোয়া পথে সমস্যা শুকনো
পায়ে চলা। এই সমস্যার সমাধান
বাটার ওয়াটারপ্রুফ জুতো। এই ধরনের
জুতোয় প্রয়োজন উৎকৃষ্ট রবার,
বাটার জুতোয় তা পাবেন।
আরামের জন্য জালি কাপড়ের
লাইনিং। সোল আর হিল্-এ
এমন নকশার কৌশল যা পারতপক্ষে
হড়কাবে না। তাছাড়া, রকমারি রঙ...
জলে ভিজুক, কাদা লাগুক,
একবার ধুলেই কেনার প্রথম
দিনের মতো আনকোরা, ছিমছাম।
Bata
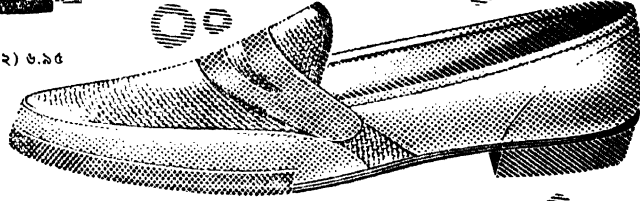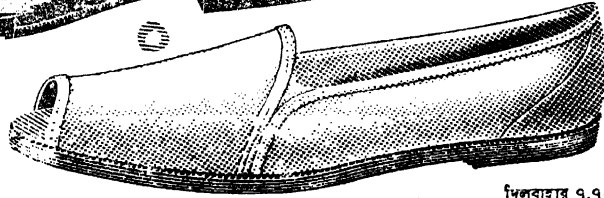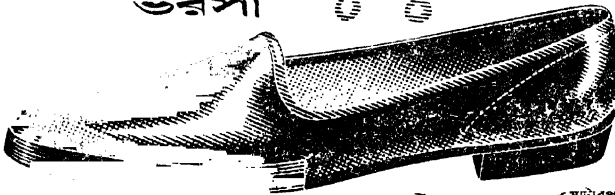
বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২১ সংখ্যা ১ · শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭১ · ১৮৮৬ শক

সম্পাদক শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

মূল্য এক টাকা

শেক্সপীয়র-উদ্যানে স্থাপনের জন্য আইভিলতা রোপণ
ক্লিভল্যাণ্ড, ওহিয়ো, আমেরিকা। ১৯১৬

বিশ্বকবি

যেদিন উদিলে তুমি, বিশ্বকবি, দূর সিন্ধুপারে,
ইংলণ্ডের দিক্‌প্রান্ত পেয়েছিল সেদিন তোমারে
আপন বক্ষের কাছে, ভেবেছিল (তুমি) বুঝি তারি
কেবল আপন ধন; উজ্জ্বল ললাট তব চুমি
রেখেছিল কিছুকাল অরণ্যশাখার বাহুজালে,
ঢেকেছিল কিছুকাল কুয়াশা-অঞ্চল-অন্তরালে
বনপুষ্প-বিকশিত তৃণঘন শিশির-উজ্জ্বল
পরীদের খেলার প্রাঙ্গণে। দ্বীপের নিকুঞ্জতল
তখনো ওঠেনি জেগে কবিসূর্য-বন্দনাসংগীতে।
তার পরে ধীরে ধীরে অনন্তের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে —
দিগন্তের কোল ছাড়ি শতাব্দীর প্রহরে প্রহরে —
উঠিয়াছ দীপ্তজ্যোতি মধ্যাহ্নের গগনের পরে ;
নিয়েছ আসন তব সকল দিকের কেন্দ্রদেশে —
বিশ্বচিত্ত উদ্ভাসিয়া ; তাই হেরো যুগান্তর-শেষে
ভারতসমুদ্রতীরে কম্পমান শাখাপুঞ্জে আজি
নারিকেলকুঞ্জবনে জয়ধ্বনি উঠিয়াছে বাজি।

১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩২২
শিলাইদহ

কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২২ সালের চৈত্র সংখ্যা 'সবুজপত্র' পত্রিকায়। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'-কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ৩৯-সংখ্যক এই কবিতাটি শেক্সপীয়রের মৃত্যুর ত্রি-শততম স্মৃতিবার্ষিক উৎসব-উদ্‌যাপন উপলক্ষে রচিত এবং কবিকৃত ইংরেজি অনুবাদ-সহ *A Book of Homage to Shakespeare* 1916 গ্রন্থে প্রকাশিত।

শেক্সপীয়র-প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তখনকার দিনে [১৮৭৬-৮৩] আমাদের সাহিত্যদেবতা ছিলেন শেক্সপীয়র মিল্‌টন ও বায়রন। ইঁহাদের লেখার ভিতরকার যে-জিনিসটা আমাদিগকে খুব করিয়া নাড়া দিয়াছে সেটা হৃদয়াবেগের প্রবলতা। এই হৃদয়াবেগের প্রবলতাটা ইংরেজের লোকব্যবহারে চাপা থাকে কিন্তু তাহার সাহিত্যে ইহার আধিপত্য যেন সেই পরিমাণেই বেশি। হৃদয়াবেগকে একান্ত আতিশয্যে লইয়া গিয়া তাহাকে একটা বিষম অগ্নিকাণ্ডে শেষ করা, এই সাহিত্যের একটা বিশেষ স্বভাব। অন্তত সেই দুর্দাম উদ্দীপনাকেই আমরা ইংরেজি সাহিত্যের সার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমাদের বাল্যবয়সের সাহিত্য-দীক্ষা-দাতা অক্ষয় চৌধুরী মহাশয় যখন বিভোর হইয়া ইংরেজি কাব্য আওড়াইতেন তখন সেই আবৃত্তির মধ্যে একটা তীব্র নেশার ভাব ছিল। রোমিও-জুলিয়েটের প্রেমোন্মাদ, লিয়রের অক্ষম পরিতাপের বিক্ষোভ, ওথেলোর ঈর্ষানলের প্রলয়দাবদাহ, এই সমস্তেরই মধ্যে যে-একটা প্রবল অতিশয়তা আছে তাহাই তাঁহাদের মনের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার করিত।

আমাদের সমাজ আমাদের ছোটো ছোটো কর্মক্ষেত্র এমন-সকল নিতান্ত একঘেয়ে বেড়ার মধ্যে ঘেরা যে সেখানে হৃদয়ের ঝড়ঝাপট প্রবেশ করিতেই পায় না, সমস্তই যতদূর সম্ভব ঠাণ্ডা এবং চুপচাপ; এই জন্যই ইংরাজি সাহিত্যে হৃদয়াবেগের এই বেগ এবং রুদ্রতা আমাদিগকে এমন একটি প্রাণের আঘাত দিয়াছিল যাহা আমাদের হৃদয় স্বভাবতই প্রার্থনা করে। সাহিত্যকলার সৌন্দর্য আমাদিগকে যে-সুখ দেয় ইহা সে-সুখ নহে, ইহা অত্যন্ত স্থিরত্বের মধ্যে খুব একটা আন্দোলন আনিবারই সুখ। তাহাতে যদি তলার সমস্ত পাঁক উঠিয়া পড়ে তবে সেও স্বীকার।

য়ুরোপে যখন একদিন মানুষের হৃদয়প্রবৃত্তিকে অত্যন্ত সংযত ও পীড়িত করিবার দিন ঘুচিয়া গিয়া তাহার প্রবল প্রতিক্রিয়াস্বরূপে রেনেসাঁশের যুগ আসিয়াছিল, শেক্সপীয়রের সমসাময়িককালের নাট্যসাহিত্য সেই বিপ্লবের দিনেরই নৃত্যলীলা। এ সাহিত্যে ভালোমন্দ সুন্দর-অসুন্দরের বিচারই মুখ্য ছিল না— মানুষ আপনার হৃদয়প্রকৃতিকে তাহার অন্তঃপুরের সমস্ত বাধামুক্ত করিয়া দিয়া, তাহারই উদ্দাম শক্তির যেন চরম মূর্তি দেখিতে চাহিয়াছিল। এইজন্যই এই সাহিত্যে প্রকাশের অত্যন্ত তীব্রতা প্রাচুর্য ও অসংযম দেখিতে পাওয়া যায়। য়ুরোপীয় সমাজের সেই হোলিখেলার মাতামাতির সুর আমাদের এই অত্যন্ত শিষ্ট সমাজে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ আমাদিগকে ঘুম ভাঙাইয়া চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। হৃদয় যেখানে কেবলই আচারের ঢাকার মধ্যে চাপা থাকিয়া আপনার পূর্ণপরিচয় দিবার অবকাশ পায় না, সেখানে স্বাধীন ও সজীব হৃদয়ের অবাধ লীলার দীপকরাগিণীতে আমাদের চমক লাগিয়া গিয়াছিল।

—জীবনস্মৃতি

বাংলায় শেক্সপীয়র-চর্চা

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ কর্মীদের সঙ্গে শেক্সপীয়র প্রথম ভারতে এসেছেন। দূর প্রবাসে চিত্তবিনোদনের জন্য কর্মীরা তাঁর নাটক অভিনয় করতেন। কয়েকজন ভাগ্যবান ভারতবাসী সেসব অভিনয় দেখবার সুযোগ পেতেন। শেক্সপীয়রের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের সূত্রপাত এ ভাবেই হয়েছে।

পরিচয় নিবিড় হল ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের পর। পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হল শেক্সপীয়রের রচনাবলী। স্কুলে-কলেজে য়ুরোপীয় শিক্ষকদের উৎসাহে শেক্সপীয়রের নাটক অথবা নাট্যাংশ অভিনীত হত। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা পুরস্কার-বিতরণী উৎসব উপলক্ষে 'মার্চেণ্ট অব ভেনিসে'র কয়েকটি দৃশ্যের অভিনয় করেছিলেন। অন্যান্য বিদ্যালয়েও অনুরূপ অভিনয়ের বিবরণ পাওয়া যায়। স্কুল-কলেজের বাইরে সাধারণ রঙ্গমঞ্চেও শেক্সপীয়রের নাটক অভিনীত হত। বিখ্যাত সাঁ স্যুসি থিয়েটারে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই অগস্ট ও ১২ই সেপ্টেম্বর 'ওথেলো' নাটকের অভিনয় হয়েছিল। বাঙালি অভিনেতা বৈষ্ণবচরণ আঢ্য ওথেলোর ভূমিকায় কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করে ইংরেজ দর্শকদেরও প্রশংসা লাভ করেন। জোড়াসাঁকোর থিয়েটারেও শেক্সপীয়রের নাটক অভিনীত হয়েছে। এমনি করে পাঠ ও অভিনয়ের মধ্য দিয়ে শেক্সপীয়রকে আমরা প্রথম জেনেছি। ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসনের শেক্সপীয়র অধ্যাপনা সে যুগের তরুণদের মনে তাঁর নাটক পাঠের প্রেরণা জুগিয়েছিল। রিচার্ডসন হিন্দু কলেজে পড়াতেন হ্যামলেট, ওথেলো, ম্যাকবেথ, কিং লিয়ার, হেন্‌রি ৪, টেমিং অব দি শ্রু, টাইমন অব আথেন্স প্রভৃতি নাটক। তাঁর পড়ানো ছিল অপূর্ব, ছাত্ররা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকত। মিশনারী কলেজের ছাত্রদের বাড়িতে শেক্সপীয়র নিজেদের পড়ে নিতে হত। নৈতিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য ক্লাসে শেক্সপীয়র পড়ানো হত না।

বাংলা ভাষায় শেক্সপীয়রের অনুবাদের জন্য আমাদের উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। অবশ্য শতকের গোড়াতেই যে একটি অনুবাদ হয়েছিল তার সংবাদ জানা যায়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্র ক্লড মংকটন এই অনুবাদ করেছিলেন। তিনি এই কলেজের ছাত্র ছিলেন জুলাই ১৮০৬ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। সিভিলিয়ান হিসাবে তাঁর পক্ষে দেশীয় ভাষা শেখা ছিল বাধ্যতামূলক। বাংলা নিয়েছিলেন তিনি। টেম্পেস্ট অনুবাদ করেছিলেন ভাষা-জ্ঞানের পরীক্ষা হিসাবে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের দলিলে আছে : Another enterprize of a similar nature has distinguished the *collegiate exercises of this year.* Mr. Monckton has undertaken, and has been able to execute, translation into Bengalee, of Shakespeare's tragedy of the *Tempest*. . . . Mr. Monckton has triumphed over these obstracles.

মংকটনকে বাংলায় শেক্সপীয়রের প্রথম অনুবাদক হিসাবে সম্মান দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু নিছক ঐতিহাসিক ঘটনা ছাড়া এই অনুবাদের মূল্য নেই। অনুবাদ করা হয়েছিল ক্লাসের এক্সারসাইজ হিসাবে। ছাপা হয়েছিল বলে জানা যায় না ; সুতরাং ক্লাসের বাইরে তার প্রভাব যেতে পারে নি। লং সাহেব তাঁর ক্যাটালগে অনুবাদের তারিখ দিয়েছেন ১৮০৫। কলেজের রিপোর্ট অনুসারে ১৮০৯ হবে।

গুরুদাস হাজরা ল্যাম্‌স্ 'টেল্‌স্ ফ্রম শেক্সপীয়র' থেকে রোমিও এবং জুলিয়েটের 'মনোহর উপাখ্যান'টির অনুবাদ প্রকাশ করেন ১৮৪৮ সালে। এর পরে মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ এবং আরও কয়েকজন মিলিতভাবে ল্যামস্ টেল্‌স্ অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ 'অপূর্বোপাখ্যান' নাম দিয়ে পূর্ণচন্দ্রোদয় প্রেস প্রকাশ করেছিল ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে। বইটিতে কতগুলি ছবি ছিল। পরবর্তী বৎসর ল্যাম্‌স্ টেল্‌স্'এর আর-একটি অনুবাদ করেন ই. রোয়ার।

শেক্সপীয়র-চর্চার ইতিহাসে ১৮৫৩ সালটি বিশেষরূপে স্মরণীয়। ঐ বছর 'হুগলী বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ছাত্র ইদানীং মালদহের আবকারীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হরচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক' 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস' অবলম্বনে রচিত ভানুমতী চিত্তবিলাস প্রকাশিত হয়। লং সাহেব এই বই সম্বন্ধে বলেছেন : Shakespeare's ideas, but given in a Bengali dress ; well and ably done। বিশেষ করে বাংলা নাটক ও অনুবাদ এবং সাধারণভাবে বাংলা সাহিত্যের তখন যে অবস্থা ছিল তার তুলনায় হরচন্দ্র ঘোষের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। শাইলকের বিখ্যাত উক্তি হরচন্দ্র কি ভাবে বাংলায় রূপান্তরিত করেছেন তা নিম্নোদ্ধৃত অংশ থেকে দেখা যাবে। বাংলা রূপান্তরে শাইলকের নাম হয়েছে লক্ষপতি রায়। লক্ষপতি বলছে—

…তুমি এই সপ্তগ্রামে আমার অনেক টাকা ও সুদ ক্ষতি করিয়াছ, তাহা আমি জাতীয় গুণে ধৈর্যাবলম্বনপূর্বক সহ্য করিয়াছি, পরে আমাকে পাষণ্ড বলিয়া গালি দিয়াছ ভুক্তাবশিষ্ট মাংসভোজী কদর্য কুক্কুর বলিয়াছ, আর আমার পূজার পট্টবস্ত্রে উচ্ছিষ্ট ফেলিয়াছ, এই সকল অপমান কি জন্য ? সুদ্ধ আমি আপন জাতীয় ব্যবসায়ের কর্ম করিয়া থাকি এই জন্য মাত্র। দেখ এখন তুমি বিপদে পড়িয়াছ এবং অতি কষ্টে কৃষ্ণমুখে বলিতেছ 'লক্ষপতি, তুমি এই উপকার করিলে আমরা বড় উপকৃত হইব' তুমি বারম্বার এইরূপ স্তব করিতেছ। কিন্তু এই তুমি ক এক দিন মাত্র হইল আমার সুমার্জিত উজ্জ্বল শুক্র শ্মশ্রুতে কফ প্রক্ষেপ করিয়াছ ও ক্ষুদ্র কুক্কুরের ন্যায় জ্ঞান করিয়া আমার পুরোদ্বার সম্মুখে অনায়াসে আমাকে পা দিয়া মাড়াইয়াছ, আজ কহিতেছ যে লক্ষপতি তোমার নিকট আমার কিছু টাকার প্রার্থনা। এখন কি আমি কহিতে পারি না যে এ কুক্কুর টাকা কোথা পাইবেক ?…তুমি আমাকে পদাঘাত করিবা, এবং মহোৎসব দিবসে আমার গাত্রে মুখ হইতে পীতাবশিষ্ট জল ফেলিবা, ও অন্য সময়ে কুক্কুর বলিয়া ডাকিবা, তোমার এই সকল সৌজন্য জন্য কি আমি দাসের ন্যায় নত হইয়া তোমাকে এত টাকা ঋণ দিব ?

—দ্বিতীয় অঙ্ক, ৪র্থ অঙ্গ

হরচন্দ্র ঘোষ চারুমুখ চিত্তহরা নাটক নামে রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েটের ভাবানুবাদও প্রকাশ করেছিলেন ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে।

১৮৬৫ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে বাংলায় অনেক শেক্সপীয়র-অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা দেশে শেক্সপীয়রের প্রভাব দেখতে পাই সাহিত্যের ক্ষেত্রে, পশ্চিম ভারতের মতো মঞ্চের উপরে নয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষের অনূদিত ম্যাকবেথ এবং আরও কয়েকটি অনুবাদ নাটক মঞ্চে সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। মহারাষ্ট্রে শেক্সপীয়রের নাটক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। 'টেমিং অব দি শ্রু' এখনও অভিনীত হয় এবং এর মারাঠী অনুবাদ 'ত্রাটিকা'র সাতটি সংস্করণ হয়েছে। অবশ্য মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং সমকালীন অন্যান্য নাট্যকারদের উপর শেক্সপীয়রের প্রভাব পড়েছে নানাভাবে।

শেক্সপীয়র-গার্ডেন, ক্লিভল্যাণ্ড, ওহিয়ো
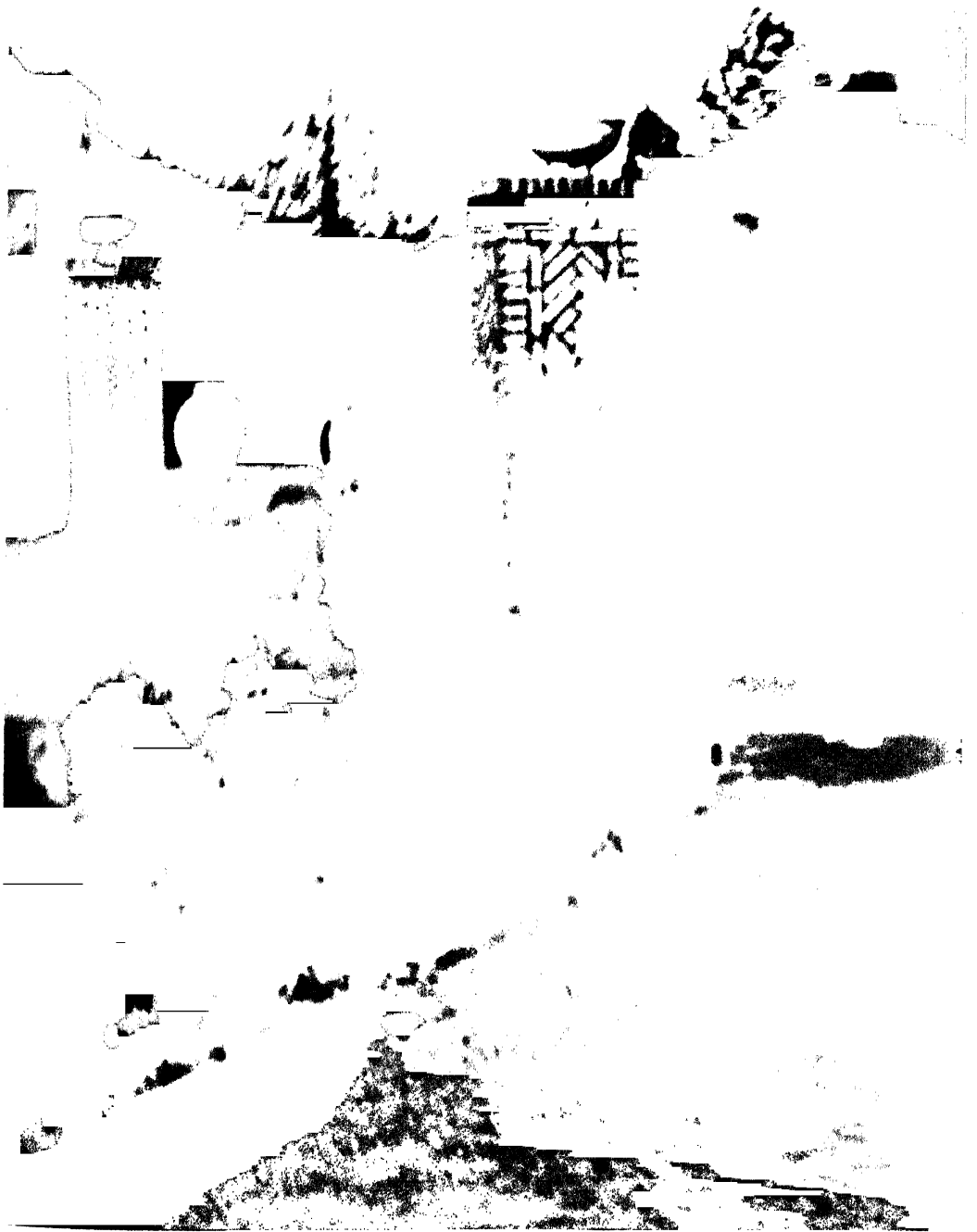
রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক রোপিত আইভিলতা স্তম্ভের উপর স্থাপিত

সাধারণভাবে বলা যেতে পারে না, বাংলা নাটকের ঘটনাপ্রধান ক্রিয়াশীলতার পর্বে শেক্সপীয়র ছিলেন আদর্শস্বরূপ। গিরিশচন্দ্র তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করতেন।

এইসব প্রভাবের কথা নিয়ে এখানে আলোচনা করব না। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত অনুবাদ ও রূপান্তরের সমীক্ষা করলেই শেক্সপীয়রের প্রত্যক্ষ প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। সকল ভারতীয় ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষাতেই শেক্সপীয়র-চর্চা সবচেয়ে বেশি হয়েছে। এই ধরনের বইয়ের সংখ্যা কত তার হিসাব পাওয়া কঠিন। কারণ রূপান্তর এমনভাবে করা হয়েছে যে শেক্সপীয়রের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয় করা দুরূহ হয়ে পড়ে। হরিরাজ, তিন ভগ্নী, ভ্রমর, বিনিময়, সুশীলা-বীরসিংহ ইত্যাদি যে শেক্সপীয়রের নাটকের রূপান্তর, নাম থেকে এবং অনেক সময় বই থেকেও তা বোঝা যায় না। তবে এমন অনুমান করা অসংগত নয় যে, বাংলায় শেক্সপীয়রের নাটক ও কাহিনীর সংখ্যা হবে দেড় শ থেকে দু শ। এই রূপান্তরের কাজ করেছেন অনেক বিখ্যাত ও অখ্যাত লেখক। খ্যাতনামাদের মধ্যে আছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ বসু, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। ঠাকুরপরিবার এক্ষেত্রেও এগিয়ে এসেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ সিম্বেলিনের ভাবানুবাদ করেছেন; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ করেছেন জুলিয়াস সীজারের অনুবাদ। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন বছর তেরো, তখন গৃহশিক্ষকের নির্দেশে তাঁকে ম্যাকবেথ অনুবাদ শেষ করতে হয়েছিল। বিদ্যাসাগর ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই অনুবাদ শুনে আনন্দ লাভ করেছিলেন। দুঃখের বিষয়, ডাকিনীদের অংশটি ছাড়া পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেছে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের মতো কালিদাসের সঙ্গে শেক্সপীয়রের তুলনা করে প্রবন্ধ লিখেছেন।

বাংলায় শেক্সপীয়র-গ্রন্থপঞ্জী থেকে দেখা যায় যে, মার্চেন্ট অব ভেনিস বাঙালি পাঠকের নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়। দ্বিতীয় স্থান ম্যাকবেথের। নীচে কয়েকটি নির্বাচিত অনুবাদ বা রূপান্তরিত গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা হল।

গোবিন্দচন্দ্র রায় অল্‌স্‌ ওয়েল দ্যাট এণ্ডস্‌ ওয়েল'এর উপন্যাস-রূপ 'ভিষক-দুহিতা' ঢাকা থেকে প্রকাশ করেছিলেন ১৮৮৮ সালে। শেক্সপীয়রের নাটকের উপন্যাস-রূপ হিন্দীতে জনপ্রিয় হয়েছিল। বাংলায় তেমন হয় নি। অ্যান্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রার অনুবাদ করেছেন দেবেন্দ্রনাথ বসু; 'ইলাবতী' নামে রূপান্তর করেছেন নিতাইচাঁদ শীল (১৯২৮)। অ্যাজ ইউ লাইক ইট'এর অনুবাদ হয়েছে দুটি। একটি সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় করেছেন 'মনের মতন' নাম দিয়ে; আর-একটি বঙ্গীয়-শেক্সপীয়র-পরিষদের পক্ষ থেকে করেছেন সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৫৭)। অনঙ্গরঙ্গিনী (১৮৯৭) নাম দিয়ে রূপান্তর করেছেন অন্নদাপ্রসাদ বসু।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কমেডি অব এরর্স'কে প্রায় মৌলিক কাহিনীতে পরিণত করেছিলেন। 'ভ্রান্তি-বিলাস' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭০ সালে। তার পর এর অনেকগুলি সংস্করণ হয়েছিল। এই রূপান্তরিত গদ্য কাহিনীটি অবাঙালি পাঠকদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কন্নড় সাহিত্যে শেক্সপীয়র-চর্চার প্রথম নিদর্শন ভ্রান্তিবিলাসের অনুবাদ। কমেডি অব এরর্স অবলম্বনে বেণীমাধব ঘোষ রচনা করেছিলেন 'ভ্রমকৌতুক নাটক' (১৮৭৩)।

সিম্বেলিন অবলম্বনে ১৮৬৮ সালে দুটি নাটক লেখা হয়েছিল। একটি চন্দ্রকালী ঘোষের 'কুসুমকুমারী নাটক', অন্যটি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সুশীলা-বীরসিংহ নাটক'। এ ছাড়া অনুবাদ করেছেন সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ভারতীয় পরিবেশে হ্যামলেটের রূপান্তর করেছেন নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী (হরিরাজ, ১৮৯৬), সিদ্ধেশ্বর ঘোষ (চন্দ্রনাথ, ১৮৯৪) এবং প্রমথনাথ বসু (অমর সিংহ, ১৮৭৪)। অনুবাদ করেছেন ললিতমোহন অধিকারী ও চণ্ডীপ্রসাদ ঘোষ যথাক্রমে ১৮৯২ ও ১৮৯৪ সালে।

'হরিরাজ' নাটকটি নিয়ে এক সময় অনেক আলোচনা হয়েছিল। শোনা যায়, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু এই নাটকের প্রথম খসড়াটি করেন। কিন্তু সম্পূর্ণ করেন নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী। নাটকের নামপত্রে লেখকের নাম নেই। প্রসিদ্ধ অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত নাটকের সকল স্বত্ব কিনে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। ২১শে জুন ১৮৯৭ ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনয় হয়। অমরেন্দ্রনাথ অভিনয় করেছিলেন হরিরাজ বা হ্যামলেটের চরিত্রে। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় দেখে খুব প্রশংসা করেছিলেন। পরে মনোমোহন থিয়েটারেও এই নাটকের অভিনয় হয়। কিন্তু অভিনয় অর্থকরী হয় নি।

রচনার নমুনা হিসাবে 'হরিরাজ' থেকে হ্যামলেটের বিখ্যাত উক্তি 'টু বী অর নট টু বী'র ভাবানুবাদ দেওয়া হল :

জীবন ধারণ কিম্বা প্রাণ বিসর্জন—
কিবা প্রয়োজন, চাহে মন জানিবারে।
আবরি হৃদয় নিজ চির অন্ধকারে—
পন্থাহারা হয়ে রব অলক্ষ্য প্রদেশে ;
অথবা সংগ্রাম করি ঝঞ্ঝাবায়ু সনে—
ফুৎকারেতে উড়াইব নিবিড় তামসী ?
সুষুপ্তি নিবৃত্তি সমশক্তি ধরে দোঁহে,
বিস্মৃতি—বিস্মৃতি নিয়ে আসে ;
ধুয়ে দেয় হৃদয়ের কালি—
সুখের চরমসীমা দুঃখের জীবনে !
চাহে প্রাণ নিদ্রা বা মরণ। **তৃতীয় অঙ্ক, ৫ম গর্ভাঙ্ক**

পাবনার জজকোর্টের উকিল ললিতমোহন অধিকারী এই অংশ অনুবাদ করতে গিয়ে কতটা সফল হয়েছেন তা নীচের উদ্ধৃতি থেকে দেখা যাবে :

কি বল কি করি, বল বাঁচি কিম্বা মরি,
একি মনের গৌরব স'য়ে থাকা সব
বিড়ম্বনা অদৃষ্ট যখন হয় বাম,
কিম্বা বাধা দিয়ে বেগ নিবারণ করা,
উথলিয়ে উঠে যবে শোকের সমুদ্র ?
ঘুমান মরণ এক ; নাই ভিন্ন ভেদ ;
এত জানা আছে ঘুমালে মনের ব্যথা,
নিভে যায় আর কত এ জ্বালা যন্ত্রণা,
এত সবার বাসনা। মৃত্যু নিদ্রামাত্র ;

স্বপ্ন দেখি নিদ্রাবেশে এই ত সঙ্কট ;
সেই মৃত্যু নিদ্রাবেশে কি স্বপ্ন দেখিব,
ছাড়িয়াছি যবে সত্ত্ব পাতি কলেবর,
এই চিন্তার বিষয়, যতদিন বাঁচি ?

যতদূর জানা যায়, জুলিয়াস্ সীজারের একটিমাত্র অনুবাদই হয়েছে। করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। অনুবাদটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯০৭ সালে। কিং লীয়ারেরও একটিমাত্র উল্লেখযোগ্য অনুবাদ (১৯০২) করেছেন যতীন্দ্রমোহন ঘোষ। কিং লীয়ার অবলম্বনে স্বরেন্দ্রচন্দ্র বসু বা ভিখারী নিরানন্দ একটি আধ্যাত্মিক কাব্যনাটক লিখেছেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের ম্যাকবেথ বাংলায় সাহিত্যগুণসম্পন্ন শেক্সপীয়র-অনুবাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর রচনা। এ ছাড়া আশুতোষ ঘোষ, মুণীন্দ্রনাথ ঘোষ, তারকনাথ মুখোপাধ্যায় ও উপেন্দ্রকুমার করও অনুবাদ করেছেন। শেক্সপীয়র-পরিষদ গ্রন্থমালার অন্তর্গত নীরেন্দ্রনাথ রায়ের অনুবাদটি আধুনিক পাঠকের উপযোগী। ম্যাকবেথ অবলম্বনে ভারতীয় পটভূমিকায় ধীরেন্দ্রনাথ পাল 'ভ্রমর' (১৮৯১), হরলাল রায় 'রুদ্রপাল নাটক' (১৮৭৪) এবং নগেন্দ্রনাথ বসু 'কর্ণবীর' (১৮৮৫) রচনা করেছেন। বিশ্বকোষ-খ্যাত নগেন্দ্রনাথই 'কর্ণবীর'এর রচয়িতা।

মেজার ফর মেজার'এর অনুবাদ করেছেন সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 'রীতিমত' নাম দিয়ে। বীরেন্দ্রনাথ রায় এই নাটকের ভারতীয় রূপ দিয়েছেন ১৯০৯ সালে, 'বিনিময়' নামে।

মার্চেন্ট অব ভেনিস'এর অনুবাদ করছেন (১৯২৫) ভারতে রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে চিকিৎসার প্রবর্তক (১৮৯৮) আশুতোষ ঘোষ ; সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় এবং বঙ্গীয়-শেক্সপীয়র-পরিষদের পক্ষ থেকে স্নুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়। এই নাটক অবলম্বনে রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক হল হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস', প্যারীলাল মুখোপাধ্যায়ের 'স্নুরলতা নাটক' (১৮৭৭), ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সওদাগর' (১৯১৫), মনোজমোহন বসুর 'সোনায় সোহাগা' (১৯১৫) প্রভৃতি।

এ মিডসামার নাইট্স্ ড্রীম অবলম্বনে সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন 'জাহানারা' (১৯০৩) এবং নীলরতন মুখোপাধ্যায় 'শরৎ-শশী নাটক' (১৮৮২)।

দেবেন্দ্রনাথ বসু -কৃত ওথেলোর অনুবাদ স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল। স্নুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'স্নুরস্নুন্দরী' (১৮৯১), তারিণীচরণ পালের 'ভীমসিংহ' (১৮৭৫) এবং ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রুদ্রসেন' (১৯০৫) ওথেলো অবলম্বনে রচিত।

রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েটের শ্রেষ্ঠ বাংলা রূপান্তর (১৮৯৫) পেয়েছি কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। হেমচন্দ্র ভারতীয় পরিবেশে কাহিনী উপস্থাপিত করলেও পরিবর্তন খুব কম করেছেন। ভেরোনার স্থলে তিনি বরণা নগরী এনেছেন ; Montague ও Capulet পরিবারের নাম দিয়েছেন মন্তাগো ও কপলত ; Benvolioকে করেছেন বেণুবল। আবার মঠের মোহান্তের নাম দিয়েছেন মথুরানন্দ। রোমিও জুলিয়েত নাম ঠিক আছে। কবরের স্থলে শ্মশান দেখানো হয়েছে।

যোগেন্দ্রনারায়ণ দাসঘোষ এবং হরচন্দ্র ঘোষও ভারতীয় পরিবেশে রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট রূপান্তরিত করেছেন। তাঁদের নাটকগুলির নাম যথাক্রমে 'অজয়সিংহ বিলাসবতী' (১৮৭৮) এবং 'চারুমুখ চিত্তহরা'

(১৮৬৪)। যোগেন্দ্রনারায়ণ তাঁর ভূমিকায় লিখেছেন : "যে সকল স্বদেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তি ইংরাজী বিদ্যাভ্যাস করেন নাই, তাঁহাদিগকে মহাকবি শেক্সপীয়রের রচনা বিষয়ে কিরূপ উদ্দেশ্য, কেবল তাহা জানাইবার জন্য আমি এই নাটকখানি বঙ্গভাষায় প্রস্তুত করিলাম। এবং তদনুসারে নাম, স্থান, আচার এবং ব্যবহার হিন্দুদিগের প্রথানুসারে লিখিত হইল।"

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নলিনী-বসন্ত' (১৮৬৮) টেম্পেস্টের শ্রেষ্ঠ বাংলা রূপান্তর। প্রস্পেরোর (বৈজয়ন্ত) প্রসিদ্ধ উক্তির রূপান্তর হেমচন্দ্র এইভাবে করেছেন :

লীলা হল সমাপন !— এ রঙ্গভূমিতে
সেজেছিল যত পরি করি নটবেশ
বায়ুর পুত্তলি তারা মিশিল বায়ুতে,
মিশিয়া হইল লীন তরল আকাশে !
হবে লীন এই রূপে, ইহাদেরি মতো,
মাটির পুত্তলি যত মানব এ ভবে ;
পাষাণের অট্টালিকা অভ্রভেদী চূড়া,
দেউল, মন্দির, মঠ, উন্নত শরীর,
রাজ-নিকেতন কিম্বা দেব-অট্টালিকা
আভাময়ী, রত্নময়ী— চূর্ণ হয়ে যাবে !···

অসার স্বপ্নের ন্যায় নিদ্রায় বেষ্টিত
অনিত্য আমরা সবে অনিত্য জগতে।

টেম্পেস্টের আর দুটি বাংলা রূপান্তর করেছেন চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ('প্রকৃতি নাটক', ১৮৮২) এবং নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী ('ঝঞ্ঝা', ১৯১৩)।

পশুপতি ভট্টাচার্য-কৃত টুয়েলফথ্ নাইট'এর অনুবাদ বসুমতীর শেক্সপীয়র-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কান্তিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় টুয়েলফথ্ নাইট অবলম্বনে লিখেছেন 'সুশীলা-চন্দ্রকেতু' (১৮৭২) নাটক। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 'ভেরোনার ভদ্রযুগল' নাম দিয়ে অনুবাদ করেছেন টু জেণ্টল্‌মেন অব ভেরোনা। উইণ্টার্স টেল অবলম্বনে 'রাণী তমালিনী' নাটক (১৯১৩) রচনা করেছেন ধনদাচরণ মিত্র।

বাংলায় শেক্সপীয়র-চর্চার ধারা সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেবার জন্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বইয়ের নাম করা হল। ল্যাম্‌স্ টেলস'এর অনেক অনুবাদ হয়েছে। কিশোরপাঠ্য শেক্সপীয়র-কাহিনীর সংখ্যাও কম নয়। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য শেক্সপীয়রের নাটকের কাহিনী সংকলন করেছিলেন হারানচন্দ্র রক্ষিত। ১৮৯৮-১৯০১ সালের মধ্যে চার খণ্ডে সংকলনটি সম্পূর্ণ হয়েছিল। অল্প সময়ের মধ্যে কয়েকটি সংস্করণ হওয়ায় বোঝা যায় কাহিনীগুলি পাঠকদের ভালো লেগেছিল।

বসুমতীর দুই খণ্ডের গ্রন্থাবলী শেক্সপীয়রের রচনা বাঙালি পাঠকের নিকট প্রচার করতে সহায়তা করেছে। দুটি খণ্ডে মোট বারোটি নাটকের অনুবাদ আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুবাদ মোটামুটি রূপে মূলানুগ।

বাংলা কবিতার সমৃদ্ধি সত্ত্বেও শেক্সপীয়রের অপূর্ব সনেটগুলির সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় নি। সম্প্রতি নির্বাচিত কয়েকটি সনেটের অনুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন মণীন্দ্র রায় (১৯৬৪)।

শেক্সপীয়র সম্বন্ধে বাংলা বই মাত্র তিনটি। ঋষি দাস মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে শেক্সপীয়রের জীবন ও সাহিত্যসাধনা আলোচনা করেছেন। তিনিই আর-একটি জীবনী লিখেছেন ছেলেদের জন্য। সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্তের 'আভন নদীর তীরে' গল্পাকারে শেক্সপীয়রের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার স্ট্র্যাটফোর্ডের শেক্সপীয়র স্মৃতি-পাঠাগারে শেক্সপীয়রের নাটক অবলম্বনে রচিত নিম্নলিখিত বাংলা বইগুলি উপহার দিয়েছিলেন :

টেম্পেস্ট অবলম্বনে রচিত— নলিনী-বসন্ত ; ঝটিকা এবং প্রকৃতি নাটক ; সিম্বেলিন অবলম্বনে রচিত— কুসুমকুমারী এবং সুশীলা-বীরসিংহ নাটক ; ম্যাকবেথের রূপান্তর— কর্ণবীর ও রুদ্রপাল নাটক ; সুরলতা নাটক (মার্চণ্ট অব ভেনিস) ; ভ্রান্তিবিলাস (কমেডি অব এরর্স) ; শরৎ-শশী নাটক (মিডসামার নাইট্‌স্ ড্রীম) ; অমরসিংহ (হ্যামলেট) সুশীলা-চন্দ্রকেতু (টুয়েল্‌ফথ নাইট)। রোমিও-জুলিয়েত (উপন্যাস) ; ভিষক-দুহিতা (অলস্ ওয়েল— উপন্যাস) ; ল্যাম্‌স্ টেল্‌সের অনুবাদ 'শেক্সপীয়রের গল্প ১ম ভাগ'। বাংলায় শেক্সপীয়র চর্চার এই নিদর্শনগুলি নিশ্চয়ই তখন স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

ইংরেজি ভাষায় যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরা শেক্সপীয়রের মূল রচনার রসাস্বাদন করতে পারতেন। তাঁদের জন্য অনুবাদ বা ভারতীয়করণের প্রয়োজন ছিল না। ইংরেজি-অনভিজ্ঞ পাঠকের নিকট শেক্সপীয়রের জগৎ এতই অপরিচিত যে, তার মধ্যে প্রবেশ করে তাঁদের পক্ষে রস গ্রহণ করা কঠিন। তাই অনেকের মনে হয়েছিল, এই অপরিচিত জগতের বাহ্যিক বাধাগুলি দূর করলে হয়তো রসাস্বাদন সহজ হবে। সুতরাং অনুবাদ অপেক্ষা জোর দেওয়া হল ভারতীয়করণের উপর। স্থান কাল পাত্রপাত্রী এবং সামাজিক পরিবেশ ভারতীয়। ভাব ও কাহিনী শেক্সপীয়রের। এই দুইয়ের মিলন-প্রচেষ্টাই ভারতে শেক্সপীয়র-চর্চার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ভারতীয় পটভূমিকায় শেক্সপীয়রের নাটকের অনুবাদ করবার সপক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন অনেকে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'ভ্রান্তিবিলাসে'র ভূমিকায় বলেছেন : "বাঙ্গালা পুস্তকে ইয়ুরোপীয় নাম সুশ্রাব্য হয় না ; বিশেষতঃ, যাঁহারা ইংরেজী জানেন না, তাদৃশ পাঠকগণের পক্ষে বিলক্ষণ বিরক্তিকর হইয়া ওঠে। এই দোষের পরিহার বাসনায়, ভ্রান্তিবিলাসে সেই সেই নামের স্থলে এতদ্দেশীয় নাম নিবেশিত হইয়াছে। উপাখ্যানে এবংবিধ প্রণালী অবলম্বন করা কোনও অংশে হানিকর বা দোষাবহ হইতে পারে না।"

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রোমিও-জুলিয়েতে'র ভূমিকায় এই বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন : "বাঙ্গলা ও ইংরাজি ভাষায় প্রকৃতিগত এত প্রভেদ যে, কোনও একখানি ইংরাজি নাটকের কেবল অনুবাদ করিলে, তাহাতে কাব্যের রস কি মাধুর্য কিছুই থাকে না, এবং দেশাচার লোকাচার ও ধর্মভাবাদির বিভিন্নতা-প্রযুক্ত এরূপ শ্রুতিকঠোর ও দৃশ্যকঠোর হয় যে তাহা বাঙ্গালী পাঠক ও দর্শকদিগের পক্ষে একেবারে অরুচিকর হইয়া উঠে। সেইজন্য আমি রোমিও জুলিয়েটের কেবল ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া এই নাটকখানি প্রকাশ করিলাম। মূলের কোন কোনও স্থানে পরিত্যাগ বা পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছি, কোথাও দু-একটি নূতন গর্ভাঙ্কও সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে। স্ত্রী

পুরুষদিগের নাম ও কথাবার্তা দেশীয় করিয়া লইয়াছি, কিন্তু প্রধান প্রধান নায়ক নায়িকাগণ ও তাহাদের চিত্ত বা চরিত্রগত ভাব, মূলে যেখানে যেরূপ আছে, সেইরূপ রাখিতে যতদূর সাধ্য, চেষ্টা করিয়াছি। ফলতঃ সেক্ষপিয়রের নাটকের গন্ধের, ও তাহার প্রধান প্রধান নায়ক নায়িকাদিগের চরিত্রের সারাংশ লইয়া, তাহা দেশীয় ছাঁচে ঢালিয়া, স্বদেশীয় পাঠকের রুচিসঙ্গত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।…আমার ধারণা এই যে, এইরূপ কোনও প্রণালী অবলম্বন না করিলে, কোনও বিদেশী নাটক বাঙ্গলা সাহিত্যে স্থান লাভ করিতে পারিবে না, এবং তাহা না হইলেও বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পূর্ণ পুষ্টিলাভ ও প্রকৃতিগত উন্নতি হইবে না। এইরূপ করিতে করিতে, ক্রমশঃ বিদেশীয় নাটক কবিতাদির অবিকল অনুবাদ বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থান পাইবার উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু আপাততঃ কিছুকাল এই প্রণালী অনুসরণ করা অপরিহার্য বলিয়াই আমার ধারণা।"

এই সম্পর্কে হরচন্দ্র ঘোষ 'ভানুমতী চিত্তবিলাসের' ভূমিকায় বলেছেন: "…আনুপূর্বিক অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ কাব্যের অনেকানেক স্থানের ভাব দেশীয় ভাষার ভাবের সহিত ঐক্য হয় না দেখিয়া কতিপয় প্রাচীন জ্ঞানবান মহাশয় উল্লেখিত কাব্যের আখ্যানের মর্ম মাত্র গ্রহণপূর্বক আমূলাৎ দেশীয় প্রণালীতে রচনা করিতে যুক্তি দান করেন…বহু স্থানে মূল কাব্যের সহিত মিলন করিলে নিবর্তন পরিবর্তনাদি দৃষ্ট হইবেক বটে, কিন্তু তাহা স্বদ্ধ দেশীয় মহাশয়দিগের অবকাশকালে গ্রন্থ পাঠামোদের আনুকুল্য বিবেচনায় করা হইল।"

ভারতীয়করণের প্রবণতা উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বর্তমান শতকের তিন দশক পর্যন্ত দেখা যায়। অনেক অক্ষম লেখক ভারতীয়করণের যুক্তিতে শেক্সপীয়রকে বিকৃতভাবে বাংলা সাহিত্যে উপস্থিত করেছেন। এর ফলে অধিকাংশ বইই পাঠকের মনে সাড়া জাগাতে পারে নি। প্রকৃত সাহিত্য গুণসম্পন্ন বাংলা-রূপান্তরের সংখ্যা খুবই কম। ফলে বাংলা সাহিত্যে শেক্সপীয়রের কোনো গভীর প্রভাব দেখা যায় না।

ভারতীয় পরিবেশে রূপান্তরিত শেক্সপীয়র-গ্রন্থাবলী বিশ্লেষণ করলে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। প্রায় সকল কাহিনীর ঘটনাস্থল বাংলা দেশের বাইরে। কাহিনীর নাটকীয়তাকে সম্ভাব্য করবার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় অপরিচিত পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' উজ্জয়িনীর পটভূমিকায় রচিত। শাইলকের প্রতিরূপ লক্ষপতি রায় গুজরাট দেশীয় উৎকট কুসীদগ্রাহী কৃপণ মহাজন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সুশীলা-বীরসিংহ নাটক' (সিম্বেলিন) পাঠককে জয়পুরে নিয়ে যায়। কতকগুলি গ্রন্থের ঘটনাস্থল দেওয়া হল: ভ্রান্তিবিলাস— হেমকূট ও জয়স্থল, দুই প্রাচীন রাজ্য; অজয়সিংহ-বিলাসবতী (রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট)— রাজপুতনা; প্রকৃতি নাটক (টেম্পেস্ট)— নিপনী দেশ ও মালিনী দেশ; কর্ণবীর (ম্যাকবেথ)— জয়পুর; অমরসিংহ (হ্যামলেট)— যোধপুর; রাণী তমালিনী (উইন্টার্স টেল)— মলয় ও সিংহল, ইত্যাদি।

পাত্রপাত্রীদের ভারতীয় নামকরণ ব্যতীত পুরোহিত ঋষি ঋষিপত্নী সন্ন্যাসী এবং সংস্কৃত শ্লোকও আনা হয়েছে। নতুন চরিত্র সৃষ্টি, উপ-কাহিনী সংযোজন, নতুন ঘটনা সন্নিবেশ ইত্যাদি প্রায় সব বইয়েই দেখা যায়। 'হরিরাজ' নাটকে নতুন চরিত্র সুরমাকে আনা হয়েছে নায়কের বোন হিসাবে। মূল নাটকে হ্যামলেটের বোন নেই। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সুশীলা-বীরসিংহ নাটকে'র শেষ দৃশ্য পরিবর্তিত

করেছেন। নাটকের শেষে যোগ করেছেন 'মনুষ্যজীবন' নামে একটি কবিতা। বোধ হয় নাটকের নীতি সংক্ষেপে বোঝাবার জন্য। উইন্টার্স টেল'এর মূল কাহিনীতে আছে, বোহেমিয়ার রাজা পলিক্‌জিনিস্ বাল্যবন্ধু সিসিলিয়ার রাজা লিওন্টিস ও তাঁর সুন্দরী মহিষীর সঙ্গে পরিবারের লোকের মতো দীর্ঘকাল একত্র বাস করেছিলেন। এর বাংলা রূপান্তর 'রাণী তমালিনী'র লেখক ধনদাচরণ মিত্রের মনে হয়েছে যে অতিথির পক্ষে এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে কোনোও পরিবারের সঙ্গে থাকা এ দেশীয় রীতির বিরুদ্ধ এবং সমাজে নিন্দনীয়। তাই তিনি সিংহলরাজকে কেবল মলয়েশ্বরের সখা নয়, মাতুলপুত্র বলেও বর্ণনা করেছেন। মূল নাটকের শেষ দৃশ্যে অমাত্য আন্টিগোনাসের বর্ষিয়সী বিধবা পত্নীর সহিত প্রৌঢ়-বয়স্ক ক্যামিলোর পরিণয় এ দেশের রুচিবিরুদ্ধ— এ জন্য অনুবাদে তাকে ব্রহ্মচর্য ব্রতধারিণী বিধবারূপে দেখানো হয়েছে। মহাদেব দে রচিত 'ভিনিস বণিক'এ প্রথমেই একটি অতিরিক্ত দৃশ্য— 'অবতরণিকা'-যোগ করা হয়েছে। শাইলক ও অ্যান্টোনিওর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নাটকের বিষয় আগেই প্রকাশ করে পাঠকের আগ্রহ নষ্ট করা হয়েছে। শাইলক বলছে,

অর্থ মোর ধর্মাধর্ম, মান অপমান,
অর্থ মোর প্রাণ, মন, জীবন সম্বল।

উত্তরে অ্যান্টোনিও বলছে :

শাইলক! তুমি কুসীদ গ্রহণকারী
নর-রক্ত-পিপাসু-দুর্জন।

নাটক জনপ্রিয় করবার জন্য গান জুড়ে দেওয়া শেক্সপীয়র-রচনার বাংলা রূপান্তরগুলির আর-একটি বৈশিষ্ট্য। ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'সওদাগর' (মার্চেন্ট অব ভেনিস) নাটকে বাইশটি গান দেওয়া হয়েছে। হ্যামলেটের (হরিরাজ) মতো ট্র্যাজেডিতেও প্রায় বারোটি গান আছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'ম্যাকবেথে' দিয়েছেন পাঁচটি গান।

সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 'ওথেলো' নাটককে বাংলায় রূপান্তরিত করতে গিয়ে এইসব সাধারণ পরিবর্তন করেই সন্তুষ্ট থাকেন নি। তাঁর 'সুরসুন্দরী' ট্র্যাজেডি নয়; তিনি শেক্সপীয়রকে উপেক্ষা করে ওথেলো ও ডেসডিমোনার মিলন ঘটিয়েছেন।

রূপান্তরিত শেক্সপীয়র-রচনাবলীর যত ত্রুটিবিচ্যুতি থাক্, এই শ্রেণীর গ্রন্থাবলীর মধ্যেই বিধৃত আছে তাঁর প্রতি আমাদের আকর্ষণের পরিচয়। আর কোনো বিদেশী লেখকের রচনা বাঙালির মনে এমন বিচিত্ররূপে প্রতিফলিত হয় নি।

শেক্সপীয়র আর আমরা

কেতকী কুশারী

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় সাম্প্রতিকতম যে প্রবণতা তাতে পাঠ্যসূচীতে উল্লিখিত টেক্সটবুকই প্রামাণিক গ্রন্থ, এবং অন্যান্য বইয়ে কৌতূহল নিষ্প্রয়োজন। যেখানে 'কাজ চালানোর মত' জানলেই পরীক্ষার পক্ষে যথেষ্ট, এবং যথেষ্ট ব'লে সশব্দে ঘোষিত, সেখানে 'তার চেয়ে একটু বেশি' জানতে চাওয়া অশোভন ধৃষ্টতা, এবং কার্যত পরিত্যক্ত। তরুণ মনের অনুসন্ধিৎসার উপর এই নির্দেশনামার ভয়াবহ ফল আমাদের শিক্ষাজগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট। শেক্সপীয়রের প্রতি অবহেলা ব্যাপ্ত ব্যাধির অন্যতম উপসর্গমাত্র। এ মুহূর্তে তাই ইংরেজির বিশেষ ছাত্রদের কাছেও শেক্সপীয়রের সযত্ন অধ্যয়ন আশা করা প্রবঞ্চনা; স্নাতকোত্তর ইংরেজি ক্লাসেও শেক্সপীয়রের বিখ্যাত পংক্তির উদ্ধৃতি ভাবলেশহীন স্তব্ধতার সূত্রপাত করে; কিং লীয়ার বা রোমিও-জুলিয়েটের মত নাটকের সঙ্গে পরিচয় প্রত্যাশা করাও বিড়ম্বনা হয়; শেক্সপীয়রের লম্বা কবিতা দুটি এবং সনেটগুচ্ছ তো প্রায় কিংবদন্তীতে পর্যবসিত, কিংবা যেন পৌরাণিক কুয়াশায় অবলুপ্ত। ম্যাকবেথ যাদের পাঠ্য, তাদের যে কিং লীয়র ওথেলো হ্যামলেটও স্বতঃই পাঠ্য, এ তত্ত্বটারও প্রতিবাদ হতে শুনেছি। "ম্যাকবেথ যখন পাঠ্য তখন ম্যাকবেথই পাঠ্য, ওথেলো সেখানে অপ্রাসঙ্গিক" এমন মত আমাদের ছাত্রদের মধ্যে বেশ দৃঢ় হয়ে এসেছে। কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, এই উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি এত ব্যাপক যে সাহিত্যচর্চা দ্রুত প্রহসনে বিলীয়মান।

এ বিশ্বাস আমাদের ছাত্রদের মধ্যে ফিরিয়ে আনা দরকার যে সিলেবাস প্রতীকধর্মী মাত্র। অর্থাৎ সিলেবাসে যদি থাকে কীট্‌সের নাইটিংগেল ওড্, তার অর্থ কীট্‌সের সব কটি ওড্ই পড়তে হবে, এবং ক্রমশ পরিচয়ের পরিধি বাড়াতে বাড়াতে কীট্‌সের সামগ্রিক কবিকৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া ইংরেজির বিশেষ ছাত্রদের কর্তব্যের অঙ্গ হবে। টুয়েলফ্‌থ্ নাইট নামটি সিলেবাসে একটি নিশানার মত কাজ করবে; তার অর্থ হবে: শেক্সপীয়রের কমেডির পূর্ণ রূপটি জানতে চেষ্টা করো।

শেক্সপীয়র নামটিও তেমনই একটি মহান প্রতীক।

শেক্সপীয়র এমন এক শিল্পী যাঁর রচনাবলী নিরন্তর বিশ্বচেতনার রসে পরিপ্লুত। শেক্সপীয়র-অধ্যয়ন নিজের মধ্যেই একটি স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ চর্চা। শুধুমাত্র শেক্সপীয়রকে জানার জন্য পৃথিবীর বহু লোকে ইংরেজি শেখেন—অন্তত কিছুদিন আগে পর্যন্তও শিখতেন, ফলিতবিজ্ঞাননির্ভর চোখঝলসানো সভ্যতার ক্রমবর্ধমান প্রসারের সঙ্গে হয়তো কিছুটা কমেছে। আবার, শেক্সপীয়রকে জানা হলে য়োরোপীয় মনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি রূপেরও পরিচয় পাওয়া যায়। য়োরোপীয় রেনেসাঁসের ইতিহাসে সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী। যেমন য়োরোপীয় মহাকাব্যের ক্ষেত্রে অতুলনীয় হোমার, যেমন মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টকেন্দ্রিক কাব্যচর্চার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দান্তে, যেমন অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ ও উনিশ শতকের গোড়ায় রোমান্টিক জাগরণের প্রতিভূ গ্যেটে, তেমনই রেনেসাঁসের সাহিত্যে শেক্সপীয়র। এ কথা সত্য যে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের উন্মেষ ধীরে ধীরে হয়েছিল, এবং কখনোই মধ্যযুগ-বনাম-আধুনিক শিরোনামাকে রক্তাক্ত বিরোধিতা ব'লে চালানো যায় না; কিন্তু ব্যাপক বিচারে এই দুই পর্যায়ের মধ্যে একটি নিশ্চিত পার্থক্য দেখা যায়,

যার সূচনাকেই ইতিহাসে রেনেসাঁস নাম দেওয়া হয়েছে। এ সময়ে য়োরোপ খ্রীষ্টকেন্দ্রিক চিন্তার পুনরাবৃত্ত পথ থেকে ক্রমাগত অব্যাহতি পেতে থাকে, গ্রীস এবং রোমের প্রাক্-খ্রীষ্টীয় সভ্যতার তাৎপর্য ক্রমশ উপলব্ধি করতে থাকে এবং তা থেকে প্রেরণালাভ করতে থাকে। ত্রিমূর্তি ঈশ্বর, ঈশ্বরপুত্র, এবং ঈশ্বরের মা, এই রূপগুলির নিরন্তর ধ্যানের পরিবর্তে বাস্তব মানুষ, তার সমস্যা, তার আকৃতি অনুশীলনের বিষয় হয়ে পড়ে। মর্ত্যবিমুখী এবং স্বর্গাভিলাষী উদ্যমের পরিবর্তে মাটির পৃথিবীকে এবং মানুষকে জানবার বুঝবার ভালোবাসবার আগ্রহ প্রকট হয়। অনিবার্য কারণে মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে আবার সেই বিনিময়ের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় যা প্রাচীন গ্রীসে ছিল, এবং যা খ্রীষ্টকেন্দ্রিক আমলে চাপা পড়ে গিয়েছিল। মধ্যযুগের সাহিত্য শিল্প সংগীত সর্বত্রই কখনও উদাত্তস্বরে, কখনও বক্তৃতার ঢঙে, কখনও দার্শনিকের বাণীর মত, আবার কখনও রাজনীতিবিদের সুবিধাবাদী প্রচারকার্যের মত, যাবতীয় পার্থিব উদ্যম এবং মানবীয় সম্পর্ককে নশ্বর এবং তুচ্ছ ব'লে এবং একমাত্র প্রতিশ্রুত নব-জেরুজালেমকেই মহাসত্য এবং শাশ্বত ব'লে তুলে ধরা হয়েছে। এই বিশিষ্ট আবেগ-জগৎ ছিল একান্তভাবে শহীদ হবার বাসনায় উদ্দীপিত, জাগতিক অর্থে নিষ্ঠুরভাবে আত্মলোপী; এর প্রচারকৌশল ছিল গণ-হিস্টিরিয়া-সৃষ্টি। এজন্য মধ্যযুগে মহান শিল্প সৃষ্ট হলেও শিল্পের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় নি। কবির যশোপিপাসা ব্যর্থ অহমিকার চূড়ান্ত বলে পরিগণিত হয়েছে, তাঁর অমরত্বলাভের প্রয়াসকে প্রায় বিজয়ী সেনানায়ক-সম্রাটদের খ্যাতি-পিপাসার তুল্য সাব্যস্ত করা হয়েছে; এবং অহংকারের অন্তিম প্রায়শ্চিত্ত এবং মুক্তির একমাত্র পন্থা হিসাবে খ্রীষ্টকেন্দ্রিক বিশ্বাসবৃত্তকেই সবার উপরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। মধ্যযুগীয় আবেগ-জগতের আর্ত হাহাকার তাই "আমি পাপ করেছি"র চীৎকারে, তার ক্রূরতম দ্বন্দ্ব ঈশ্বর এবং মানুষে, এবং তার সর্বশ্রেষ্ঠ আকৃতি কল্পিত দ্যুলোকের উদ্দেশ্যে। এর প্রতিতুলনায় রেনেসাঁসে পুনর্বার ঘোষিত হয় মানুষের মর্যাদা; প্রকৃতি এবং মানুষ এই দুই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সামগ্রীর মধ্যে নিরন্তর প্রতিক্রিয়া আবার সমাদৃত হতে থাকে; তার ফলে এক দিকে জন্ম নেয় আধুনিক বিজ্ঞান, অপর দিকে পুনর্জন্ম লাভ করে প্রকৃতি এবং মানুষের মধ্যে সেতু-স্থাপনকারী গ্রীক পুরাণ। এই সময়ে মানুষের যাবতীয় উদ্যম, তার দৈনন্দিন কর্মসূচীর পরিশ্রম, তার রুটি-বিছানা-বাপ-মা-স্ত্রী-পুত্র-আশ্রয়ী সুখদুঃখ, এবং তার বহুমুখী উচ্চ অভীপ্সা—সবই এক সহজ মর্যাদা পেতে থাকে।

শিল্পের অনিবার্য অহমিকা আর স্বতঃসিদ্ধ রইল না। বরঞ্চ শিল্পের অমৃতাভিলাষ উদাত্তকণ্ঠে ঘোষিত হতে থাকলো। সাধারণের সুখদুঃখকে সে আর উপেক্ষা করলো না, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করে তার অন্তর থেকেও সংগীত নিঃসৃত করতে থাকলো। মানুষ হবার যে অভিজ্ঞতা, তার মধ্যে যত বৈচিত্র্য, যত গভীর খদ, যত শ্যামল উপত্যকা, যত তুঙ্গ পর্বতশিখর, সব কিছুর মূল্যই স্বীকৃত হল, সব কিছুর আস্বাদন-ই কাম্য হল। শক্তিমত্তার ক্ষণস্থায়ী দম্ভকেও বুঝবার চেষ্টা করা হল, মানব-মানবীর প্রেমকেও প্রাচীন কলঙ্কের ছায়া থেকে মুক্ত করে হর্ষবিষাদের যৌথ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হল। সে বিচারে এই সময়েই মধ্যযুগের প্রতিতুলনায় আধুনিক যুগের সূত্রপাত হল। শেক্সপীয়র এ যুগের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী পুরুষ। তাঁর অভিজ্ঞতার কেন্দ্রবিন্দু মানবহৃদয়, তাঁর উচ্চাভিলাষ, ঐ হৃদয়ের উচ্চাভিলাষ তাঁর মাপকাঠি মানবিক মাপকাঠি, তাঁর সমগ্র রচনা ঐ মানবহৃদয়ের সুখদুঃখ আশা-নিরাশা আলস্য-উদ্যমের তরঙ্গে নিত্যদোলাচল। ঈশ্বর নয়, মানুষই তাঁর উপজীব্য, মানুষকে জানার নতুন নতুন বিস্ময়ে

তিনি অভিভূত। "What a piece of work is a man!" এর উদার ঘোষণা একান্তভাবে রেনেসাঁস পর্যায়ের আত্ম-আবিষ্কারের জাতিরূপ। এই কথা মধ্যযুগে উচ্চারিত হতে পারতো না। মধ্যযুগের একান্ত অভিজ্ঞতা ছিল ভগবান-ভক্তের দ্বিধাহীন দ্বন্দ্বে, যার আনুষ্ঠানিক অভিব্যক্তি নতজানু প্রার্থনাসংগীতে, যার মর্মবাণী :

I prude & kene
Thu meke an clene
Thu art ded for me
& i liue thoru the

অর্থাৎ

আমি অহংকারী আমি ধৃষ্ট
তুমি বিনয়ী তুমি পবিত্র
তুমি আমার জন্য মৃত
আমি তোমার মধ্যে জীবিত।

এ অভিজ্ঞতায় সংসার সম্বন্ধে একমাত্র সার কথা তার পদ্মপত্রনীরত্ব, মরলোক হাট বা মেলার হৈ চৈ, জনসমুদ্র বুদ্‌বুদ্ এবং ফেনায় উচ্ছ্বসিত, সুখদুঃখ ভূতপত্‌রীর মায়াবী খেলা। পৃথিবী হচ্ছে faire felde ful of folke (fair field full of folk)। পৃথিবী fareth as a fantasy ; তার পরিচয় fantum and feiri (phantom and fairy)।

এর প্রতিতুলনায় শেক্সপীয়র তাঁর কাব্যে নাটকে মানুষের আকৃতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য ব'লে স্বীকার করলেন। কখনো তিনি ক্ষত্রিয় জীবনের উত্থানপতনের কাতর দৃশ্য দেখে করুণাময় হলেন,

For God's sake, let us sit upon the ground
And tell sad stories of the death of kings . . .

কিন্তু ন্যায়দণ্ড একটুও শিথিল করলেন না দুরাকাঙ্ক্ষী প্রাণিহন্তার বিচারে ; পাপের শাস্তি আগামী নরকের জন্য না রেখে এই পৃথিবীতেই তার ব্যবস্থা করলেন,

But in these cases
We still have judgement here ; that we but teach
Bloody instructions, which , being taught, return
To plague the inventor ; this even-handed justice
Commends the ingredients of our poison'd chalice
To our own lips.

সংসারের ক্ষণস্থায়িত্ব এবং কালের সর্বগ্রাসিতা রেনেসাঁস মর্মে-মর্মে অনুভব করলেও মধ্যযুগীয় সদৃশ উপলব্ধির সঙ্গে তার প্রধান পার্থক্য এইখানে : মধ্যযুগে কালের সব-নিড়ানো কাস্তে মানুষের সব সাধনাকে পরলোকের উজ্জ্বল গোলাঘরের জন্য শস্যে পরিণত করে, আর রেনেসাঁসে কালের নখর মানুষের প্রেমকে তীব্রতর করে, মানুষের উদ্যমকে দৃপ্ত মর্যাদা দেয়।

This thou perceiv'st, which makes thy love more strong,
To love that well which thou must leave ere long.

কালের সঙ্গে কবির মুখোমুখি সংগ্রাম। এখানে কবি কালকে চ্যালেঞ্জ করেন। তিনি আহ্বান জানান কালের ক্ষমতা সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত হয়ে—"ওরে সর্বভুক কাল, খর্ব কর সিংহের নখর"[১], কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে—

Yet, do thy worst, old Time: despite thy wrong,
My love shall in my verse ever live young.

শুধুমাত্র সনেটগুচ্ছটিতেও এই বক্তব্যগুলি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি: মানুষের জৈবিক সত্তার গুরুত্ব, প্রকৃতির ঋতুচক্রের অনিবার্য গতির মধ্যে মানুষের জীবনছন্দের অন্তর্ভুক্তি, প্রকৃতির মত মানুষের ক্ষেত্রেও ব্যক্তির সন্তানোৎপাদনের মধ্য দিয়ে জাতির সত্তা-সংরক্ষণ, কালের সর্বগ্রাসিতা, প্রেমের কালজয়ী আকৃতি, কবিতার মাধ্যমে প্রেমের অমরত্ব লাভ, এবং সবার উপরে কবিতা তথা শিল্পের দৃপ্ত কালজয়ী অমৃতাকাঙ্ক্ষা। এ বিচারে সনেটগুলিকে রেনেসাঁসের সর্বাপেক্ষা উচ্চাভিলাষী গীতিমুখর কীর্তি বললে অত্যুক্তি হয় না। কালজয়ী কবিতা হিসাবে সনেটগুচ্ছের সন্দেহাতীত সার্থকতা তাঁর বক্তব্যকে প্রমাণের দৃঢ়তা দিয়েছে। কবির উচ্চারিত আকাঙ্ক্ষা সেই কবিতাতেই উপাত্ত হয়েছে। অর্থাৎ কাব্য হিসাবে সনেটগুলির উৎকর্ষই বক্তব্যসমূহের চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা করেছে।

মধ্যযুগে আদর্শ ছিল আত্মলোপ; তাই আদর্শ পন্থা ছিল মানবজাতির ক্রমলোপ: যাতে গৃহচ্যুত মানবজাতি পৃথিবীর তীর্থ পরিক্রমা করে আবার স্বগৃহে—ঈশ্বরের নগরে—প্রত্যাবর্তন করতে পারে। পতনোত্তর মানুষ একান্তভাবে উদ্বাস্তু হিসাবে বিবেচ্য। তার কাম্য স্বর্গের বাস্তুভিটায় প্রত্যাবর্তন; তার পাথেয় ক্রুশ; তার সাফল্য অন্তিম বিচারে অলৌকিক করুণা-নির্ভর। সারা মধ্যযুগে সমষ্টিগতভাবে মানবজাতির একটা বিশাল দেশত্যাগ এবং দেশান্তরযাত্রার আইডিয়া পরিলক্ষিত হয়। যেন স্বর্গের দিকে আবালবৃদ্ধবনিতার এক প্রকাণ্ড মিছিল চলেছে এক সুবৃহৎ গণ-অভিপ্রয়াণে। তাই এ যুগে প্রকীর্তিত গুণ কৌমার্য; মানুষের জীবনে প্রকৃতির নিয়মানুসারে জৈবিক প্রবৃত্তির অভিব্যক্তি দণ্ডিত; নরনারীর যৌন আকর্ষণ পতনোত্তর গ্লানিতে কলুষিত; উদ্ভিদ এবং পশুপক্ষীর জীবনের সঙ্গে তাই মানবজীবনের একাত্ম অনুভূতি অস্বীকৃত; প্রকৃতির প্রতি মানুষের সমবেদনা, বন্ধুত্ব এবং শ্রদ্ধার ভাব অননুমোদিত, কিন্তু প্রকৃতি মানুষের দাস, মানুষের ব্যবহারের সামগ্রী হিসাবে গৃহীত। মানুষ প্রকৃতির ঊর্ধ্বে; এবং প্রকৃতির উর্বরতার বিপক্ষে মানুষের কৌমার্য প্রতিস্থাপিত।

শেক্সপীয়রে—রেনেসাঁসের বাক্‌পটু মুখপাত্রে—এই সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত। মানুষের জৈবিক আকৃতির জয়গানে তিনি মুখর; উর্বরতার মাহাত্ম্যে সারা সনেটগুচ্ছ স্পন্দমান; রোমিও-জুলিয়েটের গান্ধর্ব বিবাহ তাঁর জগতে অভিনন্দিত; ওথেলো-ডেসডেমোনার অসবর্ণ বিবাহ পূর্ণ-অনুমোদিত; অ্যান্টনির সাম্রাজ্য-ত্যাগী ব্যভিচারী প্রেম মহিমান্বিত। রোমিও-জুলিয়েট নাটকের উৎস যেসব লেখকদের রচনা থেকে, যেমন দা পোর্তো, বান্দেল্লো, ব্রুক, তাঁরা সকলেই যৌবনের অসংযত হঠকারিতা এবং বাসনাদমনে

১ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ

অক্ষমতার জন্য নায়কনায়িকাকে অল্পবিস্তর গালাগাল করেছেন, এবং তাদের অন্তিম ট্র্যাজেডিকে শাস্তি হিসাবে দেখেছেন; কিন্তু শেক্সপীয়রে ধর্মভীরু ফকিরের মুখ দিয়ে যৌবনের উদ্দামতার পরিণাম সম্বন্ধে যদিও কিছুটা সতর্কবাণী উচ্চারিত করানো হয়েছে, তবুও তা নাটকের মর্মবাণীর ভগ্নাংশমাত্রও কি না সন্দেহ। বরঞ্চ প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গির নিদর্শন হিসাবে তাকে তুলে ধরে তার প্রতিতুলনায় শেক্সপীয়র এই বক্তব্যই উপস্থাপিত করেছেন যে দুঃসাহসী আবেগ "ট্রু লাভে"র অপরিহার্য অঙ্গ, এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে অনন্ত বীরত্ব এবং অনন্ত স্নেহ; একে দণ্ডিত করা দূরের কথা, সমাজ যে এর মূল্য বোঝে না এবং সামাজিক সংঘর্ষের যূপকাষ্ঠে একে যে আত্মবলি দিতে হয় সেটাই নিদারুণ পরিতাপের বিষয়। সাবধানী মনোবৃত্তির প্রবীণসুলভ উপদেশের উদ্দেশ্যে শেক্সপীয়রীয় প্রেমিকের যথার্থ উত্তর হচ্ছে:

Hang up philosophy!
Unless philosophy can make a Juliet.

শেক্সপীয়র পূর্ণপ্রত্যয়ের সঙ্গে নাটকের পর নাটকে ঘোষণা করেছেন প্রেমের সার্বভৌমত্ব; মধ্যযুগীয় প্রেমের থেকে ভিন্ন এক অর্থে এবং পরিপ্রেক্ষিতে। মধ্যযুগে প্রেম প্রধানত ঈশ্বরের বৃত্তি: মানুষের দুঃখে তিনি বিগলিত, মানুষের প্রতি প্রেমে তিনি অধীর, তাই তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ। কিন্তু মানুষের প্রেমকে হতে হবে সর্বতোভাবে ঈশ্বরমুখী, ঈশ্বরের সৃষ্ট পৃথিবীর দিকে তা যেন ধাবিত না হয়। "ঈশ্বরকে ভালোবাসা" এবং "ঈশ্বরের প্রাণীদের ভালোবাসা" এই দুয়ের মধ্যে এক তীব্র দ্বন্দ্ব মধ্যযুগের য়োরোপে সৃষ্টি করা হয়েছিল। "ঈশ্বরের প্রাণীদের—যেমন স্ত্রীপুত্র পশুপক্ষী—এদের ভালোবাসতে গিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসতে ভুলে যেয়ো না" (অর্থাৎ "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর। জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"এর সম্পূর্ণ বিপরীত কোণ)—এই সতর্কবাণী গৃহস্থের উদ্দেশ্যে এতবার উচ্চারিত হয়েছে যে গার্হস্থ্যধর্মই এক দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্রিয়াকলাপে দাঁড়িয়ে গেছে। সন্ন্যাসীরাই ভগবানের প্রিয়তর বিবেচ্য হয়েছে, তারাই ভগবানের বিচিত্র রান্নাঘরের সোনার পাথরবাটি, গৃহস্থেরা মাটির হাঁড়িকুঁড়ি মাত্র[২]। বিবাহ আদি অভিশাপে অভিশপ্ত, সম্ভব হলে বর্জনীয়, নিতান্ত অসম্ভব হলে কোনোমতে সহনীয় মাত্র। "It is better to marry than to burn" -জাতীয় অনিচ্ছাকৃত মীমাংসা এই যুগের পক্ষে লাক্ষণিক। নরনারীর মিলন মূলত পাপমেঘাচ্ছন্ন, খ্রীষ্টীয় স্যাক্রামেন্টের গুণে কিছুটা পরিত্রাত। প্রজনন তাই নিরানন্দ কর্তব্যমাত্র, স্ত্রীসহবাসে আনন্দলাভ করা পাপ। নারী আদি জননীর দোষে দুষ্টা। ব্রহ্মচর্যই অন্তিম আদর্শ। সকলেই এ পথের পথিক হলে খুব ভালো হয়। স্বর্গের উদ্দেশ্যে গণ-অভিপ্রয়াণে তাহলে আর কোনোই বাধা থাকে না।

মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে এই বিশ্বাসসমষ্টি যে বিশেষ অবস্থার সূচক তার প্রতিক্রিয়া অনিবার্য, এবং রেনেসাঁসে তা জাগ্রত। নিসর্গবিরোধী মানুষকে আবার নিসর্গের কোলে ফিরে আসতে হল। শেক্সপীয়রে তাই আমরা বারে বারে শুনি যে অনৈসর্গিকতার পথে মুক্তি নেই; মানুষের মৌল নৈসর্গিকতাই তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। গাছপালার জন্ম বৃদ্ধি ক্ষয়, পুষ্পোদ্গম, অঙ্কুরোদ্গম, ফল এবং শস্যের

২ *Epistola adversus Jovinianum*-এ সেণ্ট জেরোম বলেন যে প্রাতিষ্ঠানিক খ্রীষ্টধর্ম বিবাহকে দণ্ডনীয় বিবেচনা করে না, কিন্তু বিবাহের জন্য সেই স্থান নির্দিষ্ট করে, খানদানী পরিবারের জীবনযাত্রায় মাটি বা কাঠের পাত্রের যে স্থান।

পরিপক্কতা, ঝরা পাতার অনিবার্য পচন এবং নতুন পাতার অনিবার্য উন্মেষ, মেঘের সঙ্গে রৌদ্রের খেলা, শাখার সঙ্গে বাতাসের সৌহার্দ্য, তরঙ্গের উচ্ছল গতি, পাখির কাকলি, মৃত্তিকার রসশোষণ—শেক্সপীয়রে এই পরিব্যাপ্ত মহান জীবনের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হল মানুষের জীবন। নিসর্গাশ্রয়ী চিত্রকল্প এক নতুন তাৎপর্য পেল শেক্সপীয়রের ভাষায়। শীত যেমন তার অত্যাচারের চিহ্ন রাখে বৃক্ষলতায়, প্রান্তরে, তেমন রাখে কাল মানুষের ললাটে, কপোলে।

When forty winters shall besiege thy brow,
And dig deep trenches in thy beauty's field . . . .

That time of year thou mayst in me behold
When yellow leaves, or none, or few, do hang
Upon those boughs which shake against the cold,
Bare ruin'd choirs, where late the sweet birds sang.

নাইলতটের কর্দমের উষ্ণ উর্বরতা সঞ্চারিত হল অ্যাণ্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রার ভাষায়। নিসর্গ এবং মানুষ এক হল এরকম উপমায় :

This common body,
Like to a vagabond flag upon the stream
Goes to and back, lackeying the varying tide,
To rot itself with motion.

ম্যাকবেথের দুর্গে ডানকানের পদক্ষেপের সঙ্গেসঙ্গেই দুর্গেশ্বর-দুর্গেশ্বরীর আগামী অনৈসর্গিক আচরণের সূক্ষ্ম সূচনা করবার উদ্দেশ্যে দুর্গের চার পাশের শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রশংসা করা হল। গ্রীষ্মের অতিথি "temple-haunting martlet" পাখি তার আনাচে কানাচে বাসা বানিয়েছে, বানিয়েছে তার ঝুলন্ত বিছানা আর প্রজনক দোলনা। যেখানে মার্টলেট বাসা বাঁধে সেখানকার হাওয়া স্নিগ্ধ। নিসর্গের এই স্নিগ্ধ প্রজননক্রিয়া ও নীড়নির্মাণের গৃহেই শীঘ্র হত্যা হবে।

লক্ষণীয়, যে নিসর্গের নিত্যপরিবর্তনশীল রূপ চিত্রকল্পকে এক অনিবার্য গতি দেয়। নিসর্গের জন্ম-বৃদ্ধি-ক্ষয়ের গতির সঙ্গে ভাষার গতি বাঁধা হয়ে যায়।

Edward's seven sons, whereof thyself art one,
Were as seven vials of his sacred blood,
Or seven fair branches springing from one root:
Some of those seven are dried by nature's course,
Some of those branches by the Destinies cut;
But Thomas, my dear lord, my life, my Gloucester,
One vial full of Edward's sacred blood,

One flourishing branch of his most royal root,
Is crack'd, and all the precious liquor spilt;
Is hack'd down, and his summer leaves all vaded,
By envy's hand and murder's bloody axe.

এখানে নৈসর্গিক চিত্রকল্পের স্বাভাবিক পরিণতি অনৈসর্গিক মৃত্যুর কুঠারাঘাতে স্তব্ধ, ব্যথিত।

কিন্তু নৈসর্গিক ক্ষয় রূপান্তরিত হয় পুনর্জন্মে; জন্ম-বৃদ্ধি-ক্ষয়ের ছন্দের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিতে পারাই মহাকালের কাছে মানুষের উত্তর।

When lofty trees I see barren of leaves,
Which erst from heat did canopy the herd,
And summer's green all girded up in sheaves,
Borne on the bier with white and bristly beard,
Then of thy beauty do I question make,
That thou among the wastes of time must go,
Since sweets and beauties do themselves forsake
And die as fast as they see others grow;
And nothing 'gainst Time's scythe can make defence
Save breed, to brave him when he takes thee hence.

যেন নিসর্গের কাছেই সৃষ্টির ছন্দ এবং উল্লাস শিক্ষা করেছেন শেক্সপীয়র।

For never-resting time leads summer on
To hideous winter, and confounds him there;
Sap check'd with frost, and lusty leaves quite gone,
Beauty o'ersnow'd and bareness everywhere:
Then, were not summer's distillation left,
A liquid prisoner pent in walls of glass,
Beauty's effect with beauty were bereft,
Nor it, nor no remembrance what it was:
But flowers distill'd, though they with winter meet,
Leese but their show; their substance still lives sweet.

এখানে দ্রুতপরিবর্তনশীল ঋতুচক্রের পরিপ্রেক্ষিতে যেমন সঞ্চিত ফুলের নির্যাসকে ধরা হয়েছে, তেমন সূচনা করা হয়েছে নিরন্তর অবক্ষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে নিরন্তর জন্মের। পিতার দেহকে ছেড়ে যৌবন পুত্রের দেহে প্রবেশ করে। দেহান্তর ঘটে, কিন্তু যৌবনের জীয়ানরস সঞ্চিত থাকে; পিতৃপুরুষদের সত্তা ভিন্ন আধারে বেঁচে থাকে। আবার, শেক্সপীয়রের নিজের কাব্যেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে: তাঁর অসংখ্য অভিজ্ঞতা বাস্তব অর্থে অবলুপ্ত হয়েছে; কিন্তু সেসব থেকে তিনি যে রস নিঃশেষে নিংড়ে নিয়েছেন তা

তাঁর রচনায় সঞ্চিত হয়ে আছে, কীট্‌সের মাটির নীচে সংরক্ষিত প্রাচীন মদের মত, যাতে আছে ফ্লোরা, গ্রামের সবুজ, নৃত্য, প্রভাঁসাল গীত এবং সূর্যদগ্ধ হর্ষোৎসবের স্বাদ। শেক্সপীয়রের কাব্যে উত্তর-পুরুষের জন্য জীয়ানরস সঞ্চিত। বিশ্বের পিপাসু সকলের জন্যেই অমৃতের উত্তরাধিকার, যা পান করলেও পূর্ণ থাকে।

নিসর্গে ব্যক্তির মৃত্যুর ক্ষতি ব্যক্তির প্রজনন দ্বারা পরিপূরিত হয়; মানুষ এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। ডাব্লিউ. এইচের উদ্দেশ্যে তাই আকুল আবেদন, পিতৃত্বের গৌরব যে কি তা বোঝানোর জন্য এত আপ্রাণ চেষ্টা। কৌমার্যকেন্দ্রিক আত্মলোপী হিস্টিরিয়ার বিরুদ্ধে তাই অকুণ্ঠিত প্রজননের জয়গান। কেউ কেউ বলবেন টেম্পেস্ট এবং শেষ পর্যায়ের অন্যান্য নাটকে কৌমার্যের স্বর শোনা যায়। কিন্তু দেখতে হবে, নাটকের সামগ্রিক বক্তব্যে কৌমার্যের স্থান কি। টেম্পেস্টে, কিছু অনুধাবনের পর সহজেই বোঝা যায় যে কৌমার্যের স্নিগ্ধ সংযমব্রতের মধ্য দিয়ে নরনারীকে গার্হস্থ্যধর্মের পূর্ণাঙ্গ আনন্দে উত্তীর্ণ করাই তাঁর অভিপ্রেত; ফার্দিনান্দ-মিরান্দাকে সাময়িক সংযমের যে উপদেশ প্রস্পেরোর মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে তার উদ্দেশ্য বিবাহের অর্থকে পরস্পরের কাছে আরও উজ্জ্বল করা, তার কাজ অনেকটা আর্টের বা অনুষ্ঠানের মত: মাত্রাব্যবহারের সাহায্যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রাকৃত প্রবণতার সৌন্দর্যকে তীব্রতর করে তোলা। নিসর্গের স্বতঃস্ফূর্ত মিলনোৎসবের সঙ্গে আর্টের স্বেচ্ছা-গৃহীত সংযম: এই দুইয়ের সমন্বয়ে আদর্শ বিবাহ। বিবাহ পর্যন্ত কৌমার্যরক্ষা একটি আনুষ্ঠানিক আচার; এই আচাররক্ষায় বিবাহের আত্মিক সৌন্দর্য প্রগাঢ়তর করা হয়। কারণ যখন বর-বধূ পরস্পরের কাছে কৌমার্য সমর্পণ করে তখন তাদের সে সিদ্ধান্ত এবং সে ক্রিয়া তারা ভবিষ্যৎ জীবনে পরস্পরের জন্য যত ত্যাগস্বীকার করতে প্রস্তুত হচ্ছে তারই যোগ্য প্রতীক হয়ে পড়ে। ফার্দিনান্দ তাই বলে:

As I hope
For quiet days, fair issue and long life,
With such love as 'tis now, the murkiest den,
The most opportune place, the strong'st suggestion
Our worser genius can, shall never melt
Mine honour into lust, to take away
The edge of that day's celebration
When I shall think, or Phoebus' steeds are founder'd,
Or Night kept chain'd below.

সাময়িক সংযমের ভূমিকা অতিক্রম করে তাই আমরা আবার পৌঁছোই প্রজননের জয়গানে:

Honour, riches, marriage-blessing,
Long continuance, and increasing,
Hourly joys be still upon you!
Juno sings her blessings on you.
Earth's increase, foison plenty,
Barns and garners never empty:

Vines, with clust'ring bunches growing;
Plants with goodly burden bowing;
Spring come to you at the farthest
In the very end of harvest!
Scarcity and want shall shun you;
Ceres' blessing so is on you.

মাচ্ অ্যাডু অ্যাবাউট নাথিং'এ তাই বেনেডিক-বিয়াত্রিচের মিলন অবশ্যম্ভাবী; লাভ্স্ লেবার্স লস্ট'এ যুবকদের চিরকুমারসভা মজাদার উপায়ে উপহসিত; টুয়েল্ফ্থ্ নাইটে অলিভিয়ার ভ্রাতৃশোকজনিত বিবাহবিরোধিতা সংবেদনশীল ঠাট্টায় দূরীকৃত এবং তার স্নেহপিপাসু অন্তরের প্রকৃত চিত্র উদ্‌ঘাটিত। মধ্যযুগে নারী সন্দেহের ছায়ায় আবৃতা; কুমারী মেরী ঈশ্বরমাতৃত্বের মাধ্যমে নারীর পাপের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। যীশুর জন্মকাহিনীর মধ্য দিয়ে যে অনৈসর্গিক প্রজননবৃত্তান্তকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তা নারীর মর্যাদাবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত। এই অভিশাপ থেকে নারীকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে পুরুষকে, মুক্তি দিল রেনেসাঁস। টু জেণ্টেল্মেন অব ভেরোনার জুলিয়া থেকে সিম্বেলিনের ইমোজেন পর্যন্ত নারী প্রেমশালিনীর সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। এর আগে গ্রীক ট্র্যাজেডিতে তাকে দেখা গিয়েছিল ভাগ্যের উত্থানপতনের তরঙ্গশীর্ষে-শীর্ষে। কিন্তু প্রেমদাত্রী এবং প্রেমপাত্রী হিসাবে তার নবজন্ম ঘটলো রেনেসাঁসে, এবং উজ্জ্বলভাবে, শেক্সপীয়রের নাটকে। কৌমার্যের জন্য কৌমার্যের মধ্যযুগীয় আদর্শ শেক্সপীয়রে সজ্ঞানে বর্জিত হল। এর প্রামাণিক নিদর্শন অল্স্ ওয়েল দ্যাট এণ্ড্স্ ওয়েল'এর প্রথম দৃশ্যের বিখ্যাত প্যারোলস-হেলেনা সংলাপে। সেখানে বিদ্রূপাত্মক রসিকতার মাধ্যমে শেক্সপীয়র যা বললেন তা নগণ্য নয়, রেনেসাঁস মানুষের সামগ্রিক আত্মজিজ্ঞাসার আদর্শেই তা অনুপ্রাণিত।

It is not politic in the commonwealth of nature to preserve virginity. Loss of virginity is rational increase, and there was never virgin got till virginity was first lost. That you were made of is metal to make virgins. Virginity, by being once lost, may be ten times found: by being ever kept, it is ever lost. 'Tis too cold a companion: away with 't! . . . . There's little can be said in 't; 'tis against the rule of nature. To speak on the part of virginity is to accuse your mothers, which is most infallible disobedience. He that hangs himself is a virgin: virginity murders itself, and should be buried in highways, out of all sanctified limit, as a desperate offendress against nature. Virginity breeds mites, much like a cheese, consumes itself to the very paring, and so dies with feeding his own stomach. Besides, virginity is peevish, proud, idle, made of self-love, which is the most inhibited sin in the canon. Keep it not; you cannot choose but lose by 't! Out with 't! Within the year it will make itself two, which is a goodly increase, and the principal itself not much the worse. Away with 't!

যৌবনে আদিরসাশ্রিত কবিতা লেখার জন্য পাছে অন্তে স্বর্গচ্যুতি হয় সেই দুর্ভাবনায় পুরোনো কবিতার সমস্ত বক্তব্যকে 'বাতিল' বলে ঘোষণা করতে হয়েছিল চসরকে। ট্রইলাস এবং ক্রেসিডার ট্র্যাজিক প্রণয়কাহিনী লিপিবদ্ধ করবার পর শেষ স্তবকগুলিতে পৌঁছে নির্ভেজাল ভাষায় দণ্ডিত করতে হয়েছিল নরনারীর পার্থিব প্রেমকে। দান্তের বিয়াত্রিচে তখনই কাব্যের শাশ্বতী যখন সে ঈশ্বরপ্রাপ্তির সোপান; অজ্ঞাতনামা কবির রচিত চতুর্দশ শতাব্দীর ইংরেজি কাব্য পার্ল-এ মৃত শিশুকন্যা মৃত্যুর পরেই স্বর্গীয় দ্যুতিতে উদ্‌ভাসিত এবং যীশুর করুণারসে সিঞ্চিত হয়ে গরীয়সী; বেঁচে থেকে সাধারণ মানবীর মত ঘরকন্না করলে সে'ও ঈভের পাপের ভার থেকে মুক্ত হত না: শৈশবে মরে গিয়েই-না তার এত অনায়াসে মোক্ষ হল।

সেক্ষেত্রে শেক্সপীয়রের নায়িকারা, রোমান্টিক রোজালিণ্ড থেকে চতুরা ক্লিওপেট্রা অবধি, জীবন ও প্রেমের জয়গান করছেন। তাঁর নাটকে ঘটনার, চরিত্রের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বারংবার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এই কথা, যে সত্য একপেশে নয়, তা ব্যাপক এবং বহুমুখী, হাজার রকম দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে প্রত্যেকটিরই কিছু কিছু সার্থকতা আছে, কিন্তু কোনো একটি অভিজ্ঞতা যদি তর্কাতীতভাবে সত্য হয় তা হচ্ছে, এই যে, মানুষ মানুষকে ছাড়া বাঁচতে পারে না। মারামারি হয়, আবার সন্ধি হয়, ক্ষতস্থান জোড়া লাগে। পরিবারে, সমাজে অপরাধ আচরিত হয়, পাপের প্রায় শ্চিত্ত হয়, জীবনযাত্রা আবার চলতে থাকে। জীবন কখনও থমকে থাকে না, ম্যাকবেথ-লেডী ম্যাকবেথ-হ্যামলেট-ওফেলিয়া-ওথেলো-ডেসডেমোনা-লীয়ার-কর্ডেলিয়া এদের মৃত্যুর পরও চলতে থাকে; চিত্তশুদ্ধি হয় তার নতুন পথের সম্বল। প্রত্যেক নাটকের শেষে—কি কমেডি কি ট্র্যাজেডি কি "প্রবলেম প্লে" কি ঐতিহাসিক নাটক—জীবনযাত্রার অনিবার্যতা সূচিত হয়। নিসর্গে যেমন ঋতুচক্রের আবর্তন থেকে মুক্তি নেই, মানুষের জীবনেও তেমনি। এবং মানুষ হবার যে দুটি বড় শিক্ষা তা হচ্ছে প্রেম এবং উদ্যম থেকে, যে দুটিকে তিনি একত্র করেছেন লাভ্‌স্‌ লেবার্স্‌ লস্ট এই নাট্যনামটিতে। স্বার্থ, বিত্ত, ক্ষমতা ইত্যাদি অনুষঙ্গ থেকে মুক্ত করে নরনারীর মিলন তথা বিবাহকে তাই দেখবার চেষ্টা চলেছে। কিং লীয়ারে তাই ফ্রান্সের রাজা যৌতুকলোভী ডিউক অব বারগাণ্ডীকে উদাত্তকণ্ঠে বলছে:

My Lord of Burgandy,
What say you to the lady? Love is not love
When it is mingled with regards that stand
Aloof from the entire point. Will you have her?
She is herself a dowry.

"ট্রু লাভে"র প্রকৃতি কি তা নিয়ে অনুসন্ধানের আর অন্ত নেই শেক্সপীয়রে। কালের বৈনাশিক হিমবাহের কারণে তা নিবিড়তর তীব্রতর সুরে ঝংকৃত:

What is love? 'tis not hereafter;
Present mirth hath present laughter;
What's to come is still unsure:
In delay there lies no plenty;

Then come kiss me, sweet-and-twenty.
Youth's a stuff will not endure.

আবার, আন্তর্জাতিক অভিজাত সমাজে তার ক্রিয়াকলাপ শুরু হলে তার খাতিরে সাম্রাজ্য এবং খ্যাতিও পরিত্যজ্য, যেমন অ্যান্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রায়। যখন তার পরিণতি অসবর্ণ বিবাহে তখন তার খাতিরে প্রাচীনপন্থী পিতৃগৃহও বর্জনীয়, যেমন করতে হল ডেসডেমোনাকে। লক্ষণীয়, শেক্সপীয়রের জগতে কেউই পিছু হটে না "ট্রু লাভে"র চ্যালেঞ্জে। Let me not to the marriage of true minds। Admit impediments এই তাদের যোগ্য ধুয়া। বিপদকে তারা বরণ করে, সংগ্রামকে তারা ডরায় না, ক্লেশকে তারা স্বীকার করে। অবহেলে পান করে বিষ, অবলীলাক্রমে ধারণ করে ছদ্মবেশ। ফলত, দৈহিক অর্থে তাদের কখনো কখনো দুর্ঘটনা বা মৃত্যু ঘটলেও আত্মিক দিক থেকে তাদের কখনোই পরাজয় হয় না। বাঁচলে তো হয়ই, মরলেও তারাই জয়ী হয়।

সর্বতোভাবে জীবনের জয়কেই শেক্সপীয়র প্রতিষ্ঠা করেন। যখন বৈরাগ্যের ভাব আসে, তখন তাও জীবনজিজ্ঞাসার সূত্র ধরেই আসে। মৃত্যুর ওপারে কি সে দেশ, তার সম্বন্ধে কৌতূহল মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে— The undiscover'd country from whose bourn / No traveller returns। কিন্তু কখনোই এ-জাতীয় চিন্তাকে এমন প্রাধান্য দেওয়া হয় না যা আবার মধ্যযুগীয় মর্ত্যবিমুখিতার প্রত্যাবর্তন ঘটাতে পারে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ট্র্যাজিক নায়কদের যত বড় বড় বুলি, তাও তুচ্ছ হয়ে যায় ওফেলিয়া বা ডেসডেমোনার মৃত্যুর আগে গাওয়া লোকসংগীত, "Tomorrow is Saint Valentine's day" বা "The poor soul sat sighing by a sycamore tree"র মর্মস্পর্শী সহজ সুরে। সে সুরের মাধ্যমে দৃঢ় হয় সাধারণ নরনারীর সুখদুঃখাশ্রয়ী জীবনযাত্রার অনিবার্য গতি।

রেনেসাঁসের এই এক মহান মুখপাত্র, যাঁর কবিতার দরদ, ভাষার ঐশ্বর্য, নাটকীয় ব্যাপ্তি এবং বৈচিত্র্য একই সঙ্গে বিদগ্ধগোষ্ঠীতে স্বীকৃত এবং রঙ্গালয়ে সাধারণ্যের অভিনন্দিত, যাঁর রচনাবলী এমন এক অণুবিশ্ব যা সংসারের বিশ্বস্ত দর্পণ, যার হৃদয়ে প্রতিফলিত দৃশ্যপরম্পরায় আমরা সহজেই চিনে নিতে পারি আমাদের প্রেম ঘৃণা জয় পরাজয় সংগ্রাম সন্ধি, যার মধ্য থেকে আমরা সংগ্রহ করতে পারি আমাদের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক সমস্যার সমাধান, চয়ন করতে পারি সংঘর্ষে শান্তি, অনাচারে প্রতিবাদ, কর্মে প্রেরণা, আলস্যে ভর্ৎসনা, নৈরাশ্যে সান্ত্বনা, আনন্দে উন্মাদনা। এই যে শিল্পী, তিনি লিখে গেছেন এমন এক ভাষায়, যার ব্যাকরণ এবং শব্দসম্ভারের সঙ্গে এক ঐতিহাসিক কারণে আমরা কয়েক পুরুষ ধরে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হয়ে আসছি। এ যে কত বড় সৌভাগ্য তা আমরা অনেক সময় উপলব্ধি করতে পারি না। উল্টে, আমাদের অজান্তে ইতিহাসের অলৌকিক ডাকে যে অযাচিত সম্পদ আমাদের দরজায় এসে হাজির হয়েছে, "ভুল ঠিকানায় এসেছ" ব'লে ফেরত ডাকে তাকে ব্যস্ত হয়ে জাহাজঘাটায় পাঠিয়ে দিতে চাই।

শেক্সপীয়র-স্মরণোৎসবের এই মুহূর্তে আমাদের জিজ্ঞাস্য, শেক্সপীয়রকে জানবার জন্য আমরা যত্নবান হব কি না; সেজন্যে ইংরেজিভাষার চর্চায় আগ্রহশীল হব কি না। বিশ শতকের ভারতবাসীর কাছেও ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের এই ইংরেজ শিল্পীর কিছু কথা আছে; সে-কথা অপ্রাসঙ্গিক নয়। য়োরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের মনের অনেক বিচিত্র এবং নিগূঢ় যোগ আছে, যে যোগ নেই য়োরোপ বা ভারতবর্ষের চীন জাপান পারস্য বা প্রাচ্যের অন্য কোনো দেশের সাথে। য়োরোপকে আমাদের চিনিয়ে দিতে শেক্সপীয়রের

ভূমিকা সামান্য নয়। যেমন অর্থনীতিতে মার্ক্স, মনস্তত্ত্বে ফ্রয়েড, দর্শনে কাণ্ট হেগেল, বিজ্ঞানে নিউটন আইনস্টাইন আমাদের আলোড়িত করেছেন, তেমন সাহিত্যে করেছেন শেক্সপীয়র।

অথচ ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় ক্ষীয়মাণ উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের শেক্সপীয়র-চর্চাতেও সন্দেহাতীত মন্দা এসেছে।

একমাত্র শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের নিজের চেষ্টায় ভিন্ন শিক্ষার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দুই দিক চিন্তা করে অতঃপর গৃহীত কোনো শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের দেশে অনুসৃত হয় নি। আধুনিক শিক্ষার গোড়াপত্তন হয় রাজনৈতিক কারণে—মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনের জন্য কেরানি তৈয়ারি এবং ব্রিটিশ রাজকে সুদৃঢ় করবার জন্য রাজভক্ত পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষিত পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি দ্বারা অনুপ্রাণিত রাজপুরুষগোষ্ঠী নির্মাণ। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানের সঙ্গে বাঙালি মনের সংঘর্ষের ফলে বাংলার রেনেসাঁস শিক্ষাকর্তাদের অভিপ্রেত ছিল না। সে নবজাগরণ ছিল তাদের ভবিষ্যৎদৃষ্টির বহির্ভূত, এবং অন্য উদ্দেশ্যে প্রচারিত এক ব্যবস্থার অচিন্তিতপূর্ব উপজাত সামগ্রী। মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আমদানী হলেও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানের চর্চা বা ইংরেজি ভাষার অনুশীলন কেবলমাত্র মূল উদ্দেশ্যই সাধন করে নি, তার গৌণ উপজাত প্রতিক্রিয়াগুলিই বাংলার মননশীল ও সৃষ্টিশীল জগতে প্রধান হয়ে উঠেছিল; এবং সেজন্যেই সে ব্যবস্থা এতদিন টিঁকেছিল। শক্তিশালী ভাষামাত্রেই সিংহদ্বার; তার সাহায্যে গোটা জাতি এবং সংস্কৃতির পরিচয় মেলে। তাই পশ্চিমের অনেকেই যেমন উপনিবেশশাসনে সুবিধার জন্য ঔপনিবেশিক ভাষা শিখতে অগ্রসর হয়ে পরে সেসব ভাষার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তার চর্চা, সে-দেশের সংস্কৃতিকে জানবার প্রয়াস, ইত্যাদি করেছেন—যার ফলে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব শিল্পতত্ত্ব ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে পশ্চিমের অনুসন্ধিৎসুদের কাজ এত স্মরণীয়—ঠিক তেমনই চাকরী পাবার সুবিধার জন্য পশ্চিমী বিদ্যা বা ইংরেজিভাষার চর্চা শুরু করে বাঙালিরা সেসব ক্ষেত্রে রসপিপাসু এবং অনুসন্ধিৎসু হয়েছে, সৃষ্টির নূতন নূতন প্রেরণা পেয়েছে।

এদিকে মূল উদ্দেশ্যে রচিত শিক্ষাব্যবস্থার যে কাঠামো তা বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয় নি। এবং তার ত্রুটির তালিকা অবস্থান্তরের পর্যায়ে পর্যায়ে ক্রমবর্ধমান হয়ে চলেছে। জ্ঞান এবং প্রয়োগ, তত্ত্ব এবং ব্যবহার, এই দুইয়ের সমন্বয়ে শিক্ষাদানের সুষ্ঠু রূপটি চোখের সামনে রাখা হয় নি—এবং ফলে গোলযোগের আর অন্ত নেই। শিক্ষাব্যবস্থায় সুচিন্তিত সংগঠন হয় নি—বরং বিষমদৃষ্টি বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষা হয়ে পড়েছে নিতান্তভাবেই অর্থকরী, যেখানে তেরো-চোদ্দ বছর বয়সেই অনার্সের বিষয় মনে মনে নির্ধারণ করে ফেলতে হচ্ছে। ঐ বয়সেই কলা বিজ্ঞান ইত্যাদি শাখায় জ্ঞান বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। সতেরো আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করা যে পূর্ণাঙ্গ স্কুল-শিক্ষার লক্ষণ হতে পারে সেভাবে কেউই চিন্তা করছেন না।

কেবলমাত্র রাজনৈতিক কারণে বেশিদিন ভাষাচর্চা করা যায় না। একটু-আধটু শেখা যায়, কিন্তু সংরক্ষণ করা যায় না। ইংরেজিচর্চা এদেশে যে এতদিন টিঁকেছে তার কারণ ঐ ভাষার মাধ্যমে পশ্চিমের ভাবভাণ্ডারের সঙ্গে আমাদের ক্রমশ নিবিড় পরিচয় হয়েছে এবং আমাদের সংগঠনমূলক সৃষ্টিমূলক কর্মে ও চিন্তায় এই পরিচয় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজিকে রাখবার খুব জোরালো কারণ প্রথমত তার নিজস্ব ঐশ্বর্য, দ্বিতীয়ত তার অন্য ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারার ক্ষমতা। ইংরেজি ব্যাকরণ আয়ত্ত করবার, ইংরেজি বই কেনবার পড়বার যে সুবিধাটুকু আমরা ঐতিহাসিক কারণে পেয়ে গেছি, তার পূর্ণ

সদ্ব্যবহার করলে আমরা এই ভাষার সিংহদ্বারের সাহায্যে পশ্চিমের মনের বেশ খানিকটা বুঝতে পারবো, এবং তা জানলে নিজেদের মন বুঝতে সুবিধা হবে। ঘর এবং বাহির উভয়কে যথার্থ জানলে শিক্ষা সুষম হবে। বাহিরকে যে জানে না ঘরের অর্থ তার কাছে অসম্পূর্ণ। ম্যাথু আর্নল্ড এ-জন্যই খুব জোরের সঙ্গে বলেছিলেন যে সাহিত্যসমালোচকের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হবে নিজের ঐতিহ্য ছাড়াও অন্ততপক্ষে আরেকটি, এবং আদর্শ অবস্থায় যতগুলি সম্ভব, অন্য ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। নিজের ঐতিহ্য থেকে অধীতব্য ঐতিহ্য যত ভিন্নমুখী হয়, সংঘর্ষের ফলে প্রকৃত অনুসন্ধিৎসুর শিক্ষালাভ তত তীব্র হয়। ক্রমশ পরিচয়ের ফলে ঐতিহ্যগুলির পরস্পরবিরোধিতা ঘুচতে ঘুচতে অন্তর্নিহিত সাদৃশ্যগুলি প্রতীয়মান হতে থাকে, এবং এই অনুসন্ধান ছাত্রের চরিত্রে জীবনবীক্ষার পূর্ণতা আনে।

এইভাবে ইংরেজি ভাষার চর্চা ইংরেজি সাহিত্যের বিশেষ ছাত্র ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের ছাত্রদের ঘর-বাহিরকে জানতে, গৃহ এবং গোষ্ঠীকে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে, সহায়তা করতে পারে। ইংরেজি জ্ঞানের, এবং আনুষঙ্গিক পাশ্চাত্ত্য আচারব্যবহার ও বেশভূষার, যে উন্নাসিক দিকটি পরাধীন মনোবৃত্তির চিহ্ন হিসাবে বহুদিন ছিল। তার রেশ কেটে গেলে এই চর্চার প্রকৃত উদ্দেশ্য আমাদের প্রয়াসে পরিস্ফুট হতে থাকবে। মাতৃভাষাকে উৎখাত না করে, বরং তাকে আরও নিবিড় করে ভালোবাসতে শেখাবে। ঘরের জিনিসকে তুচ্ছ না করে, আরও আদরণীয় করে তুলবে। সন্নিহিত এবং দূর, দুইই অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে এক চিন্তাজগতের অধিবাসী হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব বিজ্ঞানের সাহায্যে যে-হারে কমে আসছে, তাতে আধুনিক যে-কোনো শিক্ষাব্যবস্থাই অন্তে গোটা পৃথিবীর পটভূমিকায় চলে আসতে বাধ্য হবে। নিজেকে, নিজের চারিপাশকে জানতে জানতে জানার বৃত্ত ক্রমশ সারা পৃথিবীকেই নিজের অন্তর্গত করবে। জ্ঞানের এইই স্বাভাবিক গতি, যাকে ব্যাহত করার চেষ্টা অপচেষ্টামাত্র, যে অপচেষ্টার অবশ্যম্ভাবী ফল চিন্তাধারার প্রাদেশিকতা, "আরও অল্প আরও অল্প বিষয় সম্পর্কে আরও অল্প আরও অল্প জানা", এবং দৃষ্টিভঙ্গির অনিবার্য দ্বৈপায়নবৃত্তি।

উচ্চ পর্যায়ের অধ্যয়নে বিজ্ঞানের ছাত্র রুশ বা জার্মান শেখে ঐ ঐ ভাষার নিবন্ধ পত্রিকা গবেষণাগ্রন্থ ইত্যাদির সুবিধা লাভ করার জন্য। কিন্তু প্রশ্ন এই, হোক বিজ্ঞানী, হোক তার অব্যবহিত উদ্দেশ্য কেবলমাত্র তত্ত্বানুসন্ধান, তবুও ঐ ঐ ভাষার ব্যাকরণের সিংহদ্বার তার কাছে একবার উন্মোচিত হলে, সে সে ভাষার গল্পকবিতার কিঞ্চিৎ ঝংকার শুনতে সে কি উৎসুকমাত্রও হবে না? কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রকৃত বিজ্ঞানীদের মধ্যে সে ঔৎসুক্য জাগ্রত হয়। এ আশা নিশ্চয়ই দুরাশা নয় যে ইংরেজিজ্ঞানলব্ধ আমাদের ছাত্ররাও নিজেদের অনুসন্ধিৎসাতেই শেক্সপীয়রে আগ্রহী হবে। ইংরেজি সাহিত্যের যাঁরা বিশেষ ছাত্র, তারা শেক্সপীয়রকে আরও ভালো করে বুঝবার জন্য তাঁর সময়ের ইংরেজি ভাষাকে অধ্যয়ন করবে, এবং সেজন্য ক্লেশ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকবেন। চসর থেকে লরেন্স অবধি ইংরেজি সাহিত্যে যে হার্দ্য উত্তাপের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারককে সম্পূর্ণ চিনবার জন্য ভাষাতত্ত্বের অনুশীলনেও তাঁরা কৌতূহলী হবেন। আর দর্শন বিজ্ঞান গণিত অর্থনীতি কারিগরী, সব বিভাগের জ্ঞানান্বেষীরাই ইংলণ্ডের য়োরোপের পৃথিবীর এই মহাশিল্পীকে আত্মীয় করতে উৎসুক হবেন।

শেক্সপীয়র এমনই এক নাম, যার স্মরণে শ্রদ্ধাই একমাত্র শোভন ভঙ্গি, যার প্রশংসায় সব অত্যুক্তিই মার্জনীয়।

প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে প্রকৃতি ও পুরাণ

সত্যেন্দ্রনাথ রায়

"ভগবতী, প্রকৃতির স্তব এবং তোমাদের [নারীজাতির] স্তবে বড়ো একটা প্রভেদ নাই।…যাহারা প্রকৃতির স্তবগান রচনা করিয়া থাকে তাহারা তোমাদেরই মন্দিরের প্রধান পূজারি।"— রবীন্দ্রনাথ, অখণ্ডতা [দীপ্তির প্রতি সমীরের উক্তি], পঞ্চভূত

১

প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে প্রকৃতিচেতনার অভাবের কথা প্রায় সর্বজনবিদিত। প্রাকৃতিক পরিবেশ অথবা নিসর্গশোভা প্রাচীন বাঙালী কবিদের সৃষ্টিপ্রেরণাকে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্‌বেজিত করে নি, তাঁদের মন অন্যত্র নিবদ্ধ। মাত্র এই সেদিন উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং পাশ্চাত্য মনোভাবের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার ফলে বাংলাসাহিত্যে নিসর্গচেতনার উন্মেষ ঘটেছে, যার পূর্ণ জাগরণ রবীন্দ্রনাথে।

প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের এই ত্রুটির কথা অনেকেই উল্লেখ করেছেন। কথাটার মধ্যে কিছুই সত্যতা নেই এমনও নয়। সুতরাং সাধারণভাবে এ অভিযোগকে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া পথ নেই। তবু, বিষয়টিকে আপাতদৃষ্টিতে যেমন স্বতঃসিদ্ধ বলে, সরল বলে মনে হয়, আসলে ব্যাপারটা কিন্তু তেমন স্বতঃসিদ্ধও নয়, তেমন সরলও নয়।

প্রথমত, প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে যে প্রকৃতিচেতনার অভাব আছে, এ কথা কি যথার্থই তথ্যভিত্তিক? প্রকৃতিচেতনার প্রত্যক্ষ নিদর্শন কি প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না? দ্বিতীয়ত, প্রত্যক্ষ নিদর্শনের অভাব বা স্বল্পতার দরুণ যাকে নেই বলে মনে করছি, সে কি অন্য কোনো পরিবর্তিত আকারে আত্মগোপন করে থাকতে পারে না? প্রকৃতিচেতনার সবসময় কি একটাই রূপ, এক রকমই প্রকাশ? আরো বড়ো প্রশ্ন, কোনো সাহিত্যে প্রকৃতিচেতনা আদৌ না থাকা কি সম্ভবপর?

এই প্রায়-অসম্ভব ব্যাপারটা যদি প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে সত্যিই ঘটে থাকে, তাহলে কেমন করে তা ঘটলো, সে যে একটা কৌতূহলের বিষয় তাতে সন্দেহ নেই।

২

প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে প্রকৃতিচেনতার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নিদর্শনের কোনো অভাব আছে, এই গোড়াকার উক্তিটিকেই অনেকে অশ্রদ্ধেয় বলে বিবেচনা করবেন। কেন, বৈষ্ণব পদাবলীতে কি নিসর্গ-শোভার বর্ণনা নেই? মিলনের দৃশ্যে, বিরহের পটভূমিতে, কিংবা অভিসারের বর্ণনায়? মঙ্গলকাব্যে কি প্রকৃতি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত? অথবা মৈমনসিংহ গীতিকায়?

প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে প্রকৃতিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না, এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। কিন্তু যতটুকু পরিমাণে এবং যেভাবে তাকে পাই, তাতে এই আপত্তির তথ্যগত ভিত্তিকে খুব দৃঢ় বলে গ্রহণ করা যায় না।

এ কথা ঠিক যে, বৈষ্ণব পদাবলীতে নায়কনায়িকার বিরহমিলনের রঙ্গমঞ্চে নিসর্গপ্রকৃতিকেও আমরা মাঝে মাঝে উপস্থিত থাকতে দেখি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, মূল নাটকের কুশীলব রূপে নয়, নিতান্তই প্রেক্ষাপট রূপে। যেমন, শূন্য গৃহে একটি বিরহকাতর নারীহৃদয়, আর তার প্রেক্ষাপটে রয়েছে ভাদ্রের ভরা বাদর।—

ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।

এবং—

তিমির দিগ্ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।[১]

কিন্তু আসল কথাটা কী? আসল কথা হচ্ছে, 'কান্ত পাহুন কাম দারুণ' এবং 'কৈছে গোঙায়বি হরি বিনা'।

নায়িকার স্বপ্নসম্ভোগের পটভূমিটা কেমন? রাধা বলছেন—

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমি ঝিমি শবদে বরিষে।

এবং—

শিখরে শিখণ্ড রোল মত্ত দাদুরী-বোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঁঝা ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে
স্বপন দেখিলুঁ হেন কালে॥[২]

এখানেও আসল কথাটা ওই 'স্বপন দেখিলুঁ'। আর বাকিটা হচ্ছে 'হেন কালে'। রাধারই হোক আর কবিরই হোক, প্রকৃতি সম্পর্কে যা কিছু সচেতনতা তা ওই 'হেনকালে'র মধ্যেই নিঃশেষিত। মিলন বিরহ অভিসার যা-ই হোক না কেন, মূল ব্যাপারটা একই, প্রকৃতির ভূমিকাটুকু সুনির্দিষ্ট।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে বিরহিনী রাধার বসন্তবেদনার একটি উদাহরণ দিচ্ছি।—

মুকুলিল আম্ব সাহারে।
মধুলোভেঁ ভ্রমর গুঞ্জরে॥
ডালে বসী কুয়িলী কাঢ়ে রাএ।
যেহ্ন লাগে কুলিশের ঘাএ॥

তেমনি, রাধার বর্ষাকালের চতুর্মাস্যায়—

ভাদর মাসেঁ অহোনিশি অন্ধকারে।
শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে॥

---

১ বিদ্যাপতি অথবা শেখর।

২ জ্ঞানদাস।

তাতো না দেখিবোঁ যবে কাহ্নাঞির মুখ।
চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফুট জায়িবে বুক ॥

কবিদের হাতের কাছে কোকিল ভ্রমর এবং মুকুলিত আম্রশাখা অথবা শিখি ভেক ডাহুক সব তৈরী। এমন কি প্রবল বর্ষণের মধ্যেও 'কোকিল কুহরে কুতূহলে'। যখন যেটির দরকার বসিয়ে দিলেই হল।

নায়িকার দুঃখবেদনাকে অল্প আয়াসে পরিস্ফুট করে তুলতে হলে বারমাস্যার বৈচিত্র্য যে বিশেষ উপযোগী প্রাচীন বাঙালী কবিরা তা ভাল করেই জানতেন। মুকুন্দরাম বিরহিনী খুল্লনার বসন্ত-বিহ্বলতার পরিচয় দিচ্ছেন—

মন্দ মন্দ বহে হিম দক্ষিণ পবন।
অশোক কিংশুকে রামা করে আলিঙ্গন ॥

শুধু বিরহবেদনাই নয়, অন্যতর দুঃখবর্ণনারও এই একই রীতি।—

মধুমাসে মলয়-মারুত বহে মন্দ।
মালতীর মধুকর পিয়ে মকরন্দ ॥
বনিতা-পুরুষ যত পীড়য়ে মদনে।

এ হেন যখন পরিবেশ, তখন ফুল্লার কী দশা?—

ফুল্লরার অঙ্গ পুড়ে উদর-দহনে ॥

মৈমনসিংহ গীতিকায় ক্বচিৎ সাক্ষাৎ উপলব্ধির সজীবতার কিছু স্পর্শ পাই।[৩] কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা মূলত একই। কমলার বারমাসীতে ফাল্গুনের বর্ণনা—

আইল ফাল্গুন মাস বসন্ত বাহার।
লতায় পাতায় ফুটে ফুলের বাহার ॥
ধনুহাতে লইয়া মদন পুষ্পেতে লুকায়।
বেহুড়া যুবতী ঘরে না দেখে উপায় ॥
ভ্রমরা কোকিলকুঞ্জে গুঞ্জরি বেড়ায়।
সোনার খঞ্জন আসি আঙ্গিন জুড়ায় ॥

'লীলা ও কঙ্ক'-গীতিকার লীলার ষান্মাষিকী গীতি থেকে দুঃখের পটভূমি রচনায় বর্ষাবর্ণনার উপযোগিতার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যখন—

হাতেতে সোনার ঝারি বর্ষা নামি আসে।—

এবং যখন কিনা—

কদম্বের ফুল ফোটে বর্ষার বাহার।
লতায় পাতায় শোভে হীরামণ হার ॥
মেঘ ডাকে গুরু গুরু চমকে চপলা।—

৩. লোকসাহিত্যে প্রকৃতিচেতনার বিষয়টির স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার যোগ্য। অন্যথায় তার প্রতি সুবিচার করা সম্ভব নয়। বৈষ্ণবসাহিত্য সম্পর্কেও একথা অল্পবিস্তর প্রযোজ্য। বর্তমান প্রবন্ধে সে-রকম আলোচনার অবকাশ নেই।

তখন—

ঘরের কোণে লুকাইয়া কান্দে অভাগিনী লীলা ॥

নায়িকার সুখদুঃখের এই সব পটভূমিকার মধ্যে কোথাও যে খাঁটি নিসর্গচেতনার পরিচয় মেলে না, এমন কথা বলি না। তা যে মেলে তার প্রমাণ উপরের উদাহরণগুলির মধ্যেই পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রচুর চর্বিতচর্বণ ঘাঁটলে তবে দু-একটি সার্থক দৃষ্টান্তের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

তাছাড়া, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত এই সব নিসর্গবর্ণনার আস্বাদ একটু ভিন্ন জাতের। এর রস মিলন-বিপ্রলম্ভেরই রস, নিসর্গের রস নয়। কবির দৃষ্টি এখানে প্রকৃতির দিকে নিবদ্ধ নয়। সময় সময় সন্দেহ জাগে, কবি আদৌ প্রকৃতিকে চোখ মেলে দেখেছেন কি না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই সব বর্ণনা কবিপ্রসিদ্ধির তালিকা থেকে টুকে নেওয়া, তার মধ্যে স্বকীয় উপলব্ধির উত্তাপ নেই। আসল প্রেরণাটা প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ নয়, বহির্বিশ্বের রূপরসগন্ধস্পর্শের আমন্ত্রণ নয়, সজাগ ও সতেজ ইন্দ্রিয়চেতনার উদ্‌বেজনা নয়। এ হল একটি অনেক কালের রীতির অন্ধ অনুবর্তন। অর্বাচীন সংস্কৃতে এবং প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্যে প্রকৃতিকে এই ভাবে প্রেক্ষাপট হিসাবে ব্যবহার করা একটি সুপ্রচলিত প্রথা। ক্লাসিক সংস্কৃত সাহিত্যেও এর নিদর্শন কিছু কম নেই। প্রাচীন বাঙালী কবিরা এ ব্যাপারে সেই বহুকাল-প্রচলিত প্রথারই অনুসরণ করেছেন।[৪]

প্রকৃতিচেতনার অন্য কোনো রকম পরোক্ষ নিদর্শন প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে মেলে কি না সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র।[৫] কিন্তু এ কথা আমাদের মেনে নিতেই হবে যে, বিরল ব্যতিক্রমগুলির কথা বাদ দিলে, এই ভাবে স্টেজ সাজাবার উপকরণ হিসাবে প্রকৃতিকে 'ব্যবহার' করা, কতকগুলি বাঁধা-ধরা প্রাকৃতিক বস্তুর তালিকা রচনা করা, একে সাক্ষাৎ উপলব্ধির প্রমাণ বলে গ্রহণ করা কঠিন। এ বরং চেতনাহীনতারই প্রমাণ। প্রথার খাতিরেই হোক আর যে জন্যেই হোক, প্রকৃতিকে স্পর্শ করার পরও যদি উদ্‌বেজিত না হই, তখনো যদি বাঁধা-বুলিই আমাদের অবলম্বন হয়, তাহলে তাকে আমাদের অনুভূতির অসাড়তা বলেই ধরতে হবে।

এই সব বাঁধা-বুলিই যদি আমাদের প্রাচীন কবিদের প্রকৃতিচেতনার প্রত্যক্ষ নিদর্শনের একমাত্র নমুনা হয়, তাহলে সেটা খুব আশার কথা নয়। এরা গতানুগতিকতা ছাড়া আর কিছুই প্রমাণ করে না।

কিন্তু অভিযোগটিকে যদি মেনেও নিই, তাহলেও এই প্রসঙ্গে অন্য যে প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হয়েছিল, সেগুলি থেকেই যাচ্ছে। এমন তো হতে পারে যে, প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে প্রকৃতিচেতনার এমন একটা রূপান্তর ঘটেছে যে তাকে আর চেনবার জো নেই? এমন এক মৌলিক রূপান্তর যার ফলে তাকে আর প্রকৃতি নামে অভিহিতই করা যায় না? এমন এক গোত্রান্তর যার ফলে তার স্বভাবটাই পালটে যায়?

৬

আমাদের প্রাচীন কবিদের প্রকৃতি সম্পর্কে উদাসীনতার কারণও বোধ করি খুব দুর্বোধ্য নয়। প্রাচীন বাংলাসাহিত্য ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্য। তার মধ্যে মানুষের আত্মপরাভবের ভাবটা বড়ো প্রবল। মানুষ

৪. দীনেশচন্দ্র সেন মৈমনসিংহ গীতিকার ভূমিকায় অনেকটা ঠিকই বলেছেন, "...খুল্লনার ছাগল চরাবার সময় বনে বসন্তের আবির্ভাব, সুশীলার বারমাসী প্রভৃতি রচনায়, বাঙ্গালা ভাষার উপর সংস্কৃত একটা মুখোস পরাইয়া দিয়াছে।"

৫. প্রকৃতিচেতনার পরোক্ষ নিদর্শনের প্রশ্নটি শাখাজাল-জটিল। বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ আলোচনার দাবী করে। নানা কারণে বর্তমান প্রবন্ধে সে প্রসঙ্গের আলোচনা সম্ভবপর নয়।

সেখানে গৌণ, দেবতাই সে সাহিত্যের মুখ্য কথা। সেখানকার সমস্ত কাহিনীই বিশিষ্ট দেবতার গৌরব-কাহিনী, বিশিষ্ট ধর্মাচারের মাহাত্ম্য-কাহিনী।

মানুষ নিজেই যেখানে কুণ্ঠিত, মানবসংসার বা মানববিশ্ব যে সেখানে অবহেলিত থাকবে এটা তো অবধারিত। দেবতা যখন অপর সব-কিছুকে আড়াল করে দাঁড়ায়, তখন নিসর্গপ্রকৃতিও স্বভাবতই চাপা পড়ে যায়। মানুষের সাহিত্যে প্রকৃতি যে প্রবেশলাভ করে, সে তো মানববিশ্বের অঙ্গীভূত হয়েই, মানব-উপলব্ধির আত্মপ্রসারের পথ ধরেই। দেবগ্রস্ত সাহিত্যে অধিকাংশ সময়ই মানব-উপলব্ধির অস্বাভাবিক আত্মসংকোচন ঘটে। অনেক সময় সেই সংকুচিত শীর্ণ সাহিত্যকে প্রকৃত সাহিত্য বলে গ্রহণ করাই কঠিন হয়ে ওঠে। প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও খানিকটা সেই রকম ঘটেছে।

ধর্মীয় সাহিত্য মাত্রেই যে প্রকৃতি-বিমুখ তা কিন্তু নয়। ধর্ম যেখানে বহির্জগৎ-কে আবৃত করে দাঁড়ায় না, সেখানে এ-রকম ঘটে না। ধর্মাচার যেখানে বহির্বিশ্বের দিকে শাখাপ্রশাখা প্রসারিত না করে', কেবলমাত্র অন্তর্জগতের পাতালের দিকেই শিকড় চালাতে থাকে, মানুষের ইন্দ্রিয়চেতনা সেখানে আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে পড়ে, মানব-উপলব্ধি সেখানে কেবলমাত্র অন্তরের মধ্যেই নিজের অবলম্বন খোঁজে। দেবতা সেখানে প্রকৃতিকে শুধু স্বীকারই করে না, একেবারে গ্রাস করে ফেলে। কিন্তু ধর্ম যেখানে মানুষের ইন্দ্রিয়চেতনাকে সম্মোহিত করে না, দেবতা যেখানে প্রকৃতিকে স্বীকার করে নেয় কিন্তু গ্রাস করে না, ধর্মীয় সাহিত্যও যে সেখানে আশ্চর্য প্রকৃতিচেতনায় উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠতে পারে, ঋগ্‌বেদের অনেক সূক্তেই তার প্রমাণ মিলবে।

সাহিত্যটা ধর্মীয় কি ধর্মীয় নয় সেটাই বড়ো কথা নয়, ধর্মটা কী জাতের সেইটেই বড়ো কথা। অর্থাৎ জীবনচেতনাটা কী জাতের সেইটেই আসল কথা। ধর্ম যেখানে আত্মছলনার দ্বারা পুষ্ট এবং আত্মছলনাকে পুষ্ট করে, বুঝতে হবে, জীবনবোধ সেখানে অতি স্তিমিত। ধর্মাচার সেখানে সর্বগ্রাসী, দেবতা সেখানে অত্যাচারী। বহির্জগৎ সেখানে অবহেলিত, প্রকৃতি সেখানে কুণ্ঠিত।

কারণ যা-ই হোক না কেন, কথাটা কিন্তু সত্য যে, আমাদের বহির্জগৎচেতনা বিশেষ প্রখর নয়, আমরা একটু বেশি রকমের অন্তর্মুখী। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চভূত গ্রন্থে 'সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ' শীর্ষক আলোচনায় আমাদের এই স্বভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "আমরা অন্তর্জগৎবিহারী। বাহিরের জগৎ আমাদের নিকট প্রবল নহে। আমরা যাহা মনের মধ্যে গড়িয়া তুলি বাহিরের জগৎ তাহার প্রতিবাদ করিলে, সে প্রতিবাদই গ্রাহ্যই করি না।··· বহির্জগতের সহিত আমাদের অন্তর্জগতের রীতিমতো সংঘাত কোনো কালে হয় না—হইলে বহির্জগৎটাই হটিয়া যায়।"

কিন্তু বহির্জগৎ সম্পর্কে চেতনা স্তিমিত হলে শুধু যে বহির্জগৎই ঝাপসা হয়ে আসে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্জগতের চেতনাও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। পঞ্চভূতের ওই আলোচনা থেকেই আর একটি মূল্যবান উক্তি উদ্‌ধৃত করছি—

> "বহির্জগৎটাকে উত্তরোত্তর বিলুপ্ত করিয়া দিয়া মনোজগৎকেই সর্বপ্রাধান্য দিতে গেলে যে ডালে বসিয়া আছি সেই ডালকেই কুঠারঘাত করা হয়।"

বহির্বিশ্বের সংস্পর্শ শিথিল হলে অন্তর্জগৎটা ঘুলিয়ে ওঠে, সেখানে অবুদ্ধির আসন কায়েম হয়।[৬] জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই তখন অবুদ্ধির প্রতাপ প্রবল হয়ে ওঠে। বিশেষ করে ধর্মাচারের ক্ষেত্র থেকে সেই অবুদ্ধিকে তখন আর কিছুতেই উৎপাটিত করা যায় না। আমাদেরও অনেকটা তাই হয়েছে।

কি অহং-চেতনা কি তদ্‌-চেতনা দুই-ই আমানের দুর্বল। প্রথমটির ফলে আমাদের সাহিত্য-উপলব্ধি নিস্তেজ ও বিকারগ্রস্ত। দ্বিতীয়টি ফলে আমাদের সাহিত্য-জগৎ শীর্ণ ও সংকুচিত। অথবা, প্রথমে দ্বিতীয়ে এ ভাবে ভাগ করা বোধকরি অসমীচীন। কারণ উভয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং উভয়ের ফলাফল পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

উপলব্ধির এই দুর্বলতা এবং সাহিত্য-জগতের এই পরিধি-সংকোচন ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত সাহিত্যেও অল্প-বিস্তর লক্ষণীয়। কিন্তু পরবর্তী কালের সাহিত্যে এটা আরো স্পষ্ট। আমাদের আলোচ্য বিষয় প্রাচীন বাংলাসাহিত্য, সেখানে এই বিকার অত্যন্ত প্রকট। সাহিত্যটা ধর্মীয়, মাত্র এইটেই তার কারণ নয়। আমাদের ধর্মাচারের মধ্যেই আমাদের জেলখানা রচিত হয়ে উঠেছে, আমাদের জীবনবোধের মধ্যেই অবুদ্ধি বাসা বেঁধেছে, এইটেই তার আসল কারণ।

বৈদিক সাহিত্যও ধর্মীয় সাহিত্য। কিন্তু বৈদিক আর্যেরা আমাদের মতো এমন একান্তভাবে অন্তর্জগৎবিহারী নন। বহির্জগৎ তাঁদের কাছে জাজ্বল্যমান উপস্থিতি। এই কারণেই ঋগ্‌বেদের সূক্তগুলি এমন বলিষ্ঠ ও ঋজু। প্রসঙ্গত গ্রীক সাহিত্যের কথাও এখানে উল্লেখ করা যায়। আবার পঞ্চভূতের সেই একই আলোচনা থেকে সমর্থন উদ্ধৃত করছি।—

> "গ্রীকদিগের নিকট বহির্জগৎ বাষ্পবৎ মরীচিকাবৎ ছিল না, তাহা প্রত্যক্ষ জাজ্বল্যমান ছিল; এই জন্য অত্যন্ত যত্নসহকারে তাঁহাদিগকে মনের সৃষ্টির সহিত বাহিরের সৃষ্টির সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইত।… বাহিরের জগৎ আমাদের নিকট তেমন প্রবল নহে, প্রত্যক্ষ-সত্য আমাদের নিকট তেমন সুদৃঢ় নহে।"

একটা কথা এখানে পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। প্রাচীন বাঙালীর ধর্মাচারের মধ্যে কোন্‌ পথে কী ভাবে অবুদ্ধি তার আসন পাকা করে বসলো, তার ঐতিহাসিক শিকড় দূর অতীতের কোন্‌ অন্ধকার পাতালে প্রসারিত, তা নির্ণয় করা এ-প্রবন্ধের মুখ্য দায়িত্ব নয়। কিন্তু এই অবুদ্ধি যে সেকালের বাঙালীর জীবনের নানা স্তরে প্রবেশ করে তাঁর জীবনবোধকে সম্পূর্ণ ঘুলিয়ে দিয়েছে, এই অবুদ্ধিলোকের ছায়ামূর্তিরাই যে দেবতার বেশ ধরে তাঁর দৃষ্টির সামনে এসে দাঁড়িয়ে সব-কিছুকে আড়াল করে দিয়েছে, এবং এই জন্যেই যে তাঁর কাছে কি বহির্জগৎ কি নিসর্গপ্রকৃতি সবই বাষ্পবৎ, সবই মরীচিকাবৎ বিলীয়মান, এই সত্যটিকে

[৬] কুবুদ্ধি বা জড়বুদ্ধি অর্থে অবুদ্ধি নয়। বুদ্ধির সমধর্মী নয়, বুদ্ধির সহগামী নয়, বুদ্ধির অধিগম্য নয়, এই অর্থে অবুদ্ধি। বুদ্ধির এলাকায় বাইরের, এই অর্থে অবুদ্ধি। জাগ্রৎ-চৈতন্যের সঙ্গে বুদ্ধি যেহেতু ওতপ্রোত, সেই হেতু বরং অন্ধ বাসনা ও অন্ধ আবেগই এর মূল আশ্রয়, মনের অবচেতনলোকই এর যথার্থ মাতৃভূমি। কেউ কেউ এর মধ্যে বাসনাকেই বড়ো করে দেখেছেন, যেমন শোপেনহাওয়ার কিংবা ফ্রয়েড। আবার কেউ কেউ এর মধ্যে বেদনা বা অনুভূতিকেই বড়ো করে দেখেছেন, যেমন রোমান্টিক কবি-শিল্পীরা। অন্যদিকে, কেউ কেউ একে ব্যক্তিগত অবচেতনার মধ্যেই নিবদ্ধভাবে দেখেছেন, যেমন ফ্রয়েড। আবার কেউ বা একে জাতিগত অবচেতনার সঙ্গে অর্থাৎ সমষ্টিগত ও ঐতিহ্যগত অবচেতনার (collective unconscious) সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছেন, যেমন ইয়ুং।

আমাদের ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করা দরকার। বলা বাহুল্য, এর পূর্ণ তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে প্রাচীন বঙ্গসংস্কৃতির সহজাত ও অর্জিত প্রবণতাগুলির সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকা দরকার। এ প্রবন্ধে সেই অত্যাবশ্যকের বেশি আমরা অগ্রসর হব না। কারণ আমাদের মূল আলোচ্য ঐতিহাসিক কারণ-পরম্পরা নয়, তার সাহিত্যিক ফলাফল।

৪

কিন্তু প্রকৃতিচেতনা একেবারেই না থাকা, এ কি আদৌ সম্ভবপর? প্রকৃতিচেতনার বিলুপ্তি অর্থ বহির্জগৎচেতনারই বিলুপ্তি। তার মানে, ইন্দ্রিয়-উপলব্ধির বিলোপ। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত সমস্ত উপলব্ধিই বিলোপ। কোনো সাহিত্যের পক্ষেই কি এরকম ঘটা সম্ভবপর?

মানতেই হবে যে সাহিত্যে তা মোটেই সম্ভব নয়। মানুষ ত্রিশঙ্কু-শূন্যে ভাসমান নয়। বহির্বিশ্বেই তার সত্তার শিকড়। তার সাহিত্য-জগৎ, তার উপলব্ধির, তার ভাবনা-বেদনা-কামনার জগৎ, তার ধ্যানের জগৎ, সে তো তার ইন্দ্রিয়-উপলব্ধির জগতেরই একটা আধ্যাত্মিক সম্প্রসারণ।

এ কথা বোধকরি ঠিকই যে, মানুষের কোনো রচনা থেকেই মানুষ আপনাকে একেবারে মুছে ফেলতে পারে না। নিজের বিশিষ্ট ব্যক্তিসত্তাটিকেই হয়তো সরিয়ে রাখতে পারে, কিন্তু মানবসত্তার প্রকাশকে কখনোই চেপে রাখতে পারে না। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে বলেছেন— মানবপ্রকাশ। সাহিত্যকে যদি সত্যিই মানবপ্রকাশ বলে মানি, তাহলে এও মানবো যে সেই মানবপ্রকাশের মধ্যে দিয়ে মানববিশ্বেরও প্রকাশ ঘটে। সাহিত্যে যে-প্রকৃতিকে পাই, সে এই মানববিশ্বেরই অঙ্গীভূত। মানুষের আত্মপ্রকাশের মধ্যেই তার নিসর্গচেতনাও প্রকাশিত হতে বাধ্য।

সেই কারণে, কোনো সাহিত্যেই প্রকৃতিচেতনা কখনোই একেবারে শূন্যের কোঠায় নেমে যেতে পারে না। মানুষ উপেক্ষা করতে চাইলেও, প্রকৃতি কখনোই নিজেকে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত থাকতে দেয় না। নানা ছলনায়, নানা রূপ, নানান্ রূপান্তরে মানুষের সাহিত্যে প্রকৃতি নিজেকে হাজির রাখে। আসল প্রশ্ন প্রকৃতিচেতনার রূপভেদের, তার রূপান্তর ও তার ছদ্মবেশের।

এই রূপান্তরের প্রশ্নটাই এখানে আমাদের মুখ্য প্রসঙ্গ। প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে প্রকৃতিচেতনা কোন্ বিকৃত রূপের মধ্যে আত্মগোপন করেছে, কোন্ ছদ্মবেশের অন্তরালে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজেছে? হয়তো দেখতে পাব, সুদূর অতীতে কোনো একদিন প্রকৃতিকে ঘিরেই একটি কল্পনার নীহারিকা গড়ে উঠেছিল। সেই কল্পনাই ধীরে ধীরে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে, ঘন হয়ে, কঠিন হয়ে, শেষকালে সত্যকে আড়াল করে তার থেকে বড়ো হয়ে উঠেছে। হয়তো দেখব, যে-দেবতা তাকে গ্রাস করেছে, সে-দেবতা আসলে তারই কল্প-মূর্তি, তারই রূপান্তর, ছদ্মবেশ। হয়তো দেখব, আপন বিকৃত রূপই প্রকৃতির স্বাভাবিক রূপকে আবৃত করে রেখেছে।

কিন্তু কথাটাকে আরো একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার। বাঙালীর বহির্জগৎ-বিমুখতার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। মনঃকল্পিত একটি স্বপ্ন-জগতের মধ্যে নিজেকে নিবিষ্ট করে রাখার প্রবণতা বাঙালীর স্বভাবধর্মে। প্রাচীন বাঙালীর ধর্মে কর্মে আচারে জীবনযাপনে সর্বত্রই এর প্রভাব সুগভীর। এ প্রভাব এক অর্থে সেই পূর্ব-কথিত অবুদ্ধিলোকেরই প্রভাব। প্রাচীন বাঙালীর মনোজগৎ এক অদ্ভুত

আলো-আঁধারির জগৎ, এক আবেগ-স্পন্দিত বাসনা-সম্মোহিত আদিম রূপকথার জগৎ। তা যেন সত্যিই স্বপ্ন দিয়ে তৈরী, সত্যিই স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন স্বপ্ন বা বাস্তবের প্রতিদ্বন্দ্বী, এমন স্মৃতি যা বিস্মৃতির থেকেও গভীরতর অন্ধকারের পথে ডাক দিয়ে নিয়ে যায়।

আরো একটু গোড়া থেকে বলি। আমরা জানি, প্রত্যেক নরগোষ্ঠীরই বা প্রত্যেক জাতিরই কিছু পুরাণ-কল্পনা বা 'মিথ্'-এর সঞ্চয় থাকে।[৭] এগুলো তার মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। কিন্তু অবস্থাবিশেষে আবার বিপদও বটে। আদিম নরগোষ্ঠীর ভাব-জগৎ পুরোপুরিই পুরাণ-কল্পনা বা মিথ্ দিয়ে গড়া।[৮] এরাই তাকে ধারণ করে' থাকে। সুতরাং 'রিলিজন' না হোক, এরাই তার 'ধর্ম'। কিন্তু ততক্ষণই ধর্ম, যতক্ষণ এরা সত্যি সত্যিই ধারণ করতে পারে। তা যখন পারে না, তখন এদের প্রভুত্ব অর্থ অত্যাচারী অন্ধতার প্রভুত্ব।

সভ্যতার ক্রমিক অগ্রগতির একটা অর্থ হল মানুষের ক্রমিক ধর্মান্তর-গ্রহণ। মিথ্-এর সম্মোহ থেকে ক্রমাগত মুক্তিলাভ। তার মানে কিন্তু মিথ্-এর অবলোপ নয়, মিথ্-এর গোত্রান্তর। মিথ্-এর বিনাশ নয়, তার প্রভুত্বের অবসান।[৯]

একটা কথা আছে, 'old gods never die'। কথাটার মধ্যে গভীর সত্য নিহিত আছে সন্দেহ নেই। শুধু দেব-দেবী নয়, অতীতের কোনো-কিছুই একেবারে নিঃশেষে হারিয়ে যায় না। অবস্থান্তরে তাদের রূপান্তর ঘটে, সময়-বিশেষে তারা গভীরে তলিয়ে যায়, কিন্তু রক্তের মধ্যে থেকে তার জড় একেবারে মরে না। তাকে অস্বীকার করার চেষ্টা, তাকে এড়িয়ে যাওয়া অনেক সময় ঐতিহ্যভ্রংশ বা আত্মবিস্মরণের নামান্তরে হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই কারণে, জাতীয় মিথ্-গুলি মোটেই সর্বথা-বর্জনীয় বস্তু নয়।

---

৭. মানবজাতির চেতনার আদি প্রত্যূষে— স্বতন্ত্রভাবে দেখলে প্রত্যেক জাতিরই চেতনার উষালগ্নে, যুক্তিশৃঙ্খলাবদ্ধ নৈয়ায়িকী চিন্তার সুষ্ঠু বিকাশের পূর্ববর্তী অধ্যায়ে, আদিম মনে পূর্ণ একাধিপত্য ছিল কল্পনার। এই আদিম কল্পনা প্রবলভাবে আবেগাত্মক এবং চূড়ান্তভাবে বাসনা-কেন্দ্রিক। এ কল্পনা একান্তভাবে মূর্ত-কল্পনা, একান্তভাবে চিত্রধর্মী বা মূর্তিসৃজনকারী কল্পনা। এই আবেগ-বাসনাত্মক রূপ-কল্পনার ক্রিয়া থেকেই 'মিথ্' বা পুরাণ-কল্পনার উদ্ভব। প্রকৃতপক্ষে আদিম জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে থেকেই, তার ম্যাজিক বা জাদুধর্মী ক্রিয়া-অনুষ্ঠানাদির (ritual) মধ্যে থেকেই মিথ্ জন্মলাভ করে। পরে বিশদীকৃত হয়ে মিথ্ যে-আকারই ধারণ করুক না কেন, প্রাথমিক অবস্থায় মিথ্ ওই সব জাদুধর্মী ক্রিয়া-কলাপেরই এক-একটি কল্প-ভাষ্য। মিথ্ এমন এক প্রতীকী ভাষা (symbolic language), আমাদের জাগ্রৎ-চিন্তার পরিচিত ভাষার সঙ্গে যার একটুও মিল নেই, সচেতন চিন্তার লজিককে যে পদে পদে লঙ্ঘন করে চলে। স্বপ্নের সঙ্গেই বরং তার গভীর সাদৃশ্য। প্রধান তফাৎ এই যে মিথ্ স্বপ্নের মতো ব্যক্তিগত নয়। আদিম মন কোনো কোনো দিক থেকে শিশুমনের সমধর্মী, বিশেষত মিথিক্যাল ভাবনার ব্যাপারে। সেই কারণে মিথ্‌কে কেউ কেউ বলেছেন— মানবজাতির শৈশব-স্বপ্ন (dream of young humanity)।

৮. 'আদিম' কথাটি এখানে কালজ্ঞাপক নয়, সভ্যতার স্তর বা অবস্থাজ্ঞাপক। নৃতত্ত্বে 'প্রিমিটিভ্' কথাটিকে সাধারণত যে অর্থে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

৯. একদিকে দর্শন বিজ্ঞান ও উন্নত ধর্মচেতনা, উন্নত নীতিবোধ এবং অপর দিকে শিল্প ও সাহিত্য— এক-কথায় উন্নততর জীবন-যাত্রা— মানুষকে মিথ্-এর সম্মোহ থেকে মুক্তি দেয়। ব্যবহারিক উপযোগিতার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেলে মিথ্-এরও মুক্তি ঘটে। সেই ভারমুক্ত মিথ্ মানুষের কল্পনাজগতের লীলাসঙ্গী, জৈব-জীবনের প্রভু নয়।

'Old gods never die' কথাটা এই দিক থেকে সত্য হলেও, এর মধ্যে ভীষণ এক মিথ্যার বীজ লুকোনো আছে। ওই যে অবস্থান্তরে রূপান্তর ঘটার কথা বলা হয়েছে, সেটা নিতান্ত কথার কথা নয়। অনেক সময় সে রূপান্তর এমনই মৌলিক রূপান্তর যে তাতে করে তার গোটা চরিত্রটাই পালটে যায়। এই মৌলিক পরিবর্তনের ফলে তার সামাজিক ভূমিকা এবং সাংস্কৃতিক মূল্য দুয়েরই বদল ঘটে। এই পরিবর্তনকে অস্বীকার করার অর্থ মানবসভ্যতার অগ্রগতিকে অস্বীকার করা। মিথ্-এর ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তনের কথাটা সমান সত্য। মৌলিক অবস্থান্তর ঘটা সত্ত্বেও মিথ্ যদি তার আদিমসত্তাকে বর্জন না করে, তাহলে তা জীবনবোধের বিকৃতিরই পরিচায়ক। কেননা, জীবনের অগ্রগতির সম্পর্কে অন্ধ না হলে মনের মধ্যে আদিম অ-পরিবর্তিত মিথ্-কে লালন করা সম্ভব নয়। কালাতিক্রান্ত মিথ্ জীবনের অগ্রগতিকে পদে পদে ব্যাহত করে। বিশেষ এক কালে যা ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বাহন, কালাতিক্রমণের ফলে তা-ই হয়ে ওঠে ঘাড়ের বোঝা।

আবার উল্টো রকমের পরিবর্তনও ঘটতে পারে। সে হল—মিথ্ যখন আর্টে পরিণত হয়। জাতীয় জীবনের পক্ষে এইটেই হল মিথ্-এর বাঞ্ছিত বিবর্তন। জীবনের অগ্রগতি যেখানে অব্যাহত, সেখানে এই রকম ঘটাই স্বাভাবিক। জীবন-পরিবেশের মৌলিক পরিবর্তন—জীবনবোধের মৌলিক পরিবর্তন—স্বাভাবিক ভাবেই মিথ্-এর এই গোত্রান্তর ঘটিয়ে তোলে। ব্যবহারিক প্রয়োজনের ভূমিতে, জীবনের প্রত্যক্ষ উপযোগিতার ক্ষেত্রে একদিন যে-মিথ্ ছিল বন্ধন, ছিল ছলনা—মিথ্যা মরীচিকা, পরিস্রুত ও ভারমুক্ত অবস্থায় তা-ই হয়ে ওঠে কবিকল্পনার বেগবান পক্ষীরাজ।

প্রাচীন বাঙালীর মিথ্-গুলো ভারমুক্ত মিথ্ নয়, কবিকল্পনার লঘুপক্ষ বাহন নয়। তারা কোন্ বিস্মৃত পূর্বপুরুষের প্রেতাত্মা, জীবনবোধের বিকৃতির সুযোগ নিয়ে একেবারে বুকের মধ্যে এসে বাসা বেঁধেছে। একদিন যা ছিল দেখবার চোখ, প্রাচীন বাঙালীর ক্ষেত্রে তা-ই হয়ে উঠেছিল তার চোখের ঠুলি। মিথ্ যা দিতে পারে না, যা দেবার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলেছে, তার কাছে তা-ই চাইলে শেষ পর্যন্ত এই রকম বিপদই ঘটে। মরীচিকার কাছে জল চাইলে যেমন হয়।

মজা এই যে, মরীচিকা বাস্তব জলেরই ছলনাময় প্রতিচ্ছবি। মিথিক্যাল দেব-দেবীরাও তেমনি বাস্তবসত্যেরই ছলনাময় প্রতিরূপ। এরা যখন বাস্তবজীবনকে আড়াল করে দাঁড়ায়, বাস্তবজীবন আসলে তখন আপন রূপান্তরের দ্বারাই আপনি আবৃত হয়ে পড়ে। প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে ঠিক তা-ই ঘটেছে। প্রকৃতিরই মিথিক্যাল রূপান্তর তার স্বাভাবিক মুখশ্রীকে আবৃত করে ফেলেছে।

৫

টমাস মান্ তাঁর 'Joseph and His Brothers' উপন্যাসের কথারম্ভে বলেছেন, "Very deep is the well of the past. Should we not call it bottomless?"... ভারতীয় সংস্কৃতির 'well of the past'-ও কম গভীর নয়। সুদূর বৈদিক কালে, অথবা সুদূরতর সিন্ধুসভ্যতার কালে পিছিয়ে গেলেও হয়তো তার তল খুঁজে পাব না। বঙ্গসংস্কৃতির সম্বন্ধেও সেই একই কথা। 'Should we not call it bottomless?'

৬

আমরা জানি, বাংলার সংস্কৃতিতে আর্যেতর মৌলিক সংস্কার এবং আগন্তুক আর্য-সংস্কার একাকার হয়ে মিশে রয়েছে। স্থানীয় লৌকিক ধ্যান-ধারণাগুলি যেমন আপন খুঁটি আঁকড়ে টিঁকে রয়েছে, ঠিক তেমনি পৌরাণিক কালের, বৌদ্ধ যুগের, উপনিষদের সময়ের ধ্যান ও ধারণা, বিশ্বাস ও সংস্কার, সবই এর মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। সুদূর ঋগ্‌বেদের কালের সংস্কারগুলিও একেবারে হারিয়ে যায় নি। ঠিক তেমনি, স্তরবদ্ধ মৃত্তিকা খনন করে বিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে আজ যার দু-একটি টুকরো সবে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, সেই হারিয়ে-যাওয়া সিন্ধুসভ্যতার আপাত-অপরিচিত ধ্যানধারণাগুলিও অলক্ষ্য-গোচর হয়ে এর মধ্যে বাসা বেঁধে আছে। 'তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে, কেহ নহে নহে দূর।'

এই সব প্রাচীন উৎসগুলির কোথাও কি প্রকৃতিচেতনার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না?—তা সে যে-স্তরেরই চেতনা হোক না কেন? কোনো-না-কোনো আকারের প্রকৃতিপূজার কোনো নিদর্শন? প্রকৃতির শক্তিগুলির সম্পর্কে কোনো কৌতূহল? হয়তো পাওয়া যায়। কিন্তু তা যদি পাওয়া যায়, তাহলে তার কোনো ভগ্নাবশেষই কি বাঙালীর সংস্কৃতিতে খুঁজে পাওয়া যাবে না? তা কি সম্ভব, বিশেষত যখন কিছুই নাকি হারায় না?

মানুষের আদিম ধর্মাচারের সঙ্গে, আদিম অনুষ্ঠানাদির সঙ্গে প্রায়ই এক ধরণের প্রকৃতিপূজার ঘনিষ্ঠ যোগ দেখতে পাওয়া যায়। প্রকৃতিকে প্রকৃতি জেনেই তার প্রতি বিস্ময়, মুগ্ধতা বা ভক্তি, সে অবশ্য অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের উন্নততর চেতনার ব্যাপার। আদিম প্রকৃতিপূজা আরো স্থূল, আরো জৈব স্তরের প্রকৃতিপূজা। এ হল প্রাকৃতিক সমস্ত-কিছুকে জীবন্ত জেনে, তার হিতকারী ও অহিতকারী শক্তিগুলির সঙ্গে আত্মীয়তা-স্থাপন, তাদের কাছে নতি-স্বীকার। অর্থাৎ এ হল এক ধরণের অবোধ সর্বপ্রাণবাদের (animism) অভিব্যক্তি। একে ঠিক পূজা বলা বোধকরি সঙ্গত নয়। এর মধ্যে কোনো অধ্যাত্মিকতা বা পবিত্রতার ভাব নেই, এর সবটাই অত্যন্ত ব্যবহারিক, সম্পূর্ণভাবে বৈষয়িক। ব্যাপারটা জাদু বা ম্যাজিকের স্তরের এবং পুরোপুরিই ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান বা কর্মের সঙ্গে যুক্ত। 'রিলিজন' অর্থে একে ধর্মচেতনা বলা যায় না। 'তন্ত্র' অর্থ যদি ধরি 'বিশিষ্ট ক্রিয়া-পদ্ধতি', তাহলে সেই অর্থে একে বলতে পারি—'প্রকৃতি-সাধন-তন্ত্র'। বিস্তৃত অর্থে তাকে ধর্ম বলতে বাধা নেই। কেননা আদিম চেতনায় তা ঐক্য আনে, তাকে ধারণ করে রাখে।

প্রকৃতি সংক্রান্ত আদিম মিথ্-গুলো এই জাদুধর্মী প্রকৃতি-সাধন-তন্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। এই মিথ্-গুলো মানুষের আদিমতম রূপ-কল্পনার অন্যতম অভিব্যক্তি। শুধু অন্যতম নয়, প্রধানতম। অনগ্রসর প্রায় সমস্ত নরগোষ্ঠীর মধ্যেই, এবং অধুনা-অগ্রসর প্রায় সমস্ত নরগোষ্ঠীরই প্রাচীন ইতিহাসে নৃতত্ত্ববিদেরা কোনো-না-কোনো আকারের প্রকৃতি-ঘটিত পুরাণ-কল্পনার সন্ধান পেয়েছেন। ভারতসংস্কৃতি তার ব্যতিক্রম নয়। বলা বাহুল্য, বঙ্গসংস্কৃতিও নয়। কি নিকট-অতীত, কি দূর-অতীত সর্বত্রই তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

দূর-অতীতের প্রসঙ্গে সিন্ধুসভ্যতার কথা মনে পড়া এখন আর কষ্টকল্পনা বলে গণ্য নয়। সিন্ধুসভ্যতার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখনো অবশ্য অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। তার প্রকৃতি-ঘটিত মিথ্-গুলো কেমন ছিল বা আদৌ ছিল কি না, সরাসরি জানবার কোনো উপায় নেই। তবে অনুমানের পথে অগ্রসর হওয়ার

পক্ষে পরোক্ষ প্রমাণও নিতান্ত কম আবিষ্কৃত হয় নি। এটা বোধকরি আজ মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, সিন্ধুসভ্যতা তার সমাজগঠনের দিক থেকে মাতৃতান্ত্রিক এবং জীবিকাসংস্থানের দিক থেকে কৃষিভিত্তিক। কৃষিজীবী নরগোষ্ঠী কখনোই প্রকৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকতে পারে না। তবে এটা খুবই স্বাভাবিক যে, তাদের মনোযোগ প্রধানত শস্য উদ্ভিদ কৃষিক্ষেত্র—এবং সেই সূত্রে শস্য-শালিনী বসুন্ধরা, এই দিকটাতেই নিবদ্ধ থাকবে। প্রকৃতি বা পৃথিবীর এই শস্য-জনয়িত্রী রূপটাই তাদের চোখে বড়ো করে' পড়বে। তাদের প্রকৃতি-সাধন-তন্ত্র স্বভাবতই শস্যউৎপাদন-পদ্ধতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, এবং তাদের প্রকৃতিঘটিত মিথ্-গুলোও এই উৎপাদন-প্রক্রিয়ারই আবেগ-বাসনাত্মক কাল্পনিক নাট্যরূপ।

অন্যপক্ষে, মাতৃতান্ত্রিক সমাজের ভাবজগতে যেহেতু মাতৃপ্রাধান্য, তাদের দেবভাবনাও সেই কারণে মাতৃতান্ত্রিক। অর্থাৎ তাদের দেবলোকে, পুরুষদেবতা নয়, নারীদেবতারই প্রাধান্য। তাদের মিথ্-গুলো মাতৃচেতনারই কাল্পনিক সম্প্রসারণ। মাতার জনয়িত্রী রূপই তাদের দেবীমূর্তিতে সংহৃত। এখানেও সেই উৎপাদন-ক্রিয়াই মিথ্-এর প্রধান আশ্রয়। এবং এই সূত্রে মাতৃচেতনা ও প্রকৃতিচেতনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

একই উৎপাদন-ক্রিয়া বা একই জনয়িত্রী শক্তি একদিকে পৃথিবীতে বা প্রকৃতিতে, অন্যদিকে মাতাতে প্রত্যক্ষীকৃত। দেবীমূর্তি এই শক্তিরই ঘনীভূত রূপ। কৃষিজীবী মাতৃতান্ত্রিক জনসমাজের ভাবদৃষ্টিতে মাতা, পৃথিবী ও দেবীতে কোনো ভেদ নেই। তাদের আদিম কল্পনায় প্রজনন, প্রসব ও শস্য-উৎপাদন অভিন্ন। সন্তান ও শস্য, জীব ও উদ্ভিদ্, একই ইন্দ্রজালিক ক্রিয়ার আপাত-বিভিন্ন প্রকাশ। জন্ম, মৃত্যু, পুনরাগমন ও অমরতা এক সূত্রে গাঁথা। প্রকৃতি-ঘটিত আদিম পুরাণ-কল্পনাগুলির এই হল কেন্দ্রস্থ ভাব-বীজ।

পৃথিবীর সমস্ত কৃষিজীবী মাতৃতান্ত্রিক আদিম জনগোষ্ঠীর পুরাণ-কল্পনার মধ্যেই এই ভাব-বীজ খুঁজে পাওয়া যায়। হরপ্পা মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলির মধ্যেও নৃতত্ত্ববিদেরা অনুরূপ পুরাণ-কল্পনার স্পষ্ট ইঙ্গিত দেখতে পেয়েছেন। আজ যদি তাদের প্রকৃতিচেতনার কোনো অভিজ্ঞান আমরা খুঁজে পেতে চাই, তাহলে তাকে খুঁজতে হবে তাদের শস্যদেবীতে, পৃথিবীদেবীতে, তাদের পোড়ামাটির মাতৃকামূর্তিগুলির মধ্যে। কেননা এই সব দেবীরা প্রকৃতিরই মিথিক্যাল রূপায়ণ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, স্বাভাবিক নিসর্গচেতনা থেকে সরে যাবার, প্রকৃতিরই কল্প-মূর্তির অন্তরালে তার স্ব-মূর্তিকে হারিয়ে ফেলার এই হল প্রধান ধাপ। প্রকৃতিকে মানববৃত্তির মধ্যে দিয়ে দেখা, তাকে মানবীমূর্তিতে দেখা, এবং সেই মানবীমূর্তিতেই দেবীমূর্তি প্রত্যক্ষ করা, আদিম রূপকল্পনার এই ধাপটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই যে প্রকৃতিতে যুগপৎ নরত্বারোপ (anthropomorphization) এবং দেবত্বারোপ (apotheosis), এর মধ্যেই আমরা প্রকৃতিচেতনার রূপান্তরের আসল রহস্যের সন্ধান পেতে পারি। যে মানস-ক্রিয়ার ফলে একের সঙ্গে অপরের ভেদ লুপ্ত হয়, দুই এক হয়ে যায় এবং তার মধ্যে থেকে অভিনব তৃতীয়ের উদ্ভব হয়, সেই মানস-ক্রিয়াই বাস্তবের ক্ষুদ্র একটি ভগ্নাংশের উপর মিথ্-এর প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ গড়ে তোলে। আরোপ ও অভিক্ষেপের প্রবল ক্রিয়া-

প্রতিক্রিয়ার মনের স্বচ্ছ আয়না যখন বেঁকে চুরে যায়, তখন সেই মায়া-আয়নায় বাস্তবের কুঁড়ে ঘরের প্রতিচ্ছবিই মিথ্-এর স্বপ্নসৌধে পরিণত হয়।[১০]

প্রাচীন বাঙালীর ভাবজীবনেও এই আরোপ ও অভিক্ষেপ ক্রিয়ার প্রভাব পরিস্ফুট। ইতিহাসের দিক থেকে এই প্রবণতার উৎস-সন্ধান অবশ্য আমাদের কাজ নয়। এর সাহিত্যিক ফলাফল কী সেইটেই আমাদের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু এর ঐতিহাসিক ইঙ্গিতটাও যে খুব অর্থপূর্ণ তা অস্বীকার করা যায় না।

৬

আমাদের সুপরিচিত 'আর্য'-সংস্কৃতিতে কিন্তু স্বাভাবিক প্রকৃতিচেতনার বিশেষ অভাব দেখি না। এই প্রসঙ্গে ঋগ্‌বেদের প্রকৃতিবন্দনার সূক্তগুলিকে আবার স্মরণ করা যেতে পারে। প্রকৃতি-ঘটিত মিথ সেখানেও আছে। কিন্তু সে মিথ্‌গুলিতে আদিমতার লক্ষণ কম। মিথ্‌গুলি অপেক্ষাকৃত লঘুভার।

বৈদিক প্রকৃতিপূজা অনেক ক্ষেত্রেই খাঁটি প্রকৃতিপূজা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই তা, প্রকৃতি যার প্রকাশ তারই পূজা। সে সব ক্ষেত্রে তার আপাত-বহুত্ববাদ খাঁটি বহুত্ববাদ নয়, যে-কারণে কেউ কেউ একে 'ক্যাথিনোথিইজম্' বা 'হেনোথিইজম্' আখ্যা দিয়েছেন। সে যা-ই হোক, মোট কথা হল এই যে বেদের ধর্ম বহির্জগৎ-বিমুখ ধর্ম নয় এবং বৈদিক জনগোষ্ঠীর জীবনবোধও মোটেই স্তিমিত নয়। মিথ্-এর গুরুভারে তার প্রকৃতিচেতনা মুহ্যমান হয়ে পড়ে নি, মিথ্-এর লঘুস্পর্শে তার কবিকল্পনাই বরং উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে।

বৈদিক সমাজ অপেক্ষাকৃত জঙ্গমতাধর্মী। তা প্রধানত পশুপালক পশুচারক নরগোষ্ঠীর সমাজ। বৈদিক সমাজ পিতৃপ্রধান। বৈদিক দেবলোক এই সমাজেরই প্রতিফলন। পণ্ডিতেরা অনেকেই মনে করেন, সূর্য নক্ষত্রমণ্ডলী আকাশ চন্দ্র পৃথিবী (এবং অগ্নি)— এরাই বৈদিক দেবলোকের প্রথম ও প্রধান অধিবাসী।[১১] বিস্তীর্ণ প্রান্তরচারী যাযাবর পশুচারক নরগোষ্ঠীর দেবকল্পনা সম্ভবত এই রকম হওয়াই

১০ এই আরোপ-অভিক্ষেপ জাতীয় মানস-ক্রিয়াকে আধুনিক মনস্তত্ত্বকথিত Projection-ক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। অবশ্য সমগ্র ব্যাপারটা শুধুই Projection নয়, আরো জটিলতর মানসক্রিয়ার ফল। আধুনিক মনস্তত্ত্বে যে-সব প্রক্রিয়াকে নির্জ্ঞান মনের ছদ্মবেশ-কৌশল (Disguises, Masks) বলে' বর্ণনা করা হয়েছে, সেই সব মানস-প্রক্রিয়ার (mental mechanisms) প্রায় সবই অল্প-বিস্তর এর মধ্যে মিশে থাকে। বিশেষ লক্ষণীয় যে, এই projection, displacement, condensation ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলি মনোবিকার ও স্বপ্ন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও বিশেষ উপযোগী। মিথ্ রচনার মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যাতেও এদের আলোচনা অপরিহার্য। বলা বাহুল্য, মিথ্-রচনার মনস্তত্ত্ব মিথ্-এর একটি মাত্র বিশেষ দিক, সুতরাং মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাই মিথ্-এর পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা নয়। নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের সাহায্য ব্যতিরেকে মিথ্-এর পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা অসম্ভব।

১১. ম্যাক্সমুলার প্রমুখ ভাষাবিদ্ পুরাণ-গবেষকদের অনেকে ইন্দো-ইউরোপীয় সমস্ত মিথ্‌কেই সূর্য ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর কাহিনীরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি শুধু বেদেরই নয়, পরবর্তী হিন্দু-পুরাণের অতি-বিশদীকৃত উপাখ্যানগুলিরও জ্যোতিষী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আধুনিক নৃতত্ত্ব-গবেষণা পূর্বোক্ত ভাষাবিদ্ পণ্ডিতদের জ্যোতিষী ব্যাখ্যাকে বহুলাংশে খণ্ডিত করেছে। ফ্রেজার মিথ্-এর শস্য-উৎপাদন ঘটিত ব্যাখ্যার উপর জোর দিয়েছেন। ফ্রেজারের ব্যাখ্যাও অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক গবেষণার সমর্থন পায় নি। একটি কথা এখানে উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। বৈদিক মিথ্ যে অধিকাংশই জ্যোতিষী-ঘটিত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বেদ-পরবর্তীকালের হিন্দু মিথ্‌গুলির মধ্যে শস্য-উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত মিথ্-এরই বোধকরি সংখ্যাধিক্য।

স্বাভাবিক। কিন্তু সূর্য ও নক্ষত্রলোক, আকাশ ও পৃথিবী, উষা ও রাত্রি, এ-ও তো ইন্দ্রিয়গম্য প্রকৃতিরই আর-একটা দিক। এখানেও অবশ্য প্রকৃতিতে নরবৃত্তির অভিক্ষেপ এবং দেবত্বারোপ ঘটেছে। কিন্তু প্রকৃতিচেতনার এই মিথিক্যাল রূপান্তর বৈদিক নরগোষ্ঠীর স্বাভাবিক ইন্দ্রিয় উপলব্ধিকে আচ্ছন্ন করে দেবার মতো শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে নি।

বেদ-পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যে ঋগ্‌বেদের সরল বলিষ্ঠতার অভাব ঘটেছে। বহির্মুখী জীবনচেতনার অভাবও সেখানে অল্প-বিস্তর লক্ষণীয়। পুরাণ-কল্পনার যেভাবে প্রসার ও বিশদীকরণ ঘটেছে তার মধ্যে পূর্বকথিত আরোপ ও অভিক্ষেপ অনেক বেশি সক্রিয়। অধিকাংশ মিথ্-ই আর পূর্বের মতো লঘুভার কবিকল্পনা নয়, তারা গুরুভার। অবুদ্ধিলোকের সঙ্গে তাদের আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠতর। বেদ-পরবর্তী যুগের হিন্দুসংস্কৃতিতে আদিমতাধর্মী মিথ্-এর সংখ্যাধিক্য এবং গুরুত্ববৃদ্ধি একটা অত্যন্ত লক্ষণীয় ব্যাপার।

প্রকৃতিচেতনায় মিথিক্যাল রূপান্তর বেদ-পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যে অনেক স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও বৈদিক উত্তরাধিকার সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় নি। প্রকৃতিচেতনায় একটা জটিল বিমিশ্রতা এসেছে, কিন্তু স্বাভাবিক প্রকৃতিচেতনারও খুব অভাব দেখি না। উপনিষদের অনেক স্থানেই আমরা তার সাক্ষাৎ পাই। সেখানে নিসর্গশোভার চিত্র নেই, কিন্তু বিরাট মহাপ্রকৃতির মহিমান্বিত উপস্থিতি সেখানে স্পষ্টই অনুভব করা যায়। তাত্ত্বিক শোধনে তার সীমারেখা অস্পষ্ট, কিন্তু বৃহতের সীমারেখা তো অস্পষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া, উপনিষদ্ মূলত সাহিত্য নয়। সাহিত্যের দিকে তাকালে কি আমরা স্বাভাবিক নিসর্গচেতনার খুব অভাব দেখতে পাই? নিসর্গশোভা কি রামায়ণের একটি মুখ্য অঙ্গ নয়? কালিদাসে কি নিসর্গচেতনার অভাব আছে? কিংবা ভবভূতিতে, অথবা বাণভট্টে? এমন কি গীতগোবিন্দের পদের মধ্যেও কি আমরা খাঁটি নিসর্গচেতনার কিছু আভাস পাই না, যদি ভাল করে লক্ষ করি?

স্বাভাবিক নিসর্গচেতনা যেমন পাই, অস্বাভাবিক— অথবা বলি, আদিমতাধর্মী মিথিক্যাল রূপান্তরও তেমনি পাই। বেদ-পরবর্তী ভারতীয় সংস্কৃতি অত্যন্ত বিমিশ্র চরিত্রের সংস্কৃতি। বৈদিক সাহিত্যের সজীব উত্তরাধিকার প্রাচীন বাংলাসাহিত্যকে অল্পই সমৃদ্ধ করতে পেরেছে, পৌরাণিক সংস্কৃতির অন্যতর উপাদানগুলির সঙ্গেই বরং তার আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠতর। ভারতীয় গণ-মানসে প্রকৃতি-ভাবনার যে বিচিত্র প্রকাশ দেখতে পাই, তার মধ্যে ঋগ্‌বেদের সূক্তের প্রভাব বোধকরি সামান্যই। প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের প্রকৃতি-ভাবনা অনেকদিক থেকে ভারতীয় গণ-মানসের প্রকৃতি-ভাবনারই সগোত্র।

৭

ভারতীয় গণ-মানসে প্রকৃতি-ভাবনার অভিব্যক্তির মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে হলে 'প্রকৃতি' কথাটার দিকে একটু ভাল করে দৃষ্টিপাত করতে হবে। প্রকৃতি একটি অনেকার্থবোধক শব্দ। কথাটির সবগুলি অর্থের পূর্ণ তালিকা দিয়ে আমাদের প্রয়োজন নেই। আমাদের অনুসন্ধানের পক্ষে প্রাসঙ্গিক, এমন কয়েকটি বিশেষ অর্থের দিকেই আপাতত দৃষ্টি দেওয়া যাক।

প্রকৃতি অর্থ স্বভাব। প্রকৃতি অর্থ নিসর্গ। যা প্রাকৃতিক তা-ই নৈসর্গিক, আবার তা-ই হল স্বাভাবিক। মানব-নির্মিত যা-কিছু, যাকে আমরা কৃত্রিম বলি, সেইটুক বাদ দিয়ে আর বাকি সব-কিছুকেই

প্রাকৃতিক বলা যায়। সংকীর্ণ অর্থে নিসর্গপ্রকৃতিই প্রকৃতি, বিস্তৃত অর্থে কেবল' নিসর্গ নয়, মানুষ জীবজন্তু সবই— যা-কিছু 'প্রাকৃতিক' তাদের সামগ্রিক সত্তাই প্রকৃতি। আরো বিস্তৃত অর্থে— সমগ্র বিশ্ব-জগৎ, যাকে বলা হয়েছে বিশ্বপ্রকৃতি। এ অর্থগুলি সবই সুপরিচিত। কিন্তু অন্য কয়েকটি অর্থও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়।

প্রকৃতি অর্থ নারী, মাতা, আধার, যোনি, শিশ্ন। প্রকৃতি অর্থ দেহ। আবার প্রকৃতি অর্থ ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত। বিষয়টা লক্ষণীয় নয় কি?

প্রকৃতিপূজা কথাটার একটা অর্থ হল জড় পূজা, পঞ্চভূতের পূজা। আর-একটা অর্থ হল শিশ্ন-পূজা। আবার আর এক অর্থ নারী-ভজনা বা নারী নিয়ে সাধনা। আবার প্রকৃতি অর্থ হল কার্যকারণের কর্ত্রী। হেতু, মূল, আদিকারণ। যুগপৎ নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ। অন্যদিকে— দুর্গা, গঙ্গা, বেদমাতা, সাবিত্রী, এমন কি ষষ্ঠী, মনসা, এঁরাও প্রকৃতি নামে অভিহিতা। বৈষ্ণব তন্ত্রে রাধিকা হলেন 'প্রধানা প্রকৃতি'।

প্রশ্ন এই যে, বিভিন্ন এই সব অর্থের মধ্যে একেবারেই কি কোনো যোগসূত্র নেই? থাকাই তো স্বাভাবিক। ভাষার ইতিহাস সেই কথাই বলে। তা যদি থাকে, তাহলে দ্বিতীয় প্রশ্ন, সে যোগ কোথায়? কোন্ সাধারণ উৎস থেকে এই সব নানামুখী অর্থ নানা দিকে উৎসারিত হয়েছে? এদের মধ্যেকার সাদৃশ্যের ভিত্তিটা কোথায়? সাদৃশ্যকল্পনা কিসের উপর দাঁড়িয়ে একের বৃত্তি এমন অনায়াসে অপরের উপর আরোপ করেছে, যাতে করে এত রকম বিচিত্র অর্থের জন্ম হতে পারে?

লক্ষণীয় এই যে, নারী মাতা যোনি দেহ পঞ্চভূত দেবী— যা-ই হোক না কেন সকলেই একটা-কিছুর উৎপত্তির হেতু, সকলেই মূল বা ক্ষেত্র বা আধার। সকলেই 'কারণ', ক্রিয়ার প্রয়োজক। কিন্তু আদিম কল্পনায় কার্য-কারণের পারম্পর্যবোধ সুস্পষ্ট নয়। সেখানে ক্রিয়া ও প্রয়োজক ভিন্ন নয়। ক্রিয়াই কারণ। সেখানে ক্রিয়াই সর্বেসর্বা।

প্রকৃতি শব্দটির মূলেও রয়েছে কৃ-ধাতু। তবে কি 'কৃ', করা, অর্থাৎ ক্রিয়াই এদের সাধারণ ধর্ম? বিশুদ্ধ ক্রিয়াই কি এই সাদৃশ্যকল্পনার ভিত্তি? হওয়া অসম্ভব নয়, কেননা আদিম জীবন ক্রিয়াময় জীবন্। বিশুদ্ধ ক্রিয়া ইচ্ছাশক্তিরই বিশুদ্ধ প্রকাশ। বলা যেতে পারে, অজ্ঞান ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ। এই বিশুদ্ধ কারয়িত্রী-শক্তিই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই শক্তিই কারণ, এই শক্তিই কর্তা, আবার এই শক্তিই ফল। এ-শক্তি অমূর্ত নয়, সূক্ষ্ম নয়, অদৃশ্য নয়। এই শক্তিই নারী, পৃথিবী, প্রকৃতি, দেবী। শক্তি ও তার মূর্তি ভিন্ন নয়।

আদিম কল্পনায় মৌলিক ক্রিয়া একটিই— উৎপাদন, যার অপর নাম সৃষ্টি। সেখানে ক্রিয়া কর্তা কারণ ও ফলের মধ্যে কোথাও কোনো ভেদরেখা নেই, সবটাই যেন একটি অখণ্ড অবিভাজ্য নিরবচ্ছিন্ন ক্রিয়াশীলতা। কাম ও কামনা, প্রজনন ও বীজ-বপন, সন্তান ও শস্য, মৃত্যু এবং মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে পুনরাগমন— কি মানুষের কি উদ্‌ভিদের, সবই এক নিরবচ্ছিন্ন অন্তহীন কর্মপ্রবাহ, সবই এক বাধাহীন ঐন্দ্রজালিক লীলা। সেই ইন্দ্রজাল প্রকৃতিতে। সেই ইন্দ্রজাল দেবতাতে। সেই ইন্দ্রজাল নারীতে।

কিন্তু এ আর সাদৃশ্যকল্পনা নয়। এ হল অভেদকল্পনা। কল্পনা বটে, কিন্তু বাস্তবের থেকে কম প্রত্যক্ষ বা কম শক্তিশালী নয়। আদিম মনের কাছে স্বপ্ন যেমন আক্ষরিক অর্থে সত্য, এ-অভেদও তেমনি আক্ষরিক অর্থে সত্য। নারী, প্রকৃতি, দেবী, এরা সম্পূর্ণ অভিন্ন। আক্ষরিক অর্থে অভিন্ন।

নারী, প্রকৃতি ও দেবীর মধ্যে সমধর্মিতা আবিষ্কার করা যে কেবল অনুন্নত মনেরই বৈশিষ্ট্য তা নয়।[১২] পঞ্চভূত গ্রন্থের 'অখণ্ডতা' থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করছি।—

"সে [প্রকৃতি] একাকী, অখণ্ডসম্পূর্ণ, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্‌বিগ্ন। তাহার অসীম নীল ললাটে বুদ্ধির রেখামাত্র নাই, কেবল প্রতিভার জ্যোতি চিরদীপ্যমান। যেমন অনায়াসে একটি সর্বাঙ্গ-সুন্দরী পুষ্পমঞ্জরী বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, তেমনি অবহেলে একটা দুর্দান্ত ঝড় আসিয়া সুখস্বপ্নের মতো সমস্ত ভাঙিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে। সকলই যেন তাহার ইচ্ছায় হইতেছে, চেষ্টায় হইতেছে না। সে ইচ্ছা কখনো আদর করে, কখনো আঘাত করে ; কখনো প্রেয়সী অপ্সরীর মতো গান করে, কখনো ক্ষুধিত রাক্ষসীর ন্যায় গর্জন করে।"

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। বরং আরো একটু অংশ উদ্ধৃত করা যাক।—

"প্রকৃতির ন্যায় রমণীরও কেবল ইচ্ছাশক্তি, তাহার মধ্যে যুক্তিতর্ক বিচার-আলোচনা কেন কী-বৃত্তান্ত নাই। কখনো সে চারি হস্তে অন্ন বিতরণ করে, কখনো প্রলয়মূর্তিতে সংহার করিতে উদ্যত হয়। ভক্তেরা করজোড়ে বলে, 'তুমি মহামায়া, তুমি ইচ্ছাময়ী, তুমি প্রকৃতি, তুমি শক্তি'।"

এর মধ্যে সাদৃশ্যবোধ আছে, অভিন্নতাবোধ নাই। অভিন্নতাবোধের ভানও নাই। আরোপ যেটুকু আছে তা সচেতন। তা শুধু প্রচ্ছন্ন সাদৃশ্যকে স্ফুটতর করে তোলে। পুরাণ-কল্পনায় এই সাদৃশ্যবোধ তীব্র ও আবেগাত্মক হয়ে, বাসনা ও ক্রিয়ার সঙ্গে বিজড়িত হয়ে ঐকান্তিক অভেদবোধে পরিণত হয়। এইখানেই মিথ্-এর কবিকল্পনার পার্থক্য। কবিকল্পনাতেও সাদৃশ্যবোধ তীব্র এবং আবেগাত্মক, কিন্তু তা বাসনা ও ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রবল আত্ম-সম্মোহের সৃষ্টি করে না। কবিকল্পনার জগৎ প্রত্যক্ষ বাস্তবের পরিপূরক, প্রত্যক্ষ বাস্তবের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।

৮

কবিকল্পনায় পৃথিবীকে বলা হয়েছে—মহাজননী। মৃন্ময়ী মাতা বসুন্ধরার মাতৃমূর্তির প্রশস্তিতে কবি বলেন, 'তুমি শ্যাম কল্পধেনু, তোমারে সহস্ররূপে করিছে দোহন···তৃষিত পরাণী যত'।[১৩] পৃথিবী হল সেই

১২. নারী ও পৃথিবী (বা ভূমি), এবং প্রজনন ও কৃষিকর্মের মধ্যে গভীর সাদৃশ্যবোধের একটি ভাষাগত নিদর্শন পাই 'ক্ষেত্র' কথাটির বিবিধ অর্থের মধ্যে। ক্ষেত্র অর্থ চাষের ভূমিখণ্ড, আবার ক্ষেত্র অর্থ পত্নী। পুনশ্চ ক্ষেত্র অর্থ দেহ। অর্থাৎ বড়ো আয়তনে প্রকৃতির কথাটার যে অর্থ, ছোট আয়তনে ক্ষেত্র কথাটারও সেই অর্থ। কখনো কখনো বড়ো আয়তনেও ক্ষেত্র কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। ক্ষেত্র অর্থ প্রকৃতি। ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থ পরমেশ্বর। বিষয়টাকে আরো একটু লক্ষ করা যাক। ক্ষেত্রজ্ঞ কথাটার আর-এক অর্থ কৃষিকর্মবেত্তা। আবার ক্ষেত্রজ্ঞের অপর অর্থ হল কামুক, ইন্দ্রিয়াসক্ত, পরদার-রত ব্যক্তি। আরো আছে। যে সামাজিক ব্যবস্থাতে সন্তান মাতৃনামে পরিচিত হয় এবং মাতার জাতিকুলের দ্বারা চিহ্নিত হয়, তাকে বলা হয় 'ক্ষেত্রপ্রাধান্য', যার অবিকল বিপরীত হল, 'বীজপ্রাধান্য'। এখানেও ভাবকল্পনা পুরোপুরি কৃষিকর্ম-কেন্দ্রিক। এইখানেই শেষ নয়। ক্ষেত্রপাল অর্থ যিনি ক্ষেত্রের শস্য রক্ষা করেন। অন্যদিকে ক্ষেত্রপাল হলেন মহাদেব এবং ক্ষেত্রপালরূপী মহাদেবের দয়ায় বন্ধ্যা বা মৃতবৎসার সন্তান জন্মে। মহাদেব একদিকে প্রজননের দেবতা, অন্যদিকে বাংলাসাহিত্যে দেখতে পাই, তিনিও কৃষিকর্মের দেবতা।

১৩. বলা বোধকরি অনাবশ্যক যে, পৃথিবীকে ধেনুরূপে কল্পনা করা কিছু নতুন নয়। 'গো' কথাটির এক অর্থ ধেনু, এক অর্থ পৃথিবী, অপর এক অর্থ মাতা। অর্থগুলোর যোগসূত্র মূল অর্থের মধ্যেই পাওয়া যাবে। মূল অর্থ হল, যথেচ্ছ বিচরণকারী। অর্থাৎ স্বেচ্ছাবিহারী। সেই সূত্রে যা-কিছু স্বেচ্ছাবিহারী তার অনেকেই গো। যেমন, ইন্দ্রিয়, বাক্য, দিক্, কিরণ ইত্যাদি। কিন্তু প্রশ্ন হল, আদিম কল্পনায় গাভী, পৃথিবী ও মাতার স্বেচ্ছাগামিতা ঠিক কোন্ ক্ষেত্রটিতে সুপ্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল? কৃষিজীবী মাতৃপ্রধান সমাজের বেলায় এ-প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া খুব দুরূহ হবে না।

মাতৃক্রোড়, 'যেথা হতে অহরহ অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ শতেক সহস্ররূপে'। প্রকৃতি ও পৃথিবীর এই প্রাণ-প্রদায়িনী জননীরূপটি কবির কল্পনা ও আদিম মিথ্-রচয়িতার কল্পনা উভয়কেই সমভাবে উদ্দীপিত করেছে।

কিন্তু প্রকৃতি বা পৃথিবীর এই একটিই রূপ নয়। 'বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে···অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।' নারীও তাই। 'কখনো চারি হস্তে অন্ন বিতরণ করে, কখনো প্রলয়মূর্তিতে সংহার করিতে উদ্যত হয়।' একদিকে প্রাণদায়িনী কল্যাণী, অন্যদিকে তপোভঙ্গকারিণী মোহিনী। পৃথিবীর মতো নারীকে সম্বোধন করেও কবি বলতে পারতেন, 'ডান হাতে পূর্ণ কর সুধা, বাম হাতে চূর্ণ কর পাত্র'। সেই যে আদিম বসন্তপ্রাতে কল্পনার সমুদ্রমন্থনে উর্বশী উঠে এসেছিল 'ডান হাতে সুধাপাত্র বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে', সে-উর্বশী নারীমাত্রেরই প্রতীক, সে-উর্বশী প্রকৃতিরই প্রতিনিধি। দেবীর কল্পনাও এর থেকে খুব দূরের নয়। কেননা, নারী ও দেবী তো আসলে ভিন্ন নয়। রাতে যিনি প্রেয়সীর রূপ ধরে আসেন, প্রভাতে তিনিই দেবীর বেশে এসে উদিত হন।

পুরাণ-কল্পনায় এই বোধটাই প্রবল ও একান্ত হয়ে বাস্তবের প্রতিদ্বন্দ্বী একটি ইচ্ছা-পূরণের কল্প-জগৎ, একটি স্বপ্ন-কুহকের, মায়া-মরীচিকার জগৎ সৃষ্টি করে' নিয়েছে।

বেদ-পরবর্তী ও মধ্যযুগের ভারতীয় পুরাণ-কল্পনার জগতে দেবীরা আর মোটেই অপ্রধান নয়। সে দেবী কখনো এক, কখনো বহু। কোথাও কল্যাণী মাতৃমূর্তি, কোথাও বা ভীষণ দানবীমূর্তি।[১৪] কখনো তিনি জগৎ-প্রসবিনী, জগদ্ধাত্রী, কখনো বা সংহারকারিণী রুদ্রাণী। কোথাও অন্নপূর্ণা অভয়া, কোথাও বা খর্পরধারিণী মুণ্ডমালিনী। কখনো ভিন্ন ভিন্ন ভাবকল্পনাসম্ভূতারা এক সঙ্গে মিশে এক পরম মহাদেবী হয়ে উঠেছে, আবার কখনো বা একই পরম মহাদেবী ক্ষেত্রভেদে, শক্তির প্রকাশভেদে, বহুধা-বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেবীতে পরিণত হয়েছে।

ভারতীয় পৌরাণিক দেবীসমাজের এই যে ছোটো এবং বড়ো, এক এবং বহু, এরা কেউ-ই আকাশ থেকে পড়ে নি। ভারতীয় জনসমাজের বিশ্ববীক্ষা এবং আত্মবীক্ষা থেকেই এই দেবীসমাজের জন্ম হয়েছে। তাদের বাসনা ও বেদনা, ভয় ও লোভে থেকে, তাদের অতীতের স্মৃতি, বর্তমানের অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যতের আশার প্রতিফলন থেকে এই দেবীদের উদ্‌ভব। দেবীকল্পনার ভাব-পরিমণ্ডলটি সব সময়ই একটি ঘন কঠিন

১৪. ফ্রয়েড প্রমুখ কেউ কেউ মনে করেন, আদিম গোষ্ঠীজীবনে পুরুষের মাতৃগমন-ভীতি এবং তৎসংক্রান্ত অবদমিত পাপবোধ মাতা বা দেবীর উপর অভিক্ষিপ্ত হয়ে দেবীকে দানবীমূর্তিতে পরিণত করেছে। অর্থাৎ নিজের গোপন পাপ মাতা বা দেবীতে হিংস্রতারূপে আরোপিত হয়েছে। কিন্তু মানুষের শৈশব-চেতনায় মাতার দ্বিবিধ মূর্তিই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ— বিশেষত সমাজটা যেখানে মাতৃপ্রধান। প্রকৃতি ও পৃথিবীর সুন্দরী মূর্তি ও ভয়ংকরী মূর্তি, এই দ্বিবিধ মূর্তিই সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার বিষয়— বিশেষত সমাজটা যদি কৃষিজীবীদের সমাজ হয়। নারীর রূপ-বৈপরীত্যও খুব অলক্ষ্যগোচর নয়। এ রকম ক্ষেত্রে, দেবীর দানবীমূর্তি-কল্পনার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে' ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যার শরণ হবার কোনো প্রয়োজন দেখছি না।

প্রত্যক্ষ বাস্তবকে ঘিরেই গড়ে ওঠে। অনুমান হয়, এ ক্ষেত্রে প্রকৃতি ও মাতাই সেই প্রত্যক্ষ বাস্তব। অথবা বলা যায়, জীবিকাসংস্থান ও সমাজবিন্যাসই সেই প্রত্যক্ষ বাস্তব।[১৫]

মনে হয়, প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতাগোচর নিসর্গপ্রকৃতিই বহুকালের বহুজনের অভিজ্ঞতা ও স্মৃতির সংশ্লেষণে, বহুতর কামনা ও বেদনার অভিসিঞ্চনে, বহুবিধ জাদুক্রিয়া ও আচার-অনুষ্ঠানের সম্মোহনে ধীরে ধীরে আদ্যাশক্তি মহাপ্রকৃতিতে পরিণত হয়েছে। তার সঙ্গে এসে মিশেছে, ঠিক-তেমনিভাবে-গড়ে-ওঠা বাস্তব-মাতৃচেতনার-রূপান্তর-থেকে-পাওয়া এক মহা-মাতৃচেতনা। এই সম্মিলিত চেতনাই রূপ-কল্পনার জাদুতে বিশ্বপ্রসবিনী বিশ্বধারিণী পরম মহাদেবী (The Great Goddess, The Great Mother—Magna Mater) হয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

৯

সকল শক্তির সারাৎসার যে-মহাশক্তি, তাকে একটি আদিম জনগোষ্ঠীর স্থূল মিথলজির সঙ্গে যুক্ত করে দেখার বিরুদ্ধে দু-দিক থেকে আপত্তি উঠতে পারে। এক আপত্তি ধর্মের দিক থেকে। দ্বিতীয় আপত্তি তত্ত্বের দিক থেকে।

ধর্মের দিক থেকে 'দেবতা-নির্মাণ' কথাটাই তো অশ্রদ্ধেয়। খাঁটি ধর্মচেতনার ক্ষেত্রে দেবতার আধ্যাত্মিক তাৎপর্যটাই আসল কথা। ধর্মজীবনে সেই অধ্যাত্মিক সত্যটাই গ্রাহ্য, আর কিছু গ্রাহ্য নয়। দেবকল্পনার ঐতিহাসিক উৎস বা তার ক্রম-বিবর্তনের প্রসঙ্গ ইতিহাসেরই প্রসঙ্গ। অধ্যাত্মচেতনার ক্ষেত্রে সে-তথ্যের কোনো মূল্য নেই।

স্বীকার করি, এ কথা অসঙ্গত নয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বর্তমান ক্ষেত্রে এ আপত্তি টেঁকে না। আমাদের বর্তমান অনুসন্ধান সাহিত্যের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে, ধর্মচেতনার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য নিয়ে নয়, দেবকল্পনার অধ্যাত্ম-সত্য নিয়ে নয়। জনকল্পনা সাহিত্যকে বা সাহিত্যের ইতিহাসকে কি ভাবে প্রভাবিত করেছে তাই যেখানে আমাদের আলোচ্য, সেখানে মিথলজির আলোচনা মোটেই অবান্তর নয়।

তত্ত্বের দিককার আপত্তিও এই একই আপত্তি। দেবী তো অমূর্ত শক্তিতত্ত্বের রূপক মাত্র। আবার জনকল্পনা এই রূপকেরই স্থূল একটা বিকার মাত্র। বিশুদ্ধ তত্ত্বকে এই রূপকও স্পর্শ করে না, বিকারও স্পর্শ করে না। তাহলে এই বিকারের আলোচনায় ফল কী?

যদি তত্ত্বই আমাদের আলোচ্য হত, তাহলে তার বিকারের আলোচনায় সত্যিই কোনো লাভ ছিল না। কিন্তু বিশুদ্ধ শক্তিতত্ত্ব মোটেই আমাদের আলোচ্য নয়। তত্ত্বের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বা যৌক্তিকতা-

১৫. মিথ্ যে গোষ্ঠীজীবনের সৃষ্টি, নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, সে কথা স্বীকার করেও, বাস্তবের মিথিক্যাল রূপায়ণের ব্যাখ্যায় ফ্রয়েড জীবিকাসংস্থান বা সমাজবিন্যাসের বৈশিষ্ট্যের উপর বিশেষ জোর দেন নি। তিনি বেশি জোর দিয়েছেন ব্যক্তি-মানসের বৈশিষ্ট্যের উপর, তার স্বকীয় অভিজ্ঞতার বিশেষত্বের উপর। তাঁর মতে ইডিপাস-কমপ্লেক্স— মাতৃগমন-বিভীষিকা ও পিতৃহনন-বিভীষিকা, এই হল মিথ্-রচনার একেবারে গোড়াকার কথা। অন্যপক্ষে, ইয়ুং সব থেকে বেশি জোর দিয়েছেন জাতির স্মৃতি-ভাণ্ডারের নিত্য উপাদানগুলির উপর, জাতির সমষ্টিগত অবচেতন মনের (Collective unconscious) উপর। এ ব্যাখ্যাতেও সামাজিক পরিবেশ ও তার অবস্থান্তরের গুরুত্ব পরিপূর্ণ স্বীকৃতি পায় নি। প্রাচীনদের মধ্যে বাকোফেনই বোধকরি প্রথম যিনি মিথ্-রচনায় সামাজিক শক্তি-দ্বন্দ্বের ভূমিকাকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিতে পেরেছেন। আধুনিক গবেষণা অবশ্য এখন তাঁকে ছাড়িয়ে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এটা তাঁর পক্ষে কিছু অগৌরবের কথা নয়।

অযৌক্তিকতা দর্শনের আলোচনার বিষয়। তাছাড়া, রূপ বা মূর্তি সব সময়ই তত্ত্বের বিকার কি না, তত্ত্ব আগে কি রূপকল্পনা আগে, সব সময় তাও বলা সহজ নয়। অনেক ক্ষেত্রে বরং মূর্ত-কল্পনাই বৈদেহী তত্ত্বের উৎস এবং আশ্রয়। শক্তিতত্ত্বের ক্ষেত্রে তা যদি না-ও হয়, তবু— মূর্ত-কল্পনার সৃষ্টি এই দেবী-ঘটিত মিথ্‌গুলি যে প্রবলভাবে বিদ্যমান এবং তারা যে ভারতীয় সাহিত্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে, এই ঐতিহাসিক সত্যটিই সাহিত্যসন্ধানীর কাছে বড়ো কথা।

কিন্তু ঐতিহাসিক দিক থেকেও যে আপত্তি উঠতে পারে না তা নয়। আপত্তি না হোক, অন্তত প্রশ্ন। পৌরাণিক সংস্কৃতি তো বৈদিক সংস্কৃতিরই উত্তরাধিকারী, তাহলে এ সংস্কৃতিতে এমন দেবী-প্রাধান্য কেন? পৌরাণিক দেবকল্পনার মধ্যে এই অপেক্ষাকৃত আদিমতাধর্মী উপাদানগুলি কোন্ পথে এসে প্রবেশ করলো? বেদেই কি তার বীজ ছিল?

বেদের উষা, অদিতি, পৃথিবী, রাত্রি, সরস্বতী— বিশেষ করে দেবীসূক্তের বাক্-দেবীর কথা উল্লেখ করে কেউ কেউ এরকম ইঙ্গিত করেছেন যে, বৈদিক দেব-ভাবনাকে তথা বৈদিক জনসমাজকে সচরাচর যতখানি পুরুষ-প্রধান বলে কল্পনা করা হয়, তা ঠিক নয়। অর্থাৎ পরবর্তী দেবী-প্রাধান্যের বীজ বেদেই বিদ্যমান। কেউ কেউ এ প্রসঙ্গে সিন্ধুসভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতার মধ্যে আদান-প্রদানের সম্পর্ক অনুমান করেছেন। তাঁদের মতে নারী-দেবতারা বৈদিক দেব-মণ্ডলীর মৌলিক দেবতা নয়, আগন্তুক দেবতা। আবার কেউ কেউ বৈদিক সভ্যতাকে সিন্ধুসভ্যতারই সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারী বলে অনুমান করেছেন। আবার এমনও হতে পারে যে, সিন্ধুসভ্যতা না হোক, অপর কোনো বিস্মৃত মাতৃপ্রধান সভ্যতাই বিবর্তিত হয়ে কালক্রমে পুরুষপ্রধান বৈদিকসভ্যতায় পরিণত হয়েছে।[১৬] কেউ কেউ আবার বৈদিক নারীদেবতাদের গুরুত্ব সম্পর্কেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

এই সব পুরাতত্ত্ব-ঘটিত সমস্যার সমাধান নিয়ে সাহিত্য-অনুসন্ধিৎসুর আপাতত চিন্তিত না হলেও চলবে। যা আছে, তা কোথা থেকে কেমন করে এল সে প্রশ্ন আমাদের নয়। যা আছে, সাহিত্যক্ষেত্রে তার তাৎপর্য কী বা প্রভাব কতখানি, এইটেই আমাদের প্রধান বিবেচ্য। বেদ-পরবর্তীকালের ভারতীয় সংস্কৃতিতে তথা ভারতীয় সাহিত্যে নারীদেবতার সংখ্যা যে সুপ্রচুর এবং তাদের প্রভাব যে সুগভীর, এইটেই আমাদের পক্ষে বড়ো কথা। বিভিন্ন পুরাণ-গ্রন্থ, তন্ত্রশাস্ত্র, বিভিন্ন ভক্তিবাদী সম্প্রদায়— যেদিকেই তাকাই, সর্বত্রই নারীদেবতার ছড়াছড়ি। প্রাচীন বঙ্গসংস্কৃতিকে বুঝতে হলে পৌরাণিক সংস্কৃতির এই পটভূমিতে রেখেই তাকে দেখতে হবে।

---

১৬. প্রসঙ্গত হেলেনিক সভ্যতার দেব-মণ্ডলীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অলিম্পিক দেবলোক যে পুরুষপ্রধান সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু হেলেনিক সংস্কৃতির তলদেশে যে মিনোয়ান ও মাইকেনিয়ান কাঠামো আবিষ্কৃত হয়েছে, সেখানে নারী-দেবতাদের সংখ্যা বা মর্যাদা বড়ো কম নয়। গ্রীসের প্রাচীনতর মিথ্‌গুলির মধ্যে আদিমতার চিহ্ন সুপরিস্ফুট। যেমন ইউরেনাসের পুরুষাঙ্গহানির কাহিনী, অথবা ক্রোনাসের সন্তান-ভক্ষণ কাহিনী। ইউরেনাসের ও পৃথিবীমাতার যুগপৎ পতি-পত্নী ও সন্তান-মাতা সম্পর্কও ইঙ্গিতবহ। এদের দাম্পত্য-কাহিনীতে মাতৃতন্ত্র ও পিতৃতন্ত্রের বিরোধেরও আভাস পাওয়া যায়। অলিম্পিক মিথ্-এ বিশ্বসৃষ্টির উপাখ্যানটিও কম আদিম নয়। স্মরণীয় যে গ্রীক মিথলজির আদি-দেবতা ইউরিনোম বিশ্বপিতা নন, তিনি বিশ্বমাতা। পণ্ডিতেরা মনে করেন, হেরা, এথীনা, আর্টিমিস, আফ্রোদিতি— এই সব বহিরাগত দেবীরা অনেক বাধাবিঘ্ন ডিঙিয়ে তবে হেলেনিক দেবমণ্ডলীতে প্রবেশের অধিকার পেয়েছে। ডিওনিসাস্ ও তার 'কাল্ট্' কম আদিমতাধর্মী নয়। ডিওনিসাস্ও বহিরাগত দেবতা। ... বৈদিক সভ্যতার ক্ষেত্রে অনুরূপ ঘটনা যে ঘটতেই পারে না তা কে বলতে পারে?

১০

প্রাচীন যুগের শেষ দিকের এবং গোটা মধ্যযুগের ভারতীয় সংস্কৃতিতে ভক্তিবাদের প্রসার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। মধ্যযুগের হিন্দুসাধনার ইতিহাস প্রধানত ভক্তিবাদী সাধনারই ক্রমবিকাশের ইতিহাস। অল্পস্বল্প সন্দেহজনক ব্যতিক্রমকে বাদ দিলে, সমস্ত ভক্তিবাদী সাধনাই শেষ পর্যন্ত কোনো-না-কোনো আকারের শক্তিসাধনা।[১৭] তলিয়ে দেখলে শক্তিসাধনা অর্থই হল কারয়িত্রী প্রতিভার বা ক্রিয়াশক্তির সাধনা। শক্তিসাধনা মাতৃসাধনাও বটে। গূঢ় অর্থে প্রকৃতিসাধনাও বলতে পারি।

পূর্ব-ভারতে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, শক্তিসাধনা বা মাতৃসাধনার অসামান্য প্রভাবের কথা কারোই অবিদিত নেই। বাংলাদেশে এ প্রভাব শুধু যে সাধনতত্ত্ব ও ধর্মাচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়। বাঙালী জাতির প্রবল মাতৃমুখী প্রবণতা তার পারিবারিক জীবনে, দৈনন্দিন আচার-আচরণে, তার সাহিত্যে — সর্বত্রই সুপরিস্ফুট। এই প্রবল গভীর মাতৃমুখিতা প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে যে-একটি সুতীব্র ভাবাবেগের সঞ্চার করেছে, অন্যত্র তা দুর্লভ। আশা কামনা ও আত্মনিবেদনের সংমিশ্রণে এই ভাবাবেগ অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে এই আবেগাত্মক বৈশিষ্ট্যটি আমাদের বর্তমান আলোচনার দিক থেকে খুব অর্থপূর্ণ। কারণ, যথার্থ মিথিক্যাল দৃষ্টির এইটেই প্রধান লক্ষণ।

শক্তিসাধনার প্রসঙ্গে স্বভাবতই তন্ত্রের কথা উঠবে। তন্ত্র কত প্রাচীন তা আমরা জানি না, কিন্তু কত প্রভাবশালী তা খানিকটা অনুমান করতে পারি। তন্ত্রের আদি উৎস কোন্ দেশে বা কোন্ সংস্কৃতিতে, প্রাচীন কালে তার প্রসারক্ষেত্র কতটা বিস্তৃত ছিল, তা এখনো গবেষণাসাপেক্ষ। কিন্তু এটা সুনিশ্চিত যে, মধ্যযুগে এবং তৎপরবর্তীকালে পূর্ব-ভারতই তন্ত্রের প্রধান প্রতিষ্ঠাভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রাচীন বঙ্গসংস্কৃতিতে তন্ত্রের প্রভাব অসামান্য। তন্ত্র যে কেবল শাক্তদের বিশিষ্ট ধর্মাচারের মধ্যেই আবদ্ধ তা নয়, বাঙালীর সাধনা ও ধর্মাচারের প্রায় প্রত্যেকটি ধারাতেই, তা সে বৌদ্ধই হোক আর বৈষ্ণবই হোক, সর্বত্রই তন্ত্রের উপস্থিতি স্পষ্ট অনুভব করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে এমনও মনে হয় যে, তন্ত্রটাই মূল কাঠামো, আর সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যগুলিই যেন আলংকারিক সংযোজন।

তন্ত্রসাধনা প্রকৃষ্টরূপেই শক্তিসাধনা। অর্থাৎ বিশুদ্ধ কারয়িত্রী প্রতিভার সাধনা, যে প্রতিভা নারীতে দেবীতে পৃথিবীতে, যে প্রতিভা প্রকৃতিতে। তন্ত্র অর্থ হল বিশিষ্ট পদ্ধতি, কর্মকাণ্ড-পদ্ধতি, অর্থাৎ ক্রিয়া-পদ্ধতি। পারিভাষিক অর্থে তন্ত্র প্রকৃতিসাধনা বা শক্তিসাধনার ক্রিয়া-পদ্ধতি। হয়তো একদিন স্থূল প্রাকৃত অর্থেও তন্ত্র তা-ই ছিল— উৎপাদন-পদ্ধতি।[১৮] তন্ত্রের মধ্যে কেউ কেউ আদিম কৃষিসমাজের এবং আদিম মাতৃপ্রধান সমাজের ভাব-কল্পনার ছাপ লক্ষ করেছেন। এ প্রকল্প সম্পর্কে যতই সংশয়ের অবকাশ

---

১৭ শৈব এবং বৈষ্ণবসাধনায় যথাক্রমে দুর্গা-পার্বতী ও রাধার প্রাধান্যের কথা এখানে স্মরণীয়। এমন কি পরবর্তীকালের বৌদ্ধ সাধনাও যে অনেকখানি পরিমাণে শক্তিসাধনায় পরিণত হয়েছিল তা সকলেরই সুবিদিত। বিভিন্ন আকার ও প্রকারের বৌদ্ধ দেবীদের মূর্তি, তাদের নামের দীর্ঘ তালিকা ও রূপের বিস্তৃত বর্ণনার কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।

১৮ তন্ত্র শব্দটির মূলে যে তন্ ধাতু, তার অর্থ হল 'বিস্তৃত করা'। এই অর্থ থেকেই তনয়, সন্তান তনু, তনুজ, তন্তুজ (অপত্য), প্রভৃতি শব্দের উদ্ভব,— এদের দ্বারা বংশ বিস্তৃত হয়। বিস্তার অবশ্য নানা ভাবে, নানা অর্থেই হতে পারে। কিন্তু বংশ-বৃদ্ধি, এই অর্থটাও মোটেই নগণ্য নয়। হয়তো এই অর্থেই, শস্যের উৎপাদন বা শস্য-উৎপাদনের বৃদ্ধি— এই সূত্রে কোনো পুরাকালে তন্ত্র আদিম কৃষিকর্মের সঙ্গেই সংপৃক্ত ছিল।

থাকুক-না কেন, তন্ত্রের আদিমতা সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ নেই, বাঙালীর ভাবদৃষ্টিতে তার প্রভাব সম্পর্কেও সংশয়ের অবকাশ নেই।

ইতিপূর্বে প্রকৃতি-ভাবনার যে স্ফীতি ও ঊর্ধ্বায়নের কথা বলা হয়েছে, সে প্রসঙ্গে সাংখ্যের কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। সাংখ্যের উদ্‌ভব ও ক্রমপরিবর্তনের ইতিহাস এখনো রহস্যাবৃত। সাংখ্যের আদি রূপটি যে কি রকম ছিল তা-ও অনেকটাই কল্পনার বিষয়। আমাদের ষড়্‌দর্শনের মধ্যে সাংখ্যই হয়তো প্রাচীনতম। অন্তত পক্ষে, সাংখ্য যে সুপ্রাচীন কালের, সাংখ্য যে আমাদের প্রাচীনতম মিথলজিদের সমবয়সী তাতে সন্দেহ নেই।

সাংখ্যের প্রভাব অতি সুদূর-প্রসারী। গীতার ভাব ও ভাষায় সাংখ্যের প্রভাব লক্ষণীয়। পুরাণাদিতেও তাই। আয়ুর্বেদাদি শাস্ত্রও প্রভূত পরিমাণে সাংখ্য-প্রভাবিত। বিভিন্ন গোত্রের ভক্তিবাদী সাধনাতেও সাংখ্যের ভাব-কল্পনার প্রভাব সুস্পষ্ট। ভারতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে সাংখ্যের স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন প্রভাবের আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'সাংখ্যদর্শন' প্রবন্ধে বলেছেন,—

> "যিনি হিন্দুদিগের পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন করিতে চাহেন, সাংখ্যদর্শন না বুঝিলে তাঁহার সম্যক্ জ্ঞান জন্মিবে না ; কেননা, হিন্দুসমাজের পূর্বকালীয় গতি অনেক দূর সাংখ্যপ্রদর্শিত পথে হইয়াছিল।"

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু অতীতের কথাই বলেন নি। তিনি আরো বলেছেন,—

> "যিনি বর্তমান হিন্দুসমাজের চরিত্র বুঝিতে চাহেন, তিনি সাংখ্য অধ্যয়ন করুন। সেই চরিত্রের মূল সাংখ্যে অনেক দেখিতে পাইবেন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি ঈষৎ পরিবর্তিত করে আমরাও বলতে পারি, যিনি হিন্দুসমাজের চরিত্র বুঝতে চান, তিনি তন্ত্র সাংখ্য প্রভৃতির পশ্চাৎপটে যে আদিম পুরাণ-কল্পনাগুলি ক্রিয়াশীল, সেগুলি অধ্যয়ন করুন, সেই চরিত্রের মূল সেখানে অনেক দেখতে পাবেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণভাবে হিন্দুসমাজ সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, বাংলার হিন্দুসমাজ সম্পর্কে সে কথা আরো অনেক বেশি প্রযোজ্য। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই সে কথার উত্থাপন করেছেন। বাংলা দেশে সাংখ্যের গভীর ও অন্তর্গূঢ় প্রভাবের কথায় তিনি বলেছেন,—

> "যখন গ্রামে গ্রামে, নগরে মাঠে জঙ্গলে শিবালয়, কালীর মন্দির দেখি, আমাদের সাংখ্য মনে পড়ে ; যখন দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী পূজার বাদ্য শুনি, আমাদের সাংখ্যদর্শন মনে পড়ে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের পরে এসব বিষয়ে গবেষণা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। আজকের দিনে তাঁর কথার আক্ষরিক যাথার্থ্য নিয়ে তর্ক তোলা নিরর্থক। কিন্তু তাঁর কথার মর্মগত সত্যতাকে উড়িয়ে দিতে পারি না—বিশেষত যখন সাংখ্যের পশ্চাৎপটে, তার প্রকৃতি-ভাবনার পশ্চাৎপটে যে আদিম লোক-কল্পনা ক্রিয়াশীল, তার দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করি।

সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব, তত্ত্বের দিক থেকে না হোক অন্তত তার বিন্যাসের দিক থেকে, মিথলজির সৃষ্টি-তত্ত্বের প্যাটার্নেরই অনুরূপ। এটা হয়তো বাহ্য, কিন্তু আভ্যন্তরীণ মিলও আছে। সাংখ্যের মূল কথা জগৎ-প্রসব। অধিকাংশ মিথ্-এর মূল কথাও প্রসব বা উৎপাদন। যখন স্মরণ করি আদিম কল্পনায় জীবপ্রসব শস্যপ্রসব জগৎপ্রসব অভিন্ন, মাতা প্রকৃতি ও দেবীতে ভেদ নেই, তখন মিলটা নজরে না পড়ে পারে না। সাংখ্যে পুরুষ নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতিই কারয়িত্রী, প্রকৃতিই সৃজনীশক্তি। অন্যপক্ষে, শক্তি-বিনা

শিবও শব। যখন স্মরণ করি, আদিম চেতনায় প্রজনন-ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষের ভূমিকা অজ্ঞাত; এবং কালক্রমে যখন সে-ভূমিকা আর রহস্যাবৃত নয়, তখনো মাতৃপ্রধান নরগোষ্ঠীতে সে-ভূমিকার সামাজিক গুরুত্ব অস্বীকৃত, তখন বেশ ব্যাপক একটা মিলের কথাই আমাদের মনে হয়।

সাংখ্যের সতত-সহগামী যোগের প্রভাবও ভারতীয় সাধনায় বড়ো কম নয়।[১৯] বাংলা দেশে তো কথাই নেই, প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে সর্বত্র যোগের উল্লেখ ছড়ানো। কোনো কোনো চর্যাকার নিজেদের যোগী বলে উল্লেখ করেছেন। বাংলার নাথসাহিত্য শৈবসাহিত্য কিনা তা নিয়ে দ্বিমত থাকতে পারে, কিন্তু সেখানে যোগের প্রভাব সম্পর্কে বিশেষ কোনো মতভেদ নেই। এমন কি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও দেখি, শঠ নায়ক যখন সহসা সাধু সেজে বসলেন তখন তাঁর যোগীর ভান: 'অহোনিশি যোগ ধেআই'। যোগের এই ব্যাপক প্রভাবের কথা স্মরণ করলে তার সহগামী সাংখ্যের কথা মনে পড়া অস্বাভাবিক নয়। যখন দেখি, প্রাচীন বাঙালীর ভাবনাবেদনাকর্ম সর্বত্রই নারীশক্তির প্রাধান্য, এবং নারী মানেই শক্তি, নারী মানেই প্রকৃতি, এবং আরো দেখি, প্রজনন-প্রসব-উৎপাদন— শক্তিকল্পনার এই হল সারাৎসার, তখন আমাদের ভাবনা সাংখ্য বা যোগ বা তন্ত্র ছাড়িয়ে বহুদূরবর্তী এক আদিম যুগের দিকে পিছিয়ে যায়। তখন বুঝতে পারি, কোনো এক আদিম সমাজের অতি দুর্মর পুরাণ-কল্পনাই প্রাচীন বাঙালীর সমগ্র ভাবদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

এই পুরাণ-কল্পনা সেদিনকার বাঙালীর মনে যে তীব্র আত্মসম্মোহনের সৃষ্টি করেছিল তার প্রভাব অতি সুদূরগামী। এই আত্মসম্মোহনই সেদিন নিসর্গপ্রকৃতির কাল্পনিক রূপকে তার চোখে প্রত্যক্ষ বাস্তবের থেকে প্রত্যক্ষতর ও সত্যতর করে তুলেছিল।

১১

নিসর্গপ্রকৃতিই রূপভেদে কোথাও পৃথিবীমাতা, কোথাও পরমেশ্বরী মহাজননী। তিনি বহুরূপীর মতো বিচিত্ররূপিণী ও বিবিধকারিণী। তিনিই সিন্ধুসভ্যতার শস্যপ্রসবিনী মাতৃকা। একই সঙ্গে তিনি ঋগ্‌বেদের অম্ভৃণ-কন্যা, আবার বাক্‌-দেবী, আবার বিশ্বাত্মিকা দেবীশক্তি। তিনি মার্কণ্ডেয় পুরাণের শাকম্ভরী, তিনি দুর্গা, আবার তিনিই নবপত্রিকা— কদলীবৃক্ষ, বিল্বশাখা, হলুদ, কচু, ডালিম। তিনিই নীলোৎপলবর্ণা উমা, ঘোরবর্ণা বিন্ধ্যবাসিনী, শবাসনা কৃশোদরা চামুণ্ডা। বৌদ্ধ দেবমণ্ডলীতে তিনিই হয়তো শস্যশীর্ষ-ধারিণী বসুধারা, সর্পকণ্ঠমাল্য-সজ্জিতা জাঙ্গুলী, সপ্তশূকরবাহী রথে তিনিই হয়তো 'সূর্য-দেবী' মারীচী। তিনিই হয়তো ভীষণদর্শনা একজটা, নরকপাল-মাল্যধারিণী নিরাত্মাদেবী, তিনিই পর্ণশবরী। তিনিই সপ্তমাতৃকা, দশমহাবিদ্যা, চৌষট্টিযোগিনী। তিনিই মহাকালী, গজলক্ষ্মী, যক্ষিণী, নাগিনী, ডাকিনী। সেই তিনিই কখনো কন্যারূপে, কখনো বধূরূপে, কখনো মাতারূপে বাঙালীর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে তার ক্ষুদ্র অন্তঃপুর-সংসারকে মহাবিশ্বসংসারের প্রতীকে পরিণত করে দিয়েছেন।

ভিন্ন ভিন্ন দেবীর নামরূপগত পার্থক্যকে, তাদের ইতিহাসগত বা উপাখ্যানগত পার্থক্যকে অস্বীকার

---

১৯ অনেকে অনুমান করেন, যোগ-সাধনার আদি-উৎস সিন্ধুসভ্যতায়। তন্ত্র ও যোগের মধ্যে কিন্তু একটি গুরুতর পার্থক্য আছে। তন্ত্রসাধনায় ক্ষেত্রপ্রাধান্য, যোগসাধনায় বীজপ্রাধান্য। ব্যাপারটা কৌতূহলদ্দীপক সন্দেহ নেই।...প্রসঙ্গত স্মরনীয় যে, নাথসাহিত্য যদিও বীজপ্রধান ভাবনারই প্রতিনিধি, তাহলেও নারী-শক্তির গুরুত্ব সেখানে মোটেই অস্বীকৃত নয়। বরং তার উল্টো। সমগ্র নাথসাহিত্যের একমাত্র বিষয়ই হল— প্রকৃতি, তার শক্তি এবং সেই শক্তির অবদমন-প্রচেষ্টা।

করি না। এ কথা বলি না যে, পৃথিবীর সমস্ত দেবীই ছদ্মবেশী প্রকৃতি। এমন কি এ কথাও বলি না যে, প্রাচীন বঙ্গসংস্কৃতির প্রত্যেকটি দেবীই নিসর্গপ্রকৃতির রূপান্তর। কিন্তু এ কথা বলি যে, বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন কালের, বিভিন্ন উপলক্ষের দেবতা-নির্মাণকারী কল্পনার মধ্যে একটি মূলগত ঐক্য আছে। উপরন্তু, সমাজপরিবেশগত সাম্য সমধর্মী দেবকল্পনারই জন্ম দেয়।[২০] এও বলি যে, প্রায় সব রকম সমাজপরিবেশেই প্রকৃতি মানুষের সব থেকে বড়ো সহায় এবং সব থেকে বড়ো চ্যালেঞ্জ। সব চাইতে অব্যবহিত প্রত্যক্ষ, সকলের থেকে বড়ো সত্য। এ কথাও বলব যে, পৃথিবীর অনেক দেশের অনেক দেবীই— বিশেষ করে কৃষিজীবী সমাজের প্রায় সব দেবীই— মূলত উর্বরতা ও উৎপাদনের দেবী ; প্রজনন, প্রাণধারণ ও পুনর্জীবনের দেবী। পুরুষদেবতা থাকলে, সে-ও তাই।[২১] এ কথাও ঠিক যে, অনেক দেবীই শস্যদেবী, পৃথিবীদেবী, প্রকৃতিদেবী। প্রাচীন বঙ্গসংস্কৃতির অধিকাংশ দেবীই তাই। সেই সঙ্গে এ কথাও বলতে হবে যে, প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের মানবীকল্প দেবীরা এবং দেবীকল্প মানবীরা অনেক সময়ই পরস্পরের সঙ্গে নাড়ীর যোগে যুক্ত। এবং এই নাড়ীর যোগটা আসলে মিথিক্যাল কল্পনারই যোগ।

স্বপ্নে যেমন ঘটে, সত্যে মিথ্যায় একাকার হয়ে যায়, এক অপর হয়ে যায়, মিথিক্যাল কল্পনাতেও ঠিক সেই রকমই ঘটে। যে যা নয়, তাকে তাই জ্ঞান করা, শুধু জ্ঞান করা নয়, আবেগের সম্মোহে তাকে সেই রকম 'প্রত্যক্ষ' করা, এইখানেই মিথিক্যাল কল্পনার আসল বাহাদুরী। এরই জোরে সাদৃশ্য অভেদে পরিণত হয়, রূপক তত্ত্বকে গ্রাস করে এবং রূপ রূপক-কে আত্মসাৎ করে ফেলে।

রূপকই যে রূপ এবং রূপই যে সত্য, এই কথাটা বুঝতে পারলেই আমরা প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের অনেক রহস্যের সন্ধান পেয়ে যাব। তখন অনায়াসে বুঝতে পারব যে, চর্যাগীতির 'ছেনালী' ডোম্বী কেবল একটি নিরবয়ব তত্ত্বের নিরীহ প্রতীকই মাত্র নয়, সে-ই সাক্ষাৎ সত্য, প্রত্যক্ষ ও সুনিশ্চিত সত্য। এ কথা মিথ্যা নয় যে শবরীবালিকা সহজসুন্দরীর রূপক। কিন্তু এও মিথ্যা নয় যে, প্রমত্ত সাধকের আবেগবাষ্পাকুল বাসনাতপ্ত অবচৈতন্যে সার সত্য মাত্র সেই এক শবরকন্যা, কণ্ঠে যার গুঞ্জামালা, পরনে ময়ূরপুচ্ছ।

এই রহস্য বুঝলে এও বুঝতে পারব, কেমন করে বৈষ্ণব সহজিয়ারা রূপে স্বরূপের আরোপ করেন ; কেমন করে বাঙালী সাধক-কবি নিতান্তই রক্তমাংসের এক রজক-কন্যাকে বেদ-বাদিনী হরের ঘরণী বলে সম্বোধন করেন ; শক্তিসাধক কি করে কুলস্ত্রীকে কালীর প্রতীক রূপেই শুধু নয়, সাক্ষাৎ কালীরূপেই গ্রহণ করেন।

বলা বাহুল্য, এ হেন সর্বগ্রাসী আরোপধর্মিতা চেতনার মধ্যে আদিমতার অস্তিত্বই সূচিত করে। এই তীব্র 'phantasy thinking' (ইয়ুং) এই কথাই প্রমাণিত করে যে, সেদিনের বাঙালী আদিমকালের এক শৈশবস্বপ্নকে (আব্রাহাম যাকে বলেছেন, infantile soul-life of the people) জীবনের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত করে তারই কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন।

---

২০. ভারতীয় পুরাণের দুর্গা দেবী আর বহুবিস্মৃত প্রাচীন ক্রীটের সিংহবাহিনী সর্পসনাথা মহাদেবীর মধ্যে পার্থক্য যতই থাক, মৌলিক একটা মিল নিশ্চয়ই কোথাও আছে। এই মিলটার উপরেই এখানে আমরা জোর দিতে চাই।

২১. প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে প্রজননের দেবতা শিব প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে কৃষিকর্মেরও দেবতা। ধর্মঠাকুরও যুগপৎ সন্তান-দাতা ও শস্য-দাতা দেবতা। ধর্মঠাকুর কচিৎ শিবের সঙ্গে একাত্মীকৃত হলেও সম্ভবত তিনি সূর্যেরই রূপ-বিশেষ। সূর্য ভূমির উর্বরতা বিধান করে।

আদিমতার সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে বড়ো কম নেই। আমাদের লৌকিক মঙ্গল-কাব্যগুলি অনেক অংশেই আদিমতা-লক্ষণাক্রান্ত। সেখানে যে সৃষ্টিতত্ত্বের সাক্ষাৎ পাই, বিশেষ করে ধর্মমঙ্গলকাব্যে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব, সে যেন এক কিম্ভূত মিথলজির ভাঙা টুকরো দিয়ে গড়া উদ্‌ভট সৃষ্টিতত্ত্ব। কিন্তু উদ্‌ভট সে যতই হোক, বহু দেশের বহু আদিম নরগোষ্ঠীর মিথলজিগত সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে তার মর্মগত আত্মীয়তা আশ্চর্য রকমের। মঙ্গলকাব্যের চণ্ডীদেবী, শিব, ধর্মঠাকুর, মনসা— এরা প্রত্যেকেই আদিমতার চিহ্ন বহন করে।[২২] গোধিকা, সিংহ, বৃষ, হংস বা সর্প— টোটেম না হোক— এরাও আদিমতারই দ্যোতক।

নারীর দৈবী-মহিমাও এই আদিম মিথিক্যাল কল্পনারই অপ্রতিহত প্রতাপের সাক্ষ্য। বাংলাসাহিত্যে কেন যে শিবজায়ার পাশে শিব সর্বত্রই এমন নিস্প্রভ, কেন যে বৈষ্ণব পদাবলী অর্থই রাধা-পদাবলী, সে রহস্যের চাবিও এইখানে। এ রহস্য প্রাচীন চিন্তার সনাতন রহস্য। কেন যে অর্‌ফিউস যা পারলো না, আইসিস্ তা পারে, ডিমিটার-ও তাতে সম্পূর্ণ অক্ষম নয়, এইখানেই তার উত্তর মিলবে। এই দেবীরা যা পেরেছেন, পুরাণের সাবিত্রী তা পারে, বাংলাসাহিত্যের বেহুলা তা পারে, রূপকথার কাজলরেখাও তা পারে, এমন কি ত্রৈলোক্যনাথের কঙ্কাবতী পর্যন্ত তা পারে। পারে, তার কারণ, নারীই জন্মদায়িনী, নারীই প্রাণপ্রদায়িনী। অন্ধজনে আলো, সে হয়তো পুরুষেও দিতে পারে। কিন্তু জন্ম যে দেয়, মৃতজনে প্রাণ একমাত্র সে-ই দিতে পারে। মাতা প্রাণকে জন্ম দেন, বার বার নতুন প্রাণ এনে এনে মৃত্যুকে খণ্ডন করেন। পৃথিবী শস্যের জন্ম দেয়, বসন্তে-শরতে বার বার শস্যের পুনরুজ্জীবন ঘটায়। প্রকৃতিতে মৃত্যু চরম কথা নয়। প্রকৃতি মৃত্যুঞ্জয়ী। জীব ফিরে ফিরে জন্মায়— সে ফিরে ফিরে আসে। উদ্‌ভিদ ফিরে ফিরে মাথা তোলে। দিন রাত্রি ফিরে ফিরে যায় আর আসে। ঋতুরা বার বার যায়, বার বার ফিরে আসে।

প্রাচীন বাংলাসাহিত্য যে-দৃষ্টি দিয়ে প্রকৃতিকে দেখেছে, নারীকেও দেখেছে অবিকল সেই একই দৃষ্টি দিয়ে। সেই দৃষ্টির বৈশিষ্ট্যই নারীকে তার কাছে অভিনব ভাবব্যঞ্জনায় রঞ্জিত করে তুলেছে। এবং নারীকেই অত্যন্ত করে দেখেছে বলে আলাদা করে প্রকৃতিকে দেখবার আর প্রয়োজন অনুভব করে নি।

বঙ্গসাহিত্যে নায়িকাপ্রাধান্য এই একই ভাব-কল্পনার একটি বিশিষ্ট পরিণাম। পঞ্চভূতের 'নরনারী'-তে রবীন্দ্রনাথ সমীরের মুখ দিয়ে এই নায়িকাপ্রাধান্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন।—

---

২২. সর্পের সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে মনসাকে কেউ কেউ পৃথিবীদেবী বলে অনুমান করেছেন। অন্যপক্ষে, মনসা নাকি, প্রজনন ও উর্বরতার দেবতা শিবের মানস-সম্ভূতা। পৃথিবী নিজেও প্রজনন-প্রসব-উর্বরতার দেবী। শিব ও মনসা কি একই শক্তির দ্বিমুখী দুই রূপ-কল্পনা? মানস-সম্ভূতা কথাটার ইঙ্গিত কী? এ কি একটা রফার চিহ্ন? বাধ্যতামূলক স্বীকৃতির মধ্যে দিয়ে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসানের ইঙ্গিত? গ্রীক মিথলজিতে যেমন এথীনা জিউসের ললাট-সম্ভূতা।— এই ললাট-সম্ভূতা কথাটা সেখানে এথীনার স্বীকৃতিলাভেরই স্মারক। এখানেও কি তাই? মনসার প্রসঙ্গে প্রাচীন ক্রীটের সেই সর্পসনাথা সিংহবাহিনী দেবীর কথা বা বিভিন্ন আদিম নরগোষ্ঠীর সর্পদেবীদের কথা মনে পড়া অস্বাভাবিক নয়। সর্প তো সব দেশের মিথলজিরই একটা বড়ো জায়গা জুড়ে আছে, এবং চিরকালই সে প্রজনন, উর্বরতা, প্রাণশক্তি এবং প্রাণের নিত্য পুনরাগমনের প্রতীক। আরো লক্ষণীয় এই যে, একা মনসাই পৃথিবীদেবী নয়, দুর্গাও পৃথিবীদেবী, এবং দুজনেই সর্পসনাথা। দুজনেরই প্রতীক সর্প। তাহলে কি দুর্গা ও মনসার অভেদকল্পনা নিতান্তই কষ্ট-কল্পনা? শিব ও মনসা-দুর্গার প্রতিদ্বন্দ্বিতা কি বিস্মৃতকালের কোনো বাস্তব দ্বন্দ্বেরই ইঙ্গিত বহন করে?

"ইংরাজি সাহিত্যে গন্থ অথবা পন্থ কাব্যে নায়ক এবং নায়িকা উভয়েরই মাহাত্ম্য পরিস্ফুট হইতে দেখা যায়।...কিন্তু বাংলাসাহিত্যে দেখা যায় নায়িকারই প্রাধান্য।...বঙ্গসাহিত্যে পুরুষ মহাদেবের ন্যায় নিশ্চল ভাবে ধূলিশয়ান এবং রমণী তাহার বক্ষের উপর জাগ্রত জীবন্ত ভাবে বিরাজমান। ইহার কারণ কী ?"

এর অন্য কারণ যা-ই থাক, একটা প্রধান কারণ এই যে, বঙ্গসাহিত্য তার এক অতি সুদূর মাতামহীর সংস্কারকে সুদীর্ঘ কাল রক্তের মধ্যে বহন করে চলেছে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য জগৎ ও জীবনকে প্রায় কখনোই সাদা চোখে তাকিয়ে দেখে নি। দেখেছে মিথ্-এর রঙীন চশমা দিয়ে। এ দেখার ঘোর এখনো আমাদের সম্পূর্ণ কেটে যায় নি।

মিথ্-এর রঙ গায়ে মেখে, মিথ্-এর জাদু-চশমায় বেঁকে চুরে গিয়ে স্বাভাবিক নিসর্গপ্রকৃতি কখনো দেখা দিয়েছে দেবীর বেশে, কখনো দেখা দিয়েছে নায়িকার মধ্যে। তার স্বাভাবিক মূর্তিটি কদাচিৎই নজরে পড়ে।

এর ফলে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে একটি অভাবিত বৈশিষ্ট্য এসেছে সন্দেহ নেই। সেইটুকুই হয়তো আমাদের লাভ। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, বিশেষত্ব মাত্রেই মূল্যবান নয়। এই মিথিক্যাল দৃষ্টির ফলে যে-বিশেষত্বগুলো আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে দেখতে পাই, তার সাহিত্যমূল্য কতখানি সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

নিসর্গও কিছু নিজগুণে মূল্যবান নয়। মানব-উপলব্ধিই নিসর্গকে আস্বাদ্য করে তোলে। নিসর্গ-উপলব্ধির থেকে সাহিত্যে যে-একটি বিশেষ রসের সঞ্চার হয়, তার মূল্যেই নিসর্গের মূল্য। জীবন-রসের যে-আস্বাদটি মাত্র এই পথ দিয়েই মিলতে পারে, সেই মহার্ঘ আস্বাদটির থেকে বঞ্চিত থাকা কম লোকসানের নয়। প্রাচীন বাংলাসাহিত্য জীবনের সেই আস্বাদ থেকে আমাদের বঞ্চিত করেছে।

১২

একটা গুরুতর ভুল বোঝার সম্ভাবনা এখনো থেকে যাচ্ছে। আমাদের সিদ্ধান্ত কি তাহলে এই যে, মিথ্-কে অবলম্বন করেছে এইটেই প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের আসল অপরাধ ? মিথ্-কে অবলম্বন করেছে বলেই কি সে স্বাভাবিক নিসর্গপ্রকৃতিকে হারিয়ে ফেলেছে ? মিথ্-কে উপজীব্য করলেই কি প্রকৃতিকে হারাতে হয় ?

এমন কথা বললে অবশ্যই ভুল বলা হবে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিষয়বস্তু বা কাহিনীগুলো প্রায় সবই পুরাণ-মূলক— বেশির ভাগ লৌকিক পুরাণ, কিছু কিছু সংস্কৃত বা শাস্ত্রীয় পুরাণ। এটা, অর্থাৎ বিষয়বস্তু বা কাহিনী-উপাখ্যানাদির এই পৌরাণিকতা মোটেই অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে না। কোন্ দেশের কোন্ প্রাচীন সাহিত্যের অধিকাংশ উপাখ্যানই পৌরাণিক উপাখ্যান নয় ? তাহলে প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের বেলাতেই বা দোষ ধরব কেন ?

দোষ উপাখ্যানের মধ্যেই নয়, দোষ উপাখ্যানের আদিমত্বের মধ্যে। দোষ দৃষ্টির মধ্যে। বরং বলি, দৃষ্টির আদিমতার মধ্যে। সমস্ত প্রাচীন সাহিত্যের বিষয়বস্তুই অল্প-বিস্তর পুরাণ-মূলক। কিন্তু সব পুরাণই সমান আদিম নয়, সব দৃষ্টিই সমান আদিমতাধর্মী নয়। কাহিনীর পৌরাণিকত্ব এবং দৃষ্টিভঙ্গীর আদিমত্ব

মোটেই এক কথা নয়। পৌরাণিক উপাখ্যানকে ব্যবহার করা, আর ভাবদৃষ্টিতে মিথিক্যাল আদিমতা রক্ষা করা, আদিমতার দ্বারা ব্যবহৃত হওয়া, এ দুটো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার।

কি আদিমত্ব, কি নবীনত্ব, কোনোটাই স্থূল বিষয়বস্তুকে বা নিছক কাহিনী-কাঠামোকে আশ্রয় করে থাকে না। উর্বশী-কাহিনীর প্রাচীনতম রূপটি নিশ্চয়ই আদিমতাধর্মী। কিন্তু চলিষ্ণু জাতির চিত্তের গতির সঙ্গে চলতে চলতেই তার আদিমত্ব খসে খসে পড়েছে। নতুন নতুন কবিকল্পনার স্পর্শে বার বার তার নব-রূপায়ণ ঘটেছে। বিভিন্ন পুরাণ-কাহিনী কালিদাসের প্রতিভার মন্ত্রে তাদের মিথ্-ধর্ম পরিত্যাগ করে অভিনব কাব্য-দেহ নিয়ে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। 'মেঘনাদবধ' বা 'তিলোত্তমাসম্ভব' কি বিশুদ্ধ পুরাণ-কল্পনা? রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' কাহিনীসূত্রে মহাভারতের কাছে ঋণী, কিন্তু তার প্রাণবস্তুও কি পৌরাণিক?

গ্রীক পুরাণগুলিকে নিয়ে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন দেশে কত নাট্যকার কত নাটক রচনা করেছেন। এই সব রচনার মধ্যে আমরা প্রাচীন উপাখ্যানের নব-রূপায়ণের, সনাতন মিথ্-কে অবলম্বন করে সম্পূর্ণ অভিনব রস-সৃষ্টির চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। একই কাহিনী নিয়ে প্রাচীন গ্রীক নাট্যকার, ফরাসী ক্লাসিসিস্ট নাট্যকার এবং বিংশ শতাব্দীর আধুনিক নাট্যকার নাটক লিখেছেন। নাটকগুলির মধ্যে স্থূল বস্তুগত মিল প্রচুর, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর অমিলটাও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থাৎ নাট্যকারেরা মিথ্-এর কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছেন, ক্ষেত্র-বিশেষে তাদের সিদ্ধ-রসের সুযোগ গ্রহণ করেছেন, কিন্তু মিথ্-এর কাছে নিজেদের শিল্পী-সত্তার স্বাধীনতা বিসর্জন দেন নি।— ওরিস্টিস-ইলেকট্রা উপাখ্যান নিয়ে লেখা ইস্কাইলাস, সোফোক্লিস ও ইউরিপিডিসের নাটকের দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য লক্ষণীয়। আবার আড়াই হাজার বছর পরে সার্ত্র-ও লিখেছেন, ও'নীল-ও প্রায় একই বিষয় নিয়ে লিখেছেন। প্রাচীনে নবীনে দৃষ্টি-ভঙ্গীতে জীবন-বেদে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। নবীনদের নিজেদের মধ্যেও ব্যবধান বড়ো কম নয়। প্রত্যেকেই আপন সাহিত্যিক ঔচিত্যবোধের নির্দেশ মেনে চলেছেন। সোফোক্লিসের 'আন্টিগোন্' আর আধুনিক নাট্যকার আনুই'এর 'আন্টিগোন্' সম্পূর্ণ দুটি ভিন্নতর জীবনবোধের পরিচয় বহন করে। দুটির কোনো*টিই খাঁটি* পুরাণ নয়, দু*টিই* সাহিত্য। বহুখ্যাত ইডিপাস উপাখ্যানের কথা ধরা যাক। এই এক উপাখ্যান অবলম্বন করে যত নাটক এতাবৎ রচিত হয়েছে, তার মধ্যে অন্তত খ্যাতনামাগুলির প্রত্যেকটিই ভিন্ন নাটক। প্রত্যেকটির মধ্যেই একদিকে নাট্যকারের স্বকীয় প্রতিভার, অন্যদিকে বিশিষ্ট যুগবেদনার স্বাক্ষর মুদ্রিত আছে, তা সে সোফোক্লিস বা ইউরিপিডিসের নাটকই হোক আর হাল আমলের জীদ্ বা কক্তোর নাটকই হোক। আদিম মিথ্-টির অবিকৃত চেহারা কোনোটির মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে না, সোফোক্লিসের মধ্যেও নয়। (হোমারের যে বিরাট 'ভোজসভা' থেকে পরবর্তীরা আহার্য সংগ্রহ করেছেন, সেখানেও নয়)। কোনোটির মধ্যেই খাঁটি 'phantasy thinking' নেই, আবেগ ও কামনার সেই সর্বগ্রাসী সম্মোহন নেই, প্রকৃত মিথ্-এর যা স্বরূপ-লক্ষণ।

পুরাণ-কল্পনাকে বাসনা-কামনা ও আসক্তি-আবেগের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেবার কাজে কবি-সাহিত্যিকেরাই সব থেকে বড়ো সহায়। প্রাচীন বাঙালী কবিরা সে পথে অগ্রসর হন নি।[২৩] যে পুরাণ-

২৩. ভারতচন্দ্রই বোধকরি এর কথঞ্চিৎ ব্যতিক্রম। কিন্তু ভারতচন্দ্র নিশ্চয়ই যথেষ্ট পরিমাণে প্রাচীন বলে গণ্য হতে পারেন না।

কল্পনাকে তাঁরা তাঁদের চেতনায়-অবচেতনায় সযত্নে লালন করেছেন, তা মোটেই লঘুপক্ষ ভারমুক্ত পুরাণ-কল্পনা নয়। তা এক আদিম অত্যাচারী অন্ধ অবোধ শক্তি। তা তাঁদের ক্ষুধা তৃষ্ণা আকাঙ্ক্ষা লোভ ও ভয়ের সঙ্গে নাড়ীর বাঁধনে বাঁধা। তা তাঁদের দৈন্য লাঞ্ছনা ও পরাজয়ের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংপৃক্ত। তা তাঁদের হীনমন্যতার আশ্রয়, বাস্তববিমুখতার প্রলোভন, কাল্পনিক আত্ম-সান্ত্বনার করুণ দিবাস্বপ্ন। তা তাঁদের কবি-কল্পনার পক্ষীরাজ নয়, বুকের উপরকার জগদ্দল পাষাণভার।

এমন এক সময় ছিল যখন এই মিথ্‌ই তাঁদের পূর্বপুরুষকে ধারণ করে রাখত। যত অক্ষম যত অপটুই সে হোক, তখন সে-ই ছিল ধর্ম। তারপর বহু কাল কেটে গেছে। দর্শন বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য উন্নততর ধর্মবোধ দেশে দেশে চেতনার যুগান্তর ঘটিয়েছে। তার কাল যখন সম্পূর্ণভাবে অতিক্রান্ত, তখনো আমরা যদি সেই আগের দিনের মতোই তাকে আঁকড়ে ধরতে চাই, তখন সে আর ধর্ম থাকে না। তখন সে-ই হয়ে ওঠে মূর্তিমান অধর্ম। কালান্তরের 'বাতায়নিকের পত্রে' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"কবিকঙ্কণচণ্ডী, অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসান, প্রকৃতপক্ষে অধর্মেরই জয়গান।"

রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র, অর্থও ঈষৎ ভিন্ন। কিন্তু আমাদের অর্থেও কথাটা পুরোপুরি সত্য। কারণ, একটা কথা সব সময়ই মনে রাখতে হবে যে, নামে 'প্রাচীন' হলেও বাংলাসাহিত্যের বয়েস নিতান্তই অল্প। মাত্র এক হাজার বছর বয়েসের এই সাহিত্যটি কালের দিক থেকে মোটেই প্রাচীন নয়। অথচ তার সর্বাঙ্গে সুপ্রাচীন আদিমত্বের ছাপ। আদিম কালে আদিমত্বই ধর্ম, অকালে তা অধর্ম। এক সময় যা ছিল জাতির শিশু-আত্মার পক্ষে প্রাণের অবলম্বন—'soul-life of the people', কালাতিক্রমণের ফলে তা-ই হয়ে দাঁড়িয়েছে জাতির পক্ষে মারাত্মক রকমের 'infantile' পশ্চাৎ-অভিমুখিতা।

১৩

স্বপ্ন, তা সে জাগর-স্বপ্নই হোক আর নিশীথ নিদ্রার স্বপ্নই হোক, তা কখনো সোজাসুজি বাস্তবের সম্মুখীন হতে পারে না, বাস্তবকে সংশোধন করতে পারে না, বাস্তববোধকে ঘুলিয়ে দিতেই মাত্র পারে। উন্মাদের স্বপ্ন-বিকার যেমন তার বাস্তববোধকে বিকৃত কলুষিত ও অকর্মণ্য করে দেয়, কালাতিক্রান্ত মিথ্‌-এর কাজও ঠিক তাই। সে শুধু চেতনাকে ঘোলাটে করতেই পারে, অবুদ্ধিলোকের কুহেলিকা দিয়ে দৃষ্টিকে আবৃত করতেই পারে, ভৌতিক কুহকের হাতছানি দিয়ে জীবনকে ছলনা করতেই পারে।

এই আত্মছলনার একটি নমুনা আমরা নারীর দৈবমাহাত্ম্যের মধ্যেই দেখতে পাই। প্রাচীন বাঙালীর ব্যবহারিক বা সামাজিক জীবনে নারীর স্থান কোথায়? আকাশকুসুমের রাজ্যে নারী অবশ্যই দেবী। কিন্তু প্রত্যক্ষ বাস্তবে নারীর অবস্থা-দৈন্য কি অতি নির্মম সত্য নয়? দুই বিপরীত ভাবনাকে একই সঙ্গে মনের মধ্যে লালন করা—কি করে এটা সম্ভব হল? সম্ভব হল এই কারণে যে, আকাশকুসুম নিতান্তই আকাশকুসুম। কার্যক্ষেত্রে সে একটি ছলনা মাত্র। তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে গেলে সেই আত্মছলনা কার্যক্ষেত্রে বাস্তবের ক্রটিগুলির উপর একটি মোহন মিথ্যার প্রলেপ রচনা করে সংশোধনকে বিলম্বিত করতেই সাহায্য করে।

পঞ্চভূতের 'সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আমাদের আত্মপ্রবঞ্চনার আর-একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।—

"গাভীকে জন্তু বলিয়া জানি, তাহার বুদ্ধিবিবেচনার প্রতিও কটাক্ষপাত করিয়া থাকি, খেতের মধ্যে প্রবেশ করিলে লাঠি হাতে তাহাকে তাড়াও করি, গোয়ালঘরে তাহাকে এক হাঁটু গোময়পঙ্কের মধ্যে দাঁড় করাইয়া রাখি ; কিন্তু ভগবতী বলিয়া ভক্তি করিবার সময় সে সব কথা মনেও উদয় হয় না।"

স্বপ্ন ভালোও নয়, মন্দও নয়। কিন্তু স্বপ্ন যখন পেয়ে বসে, স্বপ্ন যখন ভর করে, বিপদ হয় তখন। মঙ্গলকাব্য প্রসঙ্গে 'বাতায়নিকে পত্র' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"ছলনা অন্যায় এবং নিষ্ঠুরতা কেবল যে মন্দির দখল করল তা নয়, কবিদের দিয়ে মন্দিরা বাজিয়ে চামর ঢুলিয়ে আপন জয়গান গাইয়ে নিলে। লজ্জিত কবিরা কৈফিয়ত দেবার ছলে মাথা চুলকিয়ে বললেন, 'কী করব, আমার উপর স্বপ্নে আদেশ হয়েছে।' এই স্বপ্ন এক দিন আমাদের সমস্ত দেশের উপর ভর করেছিল।"

সাহিত্যের 'বিভাব'-কে যে দৃষ্টি দিয়ে দেখার কথা, আমাদের প্রাচীন কবিরা প্রকৃতিকে সে দৃষ্টিতে দেখেন নি। নিরাসক্ত সৌন্দর্যবোধের দৃষ্টি দিয়ে দেখা আর অতৃপ্ত বাসনার ফেনায়িত স্বপ্ন-বিকারের দৃষ্টি দিয়ে দেখা, এ দু'য়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। পঞ্চভূতের 'সৌন্দর্যের সম্বন্ধ' থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করছি। আশা করি তার পর এ বিষয়ে অন্য কিছু বলার আর অবকাশ থাকবে না—

"আমরা জন্মাবধিই [প্রকৃতির] আত্মীয়, আমরা স্বভাবতঃই এক। আমরা তাহার [প্রকৃতির] মধ্যে নব নব বৈচিত্র্য, পরিসূক্ষ্ম ভাবচ্ছায়া দেখিতে পাই না, এক প্রকার অন্ধ অচেতন স্নেহে মাখামাখি করিয়া থাকি।···

"আমরা পৃথিবীকে নদীকে মা বলি, আমরা ছায়াময় বট-অশ্বত্থকে পূজা করি, আমরা প্রস্তর-পাষাণকে সজীব করিয়া দেখি, কিন্তু আত্মার মধ্যে তাহার আধ্যাত্মিকতা অনুভব করি না। বরঞ্চ আধ্যাত্মিককে বাস্তবিক করিয়া তুলি। আমরা তাহাতে মনঃকল্পিত মূর্তি আরোপ করি, আমরা তাহার নিকট সুখ-সম্পদ সফলতা প্রার্থনা করি। কিন্তু আধ্যাত্মিক সম্পর্ক কেবলমাত্র সৌন্দর্য কেবলমাত্র আনন্দের সম্পর্ক, তাহা সুবিধা-অসুবিধা সঞ্চয়-অপচয়ের সম্পর্ক নহে। স্নেহসৌন্দর্যপ্রবাহিণী জাহ্নবী যখন আত্মার আনন্দ দান করে তখনি সে আধ্যাত্মিক ; কিন্তু যখনি তাহাকে মূর্তিবিশেষে নিবদ্ধ করিয়া তাহার নিকট হইতে ইহকাল অথবা পরকালের কোনো বিশেষ সুবিধা প্রার্থনা করি তখন তাহা সৌন্দর্যহীন মোহ, অন্ধ অজ্ঞানতা মাত্র।"

১৪

এখানেই আমাদের আলোচনার উপসংহার টানা যেতে পারত। কিন্তু একটি মৌলিক সমস্যার, সাহিত্যতত্ত্বঘটিত একটি গোড়াকার প্রশ্নের আলোচনা এখনো বাকি আছে। প্রশ্নটি আপাতদৃষ্টিতে কবিকল্পনা ও মিথ্-এর সম্পর্ক নিয়ে। কিন্তু মূলত এ প্রশ্ন কবির উপলব্ধি-জগতে বস্তুর রূপান্তর-প্রক্রিয়ার প্রশ্ন। কিন্তু এই গুরুতর জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে পৌঁছুবার পূর্বে প্রাসঙ্গিক আরো দু-একটি প্রশ্নের জবাব দেবার প্রয়োজন অনুভব করছি।

ভারতীয় সাহিত্য কি সর্বত্রই নারীমাহাত্ম্য বিঘোষিত ? কামিনীকাঞ্চনকে বিষবৎ পরিত্যাগ করার আদর্শ কি ভারতীয় আদর্শ নয়, বাঙালী আদর্শ নয় ?

এ প্রশ্নের উত্তর দ্বিবিধ। প্রথমত, ভারতীয় সংস্কৃতি তথা বঙ্গসংস্কৃতি অতি বিমিশ্র জাতের সংস্কৃতি—বিবিধ বিরোধী উপাদানের আকর্ষণ-বিকর্ষণে গড়া, সমন্বয় ও অ-সমন্বয়ে মেলানো এক অতি জটিল সংস্কৃতি। সুতরাং কোনো আদর্শকেই অ-ভারতীয় বলে চিহ্নিত করার আপাতত কোনো প্রয়োজন দেখি না।

দ্বিতীয় উত্তরটি কিঞ্চিৎ মনস্তত্ত্ব-ঘেঁষা। অতিমাত্রায় বিঘোষিত কাঞ্চন-বিদ্বেষ যেমন সময়-বিশেষে দরিদ্রের কাঞ্চন-কামনারই একটি ছদ্মপ্রকাশ, কামিনী-বিদ্বেষও অনেকটা সেই জাতের জিনিস।[২৪] কামিনী-বিভীষিকা আসলে নারীমহিমারই অবচেতন স্বীকৃতি, নারীশক্তিরই বিপরীতমুখী জয়গান। এ দৃষ্টিও স্বচ্ছ সহজ বাস্তবদৃষ্টি নয়। এ হল পুরুষমনের পরাভব-চেতনার একটি বিচিত্র প্রকাশ, তার আত্মরক্ষার একটি করুণ অপকৌশল, একটি গূঢ় অসুস্থ মানস-কূট। এ সেই মিথিক্যাল দৃষ্টিরই সম্প্রসারণ ছাড়া আর কিছু নয়।

অতঃপর আর-একটি প্রশ্ন। পাশ্চাত্য সাহিত্যে কি নারীবন্দনা কিছু কম পাই? সেখানে কি নারীর দৈবীমহিমায় কোথাও মিথ্-এর ছোঁওয়া লাগে নি? অথচ নিসর্গচেতনা সেখানে তো কিছু কম দেখি না? একমাত্র খ্রীষ্টান ভাব-কল্পনাতেই স্থান-বিশেষে নারী নরকের দ্বার বলে, আদিম পাপের উৎস বলে নিন্দিত। কিন্তু অন্ত্য-মধ্যযুগীয় রোমান্স সাহিত্যে? অথবা তার পূর্বপুরুষ পেগান সাহিত্যে? 'Eternal Feminine'এর বিচিত্র রূপ-কল্পনাগুলি ইউরোপীয় সাহিত্যকে কি কম প্রভাবিত করেছে? ফাউস্টে গ্যেটে যে মাতৃমণ্ডলীর বন্দনায় বলেছেন—

> "In your name, ye MOTHERS! who upon the throne
> Of the Illimitable dwell eternally alone—
> Yet not unaccompanied····
>
> ···with you
>
> Abide what things are ageless, unfading, ever new."

তা কি নারীমহিমাকীর্তনের চূড়ান্ত নয়? অথবা তা কি আদৌ মিথিক্যাল নয়? সাহিত্যে মিথ্-কে আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাব রূপে গ্রহণ করা, মিথিক্যাল চেতনার লালন, কর্ষণ ও পরিবর্ধন, এ তো উনবিংশ শতকের পাশ্চাত্য রোমান্টিক সাহিত্যের সচেতন প্রোগ্রামেরই অন্তর্ভুক্ত। অথচ এই রোমান্টিক যুগটাই তো নিসর্গকবিতার যাকে বলে স্বর্ণ-যুগ?

মানছি যে এর প্রত্যেকটি কথাই সত্য। কিন্তু তার দ্বারা আমাদের মূল বক্তব্য খণ্ডিত হয় না।

ইউরোপীয় সংস্কৃতিও মিশ্র সংস্কৃতি, সেখানেও নানাবিধ বিপরীতমুখী ভাব-কল্পনা সমাহৃত। এ কথা ঠিক যে, সেখানে শুধু পরমপিতাই পূজিত নয়, মেরীমাতার পূজাও সমান সত্য। পুরাতত্ত্বের সাক্ষ্য মানলে এও স্বীকার করতে হবে যে, সুদূর কোনো প্রাগৈতিহাসিক যুগে এক সময় সারা ইউরোপ জুড়েই মাতৃকা-দেবীর 'পূজা' প্রচলিত ছিল। কিন্তু এ তথ্য শুধু পাশ্চাত্যমানসের জঙ্গমতা ও বলিষ্ঠতারই প্রমাণ

২৪ আধুনিক মনোবিদ্যায় এ-কে বলা হয়েছে, বিপর্যাস বা reversal। কার্ল মেনিঞ্জারের ভাষায়, "Saying or doing precisely the opposite of the real unconscious wish."

দেয়। তার কারণ, এ কথা মানতেই হবে যে, ঐতিহাসিক কালের যে পাশ্চাত্য চিত্ত-জগতের সঙ্গে আমরা পরিচিত, তার কেন্দ্রস্থ ভাব-কল্পনাগুলি মাতৃপ্রধানও নয়, উল্লেখযোগ্য রকমের আদিমতা-লক্ষণাক্রান্তও নয়। জগৎ ও জীবন-চেতনার রূপান্তর ইউরোপেও ঘটেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা তার বাস্তববোধকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে নি। মিথিক্যাল ভাবনা পাশ্চাত্য সাহিত্যেও প্রচুর প্রশ্রয়প্রাপ্ত। কিন্তু ততটা অচেতনভাবে নয়, যতটা সজ্ঞানে, সচেতনভাবে। এইখানেই আসল তফাত।

প্রকৃতিচেতনার রূপান্তর পাশ্চাত্য সাহিত্যেও ঘটেছে এ কথা মোটেই অস্বীকার করি না। কিন্তু সেই রূপান্তরে স্বভাবটা ভিন্ন রকমের। যতখানি বা যেভাবে ঘটলে নিসর্গপ্রকৃতির স্বাভাবিক রূপটা চাপা পড়ে যায়, মুখোশটাই মুখ হয়ে ওঠে, ততখানি ঘটে নি, সেভাবে ঘটে নি। ততটুকুই ঘটেছে এবং ঠিক সেই ভাবেই ঘটেছে, যেভাবে যতটুকু ঘটার প্রয়োজন ছিল। অন্য কোনো প্রয়োজনের কথা বলছি না, বিশুদ্ধ সাহিত্যিক প্রয়োজন।

কিছু পূর্বে আমরা যে সাহিত্যতত্ত্বঘটিত এক মৌলিক প্রশ্নের কথা উল্লেখ করেছিলাম— কবির উপলব্ধি-জগতে বস্তুর রূপান্তরের প্রশ্ন— এইখানে এসে আমরা সেই মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালাম।

১৫

সাহিত্যে যে-নিসর্গ রূপায়িত, তা অবশ্যই রূপান্তরিত নিসর্গ। সাহিত্যে এই রূপান্তর অপরিহার্য। শুধু নিসর্গের নয়, সমস্ত কিছুরই। কবির উপলব্ধিতে সমস্তই রূপান্তরিত হয়, সমস্তই নতুন প্রাণ পায়। তাই তার নাম সৃষ্টি।

রূপান্তর অনিবার্য, কিন্তু তার একটা নির্দিষ্ট সীমাও আছে। সে সীমা সত্যেরই সীমা। এ রূপান্তর সাহিত্য-বস্তুকে কখনোই মরীচিকার মতো অলীক করে ফেলে না। বরং তার সত্যের ভিত্তিকেই দৃঢ়তর করে। এ রূপান্তর রজ্জুকে সর্প করে না, সর্পকে রজ্জু করে না। রজ্জুর অনাবৃত রজ্জুরূপ-কে— সর্পের অনাবৃত সর্পরূপ-কে প্রকাশিত করে। নিসর্গের বিষয়ান্তরস্পর্শশূন্য যে রূপ, সেই অনন্য রূপটিকেই উদ্‌ঘাটিত করে দেয়।

প্রকৃত পক্ষে, প্রকৃতির কোন্ রূপটা যে একেবারে তার নিজস্ব রূপ তা কেউ জানে না। দার্শনিকেরাও না, বৈজ্ঞানিকেরাও না। ভিন্ন ভিন্ন ভাবভূমিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপের সত্যতা। সাহিত্যের ভাবভূমিতে সেইটেই প্রকৃতির সত্য রূপ, নিরাসক্ত সৌন্দর্য-উপলব্ধিতে—বিবিক্ত অথচ ভালবাসায়-উদ্দীপিত রূপ-ধ্যানের মধ্যে যার প্রকাশ। সাহিত্যে সেইটিই প্রকৃতির স্বাভাবিক রূপ, প্রকৃতির 'নিজস্ব' রূপ।

সাহিত্যে যে রূপান্তর, তাকে রূপান্তর বলাই অর্থহীন। অর্থহীন এই জন্য যে, তা বস্তুর মর্মসত্যকে আবৃত করে না। বরং উদ্‌ঘাটিত করে। কেননা, সৌন্দর্যদৃষ্টি বস্তুকে বেষ্টন করে না, বিচ্ছিন্ন করে না, বিদ্ধ করে না। তার মধ্যে বিশেষ সুবিধার প্রার্থনা নেই। তার মধ্যে আশার ছলনা নেই, ভয়ের ভ্রূকুটী নেই, ক্ষুধার প্রদাহ নেই।

মিথ্-এর নিজস্ব জগতে মিথিক্যাল রূপটাই হয়তো সত্য। কিন্তু সাহিত্যের জগতে— বিশুদ্ধ রূপ-ধ্যানের জগতে তার প্রবেশের অধিকার নেই। তার কারণ মিথিক্যাল রূপ আশা-ভয়-ক্ষুধারই ঘনীভূত বিগ্রহ। কবিরাই এই আশা-ভয়-ক্ষুধার কঠিন সংসক্তি থেকে মুক্ত করে দিয়ে মিথ্-কে কাব্যে রূপান্তরিত করে দেন। আবার কবিরাই কখনো কখনো আশা-ভয়-ক্ষুধার নাগপাশ রচনা করে কাব্যকে আদিম অন্ধ মিথ্-এর সগোত্র করে তোলেন। মিথ্‌ধর্মী কাব্য ও কাব্যধর্মী মিথ-এর যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে এই সত্যটা প্লেটোর প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে নিশ্চয়ই ধরা পড়েছিল। বোধকরি সেই কারণেই, নিজে কবি-স্বভাবী হয়েও, নিজে মিথ্-রচয়িতা হয়েও, প্লেটো তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র থেকে, প্রধানত মিথ্-রচনার অপরাধেই, কবিদের নির্বাসিত করার প্রস্তাব করেছিলেন।

কবিকল্পনা আর মিথিক্যাল-কল্পনা বা 'phantansy thinking' (যদি একে আদৌ 'thinking' বলা যায়) খানিকটা সমধর্মী হলেও, এক বস্তু নয়। কবিকল্পনায় চেতন ও অবচেতনের, বাঙ্ময় বুদ্ধি ও বোবা বেদনার, প্রত্যক্ষ বর্তমান ও বিস্মৃত অতীতের মিলন ঘটে। কবি অতি-সচেতনতা ও অন্ধ অবচেতনা, এই উভয় অত্যাচারীর স্পর্শ থেকেই নিজেকে বিবিক্ত রাখেন। সৃজনের ভূমিতে এসে দাঁড়ালে কবি একদিকে যেমন সচেতন মনের অতি-প্রত্যক্ষতা, অতি-বিশ্লেষণ ও অতি-সন্দিগ্ধতার হাত থেকে অব্যাহতি পান, অন্যদিকে তেমনি অবচেতনার অজগর-আলিঙ্গন থেকে, তার প্রচ্ছন্ন বাসনা ও বিকৃত বেদনার কঠিন মায়াবন্ধন থেকেও নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন। কবিকল্পনার পক্ষে একদিকের বিপদ অতি-সচেতনতার প্রাধান্য, যেমন দেখি ক্ষেত্র-বিশেষে নিও-ক্লাসিসিজ্‌মে। অন্যদিকের বিপদ অবচেতনার প্রাধান্য, যেমন সুর্-রিয়ালিজ্‌মে (এবং ক্ষেত্রবিশেষে উগ্র রোমান্টিসিজ্‌মে)।

জন্মের দিক থেকে আর্ট ও মিথ্ পরস্পরের নিকট-আত্মীয়। আর্ট এবং মিথ্ দুইই আবেগের মূর্ত প্রকাশ। দু'য়ের বাহন রূপাশ্রয়ী—সৃজনাত্মক কল্পনা। কিন্তু দু'য়ের পার্থক্যও সুগভীর। মিথ্ ব্যবহারিক এবং লৌকিক। আর্ট বিবিক্ত এবং অ-লৌকিক। আর্টে কামনার উদ্‌গতি (sublimation) ঘটে। মিথ্ অতৃপ্ত কামনার আক্ষিপ্ত ছায়ামূর্তি। আর্ট মুক্ত, মিথ্ বাসনাবন্ধনে জর্জরিত। মিথ্ তখনই আর্টে পরিণত হতে পারে যখন তার বাসনার বন্ধন সম্পূর্ণ ঘুচে যায়, তার আগে নয়।

মিথিক্যাল কল্পনায় অবচেতন অংশেরই একাধিপত্য। সেখানে সেই মানস-দূরত্বের অবকাশ নেই, রূপ-ধ্যানের পক্ষে যা অপরিহার্য। তাই অবধারিতভাবে লৌকিক বিশ্বাস সেখানে কাব্য-প্রত্যয়ের স্থান অধিকার করে। অবিশ্বাসের স্বেচ্ছাকৃত প্রত্যাহার নয়, এক ধরণের স্থূল, জৈব, অবোধ বিশ্বাস এসে সত্য ও অসত্যের ভেদাভেদ লুপ্ত করে দেয়। যক্ষের মতো কালিদাসেরও যদি চেতনে অচেতনে ভেদজ্ঞান সম্পূর্ণ-লোপ পেত, তাহলে তিনি 'মেঘদূত' লিখতেন না, গৃহে আবদ্ধ থাকতেই বাধ্য হতেন। সম্মোহিত স্বপ্নচালিত চিত্ত কাব্যসৃষ্টির পক্ষে অনুকূলভূমি নয়।

১৬

সচেতন মিথ্‌চর্চায় বিপদ নেই। সচেতন অবিশ্বাস-প্রত্যাহারেও বিপদ নেই। বিপদ অন্ধতায়, বিপদ সচেতনতার চূড়ান্ত পরাভবে, বিপদ অবুদ্ধির স্পর্ধিত প্রমত্ততায়। বিপদ মিথ্ যখন বাস্তবের বিকল্প হয়ে ওঠে। প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে তাই ঘটেছে।

একদা পাশ্চাত্য রোমান্টিক কবিরাও মিথ্‌এর জগৎকে বাস্তবজগতের বিকল্প করে তুলবার প্রয়াসী হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, ইচ্ছা করলেই অবুদ্ধির সঙ্গে রফা করা যায় না, ইচ্ছা করলেই বাস্তবকে ভুলে যাওয়া যায় না। তাঁদের সেই সচেতন বিস্মৃতি-প্রয়াস তাঁদের কাব্যে এক নতুন আস্বাদ এনে দিয়েছে। তার জন্যে তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে তাঁদের সেই প্রয়াস সম্পূর্ণই ব্যর্থ হয়েছে। হতেই হবে, কেননা আদিম মিথ্‌-এর দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। 'আদি যুগ পুরাতন এ জগতে ফিরবে না আর।'

প্রকৃতিতে দেবমহিমার আরোপ (Divinization of Nature) রোমান্টিকেরাও করেছেন। কিন্তু তা আদিমতাধর্মী দেবত্বারোপ নয়, তা খাঁটি মিথিক্যাল বস্তু নয়, তার জাত আলাদা। প্রকৃতির স্বাভাবিক রূপের মধ্যেই তাঁরা ঐশ্বরিক মহিমাকে দেখতে পেয়েছিলেন। তাছাড়া, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের নিসর্গকবিতার আসল সৌন্দর্য তাঁদের তত্ত্ব-ভাবনায় নয়, আসল সৌন্দর্য সেইখানে যেখানে নিসর্গের স্বাভাবিক মহিমা নিজ গৌরবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। এমন কি তত্ত্বপ্রবণ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতার ক্ষেত্রেও এ কথা মিথ্যা নয়।

সেই যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ লিখেছিলেন, হে ভগবান, আমাকে বরং পেগান করে দাও,—সে তো সত্যি সত্যি পেগান হবার জন্য নয়, সে নিতান্তই লোকেদের অতি-জাগতিকতা ও প্রকৃতি-বিমুখতার উপর রাগ করে। তিনি কি আর সত্যিই আশা করেছিলেন যে, সমুদ্রের নীলে দেখতে পাবেন প্রোটিয়ুস উঠে আসছে জল থেকে, আর দমকা হাওয়ায় শুনতে পাবেন ট্রিটনের শঙ্খধ্বনি? এ কেবল জাগর-স্বপ্ন। তা তিনিও জানেন। জানেন যে—

ফিরিবে না, ফিরিবে না, অস্ত গেছে সে গৌরবশশী
অস্তাচলবাসিনী উর্বশী।

ফিরবে না তা জানতেন বলেই রোমান্টিকদের কবিতা মিথ্‌ নয়, ধর্মাচার নয়, তা কবিতাই। তাঁদের ক্ষেত্রে প্রকৃতিচেতনার রূপান্তর ঠিক ততটুকুই হয়েছে, যতটুকুতে বিস্ময়ের অধিকার।

প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে এই রূপান্তর আর্টের নিত্য শুদ্ধ অনাসক্ত বিস্ময়বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অতি প্রাচীন এক আদিম ধর্মাচার, অতীতনিষ্ঠ এক অবোধ অন্ধ ক্রিয়াকাণ্ড-সম্মোহ এ-সাহিত্যের সমস্ত রূপ ও রূপান্তরের একক অধিকর্তা। প্রাচীন বাংলাসাহিত্য প্রায় সম্পূর্ণভাবেই পুরাণ-কবলিত সাহিত্য।

একে আর্ট বলি কিসের জোরে? আর্টের সঙ্গে ধর্মাচারের কোথাও কোনো সম্পর্ক নেই এমন কথা বলি না। জন্মসূত্রে এরা নিকট-আত্মীয়। কিন্তু এই আত্মীয়তার যিনি অন্যতম প্রধান প্রবক্তা, সেই জেন হ্যারিসন নিজেই এ কথা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেছেন যে, 'Ritual must wane that art may wax'।

কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ধর্মানুষ্ঠানের গুটি না কাটলে আর্টের প্রজাপতি পাখা মেলতে পারে না।· ·প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের ততটুকুই খাঁটি সাহিত্য যতটুকু সে ধর্মাচার-নির্ভর নয়, ritualistic নয়। কিন্তু সে আর কতটুকু?

লোকসাহিত্যের প্রধান অংশ—সম্ভবত অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন অংশ—'ধর্মীয়'-সাহিত্য নয়। কিন্তু

তার আয়তনও যৎসামান্য, প্রাচীনত্বও সন্দেহজনক। ধর্মাচার-নির্ভর নয়, অনুষ্ঠানগতপ্রাণ সাহিত্য নয়, এমন কথা একমাত্র বৈষ্ণব পদাবলীর অংশ-বিশেষ সম্পর্কেই বোধ করি বলা চলে। ধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হলেও, পদাবলীর আবেদন প্রধানত মানবিক। তার দৃষ্টি প্রধানত রূপ-দৃষ্টি।· · প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের আর বাকি প্রায় সমস্তটাই তো মঙ্গলকাব্য-জাতীয় বস্তু। প্রায় সমস্তটাই ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড-আশ্রিত ব্যাপার। দুর্বলভাবে সাহিত্য, প্রবলভাবে মিথলজি।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-সমীপে জওহরলাল, ১৯৩৯

আচার্য জওহরলাল

সুধীরঞ্জন দাস

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জীবদ্দশায় কিংবা তাঁর মহাপ্রয়াণের অব্যবহিত পরেই তাঁর কর্মবহুল জীবনের বহুমুখীপ্রতিভার বিচিত্র বিকাশের যিনি যেটুকু অংশ দেখেছেন এবং জেনেছেন সে সম্বন্ধে বহু গুণী ও জ্ঞানীজনেরা তাঁদের নিজ নিজ গভীর অনুভূতির কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। অত্যুচ্চ পর্বতমালার পাদদেশে দাঁড়ালে দর্শক তাঁর চোখের সামনে যেটুকু পড়ে সেটুকুই দেখেন। কিন্তু তুষারাবৃত গিরিশিখরের বিরাট সৌন্দর্য দেখতে হলে দর্শককে পাহাড়ের তলদেশ থেকে অনেকটা দূরে সরে দাঁড়াতে হয়। সেইরকম পণ্ডিতজীর সমসাময়িক আমরা যারা তাঁকে বেশ কাছে থেকে দেখেছি এবং কাছাকাছি পেয়েছি সেই আমরা একটি খণ্ড মানুষকেই দেখেছি। তাঁর জ্বলন্ত সুগভীর স্বদেশপ্রীতি ও সত্যনিষ্ঠা কাউকে মুগ্ধ ও উদ্বুদ্ধ করেছে, কারও চোখে পড়েছে তাঁর সার্বভৌমিক মানবতার সুস্পষ্ট আদর্শ; কেউ-বা দেখেছি তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, কর্মকুশলতা; সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ও সাহিত্যে উৎকর্ষ। কিন্তু তাঁর সামগ্রিক অখণ্ড স্বরূপটিকে সম্যক উপলব্ধি হয়তো তেমন ভাবে করা যায় নি। বহু বছর পরে নিরপেক্ষ কোনো ঐতিহাসিক যখন ভারতবর্ষের সভ্যতা ও জাতীয়তার ইতিহাস প্রণয়ন করবেন তখন তিনি সেই সুদূরে দাঁড়িয়ে পণ্ডিতজীর বিরাট ব্যক্তিত্বের অখণ্ড জ্যোতির্ময় রূপটি দেশবাসীর সামনে ধরতে পারবেন। কিন্তু সে সময় এখনো আসে নি। সরকারী কাজে এবং বিশ্বভারতীর কাজে পণ্ডিতজীর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে না হলেও কিছুটা ব্যক্তিগত পরিচয়ের সুযোগলাভ আমার ভাগ্যে ঘটেছিল। বিশ্বভারতীর কার্যব্যপদেশে তাঁকে যেটুকু কাছে পেয়েছিলাম তারই দু-একটি প্রসঙ্গ এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করে তাঁর পুণ্যময় স্মৃতির উদ্দেশে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করব।

বহু বছর আগে—সন তারিখ ভুলে গেছি—পণ্ডিতজীকে সর্বপ্রথম চাক্ষুষ দেখি পরমশ্রদ্ধেয় স্বর্গগত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের উডবার্ন পার্কের বাড়িতে। সে সময়ে গান্ধিজী কয়েকদিনের জন্যে সেখানে বাস করছিলেন। জনসমাগমে গৃহপ্রাঙ্গণ মুখরিত। লোকের ভিড় ঠেলে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখলাম গান্ধিজী—তাঁর চারিদিকে ফরাসে সোফায় নানা গণ্যমান্য লোকের মধ্যে পণ্ডিতজীকেও দেখা গেল। তিনি দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর পরণে ছিল খদ্দরের ধুতি, পাঞ্জাবী এবং তার উপরে ছোট কুর্তা—যাকে জহরকোট বলা হত সেকালে। বোতামগুলি খোলাই ছিল। মাথায় ছিল সাদা খদ্দরের গান্ধিটুপি এবং পায়ে ছিল সাধারণ চপ্পল। সৌম্য, সুদর্শনমূর্তি মানুষটি। একঘর লোকের মধ্যে চোখে না পড়ে যায় না। মৌখিক আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ সেবারে কিছু হয় নি—চোখের দেখা মাত্র।

তার বহু বছর পরে—১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে—জীবনের অপরাহ্নবেলায় গিয়ে পড়লাম পাঞ্জাব প্রদেশে। পাঞ্জাব হাইকোর্ট তখন সিমলা পাহাড়ে সাময়িকভাবে অবস্থিত ছিল। সেখানে যাবার পথে দিল্লীতে দুদিন ছিলাম বন্ধুবর স্বর্গত শ্যামাপ্রসাদের বাড়িতে। সেই সময়ে দিল্লীতে দেখা হল ভারতগগনের দুটি উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কের সঙ্গে—সর্দার বল্লবভাই প্যাটেল, যিনি ছিলেন

তখনকার দিনের গৃহমন্ত্রী এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু— ভারতের প্রধানমন্ত্রী। দুজনের সঙ্গে পৃথকভাবে অতি অল্পসময়ের জন্যেই কথাবার্তা হল। পাঞ্জাব হাইকোর্টে বাইরে থেকে প্রধান বিচারপতি নিয়ে আসা প্রয়োজন হল কেন, অল্পকথায় সর্দার প্যাটেল আমাকে তা বেশ বুঝিয়ে দিলেন। মিতভাষী, দ্বিধাহীন, নির্ভীক পুরুষ। পাঞ্জাবের সামাজিক ও রাজনৈতিক আবহাওয়া ও নানা সমস্যার কথা, পাঞ্জাবীদের জীবনযাত্রা প্রণালী ও তাঁদের চরিত্রের ভালোমন্দ উভয় দিক নিয়ে আলোচনা করলেন এবং আমাকে পাঞ্জাবে পাঠাবার কি উদ্দেশ্য তাঁর মনে ছিল সে কথা পণ্ডিতজী বেশ খোলাখুলি বুঝিয়ে দিলেন। মৃদুভাষী, সুদূরদর্শী, আদর্শবাদী মানুষ। পণ্ডিতজীর সঙ্গে আমার এই প্রথম মুখোমুখি আলাপ। বিদায় নিয়ে সিমলার দিকে চললাম এবং পাঞ্জাব হাইকোর্টের প্রধান-বিচারপতি রূপে কাজে যোগ দিলাম।

ঠিক এক বছর পাঞ্জাবে কাটিয়ে ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাসে এসে পড়লাম দিল্লীর ফেডারেল কোর্টে, যা ক'দিন পরেই নূতন সংবিধানের নির্দেশক্রমে ভারতের সুপ্রিমকোর্টে রূপায়িত হয়ে ২৬শে জানুয়ারিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হল। এখানে আমাদের কার্যক্ষেত্র সম্পূর্ণ পৃথক হওয়ায় পণ্ডিতজীর সঙ্গে তেমন ভাবে আলাপের সুযোগ-সুবিধে হয় নি। মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে নানা অনুষ্ঠানে দেখাশোনা হত— "কেমন আছেন" "ভাল আছি" এই পর্যন্তই বলতে পারা যায়। তাও খুবই বিরল অবসরে। মন্ত্রীদের সঙ্গে জজেদের হৃদ্যতা সংগত নয় বলেই বোধ হয় পণ্ডিতজীকে একটু এড়িয়েই চলতাম।

১৯৫১ সালে যখন বিশ্বভারতীকে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করবার সিদ্ধান্ত পাকাভাবেই গৃহীত হয়ে গেছে তখন আইনের খসড়াটি নিয়ে শ্রদ্ধেয় রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্নেহভাজন অনিল চন্দের সঙ্গে আলোচনা কালে জানতে পারলাম যে বিশ্বভারতীর কর্মসমিতিতে প্রাক্তন ছাত্র ও কর্মী-সংঘ থেকে এক জন মাত্র সদস্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগ নাকি প্রথমে তাও দিতে রাজি হন নি। রথীন্দ্রনাথের পরামর্শ ও নির্দেশক্রমে পণ্ডিতজীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের একটা সময় ঠিক করে নিয়ে তাঁর অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাসচিব তখন ছিলেন অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর। তিনিও সেই আলোচনার সময়ে উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক কবীর গোড়াতেই বললেন যে, পৃথিবীর কোনো দেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক সমিতিতে অর্থাৎ সিণ্ডিকেটে প্রাক্তন ছাত্র ও কর্মীদের সদস্য পাঠাবার অধিকার দেওয়া হয় না। প্রাক্তনরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিষদে অর্থাৎ সিনেটে একজন কি দুজন সদস্য পাঠিয়ে থাকেন। তবে এক্ষেত্রে তিনি বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র ও কর্মী-সংঘকে একজন প্রতিনিধি পাঠাবার সুযোগ দিয়েছেন।

আমি বললাম, বিশ্বভারতীকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সমপর্যায়ে ফেললে ভুল করা হবে। বিশ্বভারতী একটি বিশাল একান্নবর্তী পরিবারের মতো। এখানে আমরা বয়ঃজ্যেষ্ঠদের 'দাদা' বলে সম্বোধন করে থাকি। এটা কেবল মুখের ডাক মাত্রই নয়। আমাদের মধ্যে একটি আত্মিক যোগ রয়েছে যা অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। এই অবস্থায় বিশ্বভারতীর জন্যে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তুলনামূলক ব্যবস্থা করলে বিশ্বভারতীর চিরাগত প্রথা ও নীতির অমর্যাদা করা হবে। আমরা ছোট বয়েস থেকেই গুরুদেবের কাছ থেকে নানা ভাবে ও নানা ভাষায় বরাবরই শুনে এসেছি যে তিনি অসংশয়ে বিশ্বভারতীকে প্রাক্তন ছাত্র ও কর্মীদের হাতে তুলে দিয়েছেন এবং তিনি ভরসা রাখেন যে

বিশ্বভারতীর প্রাক্তনেরা এই দায়িত্ব পালনে সর্বদা যত্নবান ও তৎপর থাকবেন। দায়িত্বের সঙ্গে প্রাক্তনদের দাবিও এসে গেছে। এখন তাঁদের সে দাবি থেকে বঞ্চিত করলে অন্যায় করা হবে।

পণ্ডিতজী চুপ করে খানিকক্ষণ কি ভাবলেন। পরে একটু হেসে শিক্ষাসচিবকে জিজ্ঞাসা করলেন কর্মসমিতির সদস্যসংখ্যা কত ধরা হয়েছে। শিক্ষাসচিব বললেন— চৌদ্দ জন। পণ্ডিতজী বললেন যে, চৌদ্দর জায়গায় পনেরো জন হলে যখন অলঙ্ঘনীয় কোনো প্রতিবন্ধক নেই তখন সদস্যসংখ্যা পনেরো জনই করে দাও।

এই নির্দেশ দিয়ে পণ্ডিতজী কাগজপত্র গুটিয়ে নিলে আমরা তাঁকে নমস্কার করে প্রসন্নচিত্তে ফিরে এলাম।

দেখলাম যে বিশ্বভারতীকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পৃথকভাবে দেখতে পণ্ডিতজী কিছুমাত্রই দ্বিধা করলেন না। বিশ্বভারতীর উপরে তাঁর যে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল এইটে যেন তারই নিদর্শন বলে মনে হল।

আইন পাস হয়ে গেল এবং সেই থেকে বিশ্বভারতীর কর্মসমিতির পনেরো জন সদস্য এবং তার মধ্যে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র ও কর্মীদের দুই জন প্রতিনিধি আসন পেয়ে আসছেন।

১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে বিশ্বভারতীর নূতন উপাচার্য নিয়োগের প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছিল। নানাজনের নাম উঠছিল। আমি তখনও ভারতের প্রধান-বিচারপতির কাজ করছিলাম। একটি সুদীর্ঘ পত্রে আমার মতামত আমি পণ্ডিতজীকে জানিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ছিলাম। একদিন সকালে অনিল এসে জানালেন যে পণ্ডিতজী একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে চান, অসুবিধে না থাকলে সেদিন সন্ধ্যায় গেলেই তাঁরও সুবিধে হবে। অনিল বললেন— যেতেই হবে। কেন ডেকেছেন এবং আমি গিয়েই বা কি বলব তা ভেবেই পাওয়া গেল না। যাই হোক, সন্ধ্যা হতে-না-হতেই অনিল এলেন যাবার জন্যে তৈরি হয়ে। গেলাম তাঁর সঙ্গে পণ্ডিতজীর বাড়িতে। বিশ্বভারতী সম্বন্ধে একথা-সেকথা হচ্ছে, কে উপাচার্য হবেন সে বিষয়ে এ-নাম ও-নাম আলোচনা হচ্ছে। এমন সময়ে আচমকা পণ্ডিতজী বলে ফেললেন— আপনিইবা কেন এ কার্যের ভার নেবেন না ?

আমি এ প্রশ্নের জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললাম— কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাজ চালাবার যোগ্যতা আমার নেই, কেননা শিক্ষা সম্বন্ধে আমার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই।

পণ্ডিতজী হেসে বললেন— শিক্ষার ভার নেবার লোক সেখানে অনেক রয়েছেন। আমি যে এককালে শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলাম এবং গুরুদেবের নিকট সান্নিধ্য পাবার সৌভাগ্য যে আমার হয়েছিল সেইটেই নাকি বড় কথা এবং উপাচার্য হবার সেইটেই নাকি আমার বড় দাবি।

অনিলের মনেও খটকা ছিল যে ভারতের প্রধান-বিচারপতির পক্ষে বিশ্বভারতীর উপাচার্যপদ গ্রহণ করা সংগত হবে কি-না। অনিল এই ধরণের একটু ইঙ্গিত দিয়েছেন অমনি পণ্ডিতজী একটু উত্তেজিত স্বরেই বললেন— কি বলছ তুমি ? বিশ্বভারতীর উপাচার্যের আসনের মর্যাদার তুলনা নেই। আমাদের রাষ্ট্রপতি অবসর গ্রহণের পর যদি এ পদমর্যাদা পান তবে তিনি নিজেকে সম্মানিত বোধ করবেন।

আমরা দুজনেই চুপ। শেষে বললাম— ভেবে দেখব, আপনিও দয়া করে আর কারো কথা ভেবে রাখবেন।

তিনি বিনা দ্বিধায় বললেন— এর মধ্যে ভাববার কিছু নেই।

আমি বললাম— সুপ্রিম কোর্টের জন্যে তো ব্যবস্থা আগে করতে হবে।

পণ্ডিতজী বললেন— না, আপনার এখানকার কার্যকাল শেষ হবার আগে এখান থেকেও আপনাকে ছাড়া সম্ভব হবে না। সুতরাং এই সময়টার জন্যে বিশ্বভারতীতে একটি অস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নিতে হবে।

তর্কের আর অবসর ছিল না। আমরা উঠে পড়লাম। আমার তখনো প্রায় মাস দশেকের কাজের মেয়াদ ছিল। এই সময়ের মধ্যে কত কি অদলবদল হয়ে যেতে পারে— এই ভেবে মনটাকে একটু হালকা করে নিলাম। কিন্তু পণ্ডিতজী বিশ্বভারতীকে কতখানি উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করে রেখেছেন তা দেখে আমরা দুজনে বিস্ময়ে অভিভূতপ্রায় হয়ে বাড়ি ফিরলাম।

১৯৫৯ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর আমার দিল্লীর কাজ শেষ হল। শেষপর্যন্ত নভেম্বর মাসে ফিরে এলাম আশ্রম-জননীর স্নেহময় কোলে। আমি উপাচার্য হবার পর পণ্ডিতজী মাঝখানে কাজের চাপে একটি বছর বাদ দিয়ে প্রত্যেক পৌষ-উৎসবের দিন আশ্রমে এসেছেন এবং পরের দিন সমাবর্তন-সভায় ভাষণ দিয়ে ছাত্রছাত্রী ও কর্মীদের সকলকেই উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁর সভাপতিত্বে সংসদের অধিবেশন-গুলি সুশৃঙ্খলায় সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৭ই পৌষের রাত্রির বিশ্রামের পর পণ্ডিতজী যখন স্নান করে সমাবর্তন-সভায় যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নীচে নামতেন তখন দেখেছি যেন তিনি দেহে মনে নূতন বল সঞ্চয় করে আমাদের সকলের মধ্যে তাঁর অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের ছোঁয়াচ লাগিয়ে দিতেন। আমি যখন তাঁকে প্রতি বৎসর একটি করে উত্তরীয় পরিয়ে দিতাম তখন তাঁর চোখ-মুখ যেন প্রসন্নতায় ভরে উঠত। গুরুদেবের উপর তাঁর যে অপরিসীম স্নেহ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল এবং বিশ্বভারতীর আদর্শের উপরে তাঁর যে সুগভীর ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল তা তিনি তাঁর সমাবর্তন-ভাষণে প্রতি বৎসরই নানা কথায় বলে গেছেন। উদাহরণস্বরূপে ১৯৬১ সালের সমাবর্তন-উৎসবে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন—

> Again we meet here in this Amrakunja and go through this beautiful ceremony. Again we have heard the recitation of the old invocations which our forebears for hundreds and perhaps thousands of years have recited previously, and we have repeated and affirmed ideals which Gurudeva gave to this institution. For me, to come here, year after year, is a privilege which I greatly value. It brings me into an atmosphere which inspires me; for, I find the living presence almost of Gurudeva here. I feel that I am on hallowed grounds where he sat and taught and worked. In my life I have received many honours. But one of those which I value very greatly and yet wonder whether I was suited for it, is
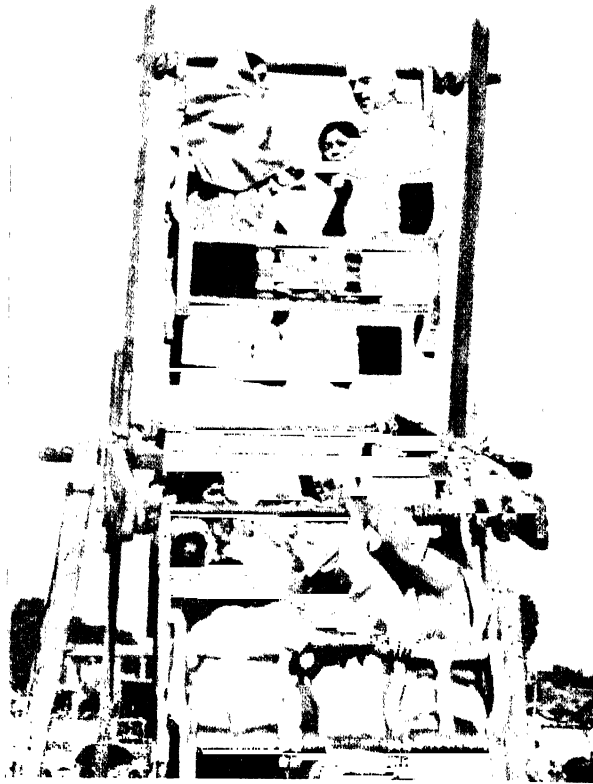
নাগরদোলায় জওহরলাল। শান্তিনিকেতন মেলা

শান্তিনিকেতন আশ্রমের ছাত্রছাত্রীবৃন্দের সঙ্গে জওহরলাল

the honour to be your Acharya and to be made to sit where Gurudeva sat. Who am I, who is anybody, to sit on that seat? At the most, we are worthy to sit at his feet and to learn from him. However, this great privilege has been given to me and I have often wondered what I can do to justify this not only here in Santiniketan and Visva-Bharati, but in my life. Because the only justification, the only way to honour a great man is to try to understand him, his message and try to follow it. This life of ours is too full of trivialities, too full of superficial things and it is only these great men who give depth to it. Can we understand that deeper meaning of a great man's message? Can we live upto it to some extent? When I come here, my courage revives because I seem to hear Gurudeva's voice, and his message reverberates in my mind; and I feel inspired by it and go back from here, I hope, a little better person than I came here.

পণ্ডিতজীর মনটি ছিল শিশুর মতো আনন্দাবেগে পরিপূর্ণ। গোড়ার দিকে দেখেছি, কথা নেই বার্তা নেই তিনি বেরিয়ে পড়েছেন মেলার মাঠে। ছাতিমতলার উত্তর দিকে যেখানে নাগরদোলাগুলি অবিশ্রাম ঘুরেই চলেছে, নজর করলে দেখা যেত, পণ্ডিতজী কয়েকটি ছেলেমেয়ে নিয়ে সেই নাগরদোলার একটি ঝোলায় বসে পরমানন্দে ঘুরপাক খাচ্ছেন। তাঁর ঝোলায় যেসব শিশুরা জুটে পড়তে পেরেছিল তাদের সবাইয়ের হাতে কঞ্চির লাঠি এবং মাথায় বেতের টুপি। তারা আহ্লাদে আত্মহারা। পণ্ডিতজীর সঙ্গে নাগরদোলায় চড়ার গল্প তাদের আর যেন ফুরায়-ই না। এদিকে পুলিসের লোকেরা ভয়ে-ভাবনায় শীতের দিনেও ঘর্মাক্ত কলেবরে ছুটোছুটি করছেন। তাঁদের নির্বন্ধাতিশয্যে শেষের দিকে অনেক বলে-কয়ে পণ্ডিতজীকে নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে ধরে রাখবার চেষ্টা করা হত। কিন্তু ভয় থাকত সবাইয়ের যে কখন না জানি তিনি বাধা-নিষেধ না মেনে বেরিয়ে পড়বেন। তাঁর আগ্রহে প্রত্যেক বছর মৃণালিনী আনন্দ পাঠশালার ছেলেমেয়েদের নিয়ে আনন্দমেলার ব্যবস্থা করা হত। ছোটদের নিয়ে খেলা ও মজলিস জমাতে পণ্ডিতজী ছিলেন সুপটু। তাদের হাতে কমলালেবু বিস্কুট ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেওয়া, বল নিয়ে খেলার কত সুন্দর সুন্দর ছবি আমাদের রবীন্দ্রসদনে সযত্নে রক্ষিত আছে।

শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী ও কর্মী আমরা বয়োজ্যেষ্ঠদের 'দাদা' বলে ডেকে থাকি সে কথা আগেই বলেছি। সে ডাক ভাসা-ভাসা মুখের বুলি মাত্রই নয়—সে ডাকের মধ্যে জেগে ওঠে অন্তরের অনাবিল শ্রদ্ধা। এই রীতি পণ্ডিতজীর খুবই ভালো লাগত। আশ্রমের ছোট-বড় ছাত্রছাত্রী ও সহকর্মীগণ আমাকে যে 'সুধীদা' বলে ডেকে তাঁদের ভালোবাসা জানান, সেই ডাকটা পণ্ডিতজীকে নিরতিশয় আনন্দ দিয়েছিল। ঐ ডাকের মধ্যে তিনি আমাদের আশ্রমের নিগূঢ় আত্মিক যোগসূত্রের পরিচয় পেয়েছিলেন। সেবারকার সমাবর্তন কাজ সেরে দিল্লী ফিরে গিয়ে তিনি যথারীতি আমাকে চিঠি লিখলেন, কিন্তু দেখলাম, এবার চিঠির সম্বোধনে নতুন একটি শব্দ; দেখলাম, তিনি সম্বোধন করেছেন—My dear Sudhir-da। চিঠিটা পড়ে খুব আনন্দ বোধ করলাম। উত্তরে আমি তাঁকে যে চিঠি দিই তার মধ্যে এক-জায়গায় জানিয়ে দিই যে,

আমার নামের বানানে r বেশি হয়েছে, ওটা বাদ যাবে। কয়েকদিন পরেই তার উত্তর এল, তিনি লিখেছেন—

PERSONAL — PRIME MINISTER'S HOUSE
No. 35—PMH/60 — New Delhi
January 4, 1960

My dear Sudhi-da

Thank you for your letter of the 1st January with which you have sent copies of the letters addressed to K. C. Chaudhuri and Dhiren Mitra.

I have noted your correction about my spelling of your name.

Yours sincerely
JAWAHARLAL NEHRU

এই সম্বোধন আমার মনে অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়েছে।

একবার সমাবর্তন-উৎসবের সময়ে নানা অতিথি-অভ্যাগত সমাগমে উত্তরায়ণের 'উদয়ন' গৃহ আনন্দ-মুখরিত হয়ে উঠেছিল। বিশ্বভারতীর মাননীয়া প্রধানা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালিকা শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর সহজ সরল সুললিত কণ্ঠস্বরে অভ্যাগতেরা মুগ্ধ এবং অনাবিল হাস্যকৌতুকে উদয়নের বৈঠকখানা আনন্দে পূর্ণ। হঠাৎ তিনি আমাকে কি-একটা কাগজ দিলেন পড়তে। আমি যেই আমার চশমার খাপটা খুলেছি শ্রীমতী নাইডু সেইদিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন— ওকি, আপনার চশমার খাপে কাগজপত্র রাখেন বুঝি? বললাম— না, জরুরী কিছুই নয়— কেবলমাত্র পুরানো ব্যবহৃত ডাকটিকিট-ক'টা রয়ে গেছে। তাঁর সঙ্গে কথায় পারার যো নেই। বললেন— ডাকটিকিট জমাবার বাতিকও রয়েছে দেখছি। আমি হেসে বললাম— যেদিন থেকে শান্তিনিকেতনে এসেছি সেদিন থেকেই ছোট-ছোট ভাইবোনেদের জন্যে ডাকটিকিট সংগ্রহ করে রাখি। তারা পেলে খুশি হয়।

পণ্ডিতজী আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনিও উৎসাহের সঙ্গে আমার সংগৃহীত ডাকটিকিটের সামান্য পুঁজিটুকু দেখে বললেন— আমার কাছে দেশ-বিদেশের লোকের কাছ থেকে চিঠি আসে। আমি তো আপনার কাছে অনায়াসে সেই সব ডাকটিকিট পাঠিয়ে দিতে পারি।

আমি খুশি হয়ে বললাম— সে তো বেশ ভালোই হবে। ছেলেমেয়েরা খুব আনন্দ পাবে।

কথাটা ওখানেই শেষ হয়ে গেল— যেমন শেষ হয়ে যায় নিরর্থক কথার কথা। ২৫শে ডিসেম্বর সমাবর্তন উৎসব সমাপন করে পানাগড়ে পণ্ডিতজীকে হাওয়াই জাহাজে উঠিয়ে দিল্লীর দিকে রওনা করে আশ্রমে ফিরে এলাম। শরীর মন তখন ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে।

২৮শে কি ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে একখানা মস্তবড় খামে আমার নামে এক চিঠি এল। খামের পিছনে গালার প্রকাণ্ড লাল ছাপ। খামের সামনের দিকে বাঁ দিকের তলায় 'প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর' বলে লেখা। খুলে দেখি একরাশ ডাকটিকিট। বহু বছর ধরে যেসব স্মারক ডাকটিকিট এ দেশে বের হয়েছে তারই এক-এক পর্যায়ের এক-এক প্যাকেট। নেহাত কথাচ্ছলে যে প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন তা স্মরণে রেখে সময় নষ্ট না করে পণ্ডিতজী যে এইসব ডাকটিকিট ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে

পাঠিয়েছেন তা দেখে মনে পরমানন্দ অনুভব করলাম। এক-এক বার মনে হয়েছিল যে হয়তো একবার এগুলি পাঠিয়েই তিনি তাঁর কর্তব্য সমাধান করলেন। না, তা করেন নি। প্রতি মাসে একটি ছোট খামে ভরা নানা দেশ-বিদেশের পুরানো ব্যবহৃত ডাকটিকিট তিনি আমার কাছে পাঠিয়ে গেছেন যতদিন জীবিত ছিলেন।

প্রতিমাসে ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে যখন সেইসব ডাকটিকিট বিতরণ করতাম কি আনন্দ ফুটে উঠত তাদের চোখে, কি উল্লাস-কলরোল ধ্বনিত হত তাদের সুললিত কণ্ঠে। ডাকটিকিট ফুরিয়ে গেলে যে বেচারা পায় নি সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলত— আমি পেলাম না যে। বলতাম— এর পরের বার যখন আবার ডাকটিকিট আসবে তখন তুমি সবার আগে পাবে। এই আশ্বাসটুকু পেয়েই সে খুশি মনে চলে যেত।

আজকে সেই ডাকটিকিটের আমদানি চিরদিনের জন্যেই বন্ধ হয়ে গেছে এবং ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের 'আবার আসবে' এই আশ্বাস দেবার ভরসাটুকুও রইল না।

ভগবৎকৃপায় জীবনের সায়াহ্নবেলায় একটি বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের মতো মানুষের নিকট-সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়েছিল। তিনি চলে গেছেন; কিন্তু তাঁর নির্মল চরিত্রের অনুপম মাধুর্য ও সৌরভটুকু রেখে গেছেন আশ্রমবাসী আমাদের সকলের জন্যে। গানের সুর থেমে গেলেও সংগীতের মূর্ছনা যেমন হৃদয়তন্ত্রীগুলিকে স্পন্দিত ও অনুরণিত করে রাখে তেমনি তাঁর স্মৃতি আমাদের জীবনে জীবন্ত হয়ে থাকবে— এ কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। পণ্ডিতজীর সান্নিধ্যলাভই আমাদের অক্ষয় সম্পদ হয়ে রয়ে গেল।

ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবে তরণেনৌকা।

জওহরলাল নেহেরু

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে এবং পণ্ডিত মতিলালের আনন্দভবনে একটি নাটকীয় মিল আছে। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে আনন্দমঠ পরোক্ষভাবে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে আনন্দভবন প্রত্যক্ষভাবে সেই ভূমিকারই অংশীদার। আনন্দমঠের বন্দেমাতরম্ মন্ত্র পরাধীন ভারতকে পুরুষানুক্রমে প্রেরণা জুগিয়েছে। আনন্দভবনের তিন পুরুষ—পিতা, পুত্র, পৌত্রী—ত্যাগ এবং নিষ্ঠার দ্বারা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন স্বাধীন ভারতের অনাগত বহু পুরুষকে তা অনুপ্রাণিত করবে এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই।

এ গেল আপাতদর্শনের মিল। এ ছাড়াও এই দুই-এর মধ্যে আর-একটি মিলের কথা অনেক সময়ে আমার মনে হয়েছে। আনন্দমঠের উপক্রমণিকায় অরণ্য-মধ্যে স্বদেশব্রতীর মুখে যে রহস্যময় উক্তি এবং শপথবাক্য উচ্চারিত হয়েছে আনন্দভবনবাসী স্বদেশপ্রাণ মতিলালের সহিত ভারতভাগ্যবিধাতার অনুরূপ একটি কথোপকথন কল্পনা করা নিতান্ত অবাস্তব বলে মনে হয় না—

> আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?
>
> তোমার পণ কি?
>
> পণ আমার প্রাণ।
>
> প্রাণ তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে। প্রাণের অধিক আর কিছু দিতে পার?
>
> পারি বৈকি, প্রাণাধিক প্রিয় যে পুত্র সেই পুত্রকে দিতে পারি।

সেই পুত্রের কাহিনী। আলোচনার উপক্রমণিকা হিসাবে উপরোক্ত সূত্রটি মনে রাখলে মানুষটিকে বোঝা সহজ হবে।

অগাধ ঐশ্বর্যের অধিকারী পিতার একমাত্র পুত্র। দুই ভগ্নি বয়সে অনেক ছোটো, জীবনের প্রথম এগারো বৎসর একমাত্র সন্তানের অতি আদরে প্রতিপালিত। পিতা দিগ্বিজয়ী অ্যাড্ভোকেট—এমন অপর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ উপার্জন করেছেন যে 'অধস্তন তিন পুরুষকে অধঃপাতে দেবার পক্ষে যথেষ্ট'। আত্মচরিতের প্রথম বাক্যটিতে জওহরলাল নিজেও এই কথাটি বলেই জীবনকাহিনী শুরু করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় 'পৈতৃক সম্পত্তির সাংঘাতিক সংঘাতেও' বিন্দুমাত্র বিপত্তি ঘটে নি।

দীর্ঘ সাত বৎসর বিদেশে কাটিয়ে, হ্যারো কেম্ব্রিজে শিক্ষা সমাপ্ত করে, ব্যারিস্টারির সনদ নিয়ে যে যুবক দেশে ফিরে এলেন—স্বদেশীয় নীলরক্ত আর বিদেশীয় আবিল রুচির মিলনে তাঁকে এক উন্নাসিক বিজাতীয় চরিত্র হিসাবে কল্পনা করা কিছুই অস্বাভাবিক ছিল না। আত্মচরিতে সকৌতুকে নিজেই সে কথার উল্লেখ করেছেন—"As I landed at Bombay, I was a bit of a prig with little to commend me." আশা করা গিয়াছিল ইনি অবিলম্বে ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজের মুকুটমণি হয়ে বসবেন, লাট-দরবারে সমাদৃত হবেন, ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনজীবীর পুত্র হিসাবে আইনব্যবসায়ে অনায়াস-প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন।

বিধাতার অভিপ্রায় ছিল অন্য। যে সাহেবিয়ানার রং ভাবা গিয়েছিল দেশে এসেও ধোপ সইবে সে

রং তেরাত্তিরও টিকল না। আইনব্যবসায়ে স্পৃহা দেখা গেল না। পিতাও একদিনের জন্য পুত্রকে আপন অভিরুচির বিরুদ্ধে কিছু করবার তাগিদ দিলেন না। পলিটিক্সে আগ্রহ আকৈশোর; কিন্তু তাঁর নিজস্ব সমাজের লোকেরা বিলিতি ইস্কুলে শেখা যে লিবারেল পলিটিক্সের চর্চা করতেন সে পলিটিক্সে মন উঠল না। প্রশ্ন হতে পারে হ্যারো কেম্ব্রিজের শিক্ষা কি তবে ব্যর্থ হল? অবশ্যই নয়। যে মানুষ পরবর্তীকালে দেশকে আধুনিক যুগের উপযোগী করে গড়বার ভার নিয়েছিলেন তাঁর পক্ষে হ্যারো কেম্ব্রিজ অত্যাবশ্যক ছিল। হ্যারো কেম্ব্রিজ না হলে দৃষ্টি এমন সুদূরপ্রসারী হত না, মন এতখানি দুনিয়া-সচেতন হত না। এই সূত্রে আর-একটি কথাও উল্লেখযোগ্য। ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুল ইংরেজের বনেদি শিক্ষার আবাস-ভূমি। জাতীয়-চরিত্রের বুনিয়াদ এরাই রক্ষা করে আসছে। এদের শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তিমূলে আছে tradition-ভক্তি। ভিক্টোরীয় যুগ পর্যন্ত অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের শিক্ষার মূলেও ঐ উদ্দেশ্যটি প্রচ্ছন্ন ছিল। বিলিতি শিক্ষার এই দিকটিও জওহরলালের জীবনে নিষ্ফল হয় নি। সম্পূর্ণ বিজাতীয় পরিবেশে শিক্ষালাভ করেও ভারতীয় ঐতিহ্যকে তিনি শ্রদ্ধা করতে শিখেছিলেন, অবশ্য মনকে সম্পূর্ণরূপে সংস্কারমুক্ত রেখে। যে মানুষ জাতীয়-ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন সে মানুষ মূলোৎপাটিত, দেশের নাড়ির সঙ্গে তার যোগ নেই— এ কথা জওহরলালকে বারম্বার বলতে শুনেছি।

এ কথা নিশ্চিত যে, জওহরলালের ন্যায় মানুষ গড়বার মতো বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে সৃষ্টি হয় নি। পৃথিবীর সব চাইতে বড়ো বিশ্ববিদ্যালয় যে জীবন— একমাত্র সেই জীবন থেকেই এমন সুসম্পূর্ণ শিক্ষা লাভ করা সম্ভব। পৃথিবীবিস্তৃত যে মানবসমাজ সেই মনুষ্যসমাজ থেকে তিনি তাঁর বিদ্যা আহরণ করেছেন। তাঁর বিদ্যা কেবলমাত্র অধীত বিদ্যা নয়, আহৃত বিদ্যা। আমাদের শাস্ত্রে বলেছে— সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে— সেই হচ্ছে বিদ্যা যা মনকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দেবে। সেই বিদ্যার সার্থকতম রূপ জওহরলালের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। এমন সর্ববন্ধনমুক্ত দিগন্তপ্রসারী মন একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো মধ্যে আমরা দেখি নি।

যদিচ মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তিই তাঁর কাম্য ছিল তথাপি পরাধীন দেশে যা স্বাভাবিক, রাজনৈতিক দাসত্বের গ্লানিই তাঁর মুক্তিক্ষুধাকে প্রথম জাগ্রত করেছে। এই মুক্তিক্ষুধাই তাঁর সকল শিক্ষার মূলে; বোধ করি গৃহের আবহাওয়ায় শিশুকাল থেকে পিতার কাছেই পাওয়া। বুয়র যুদ্ধের সংবাদে দশ বৎসরের বালক অধীর চঞ্চল। রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়ে— প্রথম এশিয়াটিক জাতির অভ্যুদয়ে— চৌদ্দ বৎসরের বালক উল্লসিত। এরই অনতিকাল পরে দেশে স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দীপনা— 'Bengal seemed to be in an uproar', পাঞ্জাব মহারাষ্ট্রে উত্তেজনা, লাজপৎ রায়ের নির্বাসন, টিলকের বজ্র-নির্ঘোষ— হ্যারোর কিশোর-বালক উত্তেজনায় অধীর।

সেই বালক শিক্ষা সমাপ্ত করে দেশে ফিরে এলেন বাইশ বৎসর বয়সে। সব-কিছুতে কৌতূহল, কিন্তু মুক্তিকামী মনকে সর্বাগ্রে অধিকার করেছে দেশের ব্যর্থকাম পলিটিক্স। কংগ্রেসের ঝিমোনো পলিটিক্স তাঁর মনে ধরে নি— নিতান্ত নিরুদ্বেগ নিরুদ্দম নির্জীব জলো-জলো পলিটিক্স। জওহরলাল চিরকালের দুঃসাহসিক অভিযাত্রী। এখানে বলে রাখা ভালো যে দেশে ফিরবার আগে গিয়েছিলেন নরওয়ে-ভ্রমণে। সেখানে এক খরস্রোতা পার্বত্য নদীতে সাঁতার কাটতে গিয়ে ঘূর্ণিপাকে পড়ে ডুবতে ডুবতে বেঁচে এসেছেন। দেশে এসে বিবাহের অনতিকাল পরে গিয়েছিলেন হিমালয়ে অমরনাথ-অভিযানে। পনের হাজার ফুট উচ্চে অতল

গহ্বরের মুখে পা দিয়েছিলেন। কোমরে বাঁধা দড়ি রক্ষা করেছে। যে মানুষ বিপদ-আপদকেই জীবনের নিত্য সহচর বলে জেনেছেন তাঁর কাছে কংগ্রেসের বিপদ-বারণ পলিটিক্স ভালো লাগবে কেন? আমাদের পুরাতনপন্থী নেতারা যখন আইনসম্মত উপায়ে স্বাধীনতা অর্জনের কথা ভাবছেন জওহরলাল তখন দেশের যুবক-সম্প্রদায়কে সকল প্রকার দুঃসাহসিক অভিযানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন, বলছেন— Learn to live dangerously।

যে মানুষটা আর পাঁচ জনের মতো নয়, একেবারে পঞ্চম— কোথাও খাপ খাইয়ে নিতে তার বিলম্ব হয়। বিলেতের ইস্কুল-কলেজে যখন পড়েছেন সেখানেও নিজেকে খাপ খাওয়াতে বেগ পেতে হয়েছে। নিজেই বলেছেন, I was never an exact fit; কিন্তু তাই বলে ইচ্ছে করে কখনো দূরে সরে থাকেন নি। যখন যে কাজে ডাক পড়েছে তাতেই সাধ্যমত যোগ দিয়েছেন। বিদেশে যেমন, দেশে এসে দেখলেন এখানেও তেমনি misfit। শুধু অশন-বসনে নয়, চলন-বলনে, ধরণ-ধারণে ভিন্ন, কথন-চিন্তনে তো কথাই নেই। শিক্ষায় দীক্ষায় রুচিতে স্বভাবে সর্বপ্রকারে সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের অধিবাসী। জনসাধারণের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা এই মানুষের পক্ষে কোনো মতেই সহজসাধ্য ছিল না। প্রথম তিন-চার বছর কেটেছে দর্শকের ভূমিকায়। সমাজের উচ্চমঞ্চে বসে দেশকে দেখেছেন সংকীর্ণ বাতায়ন পথে। এইভাবেই আরো কিছু কাল চলতে পারত। প্রথম ধাক্কা এল জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্মান্তিক দুর্ঘটনায়। রোষে ক্ষোভে দুঃখে দেশের একান্ত অসহায় অবস্থা অন্তরে অন্তরে অনুভব করলেন। কিন্তু দেশকে সম্পূর্ণরূপে জানতে তখনো বাকি ছিল। প্রথম চোখ ফুটল বিহারে গান্ধীজির চম্পারণ সত্যাগ্রহ আর গুজরাটে কায়রা সত্যাগ্রহের বিবরণ পাঠ করে। দেশটা যে শহরে বন্দরে রাজপথে নয়, কংগ্রেসের বক্তৃতামঞ্চে নয়— এই উপলব্ধি সেই প্রথম হল। নিতান্ত আকস্মিক ভাবে ঠিক এই সময়টাতেই উত্তর-প্রদেশের কিষাণদের সঙ্গে তাঁরও যোগাযোগ ঘটে গেল। এটি তাঁর জীবনের এক মাহেন্দ্রক্ষণ। প্রতাপগড় জেলার ভিটেমাটি ছাড়া নিরন্ন চাষীদের কাতর আহ্বানে গেলেন গ্রামাঞ্চলে তাদের অবস্থা নিজ চোখে দেখতে। যা দেখলেন সে তাঁর কল্পনারও অতীত ছিল। এদের দারিদ্র্য যে এমন অপরিসীম, জীবন যে এমন দুঃসহ নিজ চোখে না দেখলে তাঁর বিশ্বাস হত না। নিজের সচ্ছন্দ জীবনকে ধিক্কার দিলেন, যে সমাজে তিনি লালিত, বর্ধিত— তাকে নিতান্ত অবাস্তব বলে মনে হল, যে পোশাকি রাজনীতি নিয়ে তাঁরা ব্যস্ত তাকে মনে হল নিছক ছেলেখেলা। "I was filled with shame and sorrow, shame at my own easy-going and comfortable life and our petty politics of the city which ignored this vast multitude of semi-naked sons and daughters of India, sorrow at degradation and overwhelming poverty of India."

এই অর্ধনগ্ন অনশনক্লিষ্ট অসহায় অসমর্থ অসম্পূর্ণ মানুষগুলোই যে সত্যিকারের ভারতবর্ষ— এই সত্যটি জাজ্জ্বল্যমান হয়ে দেখা দিল। ভারতবর্ষের সঙ্গে এই তাঁর প্রথম দৃষ্টিবিনিময়। একেই বলব নেহেরুর ভারত-আবিষ্কার, তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বৃহত্তর উপলব্ধি। "Ever since then my mental picture of India always contains this naked hungry mass." শুধু তাই নয়, এই মানুষগুলোই যে তাঁর সব চাইতে আপনার জন, দেশকে পেতে হলে যে এদের মধ্যেই পেতে হবে— এই সত্যটিকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করলেন। সেই দিন থেকে আপন সমাজে, আপন পরিবেশেই নিজেকে পরবাসী মনে হয়েছে। অনুরূপ অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের জীবনেও হয়েছিল। ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজের অস্বাভাবিক অবাস্তব পরিবেশ তাঁর

কাছে কতখানি পীড়াদায়ক ঠেকেছিল এখানে তার উল্লেখ বোধ করি খুব অবাস্তব মনে হবে না—"আমি যেন আমার চোখের সামনে সমস্ত বৃহৎ ভারতবর্ষ বিস্তৃত দেখতে পাচ্ছিলুম, আমাদের এই গৌরবহীন বিষণ্ণ জন্মভূমির ঠিক শিয়রের কাছে আমি যেন বসে ছিলুম—এমন একটা বিপুল বিষাদ আমার সমস্ত হৃদয়কে আচ্ছন্ন করেছিল সে আর কি বলব। অথচ চোখের সামনে ইভ্‌নিং ড্রেস-পরা মেমসাহেব, এবং কানের কাছে ইংরেজি হাস্যালাপের গুঞ্জনধ্বনি—সবশুদ্ধ এমনি অসংগত! আমাদের চিরকালের ভারতবর্ষ আমার কাছে কতখানি সত্য—আর এই ডিনার-টেবিলের বিলিতি মিষ্টহাসি, ইংরিজি শিষ্টালাপ আমাদের পক্ষে কত ফাঁকা, কত ফাঁকি।" জওহরলালের মনেও ঠিক এই অনুভূতি। এতকালের অভ্যস্ত জীবনের সাচ্ছন্দ্য থেকে নিজেকে সমূলে উৎপাটিত করে নিলেন।

জওহরলালের চোখের সুমুখে যে ভারত দেখা দিল সে যে নিরবচ্ছিন্ন এক বেদনার চিত্র এমনও নয়। বেদনার সঙ্গে আনন্দ মিশ্রিত এ এক বিচিত্র অনুভূতি। ন্যূনতম স্পর্শে এবং সামান্যতম আশ্বাসবাক্যে এই একান্ত নির্ভরশীল অসহায় মানুষগুলির মধ্যে কি আবেগের সঞ্চার হতে পারে দেখে তিনি চমৎকৃত—"They were in miserable rags, men and women, but their faces were full of excitement and their eyes glistened and seemed to expect strange happenings which would, as if by a miracle, put an end to their long misery."

নিঃসন্দেহে গান্ধীজিই পথপ্রদর্শক। তথাপি বলব, নেহেরুর এই ভারত-আবিষ্কার একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব আবিষ্কার, কঠোরতম অভিজ্ঞতার মূল্য দিয়ে কেনা। জ্যৈষ্ঠের দুঃসহ রৌদ্রতাপে দিনের পর দিন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করেছেন, চাষীদের ঘরে রাত্রি যাপন করেছেন, তাদেরই খাদ্যে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করেছেন—"During these visits we wandered about a good deal from village to village, feeding with the peasants, living with them in their mud huts, talking to them for long hours, and often addressing meetings, big and small" রবীন্দ্রনাথের যে অভিজ্ঞান জওহরলালেরও সেই অভিজ্ঞান—দেশটা মৃণ্ময় নয়, চিন্ময়—দেশটা মাটি দিয়ে গড়া নয়, মানুষ দিয়ে গড়া। দেশের মানুষই দেশের সব চাইতে বড়ো সম্পত্তি। নেহেরু যে ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করলেন এ শুধু অক্ষম অসহায় দরিদ্র জনগণের ভারতবর্ষ নয়। আসল আবিষ্কারটা হল—আপাতদর্শনে অক্ষম এবং অসহায় এই জনতার মধ্যে যে অসীম শক্তি লুক্কায়িত সেই শক্তির আবিষ্কার। এরই মধ্যে লক্ষ্য করেছেন—"The down-trodden *Kisan* began to gain a new confidence in himself and walked straighter with head up." হোক নগ্ন, হোক অনশনক্লিষ্ট, এরা অমিত শক্তির আধার—এ বিষয়ে তিনি এখন নিঃসন্দেহ। জনবহুল দেশকে তিনি বহুবলধারিণীং বলে চিনেছেন। নেহেরু মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত। জওহরলাল মূলতঃ কবি, দেশকে দেখেছেন কবির দৃষ্টিতে, প্রেমিকের দৃষ্টিতে, রাজনৈতিক agitatorএর দৃষ্টিতে নয়।

এ যাবৎ উত্তর-প্রদেশের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই তাঁর বিচরণ। ইতিমধ্যে গান্ধীজি রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছে। অকস্মাৎ সমগ্র ভারতের জনসমুদ্র উদ্বেল হয়ে উঠল। অর্ধেক বাস্তব আর অর্ধেক কল্পনায় মিশিয়ে যে শক্তির আভাসমাত্র তিনি অনুমান করেছিলেন তার প্রত্যক্ষ রূপ যে কি বিরাট কি প্রচণ্ড কি দুর্নিবার হতে পারে নেহেরুর কবি-কল্পনাকেও তা হার মানিয়েছে।

জনবলের সঙ্গে মনোবলের মিশ্রণ ঘটলে যে অপ্রতিরোধ্য শক্তির সৃষ্টি হয় এ তারই অদৃষ্টপূর্ব দৃষ্টান্ত। সমস্ত পৃথিবী বিস্ময়ে স্তব্ধ—

বিশ্বলোক ভাবিল বিস্ময়ে,
যাহার পতাকা
অম্বর আচ্ছন্ন করে, এতকাল এত ক্ষুদ্র হয়ে
কোথা ছিল ঢাকা॥

পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তির বিরুদ্ধে এক নিরস্ত্র জনতার অহিংস সংগ্রাম—শুধু অভূতপূর্ব নয়, অচিন্ত্যপূর্ব। বিপ্লব অনেক দেশেই ঘটেছে—উন্মত্ত জনতার বিকৃত বিধ্বংসী মূর্তি, নরঘাতন পাশবিকতার রক্তাক্ত দৃশ্য পৃথিবীর নানা দেশের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে যা ঘটল পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা নেই। অপরাপর বিপ্লবের সঙ্গে এর মূলগত পার্থক্য এই যে, বিপ্লব সাধারণতঃ ধ্বংসমূলক, ভারতের বিপ্লব সৃষ্টিমূলক।

নতুন এক ভারতবর্ষের সৃষ্টিক্রিয়া শুরু হল। গান্ধী তার জন্মদাতা। এক দিকে নতুন ভারতের জন্ম হচ্ছে আর সেই সঙ্গে নতুন নেতৃত্বের সৃষ্টি হচ্ছে। সে এক অপূর্ব কাহিনী। আমাদের পুরাণের গল্পে আমরা যে সমুদ্রমন্থনের কথা শুনেছি একমাত্র তারই সঙ্গে এর তুলনা চলে। আজকের দিনে সমুদ্রমন্থনের কাহিনী কেউ বিশ্বাস করবে না। কথাটা আক্ষরিকভাবে সত্য এমন কথা আমিও বলি না। তথাপি বলব, এর মধ্যে একটি রূপকাশ্রিত সত্য আছে। সমুদ্রমন্থন সত্যি সত্যি হয় না, কিন্তু জনসমুদ্র-মন্থন হয়। গান্ধীজি যে বিপ্লবের সৃষ্টি করলেন তার একমাত্র আখ্যা জনসমুদ্রমন্থন। দেশময় যে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হল তারই বিক্ষেপে অত্যাশ্চর্য সব ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হতে লাগল। সমুদ্রমন্থনের ফলে উঠেছিল অমৃত—এই ক্ষেত্রে নতুন নেতৃত্বের অভ্যুত্থানকেই বলব অমৃত। সমগ্র দেশ স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখেছে চিত্তরঞ্জন-মতিলালের সর্বস্ব ত্যাগ, জওহরলাল-সুভাষচন্দ্রের মধ্যে দেখেছে ভারতীয় যৌবনের অম্লান মহিমা। সমুদ্রমন্থনে এক দিকে যেমন উঠেছিল অমৃত তেমনি উঠেছে বিষ। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। অশেষ দুঃখ, নির্মম নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। নীলকণ্ঠের মতো এঁরা সেই বিষ কণ্ঠে ধারণ করেছেন। এই দুঃখবরণের মধ্য দিয়েই জননায়কের সৃষ্টি হয়।

দীর্ঘদিনের দুঃখব্রত উদ্‌যাপন করে তবে নেহেরুর ভারত-আবিষ্কার সম্পূর্ণ হয়েছে। বলা বাহুল্য, এ আবিষ্কার শুধু এক তরফা হয় নি। জওহরলাল যেমন ভারতকে আবিষ্কার করেছেন ভারতবর্ষ তেমনি জওহরলালকে আবিষ্কার করেছে। ভবিষ্যৎ ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকরূপে দেশ তাঁকে বরণ করে নিয়েছে। এই সূত্রে মনে পড়ছে দশ-বারো বছর আগে নেহেরুর জন্মদিনে আমাদের শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা তাদের হাতে-লেখা পত্রিকার এক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছিল। আমাকে এসে ধরেছিল দু লাইন লিখে দিতে। মনে আছে লিখে দিয়েছিলাম—Far greater than Nehru's Discovery of India is India's discovery of Nehru। আমার কাছে এ কথার সত্যতা আজও অটুট রয়েছে। জাতি হিসাবে আমাদের শত রকমের দোষ-ত্রুটি থাকতে পারে তথাপি আমার বিশ্বাস, আমাদের জাতীয়-চরিত্রে নিত্যকালের কিছু সত্যমূল্য আছে, নতুবা এ দেশে গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ-জওহরলালের ন্যায় ব্যক্তির জন্ম সম্ভব হত না। সমগ্র জাতির জাগ্রত চেতনা এবং অন্তরের তাগিদ থেকে এমন মানুষের জন্ম হয়।

A country gets the leader she deserves—প্রত্যেক জাতি আপন যোগ্যতা অনুযায়ী তার নেতা লাভ করে। জওহরলালের মতো নেতা যে ভারতবর্ষ লাভ করেছে সে গৌরব প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রাপ্য। কারণ সে তার জন্য মূল্য দিয়েছে। জওহরলাল যে দুঃখব্রত গ্রহণ করেছিলেন সমগ্র দেশকে সেই ব্রত পালন করতে হয়েছে। দুঃখের অগ্নিতে জহরব্রত পালন করে তবে ভারতবর্ষ জওহরলালকে পেয়েছে।

জওহরলাল দুঃখব্রতী বীর। সংসারে যা-কিছু মানুষের আকাঙ্ক্ষিত কিছুরই তাঁর অভাব ছিল না। বংশগৌরব, ধনমান, বিদ্যাবুদ্ধি, রূপযৌবন—এমন সুসম্পূর্ণ আয়োজন কোনো সাংসারিক প্রয়োজনেই লাগান নি। জীবনে সকল সার্থকতার পথ যখন তাঁর সম্মুখে উন্মুক্ত সেই মুহূর্তে দ্বিধামাত্র না করে দুর্লংঘ্য সংকটের পথে অগ্রসর হয়েছেন। নিশ্চিন্ত নির্ভাবনার জীবনকে প্রত্যাখ্যান করে কঠোর নির্যাতনের পথকেই বেছে নিয়েছেন। ভারতবর্ষে এ জিনিস নতুন নয়। সিংহাসনের মোহ ত্যাগ করে এ দেশের রাজপুত্র জীর্ণকন্থা ধারণ করেছেন। আমাদের বহুভাগ্য, আমাদের এই স্বার্থকলঙ্কিত যুগে আমরা সেই সর্বত্যাগী রাজপুত্র সিদ্ধার্থকে আর-একবার দেখলুম। একেই বলে ইতিহাসের পুনরাবর্তন। যে জাতি জীবন্ত তার মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ী কোনো সত্যধর্ম নিশ্চিত নিহিত থাকে। সাময়িক অধঃপতনের ফলে হয়তো সেই সত্যধর্ম নির্জীব অবস্থায় দীর্ঘকাল লুক্কায়িত থাকে। একদিন যখন আবার জাতির চেতনা উদ্বুদ্ধ হয় তখন সেই ধর্মবোধ পুনরায় প্রোজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়। History repeats itself কথার এই একটি মাত্র অর্থই আমি জানি।

পিতৃসত্য রক্ষার জন্য চৌদ্দ বছর বনবাসের দৃষ্টান্ত এ দেশে আছে। এর চাইতেও বড়ো সত্য—মানুষের জন্মগত অধিকার রক্ষার জন্য চৌদ্দ বছর কারাবাসের দৃষ্টান্ত এ যুগেও আবার দেখা গেল। কারাগৃহের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অনভ্যস্ত কৃচ্ছ্রসাধনে কেটেছে জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল। জীবনের বহু সাধ অপূর্ণ থেকে গিয়েছে। প্রথম-যৌবনের দাম্পত্যসুখ বারম্বার খণ্ডিত হয়েছে কারাবাসের বিচ্ছেদে, রুগ্ণা স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে থাকা হয় নি, একমাত্র সন্তানের শিক্ষাব্যবস্থা আপন অভিপ্রায় অনুযায়ী করতে পারেন নি। নিজেকে সর্বপ্রকারে বঞ্চিত করেছেন, কিন্তু তার ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে হাহুতাশ করেন নি। আত্মচরিতের উপসংহারে বলেছেন—"পিছন ফিরে জীবনটাকে দেখছি। লোকে বলবে আমি জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছি। কিন্তু জীবনবিধাতা আজ যদি এসে বলেন, 'এই নে তোর জীবন, গোড়া থেকে আবার তুই শুরু কর।'—বলেছেন, যদি তা দিতেনও আমি জানি আমি নিশ্চিত আবার এই পথেই অগ্রসর হতাম। আমার মধ্যে কিছু-একটা আছে যা নিঃসন্দেহে আমাকে এই পথেই আবার টেনে নিয়ে আসত।"

সংসারের বেশির ভাগ মানুষই গৃহপালিত জীব। আমাদের পক্ষে এই মানুষের রীতিনীতি বোঝা বড়ো সহজ নয় যদিচ মহাকবির কল্পনাতে এঁর আগমনবার্তা পূর্বাহ্নেই ঘোষিত হয়েছিল—

ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে তোর তরে
নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক
নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ।

রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন যে মানুষের কথা বলেছেন, যে মানুষের স্বপ্ন দেখেছেন, এই সেই মানুষ। জীবনে যাকে আদর্শ বলে জেনেছেন তার জন্য ঝাঁপ দিয়েছেন সংকট-আবর্ত-মাঝে, দিয়েছেন বিশ্ব বিসর্জন,

নির্যাতন লয়েছেন বক্ষ পাতি। সুখের কথা, রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বপ্নের মানুষকে নিজ চোখে দেখে গিয়েছেন। নবজীবন, নবযৌবনের প্রতীক হিসাবে 'ঋতুরাজ' আখ্যা দিয়ে তাঁকে সিংহাসনে বরণ করেছেন।

এমন সর্বব্যাপী ত্যাগের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। সাংসারিক সুখসম্পদ তো বটেই, এ ছাড়াও মনের এমন অনেক অভিলাষ ত্যাগ করতে হয়েছে যা চোখে পড়বার মতো নয় কিন্তু ভেবে দেখবার মতো। স্বভাবতঃ ইনি ভিড়ের মানুষ নন। মনের আভিজাত্য এবং রুচির কৌলীন্যই তাঁকে দূরের মানুষ করে সৃষ্টি করেছিল, অথচ সেই মানুষকেই লক্ষ জনের ভিড়ের মধ্যে সারা জীবন কাটাতে হয়েছে। কবি-প্রকৃতির মানুষ, যখন পেরেছেন নিজের মধ্যেই ডুব দিয়ে একটু অন্তরালের সৃষ্টি করেছেন। অপেক্ষাকৃত ছোটো আসরে একাধিকবার তাঁকে ঘিরে বসবার সৌভাগ্য হয়েছে। চোখের দিকে যখনই তাকিয়েছি মনে হয়েছে এত ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর দৃষ্টি যেন কোন্ দূরলোকে নিবদ্ধ। এই সূত্রে মনে পড়ছে ওঁর কোনো এক বন্ধু চিঠিতে লিখছেন— You are never less alone than when alone, তা হলেও বলব, কবিমনের নিরালার বিলাসটুকু তাঁকে অনেক সময়েই ত্যাগ করতে হয়েছে।

নেহেরু প্রথমশ্রেণীর সাহিত্যিক। তাঁর মনের গড়ন মূলতঃ কবির এবং সাহিত্যিকের, কিন্তু পলিটিক্সের চাপে তাঁরও সাহিত্যচর্চার অভিলাষ পূর্ণ হয় নি, আমরাও বঞ্চিত হয়েছি। পলিটিক্স যে পরিমাণে লাভবান হয়েছে সাহিত্য সে পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যেটুকু লিখেছেন সেটুকু কারাবাসের অবকাশে। সুখের বিষয় তারও পরিমাণ বড়ো কম নয়, উৎকর্ষ সর্বজনস্বীকৃত। অটোবায়োগ্রাফি, ডিস্কভারি অফ ইণ্ডিয়া এবং ওয়ার্লড হিস্ট্রির পাতায় পাতায় লিরিকের আমেজ। নানা সমস্যায় ভারাক্রান্ত মন, তারও মধ্যে অকস্মাৎ সূর্যাস্তের বর্ণসমারোহে মন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। কারাগৃহের নির্জন কুঠরিতে বসে হঠাৎ মনে হয়েছে কতকাল নারীকণ্ঠের কথা শোনেন নি, শিশুর কলকাকলি শোনা হয় নি। আরো আশ্চর্য কি— কতদিন একটা কুকুরের ডাক পর্যন্ত শোনেন নি। কবি না হলে এমন কথা কারো মনে আসে না। তাঁর মনের কবিধর্ম তাঁর পলিটিক্সকেও এক আশ্চর্য বর্ণসুষমায় মণ্ডিত করেছে।

জওহরলাল নেহেরুকে সকলে স্টেটস্ম্যান বলে জানে; আমার কাছে তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি কবি। প্লেটো যে ফিলজফার-স্টেটস্ম্যানের কথা বলেছেন সেই আখ্যা বরং তাঁকে মানায়, যদিচ পয়েট-স্টেটস্ম্যান বললে আরো বেশি মানাবে। কর্মযোগের সঙ্গে ধ্যানযোগের, গান্ধী-আদর্শের সঙ্গে রবীন্দ্র-আদর্শের মিলন হলে যে মানুষের সৃষ্টি হতে পারে জওহরলাল সেই মানুষ। গান্ধী রবীন্দ্রনাথ— এই দুই মহামানবের যুগে আমরা বাস করেছি— এই দুই-এর মানবিক দোষ গুণ সমস্ত মিশিয়ে তেজে বীর্যে কর্মে কল্পনায় সাধ্যে সাধনায় ললিতে কঠোরে এক অত্যাশ্চর্য মানুষের সৃষ্টি হল। একজন দিয়েছেন বিশ্বকর্মার শক্তি, আর-একজন দিয়েছেন বিশ্বজনীন মন। লক্ষ্য করবার বিষয় যে নেহেরুর বৈদেশিক নীতি অনেকাংশে বিশ্বভারতীর আদর্শে গঠিত। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম যেমন সকল গণ্ডিকে অতিক্রম করে উদারতম মানবধর্মে পরিণত হয়েছে, জওহরলালেরও রাষ্ট্রনীতি ভৌগোলিক সীমাকে অতিক্রম করে সর্বমানবের কল্যাণের উদ্দেশ্যে রচিত। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম হিন্দু বা ব্রাহ্মধর্ম নয়, মানুষের ধর্ম; জওহরলালের রাষ্ট্রনীতি ভারতের রাষ্ট্রনীতি নয়, মানুষের রাষ্ট্রনীতি।

জওহরলাল ও শান্তিনিকেতন

অমিয়কুমার সেন

ভারতবর্ষে রবীন্দ্রশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সূচনা হয় বোম্বাই শহরে ১৯৬১ সনের ১ জানুআরি। উৎসবের উদ্বোধন করতে গিয়ে ভারতাত্মা জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার কাছে কোনো দমকা হাওয়ার মতো আকস্মিকভাবে এসে উপস্থিত হন নি। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় বারের সাক্ষাতের কথা মনেই পড়ে না; আমার শুধু অস্পষ্টভাবে স্মরণে আছে আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম।· ·ধীরে ধীরে বিস্ময়ের সঙ্গে নিজেই উপলব্ধি করেছিলাম যে কি করে তাঁর চিন্তা, তাঁর রচনা এবং কিছু পরিমাণে তাঁর সত্তার দ্বারাও আমরা গড়ে উঠছিলাম, গড়ে উঠছিলাম আমি এবং আমার কাল।· · গান্ধীজির সঙ্গে আমার যোগ আরও অনেক নিবিড় এবং তিনি আমাকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিতও করেছেন। কিন্তু তবুও,· ·আমার মনের সুর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই কিছুটা বেশি করে বাঁধা ছিল, যদিও আমার সকল কাযকলাপ ছিল গান্ধী-নির্ভর।"[১] রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগের সূচনা সম্পর্কে স্মৃতির এই অস্পষ্টতা নেহরুর প্রথম বা দ্বিতীয় বার শান্তিনিকেতন-পরিক্রমা সম্বন্ধেও লক্ষ্য করা যায়। অপর পক্ষে শান্তিনিকেতনের অধিবাসী এবং কিছু পরিমাণে রবীন্দ্রনাথও বহুদিন পর্যন্ত নেহরুর ব্যক্তিত্ব এবং সম্ভাবনার পরিচয় পান নি। শান্তিনিকেতনে নেহরুর প্রথম বার এবং দ্বিতীয় বারের আগমন প্রায় অলক্ষিতভাবেই ঘটেছিল।

১৯২০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে নেহরু শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে। সম্ভবত এটাই তাঁর প্রথম শান্তিনিকেতন-দর্শন। সে বছর (১৯২০ সেপ্টেম্বর) কলকাতায় কনগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের পরই ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীযুগের পূর্ণ সূচনা হয়। অধিবেশনের পর গান্ধীজি এবং আরও কয়েকজন নেতার সঙ্গে নেহরুও শান্তিনিকেতনে আসেন। তাঁর আত্মজীবনীতে আছে, "কলকাতায় কনগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন থেকে ফিরে যাবার পথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 'বড়োদাদা' নামে খ্যাত তাঁর অতি প্রিয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি গান্ধীজির সঙ্গে শান্তিনিকেতনে গেলাম। সেখানে আমরা কিছুদিন ছিলাম।"[২] আত্মজীবনী-রচনার সময় এই শান্তিনিকেতন ভ্রমণের স্মৃতি নেহরুর মনে খুব স্পষ্ট ছিল না। তা না হলে রবীন্দ্রনাথ যে তখন শান্তিনিকেতনে ছিলেন না এ কথা তিনি নিশ্চয়ই উল্লেখ করতেন। ১৯২০ সনে সেপ্টেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ড এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে ভ্রমণে ব্যাপৃত। ফ্রান্স থেকে অক্টোবরের

১ "Rabindranath Tagore did not come to me as some sudden blast. I can hardly remember the first time or the second time or the third time that I met him; I do remember vaguely I went there . . . . gradually, I myself was surprised to see how his thoughts and writings and his self were, to some extent, of course moulding us, moulding me and my generation . . . I was very much more closely in contact with Gandhiji and he affected me tremendously. And yet, . . . my mind was a little more in tune with Tagore although all my activities were conditioned by Gandhiji."

২ "On our way back from Calcutta Special Congress, I accompanied Gandhiji to Santiniketan on a visit to Rabindra Nath Tagore and his most lovable elder brother 'Boro Dada.' We spent some days there . . . ."

প্রথমে (১৬ আশ্বিন ১৩২৭) তিনি আমেরিকা যাত্রা করেন। তবে এই শান্তিনিকেতন-বাসের সময়ে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের সঙ্গে নেহরুর খুব হৃদ্যতা জন্মে। 'বড়োদাদা' দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। মহাত্মা গান্ধী যখন আশ্রমে ছিলেন তখন মৌলানা সৌকত আলি তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য আশ্রমে আসেন। আশ্রম-সংবাদে মৌলানার আগমনের খবর দেওয়া হয়েছে কিন্তু নেহরুর নামের উল্লেখ নেই। "গত ২৬শে ভাদ্র মহাত্মা গান্ধী মহাশয় আশ্রমে শুভাগমন করিয়াছেন। তাঁহার সহিত ভারতের নানা প্রদেশের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি আশ্রমের আতিথ্য গ্রহণ করেন।· ·মহাত্মাজির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সুপ্রসিদ্ধ মৌলানা সওয়াকত আলি মহাশয় আশ্রমে আগমন করেন।"[৩] এই সংবাদে গান্ধীজির অভ্যর্থনার জন্য বোলপুর স্টেশনে বহু লোক সমাগম, বোলপুর-শান্তিনিকেতনের রাস্তা ফুলপাতা দিয়ে সাজানো, কলাভবনে মহাত্মাজির সংবর্ধনা এবং পরে বাল্মীকিপ্রতিভা নাটকের অভিনয় ইত্যাদির বিবরণ আছে। কিন্তু নেহরুর নামের উল্লেখ নেই। এর থেকেই বোঝা যাবে নেহরুর নামে শান্তিনিকেতনে তখনও সাড়া জাগে নি।

১৯২০ সনের পর শান্তিনিকেতনের বাইরে নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নেহরুর সাক্ষাৎ ঘটেছিল। ১৯২৮ সনের কলকাতা কনগ্রেস এবং ১৯২৯ সনের লাহোর কনগ্রেসের পর বোঝা গেল যে গান্ধীজির নেতৃত্বের মধ্যে থেকেও নেহরু ভারতীয় রাজনীতিতে একটি নূতনত্বের ইঙ্গিত বয়ে নিয়ে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সেটা যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া গেল ১৯৩৪ সনের জানুআরি মাসে। রাষ্ট্রপতি[৪] রূপে নেহরু সেবার প্রথম কলকাতায় আসেন; সঙ্গে পত্নী কমলা নেহরু। নেহরুর 'আত্মজীবনী'তে আছে, "কলকাতা থেকে আমরা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করার জন্য শান্তিনিকেতনে গেলাম। এত কাছে এসেও আমরা তাঁর সঙ্গলাভের নিত্য আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে চাই নি। আমি এর আগে দুবার শান্তিনিকতেনে এসেছি, কিন্তু কমলা যাচ্ছেন এই প্রথম।"[৫] নেহরুর যদি ঠিক স্মরণে থাকে তবে ১৯৩৪এর আগে তিনি দুবার শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। ১৯২০ সনের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আর-এক বার ১৯২০ সনের আগে, না, ১৯২০ থেকে ১৯৩৪ সনের মধ্যে সেটা জানা যায় নি।

এবারে শান্তিনিকেতনে আসার অন্য একটা উদ্দেশ্যও ছিল। নেহরু লিখেছেন, "তিনি [কমলা] এসেছিলেন বিশেষ করে এই জায়গাটা [শান্তিনিকেতন] দেখতে, কারণ আমরা আমাদের মেয়েকে এখানে পাঠাবার কথা ভাবছিলাম।· ·সে কোনো পুরোদস্তুর সরকারী বা আধা-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবে, এতে আমার কোনো সায় ছিল না। ওখানকার পুরো হালচাল আমলাতান্ত্রিক পীড়াদায়ক এবং কর্তৃত্বব্যঞ্জক।· ·শান্তিনিকেতনে এই স্থবিরত্ব থেকে মুক্তি।"[৬]

---

৩ শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতীর মাসিক পত্র, ১৩২৭ ভাদ্র : আশ্রম সংবাদ।

৪ তখন জাতীয় মহাসভার সভাপতিকে 'রাষ্ট্রপতি' বলা হত।

৫ "From Calcutta we went to Santiniketan to pay a visit to the poet Rabindra Nath Tagore. It was always a joy to meet him and, having come so near, we did not wish to miss him. I had been to Santiniketan twice before. It was Kamala's first visit . . . ."

৬ "She had come especially to see the place as we were thinking of sending our daughter there . . . I was wholly against her joining the regular official or semi-official Universities.

১৯২০ সনে যখন নেহরু শান্তিনিকেতনে আসেন তখনও এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর ততটা আগ্রহ জন্মে নি, শান্তিনিকেতনের মনীষীরাই তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিলেন। এবারে তিনি সচেতনভাবে এখানকার শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করছেন, এটা তাঁর মন্তব্যের মধ্যে বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

১৯৩৪ সনের ১৯শে জানুআরি নেহরু সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে পৌছন। পৌছবার অল্প পরেই সন্ধ্যাবেলায় উত্তরায়ণের অঙ্গনে তাঁদের আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যর্থনা করা হয়। বৈদিকমন্ত্র আবৃত্তি করে গুরুদেব স্বয়ং তাঁদের স্বাগত জানান। পরের দিন সকালে নেহরু ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের নিকট একটি ভাষণ দেন। বিকেলে দুজনে শ্রীনিকেতনে যান। সেদিন রাত্রিবেলাই তাঁরা পাটনার উদ্দেশ্য রওনা হয়ে যান।

নেহরু কলকাতা পৌছবার কিছু আগে (১৫ জানুআরি ১৯৩৪) বিহারের বিধ্বংসী ভূমিকম্প হয়ে গিয়েছে। আর্তত্রাণের কাজে পাটনা যাবার প্রয়োজন ছিল। বিহারের নানাস্থানে তিনি যখন ঘুরে বেড়াচ্ছেন তখন এই ভূমিকম্প সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি এই দৈবদুর্বিপাককে অস্পৃশ্যতার পাপের ফল বলে বর্ণনা করেন। রবীন্দ্রনাথ এ উক্তির প্রতিবাদ করে একটি বিবৃতি দেন। নেহরুর আত্মজীবনীতে আছে, "অস্পৃশ্যতার পাপে ভূমিকম্প হয়েছে, গান্ধীজির এই বিবৃতি পড়ে আমি মনে প্রচণ্ড আঘাত পেলাম। এই উক্তি বিভ্রান্তিজনক। কাজেই রবীন্দ্রনাথ এর যে উত্তর দিয়েছিলেন তাকে স্বাগত জানালাম, তাঁর সঙ্গে আমার মনের পুরোপুরি সায় ছিল।"[৭]

এইসব ঘটনা থেকেই বোঝা যাবে যে ১৯৩৪ সনের আগে থেকেই এবং ১৯৩৪ সনে শান্তিনিকেতন-ভ্রমণ ও বিহার-ভূমিকম্প সম্বন্ধে বাক্‌বিতণ্ডার মধ্য দিয়ে নেহরু ক্রমশই শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিলেন। শান্তিনিকেতনও তাঁকে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বীকার করে নিয়েছিল গুরুদেব-নির্বাচিত মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে। অনুষ্ঠানের সময় মন্ত্রগুলি নেহরু অস্পষ্ট ভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, ধ্বনিগাম্ভীর্যের মধ্যে অর্থের শুধু আভাস পেয়েছিলেন। শান্তিনিকেতন-ত্যাগের অব্যবহিত পরেই তিনি গুরুদেবের তৎকালীন একান্ত-সচিব শ্রীঅনিলকুমার চন্দকে একটি চিঠি লিখে মন্ত্রগুলির ইংরেজি অনুবাদ চেয়ে পাঠান। নেহরুর সে-চিঠি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত নেই। সম্ভবত শ্রীঅনিলকুমার চন্দের ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে। ২৮শে জানুআরি তিনি নেহরুর চিঠির জবাব পাঠান। তার থেকে জানা যায়, দশটি মন্ত্র বা মন্ত্রের অংশ পাঠ করে গুরুদেব নেহরুকে অভ্যর্থনা করেন। মন্ত্র-নির্বাচনে কবির ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির পরিচয় আছে।[৮]

. . . The whole atmosphere that envelopes them is official, oppressive and authoritarian . . . Santiniketan offered an escape from this dead hand . . ."

৭ "I read with great shock Gandhiji's statement to the effect that the earthquake had been a punishment for the sin of untouchability. This was a staggering remark and I welcomed and wholly agreed with Rabindra Nath Tagore's answer to it."

৮ শ্রীঅনিলকুমার চন্দের চিঠিতে মন্ত্রগুলির অনুবাদ এইভাবে আছে—

(1) Come thou who bringest delight. (2) Come thou with thy magnanimous mind. (3) We offer this seat to thee. (4) Thou art a hero. (5) Waken us to-day into a perfect well-being. (6) Thou art the friendliest of all friends, thou art the messenger with thy forward-moving mind. (7) Dispel all hatred and all fear. (8) Be thou great among all men, be thou

সত্যদ্রষ্টা বৈদিক ঋষির জবানিতে গুরুদেবের আশীর্বাদ নেহরুর ভবিষ্যৎ-জীবনে পরিপূর্ণ ভাবে সফল হয়েছিল। বহু দুর্যোগের দিনে কবিকণ্ঠের এই আশীর্বাণী নিশ্চয়ই তাঁকে প্রেরণা দান করেছে।

১৯৩৫ সন থেকে আরম্ভ করে কবির জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের সঙ্গে নেহরুর যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন ছিল। কন্যা ইন্দিরার শান্তিনিকেতন-বাসকালে সে যোগসূত্র আরও দৃঢ় হয়। কবির প্রয়াণের কিছুকাল পরে তিনি বিশ্বভারতীর আচার্য-রূপে বৃত হয়েছিলেন এবং আমৃত্যু এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দীর্ঘকাল যেসব পত্র বিনিময় হয়েছিল তার অধিকাংশই রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। কিন্তু 'পুরাতন পত্রগুচ্ছ'[৯] নামে নেহরুর পত্রসংকলনে স্থান পেয়েছে, কিছু বিশ্বভারতী নিউজএর নেহরু সংখ্যায়[১০] প্রকাশিত হয়েছে। পত্রগুলির মধ্যে গুরুদেব এবং শান্তিনিকেতনের প্রতি নেহরুর ক্রমবর্ধমান শ্রদ্ধা এবং তাঁর প্রতি গুরুদেবের স্নেহ ও তাঁর অবিচলিত নিষ্ঠার প্রতি প্রবল বিশ্বাস বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়।

বিহারের ভূমিকম্পবিধ্বস্ত অঞ্চলে ত্রাণকার্যের অবসরে নেহরু এলাহাবাদে যান। পরদিনই (১১ ফেব্রুআরি ১৯৩৪) কলিকাতার ভাষণে রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁকে বন্দী করা হয়। ১৬ই ফেব্রুআরি তাঁর দু বছরের জন্য কারাদণ্ড হয়। প্রেসিডেন্সি জেলে, আলিপুর জেলে, দেরাদুন জেলে, নাইনি সেণ্ট্রাল জেলে এবং আলমোড়া জেলে তাঁর এই বন্দীদশা কাটে। এর মধ্যে তাঁর পত্নী কমলাদেবী অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। মাঝে একবার অল্পদিনের জন্য তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কন্যা ইন্দিরাকেও মায়ের সেবার জন্য শান্তিনিকেতন থেকে নিয়ে আসতে হয় (এপ্রিল ১৯৩৫)। এর কয়েক বৎসর পূর্বেই নেহরুর পিতৃবিয়োগ হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজি পিতার মতোই তাঁর ব্যক্তিগত সুখদুঃখের প্রতিও অতন্দ্র দৃষ্টি রাখছিলেন। ১৯৩৪ সনের অক্টোবর মাসেই রবীন্দ্রনাথ যুক্তপ্রদেশের (বর্তমান উত্তর-প্রদেশ) গভর্নরের কাছে এক বার্তা পাঠিয়ে কমলাদেবীর স্বাস্থ্যের জন্যই নেহরুকে কারামুক্ত করার সুপারিশ করেন। সে-বার্তার উত্তরে গবর্নর জানান যে নেহরুকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে বাংলা দেশে তাঁর রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতার জন্য, সুতরাং বাংলা দেশের কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত তাঁকে মুক্ত করা যাবে না। রবীন্দ্রনাথের চিঠি তিনি যথাস্থানে পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দেন। কমলাদেবীর অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হওয়াতে তাঁকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানো হয়। সেখানেও তাঁর স্বাস্থ্যের আশানুরূপ উন্নতি হচ্ছিল না। ১৯৩৫ সনের ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে রবীন্দ্রনাথ ভাইসরয়ের কাছে এক তারবার্তায় নেহরুর মুক্তির জন্য পুনরায় আবেদন জানান। তিনি লিখেছিলেন, "জওহরলাল নেহরুর স্ত্রীর অবস্থা সম্বন্ধে অত্যন্ত ভয়াবহ সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। চিকিৎসকগণ মনে করেন তাঁর স্বামীর অবিলম্বে তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন। মানবতার নামে আমি মহামান্য সরকারের কাছে পণ্ডিত নেহরুর মুক্তি প্রার্থনা করছি। তাহলে পরবর্তী এয়ার-মেলে তিনি ইউরোপে

harbinger of good to all men and be their friend. (9) Thou art the leader of men, we welcome thee, thou art our best-beloved, we welcome thee, thou art our richest treasure, we welcome thee. (10) Let all thy paths be propitious, and all men and all thy desires and deeds.

৯ *A bunch of old letters*: Asia Publishing House: 14 November 1958

১০ June 1964: Editor, Ranajit Ray.

গিয়ে পৌঁছতে পারবেন"।[১১] পরদিন (৩রা সেপ্টেম্বর) ভাইস-রয়ের একান্তসচিব রবীন্দ্রনাথকে লিখে জানান যে Bandenweihr Sanitorium-এর মুখ্য চিকিৎসকের কাছ থেকেও ভাইস-রয় অনুরূপ তারবার্তা পেয়েছেন। জওহরলালকে শীঘ্রই মুক্ত করা হবে। পরদিনই (৪ঠা সেপ্টেম্বর) তাঁকে মুক্ত করা হয়। *Discovery of India* গ্রন্থে নেহরু লিখেছেন, "১৯৩৫ সনের ৪ঠা সেপ্টেম্বর আকস্মিক-ভাবে আমাকে আলমোড়ার পার্বত্য কারাবাস থেকে মুক্ত করা হয়।"[১২] এই মুক্তির পিছনে রবীন্দ্র-নাথের প্রচেষ্টার কথা নেহরু হয়তো জানতেন না। এ-ঘটনা সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয় নি। জানলে তিনি নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞচিত্তে এ কথা স্মরণ করতেন। পরবর্তী ঘটনাতে এ উক্তির সমর্থন পাওয়া যাবে।

১৯৩৬ সনের ২৮শে ফেব্রুআরি ইউরোপে কমলাদেবীর দেহান্ত হয়। শান্তিনিকেতনে তাঁর স্মরণ-সভায় (৮ মার্চ ১৯৩৬) রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একটি ভাষণ পাঠ করেন। তাতে নেহরুকে 'ঋতুরাজ' আখ্যা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ভারতের নবযৌবনের দূত বলে বর্ণনা করেছেন। বিশ্বভারতী নিউজে এই ভাষণটি পাঠ করে নেহরু রবীন্দ্রনাথকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে একটি পত্র লেখেন (১ এপ্রিল ১৯৩৬)। তাতে তিনি লিখেছিলেন, "আপনার আশীর্বাদ পেয়ে আমি নিজের মধ্যে কত শক্তি লাভ করি! শক্তি লাভ করি এই কথা ভেবে যে আপনি আমাদের মতো ভ্রান্তদের বিপথ থেকে নিত্যপথে পরিচালিত করার জন্য এখনও আমাদের মধ্যে রয়েছেন।"[১৩]

১৯৩৬ সনের অক্টোবর-নবেম্বর মাসে নির্বাচনী প্রচার উপলক্ষে নেহরু বাংলা দেশে আসেন এবং ৪ঠা নবেম্বর তারিখে একদিনের জন্য কবির সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে শান্তিনিকেতনে আসেন। সঙ্গে কৃপালনী-দম্পতিও ছিলেন। কবি তখন শ্রীনিকেতনে ছিলেন। দুজনের মধ্যে বহুক্ষণ হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা হয়। নেহরু শ্রীনিকেতন-সংলগ্ন একটি সাঁওতাল-গ্রাম পরিদর্শন করেন, বোলপুরে এক জন-সভায় নির্বাচনী বক্তৃতাও দেন। বিশ্বভারতী ম্যাগাজিন নামে ইংরেজিতে টাইপ করা একটি সাময়িকপত্র তখন বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত হত। তাতে নেহরুর এবারের শান্তিনিকেতন-ভ্রমণের বিশদ বিবরণ আছে।[১৪] রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নেহরুর এবারকার একান্ত আলোচনা অসহযোগ-আন্দোলনের সূচনায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর একান্ত আলোচনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পূর্ববর্তী আলোচনায় অবশ্য দীনবন্ধু এণ্ডরুজ উপস্থিত ছিলেন। দুটি আলোচনার কোনোটির বিবরণই প্রকাশিত হয় নি। নেহরুর শান্তিনিকেতন-ভ্রমণের যে সংবাদ 'প্রবাসী' পত্রে (১৩৪৩ অগ্রহায়ণ) প্রকাশিত হয় তাতে নিম্নলিখিত মন্তব্য করা হয়েছিল, "শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সহিত জবাহরলালের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিন ঘণ্টাব্যাপী কথোপকথন হইয়াছিল।· · ভারতবর্ষের সর্বতোমুখী প্রতিভাশালী মনস্বীর সহিত কংগ্রেসের

১১ "Have alarming news of Mrs. Jawaharlal Nehru's condition, Doctors desire her husbands presence by her side (stop) In name of humanity I appeal to Your Excellency to release Pandit Nehru immediately enabling him proceed Europe next air-mail."

১২ "On the 4th September, 1935, I was suddenly released from the mountain jail of Almora."

১৩ "How much strengthened I feel by your blessings and by the thought that you are there to keep us, erring ones, on the straight path."

১৪ "On arrival at Sriniketan he received the salute of the Brati-Balakas after which he addressed a big public meeting at Bolpur." July-Nov. 1936

অধিনায়কের কী কথা হইয়াছিল, জানিতে শুধু যে অলস ও বৃথা কৌতূহল হয়, তাহা নহে, জানিতে পারিলে সর্বসাধারণ উপকৃত হইতেন।· · মহাত্মা গান্ধীর সহিত যেমন বিখ্যাত অবিখ্যাত দেশী বিদেশী বহু ব্যক্তি দেখাসাক্ষাৎ করেন, রবীন্দ্রনাথের সহিত সেইরূপ বহু বৎসর হইতে বিস্তর লোক দেখা করিয়াছেন, কথা বলিয়াছেন এবং তাঁহার কথা শুনিয়াছেন। কিন্তু গান্ধীজির সহিত এইসব সাক্ষাৎকারের ও কথোপকথনের বৃত্তান্ত ও অনুলেখন রক্ষিত ও প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের কথোপকথন লিখিয়া রাখিবার এইরূপ ব্যবস্থা থাকিলে ভালো হইত।" ভারতবর্ষের এবং পৃথিবীর নানা সমস্যা সম্বন্ধে এইসব আলোচনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও নেহরু পরস্পরের অত্যন্ত কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন। পূর্বোক্ত বিশ্বভারতী ম্যাগাজিনে বলা হয়েছে, "পরস্পরের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ এবং বিনম্র শ্রদ্ধা বিনিময়ে দুজনের এই সাক্ষাৎ সত্যই মর্মস্পর্শী হয়েছিল।"[১৫]

রবীন্দ্রনাথ ১৯২৩ সনে প্রথম চীনভ্রমণে যান। তাঁর এই ভ্রমণের ফলে শুধু চীনদেশ নয় সমগ্র প্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে সংস্কৃতির যোগাযোগের নূতন সূচনা হয়। অধ্যাপক তান-য়ুন-সানের প্রচেষ্টায় ১৯৩৪ সনে শান্তিনিকেতনে চীন-ভারত সংস্কৃতি সঙ্ঘের (Sino-Indian Cultural Society) একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। সঙ্ঘের গৃহনির্মাণের জন্যও প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হয়। ১৯৩৭ সনের ইংরেজি নববর্ষের দিনে নূতন গৃহের উদ্বোধনের জন্য কবি জওহরলালকে আহ্বান জানান। পরবর্তীকালে এশিয়ার সমস্ত দেশগুলির সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ভিত্তিতে স্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্রনীতির সূচনা করেছিলেন জওহরলাল। রবীন্দ্রনাথের এ আহ্বানে তারই দীক্ষা হয়েছিল। নেহরু অবশ্য অসুস্থতার জন্য উদ্বোধন-উৎসবে উপস্থিত হতে পারেন নি। কন্যা ইন্দিরার মারফৎ তিনি একটি ভাষণ পাঠান। কবিকে এক পত্রে লিখেছিলেন, "আমি নিশ্চয়ই যেতাম, শুধু অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য নয়, আপনাকে এবং শান্তিনিকেতনকে দেখার জন্যও। কত বছর হয়ে গেল শান্তিনিকেতনে যাওয়া হয় নি। সেদিন আমি শুধু অন্তর দিয়ে আপনার কাছে উপস্থিত থাকব। চীনভবন ভারত এবং চীনের জীবন্ত সংযোগের প্রতীক হয়ে উঠুক এই কামনা করি।"[১৬] এই লিপিতে গুরুদেব ও শান্তিনিকেতনের প্রতি যে আকর্ষণ প্রকাশিত হয়েছে সে আকর্ষণ নেহরু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বহন করেছেন। আরও একটি কৌতূহলের বিষয় এই যে, ১৯৩৬এর নবেম্বরে তিনি শ্রীনিকেতনে এসেছিলেন, শান্তিনিকেতনের অধিবাসীদের সঙ্গে মিলিতও হয়েছিলেন। তবু কিছুদিন পরেই তাঁর মনে হচ্ছে যে কত বছর তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন নি। শান্তিনিকেতনের প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণের এর চেয়ে বড়ো প্রমাণ আর কি হতে পারে।

গুরুদেবের জীবিতকালে নেহরু শেষবারের মতো শান্তিনিকেতনে এসেছেন ১৯৩৯ সনের জানুআরি মাসে হিন্দিভবন গৃহের উদ্বোধন উপলক্ষে। এক বৎসর পূর্বে, ১৯৩৮ সনে জানুআরি মাসে, দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ এই গৃহের শিলান্যাস-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠান ছাড়াও নেহরুর এবারের শান্তিনিকেতন-

১৫ "The meeting between them was a moving scene indeed for the warmth of affection and respectful homage exchanged between the two."

১৬ "I would most certainly have come, not only for the ceremony but also to see you and Santiniketan which I have not seen now for many years. As it is, I shall be with you in spirit: May the Chinese Hall be a symbol of living contact between China and India."—V. B. News 1937.

ভ্রমণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। তখন নেতাজী সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্রপতি। ২১ জানুআরি (১৯৩৯) তারিখে তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন এবং আম্রকুঞ্জে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। এই উপলক্ষে গুরুদেবের 'দেশনায়ক' প্রবন্ধটি রচিত হয়। সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয় বার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে উপলক্ষ্য করে তখন দেশময় প্রবল বিতণ্ডা চলছে। মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং তাঁর নির্বাচনের বিরোধী। ২৯শে জানুআরি তারিখে তিনি দ্বিতীয় বার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। আর ৩১ জানুআরি হিন্দিভবনের নূতন গৃহের উদ্বোধন হয়। নেহরুর শান্তিনিকেতনে আসার খবর পেয়ে সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয় বার শান্তিনিকেতনে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং নূতন পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই আলোচনার ফলে এবং হয়তো গুরুদেবের উপদেশে সুভাষচন্দ্র মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করার জন্য ওয়ার্ধা যান। ২রা ফেব্রুআরি নেহরু ও সুভাষচন্দ্র একই সঙ্গে শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে (৪ জুন ১৯৪১) ভারতবর্ষের অগণিত নরনারী, বিশেষভাবে জওহরলালের হয়ে রবীন্দ্রনাথ মিস্ ই. রাথবোনের খোলাচিঠির জবাব দিয়েছিলেন সে কথাও নেহরু ও শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কবি লিখেছিলেন, "তাঁর [মিস রাথবোন] চিঠি প্রধানত জওহরলালকে উদ্দেশ্য করেই লেখা। আর এ কথাও আমি নিশ্চিত জানি যে মিস রাথবোনের স্বদেশবাসীরা যদি কারাপ্রাচীরের অন্তরালে তাঁর কণ্ঠরোধ করে না রাখতেন তবে স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই মহান্ নেতা তাঁর এই সম্পর্কিত উপদেশের সমুচিত নির্ভীক প্রত্যুত্তর দিতেন। জোর করে তাঁকে আজ মৌন করে রাখা হয়েছে, কাজেই রোগশয্যা থেকেও আমাকে এর প্রতিবাদ করতে হচ্ছে।"[১৭] রবীন্দ্রনাথের উত্তরের সূচনায় এই কয়টি পংক্তি নেহরুর ব্যক্তিত্বের প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধার পরিচায়ক। অত্যাচারে নিষ্পেষিত সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সেদিন শুধু শান্তিনিকেতন থেকেই ভারতবর্ষ এবং ভারতাত্মা নেহরুর সম্মান রক্ষার জন্য একটিমাত্র প্রতিবাদবাণী উচ্চারিত হয়েছিল এবং সেটি স্বয়ং কবির কণ্ঠ থেকে— এ কথা শান্তিনিকেতন চিরকাল গৌরবের সঙ্গে স্মরণ করবে।

গুরুদেবের প্রয়াণের পর নেহরু যে শোক প্রকাশ করেছিলেন তাতে শান্তিনিকেতন এবং বিশ্বভারতীর বিশেষ উল্লেখ আছে: "আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি যে প্রতিটি ভারতবাসীর শান্তিনিকেতন এবং বিশ্বভারতীর উন্নতি এবং বিকাশের জন্য চেষ্টা করা উচিত। ওখানেই গুরুদেবের আদর্শ বিধৃত হয়ে আছে।"[১৮] গুরুদেবের প্রয়াণের কিছু পূর্বে (ফেব্রুআরি ১৯৪০) মহাত্মা গান্ধী একবার শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। গান্ধীজি চলে যাবার সময় গুরুদেব তাঁর হাতে একটি চিঠি দেন। সে চিঠিতে তাঁর প্রয়াণের পর বিশ্বভারতীর প্রতি লক্ষ রাখার জন্য গান্ধীজিকে অনুরোধ করেছিলেন। গান্ধীজিও সে অনুরোধে সাড়া দিয়ে বিশ্বভারতীর মঙ্গলের জন্য চেষ্টিত থাকবেন এ আশ্বাস দেন। নেহরু নিজে যেমন উপলব্ধি

---

১৭ "Her letter is mainly addressed to Jawaharlal and I have no doubt that if that noble fighter of freedom's battle had not been gagged behind prison bars by Miss Rathbone's countrymen he would have made a fitting and spirited reply to her gratuitous sermon. His enforced silence makes it necessary for me to voice a protest even from my sick bed."

১৮ "I earnestly trust that every Indian will consider it his duty to help in the development and growth of Santiniketan and Visva-Bharati which embody Gurudev's ideals."—V. B. News Sept. 1941

করেছিলেন যে গুরুদেবের সঙ্গেই তাঁর মানসিক ক্ষেত্রে বেশি মিল ছিল, গান্ধীজিও তেমনি জানতেন শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের যোগ্যতম উত্তরাধিকারী জওহরলাল। শান্তিনিকেতনের ভার তাঁর উপর দেবার চিন্তা সর্বদাই মহাত্মাজির মনে ছিল। নেহরু শান্তিনিকেতনের ভার নিলে গুরুদেবের আত্মাও তৃপ্ত হত। গুরুদেব ও মহাত্মাজির এই সম্মিলিত ইচ্ছা আরও কিছুকাল পরে পূর্ণ হয়েছিল।

গুরুদেবের প্রয়াণের পর নেহরু প্রথম শান্তিনিকেতনে আসেন ১৯৪২ সনের ফেব্রুআরি মাসে জেনারেল চিয়াং কাইসেক এবং মাদাম চিয়াং কাইসেকের সঙ্গে। এতদিন তিনি শান্তিনিকেতনে এসেছেন অতিথি হিসেবে। এবার নিজেই ভারতবর্ষের অতিথিদের শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছেন। শান্তিনিকেতনের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একই ভূমিকায় তাঁকে এবার নূতন রূপে দেখা গেল। চিয়াং-দম্পতির অভ্যর্থনার ব্যবস্থাপনার মধ্যে তাঁর দায়িত্বও কম ছিল না। স্বেচ্ছাসেবকদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানোর ব্যাপারেও তিনি সাহায্য করেছিলেন। শান্তিনিকেতন এবার তাঁকে নূতন করে পেল। বিশ্বভারতী নিউজে (মার্চ ১৯৪২) চিয়াং-দম্পতির শান্তিনিকেতন-ভ্রমণের সংবাদ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "আমাদের মহামান্য অতিথিদের শান্তিনিকেতন-আগমনের মধ্যে সব চেয়ে আনন্দজনক দিক্‌টি হল এই যে তাঁদের অবস্থানের সময় জওহরলালও তাঁদের সঙ্গে এখানে উপস্থিত ছিলেন।"[১৯]

বিশ্বভারতীর ১৯৪৫ সনের বার্ষিক উৎসবে এবং সমাবর্তন-উৎসবে নেহরু পৌরোহিত্য করেন (২৩ ডিসেম্বর ১৯৪৫)। সমাবর্তন-উৎসবের ভাষণে তিনি বলেন, "এখানে আসবার জন্য আপনাদের পক্ষ থেকে আমাকে অনুরোধ-উপরোধ করার প্রয়োজন হয় নি; কারণ শান্তিনিকেতন এবং বিশ্বভারতীর আকর্ষণই যথেষ্ট ছিল। আর আমি এখানে ঘন ঘন আসি বা না আসি, আমার চিন্তা প্রায়ই এ জায়গাকে ঘিরে থাকে।·· গুরুদেবের প্রেরণার কথা এ জায়গায় বলা আমার পক্ষে বাহুল্য হবে, কারণ এ স্থান তাঁর দ্বারা পূর্ণ হয়ে আছে।"[২০] ২৪শে ডিসেম্বর তিনি চীন-ভারত সংস্কৃতি সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশনেও সভাপতিত্ব করেন। চীনভবনে এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এবারে নেহরুকে শান্তিনিকেতন খুব অন্তরঙ্গভাবে পেয়েছিল। তিনি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করেছিলেন, মেলাপ্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, এমনকি নাগরদোলায়ও চড়েছিলেন। শিশুদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

১৯৪৯ সনের ২রা মে তারিখে বিশ্বভারতী-সংসদের সভায় নেহরুকে বিশ্বভারতীর আচার্যপদে বরণ করা হয়। সেদিন থেকে আমরণ তিনি বিশ্বভারতীর আচার্যের পদ অলংকৃত করেছিলেন। আচার্যরূপে বিশ্বভারতীর কর্মপরিচালনায় যতটা সক্রিয় সহযোগিতা করা উচিত ছিল তাঁর বৃহত্তর কর্ম তাঁকে ততটা সহযোগিতা করতে দেয় নি বলে তিনি সর্বদাই আক্ষেপ করেছেন। গুরুদেবের শূন্য আসনে তাঁকে বসতে হয়েছে বলে তাঁর সংকোচের অন্ত ছিল না। কিন্তু এ-আসনের গৌরবকে তিনি মহামূল্য মনে করতেন। গুরুদেবের জন্মশতবার্ষিকীর বিশেষ সমাবর্তন-উৎসবের ভাষণে তিনি বলেছিলেন যে, জীবনে অনেক সম্মান

---

১৯ "A most pleasing feature of the visit was the presence of Pandit Jawarharlal also."

২০ "It did not require any insistence on your part to bring me here; for the pull of Santiniketan and Visra-Bharati is strong, and whether I come here or not, often my thoughts come here . . . It is not for me to say anything of the inspiration of Gurudeva here, because the whole place is full of him."

তাঁর ভাগ্যে জুটেছে, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান হল বিশ্বভারতীর আচার্যের পদে তাঁর নির্বাচন। তিনি বলেছিলেন, "আমার তো নয়ই, অন্য কারুরই তাঁর আসনে বসবার যোগ্যতা নেই। আমরা বড়জোর তাঁর পদপ্রান্তে বসবার যোগ্য।"[২১]

১৯৫১ সনের মে মাসে প্রধানত নেহরুর সহযোগিতায় বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়রূপে পরিগণিত হয়। বিশ্বভারতী বিলটি পার্লামেণ্টে গৃহীত হবার পর তারবার্তায় নেহরু নিজেই এই সুসংবাদ শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দেন। ১৯৫২ সনের ডিসেম্বরের সমাবর্তনে বিশ্বভারতী প্রথম স্নাতকদিগকে নিজের উপাধি বিতরণ করেন। সে সমাবর্তন-উৎসবে নেহরু নিজে উপস্থিত হতে পারেন নি। একটি বাণী পাঠিয়েছিলেন। সে-বাণীতে উপাধির মোহে বিশ্বভারতীর আদর্শ যেন ক্ষুণ্ণ না হয় এই কামনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "এবারই প্রথম বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়রূপে নিজের ছাত্রদের উপাধি দেবে। উপাধির মোহ আমার নেই, আর উপাধি-বিতরণের জন্য গুরুদেব এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন নি। তিনি ছাত্রদের একটি স্বাধীন ও আনন্দময় আবহাওয়ার মধ্যে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যাতে তাঁরা ভবিষ্যৎ জীবনে স্বাধীন ভারতবর্ষের গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে।"[২২] ১৯৫৩ সনের সমাবর্তন-উৎসবেও তিনি একটি বাণী পাঠান। তাতেও বিশ্বভারতীর বিশিষ্টতা এবং গুরুদেবের আদর্শ সম্বন্ধে অবহিত থাকার নির্দেশ ছিল। তিনি লিখেছিলেন, "যদি এইসব আদর্শ বিলীন হয়ে যায় তবে বিশ্বভারতী এবং শান্তিনিকেতনের তাৎপর্যও থাকে না।"[২৩]

১৯৫৩ সনের সমাবর্তন-উৎসবের থেকে আরম্ভ করে ১৯৬৩ সনের সমাবর্তন-উৎসব পর্যন্ত দীর্ঘ দশ বৎসরের উৎসবে নেহরু মাত্র দুবার অনুপস্থিত ছিলেন— একবার ১৯৫৫ সনে, অন্যবার ১৯৬০ সনে। কিন্তু ১৯৬১ সনে শতবার্ষিকীর বৎসর তিনি দুবার শান্তিনিকেতনে আসেন। একবার বিশেষ সমাবর্তন উপলক্ষ্যে মে মাসে, অন্যবার বার্ষিক সমাবর্তন-উৎসবে ডিসেম্বর মাসে। বৎসরে একবার করে এই শান্তিনিকেতন আগমনকে তিনিও গান্ধীজির মতো 'Annual Pilgrimage' বা 'বার্ষিক তীর্থযাত্রা' বলতেন।[২৪] এই কয় বৎসর শান্তিনিকেতনের অধিবাসীরা তাঁকে দেখেছেন নানা রূপে। তাঁরও ব্যক্তিত্বের নানাদিক এখানে এসেই যেন বেশি করে পরিস্ফুট হত। তিনি স্নাতক ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে প্রত্যেক বৎসর ছবি তুলেছেন, আনন্দপাঠশালার শিশুদের সঙ্গে শিশুর মতো আনন্দ করেছেন, বিশ্বভারতীর ক্ষুদ্রতম কর্মীর সঙ্গে নমস্কার-বিনিময় করেছেন, প্রাক্তন ছাত্রদের সভায় অনাহূত গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন— সারা শান্তিনিকেতন যেন

---

২১ "Who am I, who is anybody to sit on his seat. We can at least sit at his feet" . . . Convocation Address—1961 May.

২২ "This is the first occasion on which Visra-Bharati will confer its own degrees on its students as a Statutory Central University. I am not enamoured of degrees and it was not for awarding degrees that Gurudeva built up this institution. He wanted to train students in an atmosphere of freedom and joy so that they might participate, in their later years, in creative activity in free India,"—V. B. News, January 1953.

২৩ "If these ideals fade away, then Santiniketan and Visva-Bharati lose all significance,"—V. B. News, January 1954.

২৪ কলাভবনের খাতায় ১৯৫৮ সনে লিখেছিলেন—
"Another visit a year after and another experience of peace and beauty"

তাঁর স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে উঠত। তিনি বলতেন, বৎসরে তিন-চার দিন শান্তিনিকেতনে অবস্থান তাকে নূতন প্রেরণা দেয়। শান্তিনিকেতনেও সারা বছর ধরে এই তিন-চারটি দিনের অপেক্ষা করে থাকত। তিনি যে দু বৎসর আসেন নি সেবারের উৎসব-আয়োজনকে হতশ্রী বলে মনে হয়েছে।

এখানে এলে তিনি নিরাপত্তা-ব্যবস্থাকে মোটেই মেনে চলতে না। পদমর্যাদা অনুযায়ী ব্যবহারও তাঁর ধাতে সইত না। এখানে তাঁর সহজ-রূপটিই দেখা যেত। পুরাতন বন্ধু এবং আশ্রমগুরুদের তিনি সর্বদাই নিজে গিয়ে দেখে এসেছেন, তাঁদের আসবার অপেক্ষা করেন নি। পণ্ডিত হারচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর ভুল হয় নি। আচার্য নন্দলাল বসু এবং শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুরের সঙ্গে শেষবারের সময়ও (১৯৬৩ ডিসেম্বর) তাঁদের নিজের গৃহে গিয়ে দেখা করে এসেছেন।

সমাবর্তন-উৎসবে তিনি প্রতিবারই ভাষণ দিয়েছেন, যেবার উপস্থিত থাকতে পারেন নি সেবার বাণী পাঠিয়েছেন। সেগুলি সংগৃহীত হয়ে প্রকাশিত হলে দেখা যাবে যে গুরুদেবের শিক্ষাচিন্তা এবং শান্তিনিকেতনের আদর্শের ব্যাখ্যাতা হিসেবেও নেহরু স্বতন্ত্র গৌরবের অধিকারী। স্বাধীন ভারতবর্ষে আমরা গুরুদেবকে পাই নি। কিন্তু তাঁর চিন্তাকে নূতন ভারতবর্ষের সংগঠনের কাজে কি করে ব্যবহার করা যায় এ সম্বন্ধে নেহরু আমাদের পথনির্দেশ করেছেন।

বৎসরান্তে নেহরুর শান্তিনিকেতন-বাসের সময়ে নানা ঘটনার স্মৃতি আশ্রমবাসীদের মনে চিরদিন জাগ্রত থাকবে। একবারের দু-একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। এর মধ্যে সহজ মানুষ জওহরলালের পরিচয় আছে। ১৯৫৬ সনের সমাবর্তন-উৎসব হয়েছিল ১৯৫৭ সনের ১৫ই জানুআরি। সেবার সরকারী নিরাপত্তা ব্যবস্থার খুব কড়াকড়ি। মেলার মাঠে নেহরুর ভাষণের জন্য একটি মঞ্চ তৈরি করা হচ্ছিল। শেষমুহূর্তে সরকারী নির্দেশে সে কর্মসূচী বাতিল করে দিতে হল, মঞ্চ ভেঙে ফেলা হল। নেহরু এসে পৌছলেন সমাবর্তন-উৎসবের আগের দিন বেলা এগারোটায়। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর তিনি বিশ্রাম করতে গেলেন। নিরাপত্তা-ব্যবস্থার ভার যাঁদের উপর ছিল তাঁরাও কিছুক্ষণের জন্য অবসর পেলেন। বেলা প্রায় তিনটের সময় নেহরু উদয়ন গৃহের দোতলা থেকে প্রায় অলক্ষ্যে নেমে এলেন। কয়েকজন ছাত্র এবং শিক্ষক স্বেচ্ছাসেবক নীচে অপেক্ষারত ছিলেন। নেহরু তাঁদের বললেন, "আমাকে একটা গাড়ি দিতে পারেন," গাড়ি এল। সেটা বন্ধ গাড়ি। নেহরু বললেন, "আমি খোলা গাড়ি চাই।" এল খোলা গাড়ি। তাতে উঠেই বললেন, "চালাও", গাড়ি উত্তরায়ণ থেকে বেরিয়ে যেতেই নিরাপত্তা-ব্যবস্থার কর্তারা ছুটোছুটি করে এলেন। নেহরু কোথায় গিয়েছেন কেউ বলতে পারেন না। তাদের মাথায় বজ্রাঘাত। জীপ তাদের নিয়ে নানা দিকে ছুটল। এদিকে নেহরু আশ্রম ঘুরে আচার্য নন্দলাল বসুর বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। সেবারই নিরাপত্তা-ব্যবস্থার কড়াকড়িতে স্থির হয়েছিল যে সমাবর্তন-উৎসবে স্নাতকরা নেহরুর হাত থেকে সপ্তপর্ণী পত্র নেবেন না, শুধু দূর থেকে তাঁকে নমস্কার করে চলে যাবেন। উৎসব আরম্ভ হল। দু-একজন স্নাতক চলে যেতেই নেহরু উপাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে জিজ্ঞেস করলেন, "অন্যবার তো আমিই এদের সপ্তপর্ণীপত্র দিই। এবারে দিচ্ছি না কেন?" উপাচার্য তাঁকে কারণটা জানাতেই তিনি বললেন, "সেসব হবে না, আমিই দেব।" এক মুহূর্তে এত যত্নের ব্যবস্থা পালটে গেল। স্নাতকদের মুখে হাসি দেখা গেল। তারা পর পর তাঁর হাত থেকে আশীর্বাদী পত্র নিয়ে যেতে লাগলেন। যে দু-তিন জন

এর আগেই পত্র নিয়ে চলে গিয়েছে তারা নেহরুর হাত থেকে আবার পত্র নেবার অনুরোধ জানাতেই নেহরু সানন্দে রাজি হয়ে গেলেন। কাউকে বঞ্চিত করলেন না।

নিরাপত্তা-ব্যবস্থার তাগিদে সেবার সমাবর্তনের স্থান পরিবর্তন করা হয়। আম্রকুঞ্জের পরিবর্তে উত্তরায়ণ-প্রাঙ্গণে সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেটা নেহরুকে পীড়া দিয়েছিল। সমাবর্তন-ভাষণে তিনি এই স্থান-পরিবর্তনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন, এই উৎসব-অনুষ্ঠানের সঙ্গে আম্রকুঞ্জের পরিবেশ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন ক্ষুদ্র ব্যাপারেও আদর্শচ্যুত হতে আরম্ভ করলে বৃহত্তর আদর্শও ধীরে ধীরে আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। আজ আম্রকুঞ্জ থেকে উৎসব-প্রাঙ্গণ দূরে সরিয়ে আনলে তাকে ঘিরে যে আদর্শ গড়ে উঠেছে সে আদর্শও একদিন আমাদের থেকে দূরে চলে যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন, "I do wish that we go back to the mango grove"।

১৯৬৩ সনের ডিসেম্বরে নেহরু শেষবার শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। সেবারে আচার্যরূপে তাঁর কার্যকাল শেষ হয়ে যায়। সেবারের সংসদে তাঁকে আবার পরবর্তী কার্যকালের জন্য আচার্যপদে বরণ করা হয়। সে কার্যকাল উত্তীর্ণ হবার পূর্বেই আমরা তাঁকে হারিয়েছি। গুরুদেবের মৃত্যুর পর এত বড়ো আঘাত শান্তিনিকেতনের জীবনে আর আসে নি। নেহরু শান্তিনিকেতন ছেড়ে যান ২৫ ডিসেম্বর বেলা আটটার সময়। সেদিন আশ্রমের সংঘের উদ্যোগে পরলোকগত আশ্রমবন্ধুদের স্মরণসভা হচ্ছিল। তাতে নেহরু উপস্থিত থাকবেন কথা ছিল। কিন্তু পূর্বরাত্রে অনিবার্য কারণে সে ব্যবস্থা পালটে গেল। নেহরু জানালেন ওই সভায় তাঁর উপস্থিত থাকা সম্ভব হবে না বলে তিনি দুঃখিত। সভার অধিবেশন যখন চলছিল তখন নেহরু শান্তিনিকেতন ত্যাগ করে যান। অন্যবার তাঁর যাবার পথে আশ্রমবাসীরা নম্রহৃদয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন; ছাত্রছাত্রীরা শান্তিনিকেতন-গান করে তাঁকে বিদায় দেয়। এবার শেষবারের মতো তারা সেরকম করে তাঁকে বিদায় দিতে পারেন নি—এ দুঃখ শান্তিনিকেতনে চিরস্থায়ী হয়ে রইল। প্রথম শান্তিনিকেতনে আসার দিন যেমন সকলের অলক্ষ্যে এসেছিলেন শেষ যাবার দিনেও প্রায় তেমনি অলক্ষ্যে তিনি চলে গেলেন। কিন্তু চুয়াল্লিশ বছর আগে সেই অলক্ষ্যে আসা আর আজকের এই অলক্ষ্যে চলে যাওয়ার মধ্যে বহু বছর ধরে আশ্রমবাসীর জীবনকে সুধায় ভরে দিয়েছেন। গান্ধীজির নেতৃত্বের মধ্যে থেকেও তিনি যেমন ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে নূতন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন, তেমনি গুরুদেবের পরিপূর্ণ জীবনের আদর্শকেও তিনি সমৃদ্ধ করেছেন। সেটা গুরুদেবকে অতিক্রম করে নয়, তাঁকে স্বীকার করে। মহর্ষি ও গুরুদেবের সাধনার ক্ষেত্র এই শান্তিনিকেতনের পুণ্যভূমিতে আর-একটি মহাজীবনের বীজ এসে পড়েছিল। সে বীজ যদি অমর অঙ্কুরে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে তবে শান্তিনিকেতন ধন্য হবে।

দ্বারকানাথ ঠাকুর। কিশোরীচাঁদ মিত্র। ১৮৭০। অনুবাদ শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ। সম্পাদনা শ্রীকল্যাণকুমার দাশগুপ্ত। সম্বোধি পাবলিকেশানস প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা ১। সুলভ সংস্করণ আট টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা; শোভন সংস্করণ দশ টাকা।

এমারসনের বিখ্যাত *Representative Men* গ্রন্থে CULTURE কথাটির একটি চমৎকার সংজ্ঞা পাই গ্যেটের কথাগুলির মধ্যে—"Our lives ought to strive to show a perfect balance of all our faculties; intellect emotion, will ought all of them to work in perfect harmony, and this harmony he called culture. 'Men's highest merit' he said, 'always is as much as possible, to rule external circumstances, and as little as possible to let himself be ruled by them'".

Culture কথাটির মানে সংস্কৃতি। উক্ত মানদণ্ডে বিচার করিলে দ্বারকানাথ ঠাকুরকে আমরা একজন সংস্কৃতিসম্পন্ন যুগনেতা বলিয়া আখ্যাত করিতে পারি। জীবনে ও কর্মে তিনি ছিলেন এমন একজন মানুষ।

তাঁহার কথা আমরা যেন বিস্মৃত হইতেই চলিয়াছি। ইহার অবশ্য কারণ আছে। দ্বারকানাথ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু। রামমোহনের প্রগতিমূলক বিবিধ কর্মে দ্বারকানাথ বিশেষ সহায় হন। রামমোহন-জীবনীতে তাঁহার কথা কিছু কিছু উল্লিখিত হইলেও ইহা হইতে দ্বারকানাথের পূর্ণপরিচয় আমাদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব নহে। আর-একটি কারণে হয়তো দ্বারকানাথের প্রতি পরবর্তীদের বিরূপ মনোভাব প্রকট হইয়া উঠে। তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আত্মজীবনীতে পিতা দ্বারকানাথের বৈভব ও বিলাস সম্বন্ধে যেভাবে উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে ঐ ধরণের বিরূপ ধারণা লোকের মনে বদ্ধমূল হইবার বোধ হয় অবকাশ পাইয়াছে। দ্বারকানাথ দুই শত ব্রাহ্মণকে প্রতিপালন করিতেন— পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ ম্যাক্সমুলার প্রমুখাৎ তাঁহার উক্তি এরূপভাবে পরিবেশন করিয়াছেন যে, তাহাতে দ্বারকানাথের 'দায়'ই সূচিত হয়। তিনি যে কর্তব্যবশে, স্বদেশীয় ধর্ম শিক্ষা সংস্কৃতি রক্ষার জন্য এইরূপ করিতেন তাহা মোটেই হৃদয়ঙ্গম হয় না। যে কারণেই হোক দ্বারকানাথ-জীবনের বৈশিষ্ট্য সম্যক প্রতিভাত হইতে পারে নাই। দ্বারকানাথ আমাদের দৃষ্টির অন্তরালেই থাকিয়া যাইতেন যদি না কিশোরীচাঁদ মিত্র *Memoir of Dwarkanath Tagore* নামক গ্রন্থে তাঁহার জীবনচিত্র রাখিয়া যাইতেন। এ দিক হইতে এই গ্রন্থখানির মূল্য অপরিসীম। এবং লেখক কিশোরীচাঁদ একারণ আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন।

এটি কিন্তু আদতে ছিল একটি বক্তৃতা। প্রতি বৎসর ডেভিড হেয়ারের স্মৃতিসভায় এক-এক জন মনীষী জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এক-একটি বিষয় লইয়া বক্তৃতা করিতেন। কিশোরীচাঁদ ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে 'হেয়ার স্মৃতি-সভায়' এই দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। উহাই গ্রথিত হওয়ায় আজ আমরা দ্বারকানাথ সম্বন্ধে জানিবার বিশেষ সুযোগ পাইতেছি। এই সূত্র ধরিয়া দ্বারকানাথ-জীবনে বহু অজ্ঞাত ও স্বল্পজ্ঞাত তথ্যের অনুসন্ধানে আমরা প্রবৃত্ত হইতে পারি। আর-একটি কথাও কিন্তু আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন। বক্তৃতায় সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখ করা সম্ভবপর নয়। কোনো কোনো বিষয়ের বিশদ আলোচনা আবার কোনো কোনো

বিষয়ের ভাসা ভাসা উল্লেখ, সামান্য সামান্য ভুলভ্রান্তি এবং কোনো কোনো বিষয়ের অনুল্লেখ থাকিতে পারে। সমসাময়িক ও অব্যবহিত পরবর্তীদের নিকট যাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয় তাহা পরে হয়তো তেমনি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় না। আবার, তাঁহাদের নিকট ঐ সময় যাহা আদৌ উল্লেখযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পরবর্তীকালে তাহার গুরুত্ব স্বীকার না করিয়া পারি না। এই সকল দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দ্বারকানাথ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা হওয়া আবশ্যক। ইহার ফলে এমন একজন যুগনেতার ব্যক্তিমানসের সঙ্গে আমরা সম্যক পরিচিত হইতে পারিব। এখানে অবশ্য কয়েকটি বিষয়মাত্র উল্লেখ করিব।

দ্বারকানাথ যৌবনে ও প্রৌঢ়ে সরকারী-বেসরকারী বহু ইংরেজের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহাদের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পান। ক্রমে তাঁহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে তৎকালীন অবস্থায় স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর সত্যকার কল্যাণ সাধন করিতে হইলে ইউরোপীয়দের সহায়তা বিশেষভাবে আবশ্যক। রামমোহন রায়ের বিলাতযাত্রার প্রাক্কাল পর্যন্ত (১৮৩০) তাঁহার সঙ্গে এবং ইহার পরে স্বয়ং ভারতবর্ষের সর্ববিধ কল্যাণকর কর্মে এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই তিনি কার্য করিয়া গিয়াছেন। ভারতবাসী ও ইউরোপীয় নেতৃবৃন্দের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যেসব আন্দোলন ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত হয় তাহার পুরোভাগে দেখি দ্বারকানাথকে। প্রথম দিকে একদল নেতৃস্থানীয় ভারতবাসী এই ধরণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার বিরোধী মনোভাব পোষণ করিলেও দ্বারকানাথের আন্তরিকতাপূর্ণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রযত্নে ইহা ক্রমান্বয়ে দূরীভূত হয় এবং জমিদার সভা (জমিদারী সভা নহে) প্রতিষ্ঠায় ভারতবাসী ও ইউরোপীয় প্রধানেরা হাতে হাত মিলাইয়া কার্য করিতে লাগিয়া যান। প্রায় এক যুগ ধরিয়া দ্বারকানাথ শুধু ভারতবাসীদের নেতৃপদেই সমাসীন ছিলেন না, ইউরোপীয়দের হিতৈষী বান্ধব বলিয়াও প্রতিপন্ন হন। দ্বারকানাথের উদ্দেশ্য কিন্তু স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর সর্ববিষয়ে উন্নতিসাধন।

ইহার একটি দৃষ্টান্ত প্রথম দিকেই আমরা পাই— 'কলোনাইজেশান'-আন্দোলনের মধ্যে। এই কথাটির গূঢ়ার্থ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। ১৮৩৩ সনের সনন্দের পূর্বে ইউরোপীয়েরা এ দেশে ভূমিস্বত্ব ক্রয়ের অধিকারী ছিলেন না। সরকার প্রয়োজন বোধ করিলেই 'লাইসেন্স' বা এখানে বাসের অনুমতি পত্র বাতিল করিয়া দিয়া ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিতেন। দ্বিতীয় দশকের শেষ নাগাদ এই ব্যবস্থানুযায়ী তেমন কার্য করা না হইলেও ভূমিস্বত্বের অধিকারী না হওয়ায় তাঁহারা স্বচ্ছন্দে শিল্পব্যবসায় পরিচালনা করিতে অসমর্থ ছিলেন। অথচ এই সময়েই দেখা যায় ইউরোপীয়দের দ্বারা দেশের অভ্যন্তরে শিল্পবাণিজ্য প্রসারের দরুণ ভারতবাসী জনসাধারণ তখন বেশ উপকৃত হইতেছেন। দ্বারকানাথ বিশ্বাস করিতেন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো দৃঢ় না হইলে উন্নতিপ্রচেষ্টায় বিষম ব্যাঘাত ঘটিবে। আর ইহা সম্ভব হয় বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার দ্বারা। কাজেই ইউরোপীয়রা যাহাতে এ দেশের স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া উন্নতিমূলক কার্যে সাগ্রহে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন তদুদ্দেশ্যে রামমোহন রায়ের মত দ্বারকানাথ উক্ত আন্দোলনকে স্বাগত করেন। হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকেরাও এই আন্দোলনের পক্ষপাতী হন। তাঁহাদের প্রকাশিত 'পার্থেনন' পত্রের প্রথম সংখ্যাতেই যে দুইটি বিষয়ের আলোচনা ছিল তাহার একটি হইল এই— 'কলোনাইজেশন' বা এ দেশে ইউরোপীয়দের স্থায়ীভাবে বসবাসের সমর্থন। এই উদ্দেশ্যে ১৮২৯ সনের ১৫ই ডিসেম্বর কলিকাতার টাউন হলে ইউরোপীয়দের একটি সাধারণ সভার আয়োজন হয়। তাহাতে রামমোহনের

মত দ্বারকানাথ ঠাকুরও যোগদান করেন। এ দেশে ইউরোপীয়দের স্থায়ী বাসিন্দা হইবার বিরুদ্ধে যে সব বাধা-নিষেধ বলবৎ ছিল তাহা তুলিয়া দিবার নিমিত্ত দ্বারকানাথ স্বয়ং একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই উপলক্ষে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতাটি এই—

"With reference to the subject more immediately before the meeting, I beg to state that I have several zemindaries in various districts, and that I have found the cultivation of indigo and residence of Europeans have considerably benefitted the country and the community at large; the zemindars becoming wealthy and prosperous, the ryots materially improved in their condition, and possessing many more comforts than the generality of my countrymen where indigo cultivation and manufacture is not carried on, the value of land in the vicinity to be considerably enhanced, and cultivation rapidly progressing. I do not make these statements merely from hearsay, but from personal observation and experience, as I have visited the places referred to repeatedly, and in consequence am well acquainted with the character and manners of the indigo planters. There may be a few exceptions as regards the general conduct of indigo planters; but they are extremely limited, and are, comparatively speaking, of the most trifling importance. I may be permitted to mention an instance in support of this statement: Some years ago, when indigo was not generally manufactured, one of my estates, where there was no cultivation of indigo, did not yield a sufficient income to pay the government assessment; but within a few years, by the introduction of indigo, there is now not a biggah on the estate untilled, and it gives me a handsome profit; several of my relations and friends, whose affairs I am well acquainted with, have in like manner improved their property, and are receiving a large income from their estates. If such beneficial effects as these I have accrued from the bestowing of European skill on one article of production alone, what further advantages may not be anticipated from the unrestricted application of Britiesh skill, capital, and industry to the very many articles which this country is capable of producing, to as great an extent, and of as excellent a quality as any other in the world, and which of course cannot be expected to be produced without the free recourse of Europeans?"—*The Asiatic Journal,* June 1830. *Asiatic Intelligence* p. 69

ইউরোপীয়দের বিদ্যাবুদ্ধি নৈপুণ্য শ্রম ও মূলধন যথোপযুক্তভাবে ব্যবহৃত হইলে জমিদার প্রজা অর্থাৎ জনসাধারণ যে উপকৃত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। শুধু নীল-শিল্প দ্বারা দেশবাসীর বিশেষ উপকার

সাধিত হইতেছে। অন্যান্য শিল্প-ব্যবসায়েও তাহাদের অভিজ্ঞতা প্রযুক্ত হইলে দেশের চেহারা আশু ফিরিয়া যাইবে— এখানে দ্বারকানাথ এই মর্মে বলিয়াছেন। কয়েক বৎসর পরে দ্বারকানাথ নিজেও শিল্প-ব্যবসায়ে ইউরোপীয়দের অভিজ্ঞতা নৈপুণ্য এবং মূলধন সম্যকভাবে কাজে লাগাইবার নিমিত্ত 'কার ঠাকুর কোং' স্থাপন করেন (১৮৩৪)। অবশ্য পরবর্তী পঞ্চম ষষ্ঠ দশকে মফস্বলবাসীরা ইউরোপীয় শিল্প-ব্যবসায়ীদের অত্যাচার-নিপীড়নে নানা কারণে বিশেষভাবে বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল।

সমসময়ের শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারের সঙ্গেও দ্বারকানাথের ঘনিষ্ঠ সংযোগ লক্ষ করি। হিন্দু কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ-কালে রামমোহন রায় ইহা হইতে সরিয়া যাইতে বাধ্য হন। তিনি এই কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রায় সমকালেই অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল স্থাপন করেন, ইহারও উদ্দেশ্য হিন্দু সন্তানগণকে সুনিয়মিতভাবে ইংরাজী শিক্ষা দান। এই বিদ্যালয়টি ছিল অবৈতনিক। দ্বারকানাথ রামমোহনের প্রগতিমূলক সকল কর্মেরই সঙ্গী ও সমর্থক। এই বিদ্যালয়টিরও তিনি অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হইলেন। ইহার পরিচালনায় তাঁহার অর্থসাহায্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। পুত্র দেবেন্দ্রনাথের বয়ঃক্রম যখন দশ বৎসর তখন তিনি তাঁহাকে এখানে ভর্তি করিয়া দিলেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথ যে এখানে অধ্যয়নরত ছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। এই স্কুলে দেবেন্দ্রনাথের সহপাঠী ছিলেন রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায়। দ্বারকানাথের নিয়মিত অর্থদান ও ছেলেদের পাঠোৎকর্ষ সম্পর্কে সমসাময়িক সংবাদপত্রে উল্লেখ পাই। শিক্ষা সম্পৃক্ত বিষয় আলোচনা কালে রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত-অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলের সঙ্গে দ্বারকানাথের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা অবশ্যই উল্লেখ করিতে হয়।

হিন্দু কলেজের ধর্মহীন শিক্ষাদান -রীতির উপর রামমোহন বিশেষ বিরূপ ছিলেন। ইহার কু-ফলের প্রতি তিনি ঐ সময়েই অবহিত হন। দ্বারকানাথও এতাবৎকাল এইরূপ অভিমতই পোষণ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন প্রতিষ্ঠাবধি হিন্দু কলেজের সঙ্গে তাঁহার সংযোগ স্থাপিত হয়। আবার কাহারও মতে ১৮২৫-২৬ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের পুনর্গঠন ব্যাপারে দ্বারকানাথের যথেষ্ট হাত ছিল। আমি প্রতিষ্ঠার জল্পনাকল্পনা হইতে হিন্দু কলেজের ধারাবাহিক কার্যবিবরণের পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছি। কি এই কার্যবিবরণে কি সমসাময়িক পুস্তকপুস্তিকায় এই সময়ে কলেজের সঙ্গে দ্বারকানাথের যোগাযোগের কোনোরূপ উল্লেখই পাই না। ডা. হোরেস হেম্যান উইলসন সরকার কর্তৃক হিন্দু কলেজের 'ভিজিটর' নিযুক্ত হইয়া ঐ বৎসর কলেজ-পুনর্গঠনে অভিনিবিষ্ট হন। এই সময়ে ডেভিড হেয়ার কলেজের অধ্যক্ষ-সভায় সদস্যরূপে যোগ দেন। ১৮২৬ সনের মে মাসে ডিরোজিও ইহার চতুর্থ শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসেন। কোথায়ও কিন্তু দ্বারকানাথের নামগন্ধ পর্যন্ত নাই। হিন্দু কলেজের সঙ্গে দ্বারকানাথের সংযোগ স্থাপিত হয় পরোক্ষভাবে ১৮৩১ সনের প্রথম হইতে। জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে তিনি তখন কলেজে ভর্তি করিয়া দেন। কলেজের সঙ্গে দ্বারকানাথের প্রত্যক্ষ সংযোগ সাধিত হয় ১৮৩৩ সনে। তখন সর্বপ্রথম তিনি ইহার অধ্যক্ষ-সভায় সদস্যরূপে যোগদান করেন। এই সম্বন্ধে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ-সভার অন্যতম সদস্য রাধাকান্ত দেবের একটি উক্তি উদ্ধৃত করি। তিনি ডা. উইলসনকে ১৮৩৩, ১৪ই মে এক পত্রে লেখেন—

> "Prosunnocomer Takore was elected in the room of his deceased brother and Dwarkanath Takore in that of late Ladlymohon Takore".

মৃত্যুকাল পর্যন্ত দ্বারকানাথ কলেজের অধ্যক্ষ-সভার সদস্য থাকিয়া ইহার যাবতীয় সংস্কার ও উন্নতিমূলক কার্যে সময় ও শক্তি বিনিয়োগ করেন।

হিন্দু কলেজের কার্য সুপরিচালনার নিমিত্ত ১৮৩৫ সনে সরকার একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তখন হইতে অধ্যক্ষ-সভায় সরকারী শিক্ষা কমিটির কয়েকজন সদস্যকে লওয়া হয় এবং শিক্ষা কমিটিতেও অধ্যক্ষ-সভা হইতে প্রতি বৎসর দুই জন সদস্য প্রতিনিধিত্ব করিবার সুযোগ লাভ করেন। ১৮৩৯-৪০ সনে দেখিতে পাই দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং রসময় দত্ত কমিটিতে হিন্দু কলেজের প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছেন।

হিন্দু কলেজে ইংরেজী শিক্ষারই প্রাধান্য। অল্পবয়স্ক ছাত্রগণকে শুধু বাংলার মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি শিখাইবার নিমিত্ত হিন্দু কলেজের সংলগ্ন একটি পাঠশালা স্থাপিত হয়। সরকারী শিক্ষা-বিবরণীতে ইহার নাম পাই 'হিন্দু কলেজ বাংলা পাঠশালা'। এই পাঠশালা স্থাপন ব্যাপারে দ্বারকানাথ বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। ১৮৪০, ১৮ই জানুয়ারি পাঠশালাটির কার্য আরম্ভ হয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের তত্ত্বাবধানে। বিদ্যাবাগীশের নিয়োগে দ্বারকানাথের যে যথেষ্ট হাত ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রামমোহন রায়ের বিলাতযাত্রার (নভেম্বর ১৮৩০) পর হইতে দ্বারকানাথ দীর্ঘকাল প্রতিমাসে ৮০৲ ব্যয় করিতেন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিপালনের নিমিত্ত।

হিন্দু কলেজ প্রসঙ্গে আর-একটি কথা স্মরণীয়। কলিকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত দ্বারকানাথ-স্মৃতিসভায় (ডিসেম্বর ১৮৪৬) এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে ভারতীয় ছাত্রগণকে বিলাতে উচ্চতম সাধারণ ও কারীগরী বিদ্যা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে একটি তহবিল গঠন করা হোক; আর এ জন্য কয়েকজন ভারতীয় ও ইউরোপীয় লইয়া একটি কমিটিও গঠিত হয়। দ্বারকানাথের বিশ্বাস ছিল, এইরূপ উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া ভারতীয়েরা স্বদেশের কল্যাণসাধনে সক্ষম হইবেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কিন্তু দেখা গেল এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয় নাই। এই সনের ১০ই জুলাই দ্বারকানাথ ঠাকুর-স্মৃতি তহবিলের চাঁদা-দাতৃগণ এক সভায় মিলিত হইয়া সরকারের নিকট 'দ্বারকানাথ ঠাকুর স্কলারশিপ' নামক একটি বৃত্তি স্থাপনের প্রস্তাব করেন। শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে এ সম্বন্ধে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে—

> At a meeting of the subcribers to the Dwarakanath Tagore Testimonies held in the Town Hall, on Tuesday, the 10th of July 1849, it was resolved with the official sanction of the Trustees, to devote the funds collected to the foundation of scholarship, in the Hindu College, to be called the Dwarakanath Tagore Scholarship, the amount being made over to the council of Education, who were requested to undertake the duty of giving effect to the resolution.—General Report on Public Instruction, etc, from 1st May 1848 to 1st October 1849

এই সুপারিশ অনুযায়ী সরকারী শিক্ষা-সমাজ (Council of Education) হিন্দু কলেজের (বর্তমান Presidency College) নিমিত্ত একটি প্রথমশ্রেণীর বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। ইহার নাম হইল 'দ্বারকানাথ ঠাকুর স্কলারশিপ্'। এই বৃত্তিটি অদ্যাবধি দেওয়া হইতেছে। কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি ও মেডিকেল কলেজের সহিত দ্বারকানাথের সক্রিয় যোগাযোগের কথা আজ সুবিদিত হইলেও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

দ্বারকানাথ ইউরোপীয় অংশীদের লইয়া একটি যৌথ কারবার স্থাপন করেন এবং বিবিধ শিল্প-ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। ইহাতেই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। তিনি সমাজের অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক সামাজিক বিভিন্ন কল্যাণকর উন্নয়নকর্মে সানন্দে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন। ব্যাঙ্ক বীমা সংবাদপত্র পরিচালনা প্রভৃতি তো বটেই, উপরন্তু 'ফিভার হাসপাতাল কমিটি', ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি প্রভৃতিতেও সময় শক্তি ও অর্থ প্রয়োগ করিতে তৎপর হইলেন। ব্যাঙ্ক ও বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়নমূলক কার্যের পক্ষে যখনই কোনোরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে তখনই তিনি অপরাপর ইউরোপীয় ও ভারতীয় প্রধানদের সঙ্গে একযোগে ইহার প্রতিকারে অগ্রণী হইয়াছেন। সরকার ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি সরকারী বীমা কোম্পানি স্থাপনের সংকল্প করিলে বীমা কোম্পানিগুলির পক্ষে ইহার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর তাহার পুরোভাগে আসেন। অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ-সহযোগে বীমা কোম্পানিগুলির পক্ষ হইতে সরকারের নিকট একখানি স্মারকলিপি প্রেরিত হয়। ইহাতেও দ্বারকানাথ বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করেন। সরকার অগত্যা বীমা কোম্পানি স্থাপনের সংকল্প পরিত্যাগ করেন।

কোনো সরকারী কার্যে বিরোধিতা করিতে অগ্রসর হইলেও দ্বারকানাথ সরকারের সপক্ষতা করিতেও দ্বিধা করেন নাই, যখনই তিনি মনে করিয়াছেন ইহার দ্বারা সমাজের সত্যকার কল্যাণ হইবে। সরকার কর্তৃক 'সেভিংস ব্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠাকালে তাঁহার সহযোগিতা ইহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সেভিংস ব্যাঙ্ক বা সঞ্চয়ভাণ্ডার স্থাপন উদ্দেশ্যে ১৮৩৩, ১২ই অক্টোবর একটি পরিচালনা-কমিটি স্থাপন করেন ১৪ জন ইউরোপীয় ও ভারতীয় প্রধানদের লইয়া। ভারতীয়েরা ছিলেন পাঁচ জন। তাঁহাদেরও পুরোবর্তী ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। পরবর্তী ১ নভেম্বর সেভিংস ব্যাঙ্ক খোলা হইল। এই দিনে আমানতকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ। এই দিনকার কার্যকলাপ প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে যে বিবরণ বাহির হয় তাহার মধ্যে পাই—

> "The Savings Bank was opened to the public on the 1st November. On that day there were 62 deposits, varying from Re 1 up to Rs 400. . . At the head of the first day's list appear the names of Baboo Dwarkanath Tagore ared his son for Rs 400 each as an example to the Hindu Community."—The Asiatic *Journal Vol. xiii, 1834, Asiatic Intelligence, Calcutta, April.*

ফিভার হাসপাতাল-কমিটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব সমধিক। কলিকাতার যাবতীয় উন্নতি তথা পৌরসভার মূল পাই এই কমিটির মধ্যে। দ্বারকানাথ প্রথমাবধি এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জনসাধারণের নিমিত্ত একটি জ্বররোগের হাসপাতাল স্থাপনের উদ্দেশ্য লইয়াই এই কমিটি প্রথম কার্যে অগ্রসর হয় এবং ভারতীয় প্রধানেরা একদিনেই ষোল হাজার টাকা তুলেন। ইহার মধ্যে দ্বারকানাথের দান সর্বোচ্চ, তিনি দেন তিন হাজার টাকা। একটি জ্বররোগের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ইহা স্থাপিত হইলেও অবিলম্বে ইহার কার্যক্ষেত্র প্রসারিত হইল এবং সরকার ইহাকে একটি সরকারী কমিটির মর্যাদা দান করিলেন। কার্য সুপরিচালনার নিমিত্ত কমিটি তিনটি সাব-কমিটিতে বিভক্ত হয় এবং দ্বারকানাথ ইহার একটিতে সদস্যরূপে গৃহীত হইলেন। অপরাপর সাব-কমিটিতেও তিনি প্রয়োজন মত

সাক্ষ্য দেন। কলিকাতার গৃহনির্মাণ, রাস্তাঘাট, নর্দমা, জলনিষ্কাষণ, সুপেয় জলের ব্যবস্থা, কর-নির্ধারণ এবং হাসপাতাল-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ই উক্ত কমিটির অনুসন্ধানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটিতে দ্বারকানাথ ঠাকুরের লক্ষ টাকা দান তাঁহার মানবপ্রীতির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দুঃস্থ অন্ধ আতুরদের সাহায্যার্থেই ছিল এই দান। দ্বারকানাথ এই সোসাইটির পরিচালকদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন। কলিকাতায় ভিক্ষুকদের যথেচ্ছ বিচরণ বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে কর্মক্ষম করিবার নিমিত্ত সোসাইটি সরকারের নিকট একটি আইন বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করেন। ইহার মূলেও ছিলেন দ্বারকানাথ। সরকার এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৮৪০ সনে একটি 'ভ্যাগ্রান্ট অ্যাক্ট' বিধিবদ্ধ করেন।

এখানে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির (অ্যাসোসিয়েশন নহে) কথা একটু উল্লেখ করিতে হয়। লণ্ডনে ১৮২৬ সনের জুলাই মাসে স্থাপিত এই সভাটি বিদেশে ভারত-হিতার্থে আয়োজিত প্রথম রাজনৈতিক সভা। স্থানীয় ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটি বা জমিদার-সভার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে এবং ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে বিলাত-প্রবাসকালে সাক্ষাৎভাবে দ্বারকানাথ এই সোসাইটির সংস্রবে আসিলেন। ইহার জল্পনাকল্পনা হইয়াছিল কিন্তু এই কলিকাতায় বসিয়া। দ্বারকানাথের বিশেষ প্রিয়পাত্র উইলিয়ম অ্যাডাম (অ্যাডামস্ নহে) এইরূপ একটি সোসাইটির মারফত ভারতবর্ষের তথ্যানুগ অবস্থা এবং তৎসম্বন্ধে ভারতবাসীর মতামত বিলাতে পেশ করিলে সুফল ফলিবে এই ভরসায় ভারতত্যাগের প্রাক্কালে প্রবীণ ও নবীন নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। দ্বারকানাথের সঙ্গেও তাঁহার যে এ সম্পর্কে আলাপাদি হইয়াছিল তাহাও স্বতঃই অনুমিত হয়। অ্যাডাম উক্ত সোসাইটির মুখপত্র 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাডভোকেট' পত্রিকারও প্রতিষ্ঠাবধি (জানুয়ারি, ১৮৪১) সম্পাদনা করিয়াছিলেন।

কোনো মহৎ জীবনকথা সমসাময়িক বা প্রায়-সমসাময়িক ব্যক্তিদের লিখিত হইলে তাহা আকর-গ্রন্থের মর্যাদা পাইয়া থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কৃতী মানুষদের জীবনেতিহাস এইরূপ কয়েকখানি মাত্র পাইতেছি। প্যারীচাঁদ মিত্র লিখিত ডেভিড হেয়ার, রামকমল সেন ও কোলস্‌ওয়ার্দি গ্রান্টের ইংরাজী জীবনী সংক্ষিপ্তাকারে হইলেও এগুলি আমাদের নিকট সমসময়ের দিগ্‌দর্শন হইয়া আছে। এইরূপ একখানি দিগ্‌দর্শন স্বরূপ গ্রন্থ প্যারীচাঁদের মিত্রের অনুজ কিশোরীচাঁদের *Memoir of Dwarkanath Tagore*। ইহার অনুবাদ প্রকাশে বাংলা সাহিত্য শুধু সমৃদ্ধই হয় নাই, গত যুগের সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনায় ইহার যে একটি সুনির্দিষ্ট স্থান রহিয়াছে তাহাও স্বীকৃত হইল। এই কারণে আমরা বারবার অনুবাদককে সাধুবাদ করি।

গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় ইহার সুষ্ঠু সম্পাদনায়। গ্রন্থসম্পাদনা ক্ষেত্রে সম্পাদক একটি নূতন পথের সন্ধান দিয়াছেন। গ্রন্থোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে যেমন, তেমনি গ্রন্থকার-জীবনী, গ্রন্থপ্রকাশ প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা বিষয়ের তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালি জীবন ও সাধনার ক্ষেত্রে বহু নূতন নূতন আকরের সন্ধান মিলিয়াছে, এ সমুদয়ের ভিত্তিতে নানা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনায়ও লেখক-গবেষকগণ অভিনিবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের রচনা ইংরাজী ও বাংলা পুস্তকে ও প্রবন্ধে আমরা এখন পাইতে পারি। সম্পাদক প্রসঙ্গকথায় এগুলির কিছু কিছু সদ্‌ব্যবহার করিতে যত্ন লইয়াছেন।

আর-একটি বিষয়ও এখানে উল্লেখযোগ্য। বিলাতে ও ফ্রান্সে অবস্থানকালে দ্বারকানাথ কি কি কার্যে লিপ্ত ছিলেন তাহার কিছু বিবরণ উক্ত গ্রন্থে আছে বটে কিন্তু আরও বহু তথ্য জানিবার জন্য পাঠকের মনে কৌতূহল ছিল, কিছুকাল যাবৎ গবেষকগণ বিলাতে বসিয়া এই সম্বন্ধে নানা তথ্য সন্ধানে লিপ্ত হন এবং ইহার ফলাফলও তাঁহারা নিজ নিজ রচনায় পরিবেশন করেন। সম্পাদক এই সম্পর্কেও সবিশেষ অবহিত।

প্রথম বিলাতযাত্রার পথে দ্বারকানাথ যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তাহা তিনি একটি দিনলিপিতে রাখিয়া গিয়াছেন। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র বহু সংখ্যা ধরিয়া ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল দেখিয়াছি। দ্বিতীয় বার বিলাতে ও ফ্রান্সে অবস্থানকালে ভাগিনেয় নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারকানাথের গতিবিধি ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে এ দেশে কোনো কোনো আত্মীয়কে পত্র লেখেন। তাহা হইতে বহু খুঁটিনাটি বিষয়ের পরিচয় মেলে। রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত এইসকল পত্র হইতে সম্পাদক তথ্য আহরণ করিয়াছেন। রামমোহন ও দ্বারকানাথকে লেখা বহু পত্রের মাইক্রোফিল্ম-নকল বোস্টন হইতে আনানো হইয়াছে এবং তাহা বর্তমানে ন্যাশনাল আর্কাইভসে স্থান পাইয়াছে। এইসকল পত্রের ভিত্তিতে রামমোহনের ন্যায় দ্বারকানাথ সম্বন্ধেও আমরা অনেক নূতন তথ্য পাইতে পারি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

রবীন্দ্র-সাগরসংগমে। শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লি, কলিকাতা ১২। দশ টাকা।

রবীন্দ্রকাব্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কথা ভাবতে গেলে ব্যাখ্যার দুরূহতার কথাই আগে মনে পড়ে। কথাটা স্পষ্ট করা দরকার। মনে পড়ে, সরসীলাল সরকার রচিত 'রবীন্দ্রকাব্যে ত্রয়ী পরিকল্পনা'র প্রথম দিকের একটি অংশ। রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহের অন্তর্নিহিত মনস্তত্ত্বের স্থায়ী ভিত্তি সন্ধান করে সরকার মশাই 'তাল-গান-গতি'র তত্ত্বে পৌঁছেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কবির অবচেতন মনের প্রতীক-স্ফুরণের কয়েকটি নমুনা তিনি দেখিয়েছিলেন। তাঁর সে আলোচনা দেখে কবি বলেন— 'তুমি যে লিখিয়াছ অবচেতন মন হইতে আমার কবিতা লেখা হয় সে কথাটা ঠিক, কেননা আমি ভাবিয়া-চিন্তিয়া চেষ্টা করিয়া কবিতা লিখি না। তবে অবচেতন মনের মধ্যে যে সকল প্রতীকের সৃষ্টি হয় তাহাদের যে একই অর্থ থাকে এমন নয়, সুতরাং তুমি যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছ, তাহাও হইতে পারে, আবার তাহার অন্য ব্যাখ্যাও হইতে পারে।'

যখন তাঁর অচলিত সংগ্রহগ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা হচ্ছে, সেই সময়ে তিনি এক চিঠিতে লিখেছিলেন— 'সমগ্র গ্রন্থাবলী বলতে বোঝায় অনেকখানি অংশ যা প্রাগৈতিহাসিক; যার সঙ্গে আমার সাহিত্য-ইতিহাসের দূরবর্তী যোগ আছে কিন্তু চলতি কারবার বন্ধ হয়ে গেছে।'

১৯৩৫এর ৫ই জুন চন্দননগরে তিনি তাঁর 'অবর্জিত' কবিতাটি লেখেন। তাতে এই আত্মকথাটুকু ব্যক্ত হয়েছিল—

যাহা কিছু লেখে সেরা নাহি হয় সবই,
তা নিয়ে লজ্জা না করুক কোনো কবি—
প্রকৃতির কাজে কত হয় ভুলচুক ;
কিন্তু, হেয় যা শ্রেয়ের কোঠায় ফেলে
তারেও রক্ষা করিবার ভূতে পেলে
কালের সভায় কেমনে দেখাবে মুখ।

'রবীন্দ্র-সাগরসংগমে' বইখানিতে রবীন্দ্রনাথের নানা রচনা সম্বন্ধে অধুনা স্বর্গত একষট্টি জন লেখকের নানা ভঙ্গির স্মরণীয় এবং মূল্যবান মতামত সংকলিত হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর রচনাবলী সম্বন্ধে প্রকাশিত মতামত ও টীকা-টিপ্পনীর উদ্ধৃতি আছে। এসবই অবশ্য অপেক্ষাকৃত অতীতের, নিকট-অতীত বা বর্তমানের নয়। তবে, পাদটীকায় একালের কোনো কোনো আলোচনা ও আলোচকের নামোল্লেখ আছে। সম্পাদক লিখেছেন, 'লোকান্তরিত জ্ঞানী গুণী সমালোচকজনের উক্তি ও মন্তব্যের সহিত বর্তমানকালের জীবিত ব্যক্তিদের উক্তির সামঞ্জস্য প্রদর্শনই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।' ভূমিকায় তাঁর আরও একটি উক্তি স্মরণীয়, সেটি এ-বইখানির পরিচিতি হিসেবে ধর্তব্য— "রবীন্দ্র-সাগর-সংগমে প্রধানতঃ রবীন্দ্র-সাহিত্যের উপর রচিত পূর্বাচার্যদিগের সমালোচনা, টীকা-টিপ্পনী ও মন্তব্যের সংকলন। অনুরূপ গ্রন্থ এযাবৎ সম্ভবতঃ আর প্রকাশিত হয় নাই। রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল্যায়নের দিক হইতে ইহা একখানি মূল্যবান প্রাচীন দলিল বিশেষ। এই দলিলের লেখকগণ আজ সকলেই লোকান্তরিত। রবীন্দ্রনাথের রচনারম্ভের প্রাথমিক যুগ হইতে তাঁহার সম্পর্কে এবং তাঁহার কাব্য-সাহিত্য সম্পর্কে এই মনীষীরা কি ধারণা পোষণ করিতেন, এই সংকলন-গ্রন্থের সাহায্যে তাহারই সামগ্রিক রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। কেবলমাত্র ব্যক্তি-বিশেষের রচনাই নহে, তৎকালীন বঙ্গভাষায় রচিত সাময়িক পত্রিকাগুলিতেও সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে, রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-রচনা সম্পর্কে কি ধরণের বাদানুবাদ ও মন্তব্য প্রকাশিত হইত, তাহারও আংশিক নিদর্শন এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।"

শ্রীযুক্ত বিশু মুখোপাধ্যায় সুপরিচিত সাহিত্যিক। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা পড়ে জীবনের শেষ বছরে কবি নিজে তৃপ্তি লাভ করেন। বিশুবাবুর অকৃত্রিম রবীন্দ্রানুরাগ আলোচ্য এই সংগ্রহগ্রন্থের সু-সম্পাদনায় সংশয়াতীত ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। বইখানি অভিনন্দনযোগ্য।

কালীপ্রসন্ন ঘোষের [বান্ধব, মাঘ, ১২৮৫] 'কবি-কাহিনী' ; ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের [বঙ্গবাসী, ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী] 'বাল্মীকি-প্রতিভা' ; কালীপ্রসন্নর [বান্ধব, আষাঢ়, ১২৮৮] 'রুদ্রচণ্ড' ; ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের [এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ, ২ আষাঢ়, ১২৯০] 'প্রভাত-সংগীত', হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের [কবির কথা, ১৩৬১] 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' ; কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের বহু-নিন্দিত 'রাহু'-রচিত 'ইহা কড়িও নহে, কোমলও নহে, পুরো সুরে মিঠে ও কড়া' পুস্তিকার 'কড়ি ও কোমল' ; এবং তারই পাশে দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর [নব্যভারত, অগ্রহায়ণ, ১২৯৪] 'কড়ি ও কোমল' ; গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর [সাহিত্য, বৈশাখ, ১২৯৮] এবং নিত্যকৃষ্ণ বসুর [সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী] 'রাজা ও রানী' সম্পর্কিত পর পর দুটি আলোচনা ; ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের [নব্যভারত, পৌষ, ১২৯৭] 'মন্ত্রি-অভিষেক' ; প্রিয়নাথ সেনের [সাহিত্য, পৌষ ১৩০০] 'মানসী' ; প্রমথ চৌধুরীর [প্রবন্ধসংগ্রহ]

এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ['কাব্যে নীতি' নামে ১৩১৬র জ্যৈষ্ঠের 'সাহিত্যে' প্রকাশিত] 'চিত্রাঙ্গদা' সম্পর্কিত পর পর দুটি প্রবন্ধ; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের [দাসী, বৈশাখ, ১৩০৩] 'চিত্রা'; রমণীমোহন ঘোষের [প্রদীপ, আষাঢ়, ১৩০৬] 'চৈতালি'; এবং সেই সূত্রেই পাদটীকায় 'দাসী' পত্রিকায় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের অতি-বিরূপ আলোচনার উল্লেখ; অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের [প্রদীপ, ভাদ্র, ১৩০৮] 'কথা'; চন্দ্রনাথ বসু [৩০এ শ্রাবণ ১৩০৭ তারিখের পত্রে এবং পরে বিশ্বভারতী পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত] ও সতীশচন্দ্র রায়ের [সতীশচন্দ্রের রচনাবলী ১৩১৯] 'ক্ষণিকা' সম্পর্কিত পর পর দুটি আলোচনা; ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'নৈবেদ্য'; এবং সেই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিশ্বাশ্রয়ী স্বরূপের দিকে উপাধ্যায়ই যে প্রথম তর্জনী-সংকেত করেন, তিনিই যে তাঁকে প্রথম 'গুরুদেব' সম্বোধন করেন, পাদটীকায় সে-সব কথার উল্লেখ; সুখরঞ্জন রায়ের [প্রতিভা, 'কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ,' অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩১৮] এবং সুরেশচন্দ্র সমাজপতির [সাহিত্য, 'নববঙ্গদর্শন' ১৩২৭] 'চোখের বালি'; নিশিকান্ত সেনের [জাহ্নবী, মাঘ, ১৩:৪] 'নৌকাডুবি'; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের [বাণী, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩১৭] 'গোরা'; ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ['কবি রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব' পুস্তিকা] এবং বিপিনবিহারী গুপ্তের [মানসী, মাঘ, ১৩১৮] 'গীতাঞ্জলি' সম্পর্কিত পর পর দুটি প্রবন্ধ; অজিতকুমার চক্রবর্তীর [ভারতী, চৈত্র, ১৩১৮] 'ডাকঘর'; ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের [আর্যাবর্ত, দ্বিতীয় বর্ষ, কার্তিক] 'অচলায়তন', এবং সেই সূত্রেই এই সংকলনের 'পরিশিষ্ট' ক অংশে মুদ্রিত ৩রা অগ্রহায়ণ ১৩১৮ তারিখে লেখা রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ পত্র; সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের [ভারতী, ফাল্গুন, ১৩২২] 'ফাল্গুনী'; উগ্র রক্ষণশীল যতীন্দ্রমোহন সিংহের ['সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা') 'ঘরে-বাইরে'; সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের ['রবি-দীপিতা'] 'বলাকা'; সরসীলাল সরকারের [বিচিত্রা, পৌষ, ১৩৩৮] 'চতুরঙ্গ'; চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ে [প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯] 'যোগাযোগ'; রমাপ্রসাদ চন্দের [বসুমতী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯] 'শেষের কবিতা'; রাজশেখর বসুর [প্রবাসী, মাঘ, ১৩৪১] 'চার অধ্যায়'; এই পর্যায়ক্রমে রবীন্দ্র-সাহিত্যের নানা দিকের নানা আলোচনা এখানে এক পাত্রে পরিবেষিত হয়েছে। অনুকূল-প্রতিকূল, দু রকম মনোভঙ্গিই এখানে গৃহীত হয়েছে। সম্পাদকের ধৈর্য সতর্কতা এবং সামঞ্জস্যবোধের পরিচয় এইসব রচনার নির্বাচনে বিন্যাসে এবং পাদটীকা-সংযোজনার গুরু পরিশ্রমেই প্রকাশিত। 'পরিশিষ্ট' অংশে মোহিতচন্দ্র সেনের 'কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা,' দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'কাব্যে নীতি', বিপিনচন্দ্র পালের 'রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যের মাত্রা' 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি', বিজয়চন্দ্র মজুমদারের 'বাঙ্গালা ভাষার মামলা,' চিত্তরঞ্জন দাশের 'জন্মকথা', অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য', সরলাদেবীর 'রবীন্দ্র-বঙ্কিম বিতর্ক' ইত্যাদি অংশ রবীন্দ্রানুরাগী পাঠক ছাত্র গবেষক ও অধ্যাপকদের খুবই কাজে লাগবে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায়', অরসিক রায়ের 'নটরাজ', অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'ভাই হাততালি' ইত্যাদি এই লেখাগুলিরই অন্তর্ভুক্ত।

নিজে নেপথ্যে থেকে সম্পাদক সুদীর্ঘকালের রবীন্দ্র-রচনাবলীর পারিপার্শ্বিক ক্ষেত্র, পরিমণ্ডল এবং মননভূমির নিখুঁত পরিচয় দিয়েছেন এই বইখানিতে।

হরপ্রসাদ মিত্র

ইংরেজী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ও মূল্যায়ন। শ্রীবিমলকৃষ্ণ সরকার। স্বপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৬। নয় টাকা।

পঞ্চপণ্ডিত রচিত *A Literary History of England*-এর ভূমিকায় সম্পাদক A. C. Baugh বলেছেন, ইংরেজী সাহিত্যের পরিধি এতই বৃহৎ যে, কেউই এর সামান্য ভগ্নাংশের বেশি পড়ে উঠতে পারে না। সমালোচনা ইতিহাস ও জীবনীমূলক গবেষণা ইংরেজী সাহিত্য ও সাহিত্যিক নিয়ে এত হয়েছে, রীতিরূপ ধারা ও যুগপর্বের উপর এত বেশি কাজ হয়েছে যে, কোনো পণ্ডিতই এককভাবে এই বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার আয়ত্ত করতে পারেন না। তাই মাত্র একজন লেখক কর্তৃক রচিত সমগ্র বিষয়ের উপর একাধারে ব্যাপক ও প্রামাণিক ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস অসম্ভব বললেই হয়।[১] Legouis ও Cazamian রচিত *A History of English Literature* আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ একখানি গ্রন্থ। তা সত্ত্বেও গ্রন্থের প্রারম্ভে গ্রন্থকারদ্বয় প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে একটি করে ভূমিকা লেখা প্রয়োজন বোধ করেছেন। Legouis তাঁর ভূমিকার শেষে বলেছেন, তাঁর মন্তব্যগুলি পুস্তকের প্রথম অংশের প্রতিই প্রযোজ্য; দ্বিতীয় অংশে স্বতন্ত্ররীতি অনুসৃত হয়েছে এবং ঐ অংশের জন্য পৃথক ভূমিকাও দেওয়া হয়েছে।[২] দ্বিতীয় ভূমিকায় Cazamian স্পষ্ট করেই বলেছেন যে দুজন লেখকের চিন্তারীতিও পৃথক, এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে তাঁদের দুজন লেখকের চিন্তারীতির পার্থক্যই এই পার্থক্যের জন্য অংশতঃ দায়ী।[৩] দেখা যাচ্ছে যে একখানি গ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও এটি প্রকৃতপক্ষে দুটি স্বতন্ত্র গ্রন্থেরই সমাহার। বহুপর্বিক এবং একাধিক লেখকের গ্রন্থ ছাড়া ইংরেজী সাহিত্যের বিস্তৃত, পূর্ণ ইতিহাস রচিত হওয়া যে দুষ্কর এটি যেন তারই প্রমাণ। এমনকি ইংরেজী সাহিত্যের কাব্য উপন্যাস প্রভৃতির পৃথক ইতিহাসও দেখা যায় এক খণ্ডে ভালোভাবে সম্পূর্ণ করা যায় না। E. A. Baker রচিত *A History of English Novel* তার জলন্ত প্রমাণ। পরিশিষ্টসহ পঞ্চদশ খণ্ডে সমাপ্ত *The Cambridge History of English Literature*-এর মুখবন্ধে যুগ্মসম্পাদক A. W. Ward ও A. R. Waller গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও পরিসরের কথা তুলেছেন। তাঁরা বলেছেন, গ্রন্থে ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে ভাষণ গবেষণা সাংবাদিকতা মুদ্রণরীতি বর্ণমালাবিবর্তন এমন কি

১ The extent of English literature is so great that no one can hope to read more than a fraction of it, and the accumulated scholarship—biographical, critical, and historical—by which writers and their works, and the forms and movements and periods of English literature have been interpreted, is so vast that no single scholar can contract it. A literary history of England by one author, a history thas is comprehensive and authoritative over the whole field, is next to impossible. (Preface, p. v.)

২ These remarks apply to the first volume. The second, which follows its own method, has a separate introduction. (Introduction—Part I, p. xi.)

৩ The division of the book into two parts . . . entails obvious differences of presentment and even of method. It would be vain to deny that they are partly due to the different habits of thought of the two authors. (Introduction—Part II, p. xii.)

আমেরিকা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশের রচনার উপর আলোচনাও বাদ দেওয়া হয়নি।[৪] ইংরেজী-সাহিত্য এতই বিচিত্র বহুপ্রসূ ও বহুযুগবিস্তৃত যে তার সুষ্ঠু ইতিহাস রচনা এক দুরূহ কাজ। একক দৃষ্টিকোণ থেকে এই সমগ্রসাহিত্যের পরিক্রমা করতে গেলে সর্বত্র সমান আগ্রহ বজায় রাখা যে-কোনো লেখকের পক্ষেই খুব কঠিন।

তা ছাড়া, সাহিত্যের ইতিহাস পরোক্ষভাবে সাহিত্যের মূল্যায়নও বটে। বৈদগ্ধ্য ও পরিশীলিত সাহিত্যরুচির সঙ্গে নিরপেক্ষতা যুক্ত না হলে সাহিত্যের মূল্যায়নে অনেক বিভ্রান্তি ঘটতে পারে। হয়তো এই দূরত্বের জন্যই বিষয়জ্ঞ বিদেশী পণ্ডিতদের মূল্যায়নে অনেক ক্ষেত্রে নূতনত্ব ও নির্ভরযোগ্যতা বেশি পাওয়া যায়। জার্মান পণ্ডিত B. Ten Brink রচিত *Geschichte der englischen Literatur*, ফরাসী পণ্ডিত H. Taine রচিত *Histoire de la Littérature anglaise*, J. J. Jusserand রচিত *Histoire Litterraire du Peuple anglais* এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে Legouis ও Cazamian রচিত ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস এজন্য এত আদৃত। এঁদের গ্রন্থ ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে এবং তা থেকে ইংরেজরা ইংরেজী সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ করেছেন। স্বদেশীয় লেখকরা জাতীয় সাহিত্যের গৌরবঘোষণায় অনেক সময়ই একদেশদর্শী হয়ে পড়েন, তাঁদের অনেকে ঐতিহাসিক তন্নিষ্ঠা বজায় রাখতে বা বিদেশী প্রভাবের ফলশ্রুতিকে যথাযথ স্বীকৃতি দিতে দ্বিধান্বিত হন; ফলে প্রত্যেক সাহিত্যের ইতিহাসই যে প্রকৃতপক্ষে বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসের একটি অংশ সে সত্যটি তাঁদের রচনায় অপহ্নুত থেকে যায়। সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় অন্তর্দৃষ্টি ও বহির্দৃষ্টি সমন্বিত হওয়া প্রয়োজন, এবং চাই লেখকের নির্লিপ্তি-স্বচ্ছ আগ্রহ। এক্ষেত্রে তাই বিদেশী পণ্ডিতদের খানিকটা অতিরিক্ত সুযোগ বর্তমান। ইংরেজী সাহিত্যের বিচারে Saintsburyর পক্ষে যে-নির্লিপ্তি হয় অসম্ভব নয় লালিত, বিদেশী বলে Legouisএর পক্ষে তাই সুলভ ও অবলীলায়িত। জার্মান পণ্ডিত M. Winternitz রচিত প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে তাকালেই এই সত্যটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। যোগ্যতাসম্পন্ন বাঙালী লেখকের পক্ষে ইংরেজী সাহিত্যের এরূপ পরিচ্ছন্ন নির্ভরযোগ্য পক্ষপাতশূন্য ইতিহাস রচনা সম্ভব বলে আশা জাগে।

যদিচ ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা দিয়েই আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের পত্তন হয়েছে এবং ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের ইতিহাস দু শতাব্দীকাল যাবৎ পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ করে আছে, তবু স্বীকার্য যে ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় বা মূল্যায়নে ফরাসী বা জার্মানদের মতো ভারতীয় ইংরেজীবিদ্‌দের কোনো বিশিষ্ট দান নেই। আধুনিক শেক্সপীয়র-গবেষণা ও ব্যাখ্যানে Henri Fluchére বা Wolfgang H. Clemen -এর প্রতিষ্ঠা কোনো ইংরেজের চেয়ে কম নয়; কিন্তু ভারতীয় পণ্ডিতদের দান সেখানে খুবই অকিঞ্চিৎকর। এর কারণ, ভারতীয়দের মধ্যে যাঁরা ইংরেজী সাহিত্যের চর্চা করেন তাঁদের প্রধান চেষ্টা হয় কী ক'রে ইংরেজ সমালোচকদের দৃষ্টিকোণ সযত্নে ও সপরিশ্রমে আয়ত্ত করা যায়। আমাদের ইংরেজী সাহিত্য বিষয়ক রচনা সমালোচনা ও গবেষণা ইংরেজ পণ্ডিতদের কাছে কতখানি গ্রাহ্য করা যাবে সেইটিই যেন আমাদের মুখ্য ভাবনা। ফলে ইংরেজ পণ্ডিতরা যেখানে 'না' করেছেন আমাদেরও সেখানে 'মা লিখ' শিরোধার্য করতে

৪ They included certain allied subjects such as oratory, scholarship, journalism and typography, and they did not neglect the literature of America and the British Dominions.

(Prefatory note, p. v.)

হয়েছে। উজ্জ্বল ব্যতিক্রম দু-একটি আছে, কিন্তু তা অতি বিরল। আমাদের পক্ষে আত্মপ্রত্যয়ী ও স্থায়ী মূল্যবান সমালোচনা সৃষ্টি করা অসম্ভব, যদি না প্রথমেই আমরা ভারতীয় পাঠকের বোধগম্য হবে এমন স্বচ্ছ সুযুক্তিপূর্ণ সাহিত্যের ইতিহাস বা সমালোচনাগ্রন্থ মাতৃভাষায় রচনা করতে পারি। মাতৃভাষার দুর্বলতা বা দীনতা যাই থাকুক, তার প্রধান গুণ এই যে চিন্তার দৈন্য ও অস্পষ্টতা তাতে সহজেই ধরা পড়ে। আন্তর্জাতিক ভাষায় লিখিত না হলে রচনা আন্তর্জাতিক মর্যাদা বা মৌলিকতার দাবী করতে পারবে না, এর চেয়ে হীনমন্য ভাবনা আর কিছু নেই। বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায় একদা বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "ইংরাজিপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থিরজ্ঞান আছে যে তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা ভাষায় লেখক মাত্রই হয় বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপিকৌশলশূন্য; নয়ত ইংরাজিগ্রন্থের অনুবাদক।" খুবই আশার কথা, অধুনা 'ইংরাজিপ্রিয় কৃতবিদ্য' কেউ কেউ মাতৃভাষায় ইংরেজী সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনায় উদ্যোগী হয়েছেন। এঁদের মধ্যে শ্রীবিমলকৃষ্ণ সরকারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; তিনি ইংরেজী সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং আধুনিক বাংলাসাহিত্যেও সমান আগ্রহী।

ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে A. Compton-Rickett সাহিত্যের সামাজিক পটভূমির উপর বিশেষ জোর দেবার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, সাহিত্য নিছক বিদ্যায়তনিক ফল নয়, জাতীয় বিবর্তনের বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টারই অন্যতম অভিব্যক্তি।[৫] শ্রীবিমলকৃষ্ণ সরকার যেভাবে তাঁর গ্রন্থ বিন্যস্ত করেছেন তা হচ্ছে এই: "প্রত্যেক যুগের সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তার আংশিক বিশ্লেষণ, যুগধর্মের প্রভাবে যে সাহিত্যচিন্তা ও রচনারীতির উদ্ভব হয় তার বৈশিষ্ট্যনির্ণয় এবং তৎকালীন বিশিষ্ট রচনাবলীর গুণাগুণ বিচার।"[৬] Compton-Rickettএর গ্রন্থে লেখকজীবনী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। গ্রন্থকার জীবনী-অংশ বাদ দিয়েছেন, তার ফলে গ্রন্থ-কলেবর অতি-স্ফীত হয় নি, কিন্তু বর্ণনা সুপ্রবাহী হতে পেরেছে। সংক্ষেপণের তাগিদে অত্যুক্ত, অতি-মুখর বা উদ্ধৃতি-জটিল রচনার বিপদ থেকে তিনি সহজেই মুক্ত হয়েছেন। ইংরেজী সাহিত্য বিষয়ে বাংলায় এমন সুপাঠ্য নাতিদীর্ঘ অথচ নির্ভরযোগ্য সম্পূর্ণ পরিচায়কগ্রন্থ নিতান্তই বিরল। শ্রীসরকার প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত পরিক্রমা করেছেন। কিন্তু কোথাও পরিমিতি বা স্বাচ্ছন্দ্য পরিহার করেন নি। অ্যাংলো-স্যাক্সন প্রহেলিকা (riddle) যেমন আলোচনা থেকে বাদ যায় নি তেমনি হালের তিরিক্ষিতরুণ (angry youngmen)-দের কথাও তিনি উল্লেখ করতে ভোলেন নি। হয়তো মাঝে মাঝে তুলনাক্রমে বিশ্ব তথা বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গ অবতারণা করলে পরিচ্ছেদগুলি আরো চিত্তগ্রাহী বা তাৎপর্যবহ হত। যেমন, প্রাচীন অ্যাংলো-স্যাক্সন যুগের 'Beowulf' প্রসঙ্গে স্ক্যাণ্ডিনেভীয় ও আইসল্যাণ্ডীয় 'সাগা' এবং গ্রীক, টিউটনিক ও ভারতীয় মহাকাব্যগুলি যুগপৎ উল্লেখ করা যেত। গ্রন্থে Hall, Marston প্রভৃতি এলিজাবীথীয় ব্যঙ্গ-কবিদের উল্লেখ আছে, কিন্তু চসারোত্তর যুগের পূর্বসূরী Skelton, Barclay প্রভৃতির অনুল্লেখে ঐতিহাসিক সূত্রটি ছিন্ন হয়েছে মনে হয়; ভিক্টোরীয় যুগের অনেক কিছুই উপস্থিত আছে, নেই Lewis Carroll এবং তাঁর 'wonder land'। এইসব সামান্য

---

৫ Literature is viewed not as a mere academic product, but as one expression of the many-sided activities of national growth. (Preface)

৬ ভূমিকা, পৃ ।/০

ত্রুটি আমরা সহজেই উপেক্ষা করতে পারি। কারণ, লেখক রোমান্টিক পর্বের ইতিহাস-ব্যাখ্যানে যে সাফল্য অর্জন করেছেন তা অনুকরণীয়। গ্রন্থের পরিশিষ্টে লেখক ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের যোগসূত্রটি দেখাতে চেষ্টা করেছেন। এই অংশটি গ্রন্থের এক বৈশিষ্ট্য। অনুরূপভাবে চিরাচরিত ট্রাডিশন না মেনে লেখক যদি অন্তত পরিশিষ্টেও আধুনিক মার্কিন সাহিত্যের ধারা নিয়ে আলোচনা করতেন তবে বাঙালী পাঠকদের কাছে গ্রন্থটির মূল্য অনেক বর্ধিত হত সন্দেহ নেই।

আলোচ্য গ্রন্থটির জন্য শ্রীবিমলকৃষ্ণ সরকার ধন্যবাদার্হ। গ্রন্থটিতে কোথাও অনুবাদ-সুলভ আড়ষ্টতা নেই। যে-বিষয়গত আত্মপ্রত্যয় ও সাহিত্যিক মূল্যবোধ থাকলে বিদেশী সাহিত্যের ইতিহাস মাতৃভাষায় স্বাধীনভাবে ব্যাখ্যা করা যায় তা শ্রীসরকারের আছে।

জগন্নাথ চক্রবর্তী

প্রাপ্ত গ্রন্থাবলী

সাহিত্যরুচি ॥ সরোজ আচার্য। ন্যাশনাল পাবলিশার্স। তিন টাকা।

অ্যারিওপ্যাগিটিকা: জন মিল্টন ॥ শশিভূষণ দাশগুপ্ত অনূদিত। সাহিত্য অকাদেমী। তিন টাকা।

কবি তরু দত্ত ॥ রাজকুমার মুখোপাধ্যায়। এশিয়া পাবলিশিং কোং। দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

আকাশে অনেক ঘুড়ি ॥ সুচরিত চৌধুরী। জলসীমা প্রকাশনী। তিন টাকা।

বীরাঙ্গনা কাব্য ॥ অমরেন্দ্র গণাই সম্পাদিত। অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স। তিন টাকা।

অচিরা ॥ প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। শান্তি লাইব্রেরী। চার টাকা।

ভারতীয় গ্রামীণ সংস্কৃতি ॥ শান্তিদেব ঘোষ। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং। তিন টাকা।

রূপকার নন্দলাল ॥ শান্তিদেব ঘোষ। রত্নসাগর গ্রন্থমালা। আড়াই টাকা।

ডিলিরিয়াম ॥ বীরেন চট্টোপাধ্যায়। চার টাকা।

স্বর্গরাণীর মিলন-ডাক ॥ ভক্ত মাধব। অধ্যাত্মবিজ্ঞান-গবেষণা মন্দির। পাঁচ টাকা।

রূপযানী ॥ রমাপদ চৌধুরী। সরস্বতী গ্রন্থালয়। চার টাকা।

বেদ-মীমাংসা ॥ অনির্বাণ। সংস্কৃত কলেজ। দশ টাকা।

কাজী নজরুল প্রসঙ্গে ॥ মুজফ্ফর আহ্মদ। বিংশ শতাব্দী। চার টাকা।

প্রবাদ-বচন ॥ গোপালদাস চৌধুরী ও প্রিয়রঞ্জন সেন। বুকল্যাণ্ড। ছয় টাকা।

পশ্চিম দিগন্ত ॥ নির্মল চট্টোপাধ্যায়। কল্লোল প্রকাশনী। দুই টাকা।

ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান ॥ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বুকল্যাণ্ড। ছয় টাকা।

গৌড় ও পাণ্ডুয়া ॥ কালীপদ লাহিড়ী। দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

মধুসূদনের কবিমানস ॥ শিশিরকুমার দাশ। বুকল্যাণ্ড। দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

শারদোৎসব দর্শন ॥ সমীরণ চট্টোপাধ্যায়। ওরিয়েন্ট বুক কোং। দুই টাকা।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ॥ বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন প্রকাশিত। তিন টাকা।

রাষ্ট্র ও গণতন্ত্র ॥ পরিমলচন্দ্র ঘোষ। এইচ. চ্যাটার্জি। পাঁচ টাকা।

বাংলা নাট্য-বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র ॥ অহীন্দ্র চৌধুরী। বুকল্যাণ্ড। পাঁচ টাকা।

সাহিত্যতত্ত্ব ॥ বিনয় সেনগুপ্ত। নয়া প্রকাশ। চার টাকা।

গুরুদর্শন ॥ সমীরণ চট্টোপাধ্যায়। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

সময় ও সুকৃতি ॥ জ্যোতির্ময়ী দেবী। ডি. এম. লাইব্রেরী। তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

সৈনিকের প্রাণবীণা ॥ চুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়। এক টাকা।

মানবতাবাদ ॥ বসুধা চক্রবর্তী। দ্বীপায়ন। সাত টাকা।

সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ ॥ শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। গান্ধী স্মারকনিধি। দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥ সীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

সম্পাদকের নিবেদন

বিশ্বভারতী পত্রিকা একবিংশ বর্ষে পদার্পণ করল।

শেক্সপীয়রের (১৫৬৪ - ১৬১৬) চতুর্থ-জন্মশতবার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপনের সুযোগ আমরা নূতন বর্ষের এই প্রথম-সংখ্যায় গ্রহণ করলাম। এই উপলক্ষে শেক্সপীয়রের তিরোধানের ত্রি-শততম স্মৃতিবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ শেক্সপীয়র-স্মরণে যে কবিতাটি রচনা করেন কবির হস্তাক্ষরে সেটি মুদ্রণ করা হল। এই কবিতাটি রচনার কয়েক মাস পরে (১৯১৬) রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা-সফরে যান, সেই বছরই শেক্সপীয়রের ত্রি-শততম তিরোধান-বার্ষিক। বছরের শেষের দিকে তিনি ক্লিভল্যাণ্ডে উপস্থিত হন এবং তথাকার শেক্সপীয়র-গার্ডেনের জন্য একটি পাত্রে আইভিচারা রোপণ করেন; পাত্রটি তৎপরে উক্ত উদ্যানে রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত একটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত হয়। রকফেলর পার্কের একটি অংশ এই উদ্যান, বর্তমানে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে ইংলিশ গার্ডেন। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনে এ বিষয়ে তথ্য ও চিত্র সংগৃহীত আছে। বর্তমান সংখ্যায় আমরা প্রাসঙ্গিক চিত্র-দুটিও মুদ্রণ করলাম।

সেইসঙ্গে শেক্সপীয়র-প্রসঙ্গে রবীন্দ্ররচনা ব্যতীত আরও দুটি রচনা মুদ্রিত হল।

গত ২৭ মে (১৯৬৪) তারিখে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পরলোকগমন করেছেন। সংস্কৃতিসম্পন্ন কীর্তিমান ভারতমৃত্তিকার সন্তান তিনি, তাঁর প্রতি দেশবিদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা শ্রদ্ধা অর্পণ করেছেন। আমরা বিশ্বভারতীর আচার্যের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম।

স্বী কৃ তি

শেক্সপীয়র-উদ্যান ও রবীন্দ্রনাথের আইভিচারা রোপণ চিত্র-দুটি এবং বিশ্বকবি ও ঋতুরাজ জওহরলাল পাণ্ডুলিপি-দ্বয় শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত।

রবীন্দ্র-সমীপে জওহরলাল চিত্র শ্রীকাঞ্চন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক এবং শান্তিনিকেতন-মেলায় নাগরদোলায় জওহরলাল চিত্র শ্রীতারক দাস কর্তৃক গৃহীত এবং তাঁদের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সহ-সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

পুরাতন সংখ্যা

বিশ্বভারতী পত্রিকার পুরাতন সংখ্যা কিছু আছে। যাঁরা সংখ্যাগুলি সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক, তাঁদের অবগতির জন্য নিম্নে সেগুলির বিবরণ দেওয়া হল—

¶ প্রথম বর্ষের মাসিক বিশ্বভারতী পত্রিকার চার সংখ্যা, একত্র ১·০০।

¶ তৃতীয় বর্ষের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা, প্রতি সংখ্যা ১·০০।

¶ পঞ্চম বর্ষের দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, প্রতি সংখ্যা ১·০০।

¶ অষ্টম বর্ষের প্রথম তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, প্রতি সংখ্যা ১·০০।

¶ নবম বর্ষের প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, প্রতি সংখ্যা ১·০০।

¶ ষষ্ঠ সপ্তম দশম একাদশ ও চতুর্দশ বর্ষের সম্পূর্ণ সেট পাওয়া যায়। প্রতি সেট ৪·০০, রেজেস্ট্রী ডাকে ৬·০০।

¶ পঞ্চদশ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা ৩·০০, বাঁধাই ৫·০০; তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, প্রতিটি ১·০০।

¶ ষোড়শ বর্ষের দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুক্ত-সংখ্যা, ৩·০০।

¶ অষ্টাদশ বর্ষের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়, উনবিংশ বর্ষের তৃতীয় এবং বিংশ বর্ষের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা পাওয়া যায়, প্রতি সংখ্যা ১·০০।

বিশ্বভারতী পত্রিকা

কলকাতার গ্রাহকবর্গ

স্থানীয় গ্রাহকদের সুবিধার জন্য কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়মিত ক্রেতারূপে নাম রেজিস্ট্রি করবার এবং বার্ষিক চার সংখ্যার মূল্য ৪·০০ টাকা অগ্রিম জমা নেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এইসকল কেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা উল্লিখিত হল—

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ কলেজ স্কোয়ার

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন

জিজ্ঞাসা
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
৩৩ কলেজ রো

ভবানীপুর বুক ব্যুরো
২বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড

যাঁরা এইরূপ গ্রাহক হবেন, পত্রিকার কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হলেই তাঁদের সংবাদ দেওয়া হবে এবং সেই অনুযায়ী গ্রাহকগণ তাঁদের সংখ্যা সংগ্রহ করে নিতে পারবেন। এই ব্যবস্থায় ডাকব্যয় বহন করবার প্রয়োজন হবে না এবং পত্রিকা হারাবার সম্ভাবনা থাকে না।

মফস্বলের গ্রাহকবর্গ

যাঁরা ডাকে কাগজ নিতে চান তাঁরা বার্ষিক মূল্য ৫·৫০ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কলিকাতা ৭ ঠিকানায় পাঠাবেন। যদিও কাগজ সার্টিফিকেট অব পোস্টিং রেখে পাঠানো হয়, তবুও কাগজ রেজিস্ট্রি ডাকে নেওয়াই অধিকতর নিরাপদ। রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠানোর জন্য অতিরিক্ত ২২ লাগে।

শ্রাবণ থেকে বর্ষ আরম্ভ।

দেশের সমৃদ্ধি ও জাতীয় সংহতির
মধ্য দিয়েই সার্থক হয়

জাতীয় উৎসব

এই দিনে
আমাদের সংকল্প হোক :

- জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করব
- সকলপ্রকার অপচয় বন্ধ করব
- সর্বত্র উৎপাদন বৃদ্ধি করব
- জাতীয় প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পুজোয় চাই নতুন জুতো
Bata

বয়স যাই হোক
নিম টুথ পেষ্ট সব বয়সের পক্ষেই সমান উপকারী মাজন।
নিম টুথ পেষ্ট-ই হল একমাত্র টুথ পেষ্ট যার মধ্যে নিমের বীজবারক, দুর্গন্ধনাশক ও কষায় গুণের সঙ্গে আধুনিক দন্তবিজ্ঞান-সম্মত ঔষধাদির সার্থক সমন্বয় ঘটেছে। এই টুথ পেষ্ট পাইওরিয়া, কেরিজ এবং টার্টার নিরোধে সাহায্য করে, দাঁতের এনামেল অটুট রাখে এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর ক'রে প্রশ্বাস সুরভিত করে।
নিম-এর তুলনা নেই।
TOOTH P
CALCHEM
টুথ পেষ্ট
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা—২৯।

১ জামশেদজী নাসেরওয়ানজী টাটা
৩রা মার্চ ১৮৩৯—১৯এ মে ১৯০৪

'একাই একটি প্ল্যানিং কমিশন'

জামশেদজী টাটার ব্যক্তিত্বের একটি বড় দিক ছিল তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন, তাঁর নতুনের নেশা, তাঁর দুঃসাহসিক প্রেরণা। এই গুণগুলি তাঁর জীবনে ছোট-বড় সব কাজের মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। বোম্বাই শহরে যিনি সর্বপ্রথম বাস-গৃহে বিজলী বাতি নেন, সেই জামশেদজীই ভারতে প্রথম জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্টেশন বসান যা আজ বর্ধিত হয়ে সারা দেশের মোট উৎপাদিত বৈদ্যুতিক শক্তির প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ সরবরাহ করে। যিনি জানবার আগ্রহে আমাদের দেশে একটি প্রথম সিনেমাটোগ্রাফ যন্ত্র আনান, সেই জামশেদজীই ভারতের সর্বপ্রথম ফলিত ও মৌলিক বিজ্ঞান-গবেষণাগার বাঙ্গালোরে প্রতিষ্ঠা করেন। আর যিনি আমাদের দেশে প্রথম মোটর-গাড়ি আনানোয় অগ্রণী ছিলেন, সেই জামশেদজীই ভারতীয় ইস্পাত শিল্পের গোড়াপত্তন করেন।

শক্তি, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও ইস্পাত—এইগুলির সঙ্গে আমাদের দেশে যাঁর নাম চিরকালের জন্য জড়িত থাকবে, তিনি হলেন জামশেদজী নাসেরওয়ানজী টাটা—যাঁকে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু "একাই একটি প্ল্যানিং কমিশন" ব'লে সম্মান দিয়ে গেছেন।

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরীর সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে ১৩৭১ সালের বৈশাখে অর্ধমূল্যে জগদীশবাবুর ছোট গীতা ও উচ্চ কমিশনে অন্যান্য বই বিক্রয় হইতেছে।

হাওড়া মোটর কোম্পানী

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২১ সংখ্যা ২ · কার্তিক-পৌষ ১৩৭১ · ১৮৮৬ শক

সম্পাদক শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

মূল্য এক টাকা

জ্যোতিষ্কের ঘটে সম্মিলন। সেথাকার শুভ্র আলো
বরমাল্যরূপে তব দীপ্তিমান সমুদার ললাটে জড়ালো
বাণীর দক্ষিণ পাণি

মোরে তুমি জানো বন্ধু বলি,
আমি কবি আনিলাম ভরি মোর ছন্দের অঞ্জলি
স্বদেশের আশীর্বাদ, বিদায়কালের অর্ঘ্য মোর,
বাহুতে বাঁধিনু তব আমার শ্রদ্ধার রাখীডোর॥

গূঢ় হতে উৎসারিত জ্যোতিষ্কের সম্মিলন ঘটে
যেথায় রচিত হয় বর্ণে বর্ণে কল্পনার পটে
সুন্দরের আমন্ত্রণ লিপি।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের ৭২ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষীয় দার্শনিক কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি প্রেরণ করেন। প্রবাসী ১৩৪২ মাঘ সংখ্যায় এই অনুষ্ঠানের বিবরণসহ কবিতাটির এই পাঠ মুদ্রিত হয়—

জ্ঞানের দুর্গম ঊর্ধ্বে উঠেছ সমুচ্চ মহিমায়,
যাত্রী তুমি, যেথা প্রসারিত তব দৃষ্টির সীমায়
সাধনা-শিখরশ্রেণী ; যেথায় গহন গুহা হ'তে
সমুদ্রবাহিনী বার্তা চলেছে প্রস্তরভেদী স্রোতে
নব নব তীর্থ সৃষ্টি করি, যেথা মায়া-কুহেলিকা
ভেদি উঠে মুক্তদৃষ্টি তুঙ্গশৃঙ্গ, পড়ে তাহা লিখা
প্রভাতের তমোজয়-লিপি ; যেথায় নক্ষত্রলোকে
দেখা দেয় মহাকাল আবর্তিয়া আলোকে আলোকে
বহ্নিমণ্ডলের জপমালা ; যেথায় উদয়াচলে
আদিত্যবরণ যিনি, মর্ত্যধরণীর দিগঞ্চলে
অনাবৃত করি দেন অমর্ত্যরাজ্যের জাগরণ,
তপস্বীর কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্ছ্বসিয়া— শুন বিশ্বজন,
শুন অমৃতের পুত্র, হেরিলাম মহান্ত পুরুষ
তমিস্রের পার হ'তে তেজোময়, যেথায় মানুষ
শুনে দৈববাণী। সহসা পায় সে দৃষ্টি দীপ্তিমান,
দিক্‌সীমা প্রান্তে পায় অসীমের নূতন সন্ধান।
বরেণ্য অতিথি তুমি বিশ্বমানবের তপোবনে,
সত্যদ্রষ্টা, যেথা যুগ-যুগান্তরে ধ্যানের গগনে
গূঢ় হ'তে উদ্বারিত জ্যোতিষ্কের সম্মিলন ঘটে,
যেথায় অঙ্কিত হয় বর্ণে বর্ণে কল্পনার পটে
নিত্য সুন্দরের আমন্ত্রণ। সেথাকার শুভ্র আলো
বরমাল্যরূপে তব সমুদার ললাটে জড়ালো
বাণীর দক্ষিণ পাণি

মোরে তুমি জানো বন্ধু বলি ;
আমি কবি আনিলাম ভরি মোর ছন্দের অঞ্জলি
স্বদেশের আশীর্বাদ, বিদায়কালের অর্ঘ্য মোর
বাহুতে বাঁধিনু তব সপ্রেম শ্রদ্ধার রাখীডোর।

১ ডিসেম্বর ১৯৩৫

পত্রালাপ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর · ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রিয়বন্ধুবরেষু

আপনার চিঠিখানি পড়ে আনন্দিত হলুম। শারীরিক দুর্বলতাবশত কলকাতায় আপনার সম্বর্ধনার দিনে আমার উপস্থিত থাকা অসম্ভব ছিল তাই কবিতায় আপনার অভিনন্দন রচনা করে অনুপস্থিতির শূন্যতা পূর্ণ করবার চেষ্টা করেছি। ভালোই হোলো, আপনার স্মরণ ঘোষণার মধ্যে ওটা রয়ে গেল।

আমি সম্ভবত আগামী মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলকাতায় যাব। সেই সময়ে আপনার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করব। ইতি ২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রদ্ধাস্পদেষু, Dated 22. 2. 1936

আজ কয়েকদিন হইল আমি মনে করিতেছি যে আপনাকে চিঠি লিখিয়া আপনার প্রতি আমার হৃদয়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিব। কিন্তু আমি এক্ষণে অন্ধ ও পঙ্গু; তাহা ছাড়া কিছুদিন হইল আমার পাঠক বা লেখক (Reader) কেহই ছিল না। সুতরাং আমাকে মূক ও বধির থাকিতে হইয়াছিল। আমি যে হৃদয়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে পারি নাই ইহার জন্য আমি অতিশয় ক্ষুণ্ণ আছি।

কিছুদিন হইল আমার মনে একটি আশা জাগরূক রহিয়াছে তাহা আপনার সহিত আর একবার সাক্ষাৎ করা ও আপনাকে আমার হৃদয়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধা উপহার দান করা।

অনেকদিন প্রশান্ত[১] এখানে আসে নাই সুতরাং তাহার সাহায্য লইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশাও চরিতার্থ করিতে পারি নাই। প্রশান্ত এখন Presidency Collegeএর Offg. Principal ও তজ্জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত। এবার যখন আপনি কলিকাতায় আসিবেন আমি প্রশান্তকে সঙ্গে লইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

আপনি জয়ন্তী উপলক্ষে যে প্রীতি সম্ভাষণ পাঠাইয়াছিলেন তাহা আমাকে পড়িয়া শুনান হইয়াছে। আপনার এই প্রীতি উপহার আমাকে সঞ্জীবিত করিয়াছে। আপনাকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি না কারণ প্রীতির ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতার স্থান নাই তবে অশ্রুনিষিক্ত প্রীতি ও হৃদয়ের অকিঞ্চনতা জ্ঞাপন করিতেছি। আমার একটি আশা চিরদিন হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে লুক্কায়িত ছিল যে, আপনার গদ্য, পদ্য ও নাট্যাবলীর একটি আদর্শ সঞ্চয়ন করিব যাহাতে রচনাগুলি এরূপভাবে সজ্জিত হয় যে এই কাব্য-সমষ্টি একটি অদ্ভুত মহাকাব্য বলিয়া চিরদিন চিহ্নিত থাকে। শ্রেষ্ঠ কবির আত্মবিকাশই সর্বাপেক্ষা তাহার

---

১ শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

মহতী সৃষ্টি, কিন্তু বিধির বিধানে আমি বুঝিলাম যে আমি অনন্তকালের উপাসক হইলেও কাল আমাকে উপহাস করিয়াছে। কিন্তু আমি যাহা পারিলাম না অপরে তাহা পারিবে এই আশা আমি রাখি। ইতি

আপনার

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল

Cambridge
29th May 1914

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আমি দেশের জন্য রওয়ানা হইব। এখানে এখনও আমি Rothensteinএর সহিত সাক্ষাৎ করিতে সুযোগ পাই নাই। শীঘ্রই তাঁহার Country residenceএ যাইয়া সাক্ষাৎ করিব।

এবার জাহাজে Mr. Thompsonএর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল। বসন্ত-প্রয়াণের[১] সম্বন্ধে কথা হইলে, তিনি আমার সহিত প্রথম পরিচ্ছেদটী পাঠ করেন, ও অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে ইংরাজি অনুবাদ করিতে সম্মত হন। Marseillesএ পঁহুছিবার মধ্যে প্রথম অংশের একরকম rough translation হইয়া যায়। বিলাতে এ কাজটা অগ্রসর হইবে না ভাবিয়া আপনাকে অনুবাদের বিষয় জানাই নাই। কিন্তু Thompson সাহেব সেই প্রথম অংশের অনুবাদটা revise করিয়া Macmillanদের কাছে দিয়া আসেন। তাহার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের অনুবাদ এক রকম শেষ হইয়াছে, ও Thompson সাহেবের অনুরোধে আমি Macmillanদের নিকট পাঠাইয়াছি।

Thompson সাহেব Macmillanএর নিকট আপনার ভূমিকার কথা বলিতে তাঁহারা সেই ভূমিকাটি দেখিতে চান।

আমি Macmillanদের লিখিয়াছি যে ভূমিকাটি অত্যন্ত উপাদেয়। ভূমিকাতে গ্রন্থ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও লিখিয়াছি। কিন্তু জানাইয়াছি যে আপনার অনুমতি বিনা সে ভূমিকার translation ছাপাইতে চাহি না। English translationটা ভূমিকা ছাড়া Macmillan ছাপাইতে সম্মত হইবে কি না বিশেষ সন্দেহের বিষয়।

Macmillanএর কাছে এইরূপে প্রথমে উপস্থিত হইতে আমার ইচ্ছা ছিল না এখনও Rothenstein দেখেন নাই, ও তাঁহার পরামর্শ না লইয়া কিছুই করিব না।

আপনার ভূমিকাটি এখনও অনুবাদ করি নাই। কলিকাতায় যাইয়া ভূমিকার English translation ছাপা সম্বন্ধে আপনার মত জিজ্ঞাসা করিব। এখন সে বিষয় কিছুই স্থির করিবার আবশ্যক নাই। আমার নিজের মনের ভাব এই যে ভূমিকাটি আপনার যে মহত্ত্ব দেখাইতেছে, তাহা সাহিত্যিকদের মধ্যে অতুলনীয়। শুধু তাহা নয়। একজন জ্ঞানী ও বিবেচক ব্যক্তি (Professor of Philosophy) ভূমিকাটি পড়িয়া বলিয়াছিলেন—"এই ভূমিকা পড়িয়া রবিবাবুকে worship করিতে হয়। এ ভূমিকাটি রবিবাবুর সাধনার পরিচয় দেয়। এমন একটা noble dignified calm আত্মপরিচয়— which irresistably draws one's homage."

আমারও এই feeling ; কিন্তু এ বিষয়ে পরে আপনার সহিত আলোচনা করিব। আবশ্যক হইলে English translationএ কোন কোন অংশ ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে।

---

১ ব্রজেন্দ্রনাথের কন্যা সরযূবালা দাশগুপ্তা লিখিত কাব্যগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ বইটির ভূমিকা লেখেন।

Cambridge

29th May 1914

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

অল্পকালের দিনের মধ্যেই আমি দেশের জন্য রওয়ানা হইব। এখানে এখন ও আমি Rothenstein এর সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ পাই নাই। শীঘ্রই তাঁহার Country residence এ যাইয়া সাক্ষাৎ করিব।

এবার জাহাজে Mr. Thompson এর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল। বসন্ত-প্রভাতের সম্বন্ধে কথা হইলে, তিনি আমার সহিত প্রথম পরিচ্ছেদটা পাঠ করেন, ও অতঃপর আমার সহকারে ইংরাজি অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। Marseilles এ পৌঁছিবার মধ্যে প্রথম অংশের একরকম rough translation হইয়া যায়। কিন্তু আমি এ কথা যে অনুমান হবে না তাঁহার অনেককে অনুবাদের কিছু দরকার নাই। কিন্তু Thompson সাহেব সেই প্রথম অংশের অনুবাদ revise করিয়া Macmillan কে আবার দিয়া আসেন, তাহার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের অনুবাদ একরকম শেষ হইয়াছে, ও Thompson সাহেবের

বিবেচক ব্যক্তি (Professor of Philosophy) ও মিসার্স
দাসের অভিমত — "এই ভারতীয় কবিকে
রবি বাবুকে worship করতে হয়। এ ভারতীয়দের
রবিবাবুর সম্বন্ধে পরিচয় দেয়। — এমন একটা
noble dignified calm ব্যক্তিত্ব, — which
irresistibly draws one's homage".

আমারও ঐ feeling; কিন্তু এ বিষয়
পরে আপনার সহিত আলোচনা করব। আপাতত
এইটে English translation এ কোন কোন অংশ
বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

Gitanjali সম্বন্ধে এখানে যত
আলোচনা হয়, তাতে দেখি কেবল আপনাকে
একজন mystic বলিয়া ধরে। আমি এটা পছন্দ
করি না। আমার mysticism বোধ যদি একেবারে
থাকিত, তাহলে ও বুঝিতাম আপনার একটা
দিক অন্তত: বুঝিয়াছি কিন্তু তাহাও নহে।
আর art, poetry, interpretation of life দিক আছে
লোককে আপনাকে বুঝাতে দেখে ইহারই ইহা আছে।
আমি সেই জন্য বলি যে আপনার Poetry, Drama
novels and stories এর মধ্যে Gitanjali আপনার
শ্রেষ্ঠ জিনিস নয় (from the point of view of Art
as the representation of life). যে সমালোচ
উপরে, Gitanjali কীর্তনের একটা মহিমার
দিক দেখাইয়াছেন — অথচ তাহা উপরে বাই-

কিন্তু আপনাকে কেবল গীতাঞ্জলির ভিতর দিয়া
দেখিলে আপনাকে খাটো করা হয়। আর আমাদের
শ্রেষ্ঠ কবিদের হইতেও তিনি কাব্যে শ্রেষ্ঠতর;
উঁহাকে mystic বলিয়া literary art বা আর্ট-
হইতে একেবারে বাদ দিলে অবিচার হয়, উহা
mysticism এর নামেই হউক আর
বাইবেলের নামেই হউক, আর Psalmist এর
সহিত একাসনে বসাইয়াই হউক। Mr Yeats
and Miss Underhill এ বিষয়ে কিছু দোষ
ভুল করিয়াছেন।

আপনার শরীর তত ভাল নয় -
এখানে ও India (Bengal) students বা
অনেকের ও তাই। সকলেই আপনার
সুস্বাস্থ্য কামনা করে। ঈশ্বর করি
আর কাল দেশে ফেরেন ও সকলের
হাত হইতে অব্যাহতি পাইবেন।

প্রণত
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

Gitanjali সম্বন্ধে এখানে যতই আলোচনা করি, ততই দেখি কেবল আপনাকে এরা mystic বলিয়া জানে। আমি এটা পছন্দ করি না। আদত mysticism বোধ যদি এদের থাকিত, তা হলেও বুঝিতাম আপনার একটা দিক অন্ততঃ বুঝিয়াছে। কিন্তু তাহাও নহে। আর art, poetry, interpretation of life হিসাবে লোকে আপনাকে বুঝিতে শেখে ইহাই ইচ্ছা করি। আমি সেইজন্য বলি যে আপনার Poetry, Drama, novel and storiesএর মধ্যে Gitanjali অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ জিনিষ আছে (from the point of view of Art as the representation of life). সে সকলের তুলনায় Gitanjali জীবনের একটা রহস্যের দিক দেখাইয়াছে— অবশ্য তাহার তুলনা নাই— কিন্তু আপনাকে কেবল গীতাঞ্জলির ভিতর দিয়া দেখিলে আপনাকে ছোট করা হয়। আজকালকার শ্রেষ্ঠ কবিদের হইতেও যিনি কাব্যে শ্রেষ্ঠতর, তাঁহাকে mystic বলিয়া literary art বা কাব্য হইতে এক পাশে রাখিলে অবিচার হয়, তাহা mysticismএর নামেই হউক আর সাধনের নামেই হউক আর Psalmistএর সহিত একাসনে বসাইয়াই হউক। Mr. Yeats and Miss Underhill এ বিষয়ে কিয়দংশে ভুল করিয়াছেন।

আপনার শরীর তত ভাল নয়— এখানেও Indian (Bengali) Studentsরা খপর লয় ও রাখে। সকলেই আপনার স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করে। ভরসা করি আজকাল দেশে গোলযোগ ও অশান্তির হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন।

প্রণত

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল

25 Rammohan Shaw Lane,
Duff Street,
1st March 1918

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

কাল সন্ধ্যাবেলা একটী কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। University Commission আমার Replyটা private রাখিতে বলিয়াছেন। Newspaperএ কিম্বা অন্য রকমে publish করিতে বারণ করিয়াছেন। Replyটা যে confidential এই কথাটি আমি কাল বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

আজ সকালে কাগজে দেখিলাম "Sir Rabindranath declines the Presidentship"। ভালই হইয়াছে।

বশম্বদ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল

মহীশূর
১২ই ডিসেম্বর ১৯২১ খৃঃ

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইল— তজ্জন্য অপরাধী। এখানে First Member of Council (Education Member) ও অপরাপর কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তির সহিত দেখা করিতে হইয়াছিল— সকলেই আয় ব্যয়— সংকুলনের চিন্তায় ব্যস্ত— আর্থিক অনাটন এত বেশী যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আসল খরচই অসম্ভব

ভাবে কমাইতে হইয়াছে— আর Extension Lectures বাবদে যে টাকা ছিল তাহা নির্ম্মমভাবে ছাঁটিয়া ফেলা হইয়াছে— এখন আমরা অচলায়তনে আছি কি পলাতকায়— ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই— সে অবস্থার কথা দেখা হইলে বলিব। সেটা দশ অবস্থার বাহিরে— একাদশ— শেষে হিন্দুবিধবার একাদশীতে গিয়া না দাঁড়ায়। আমার এক বৎসরের অভিজ্ঞতায় যাহা লাভ হইয়াছে, তাহা শুনিলে আপনি কি ভাবিবেন বলিতে পারি না।

আমি শীঘ্রই কলিকাতায় পঁহুছিব। Prof. Sylvain Leviর সহিত সম্ভবতঃ কলিকাতায় দেখা হইবে। আপনিও হয়ত এবার বড়দিনের সময় কলিকাতায় থাকিবেন— তবে দূর হইতে ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না— যাহা হউক যদি কলিকাতায় দেখা হয় ভালই। না হইলে আপনি যেখানে থাকেন, সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইব। অনেক কথা বলিবার আছে ও শুনিবার আছে— এবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া ফিরিতেছি না।

দেশের অবস্থার কথা— গিয়া শুনিব। দূর প্রবাসে হয়ত ভুল ধারণা জন্মিয়াছে।

Prof. Sylvain Leviকে আমার ভক্তিপূর্ণ নমস্কার জানাইবেন।

আপনার

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল

Mysore

5th January 1936

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

যে দিন আমি কলিকাতা হইতে রওয়ানা হই তাহার পূর্ব্বরাত্রে কালিদাস আমাকে জানাইল যে আপনি বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন ও কর্ণের বেদনা হইতে কষ্ট পাইতেছেন। আমি ভাবিলাম যে এরূপ অবস্থায় বোধ হয় আপনার মহীশূরে আসা স্থগিত হইতে পারে।

এখানে আসিয়া মহারাজার গতিবিধির খপর লইলাম। প্রাইভেট সেক্রেটারি মির্জা সাহেব বলিলেন যে মহারাজার মার্চমাস পর্যন্ত কোথায় অবস্থান করিবেন কিছুই ঠিক নাই। হইলও তাহাই। বেশীদিন কোথাও থাকেন নাই, শেষে ডিসেম্বর মাসে তিনি উত্তর ভারতে নানা স্থানে পর্য্যটনে বাহির হইলেন। তাহার মাতা Dowaga Maharani ও পরিবার পরিজন সঙ্গে গিয়াছেন। তাঁহারা বোম্বে বেনারস হয়ত বা কলিকাতাও যাইবেন। ও আবার মার্চমাসে বোধ হয় ফিরিয়া আসিবেন। মির্জা সাহেব বলিলেন যে মার্চের শেষে কিম্বা এপ্রিলের প্রারম্ভে কিছুদিনের নিমিত্ত (বোধ হয় দুই সপ্তাহ) এখানে থাকিয়া পরে Ooty যাত্রা করিবেন। আপনার সেই সময়ে মহীশূরে আসার সুবিধা হইবে কি ?

Philosophical Congressএ আপনার Presidential Address— পড়িলাম অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে— এই রাষ্ট্রীয় হুজুগের দিনে এরূপ রসসামগ্রী দুর্লভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের রেজিষ্ট্রার সুব্রহ্মণ্য আয়ার মহাশয় আমায় বলিলেন যে চীন হইতে আপনার পুনরায় নিমন্ত্রণ আসিয়াছে ও আপনি শীঘ্রই চীন দেশে রওয়ানা হইতেছেন। ইহা কি সত্য ? চীনের সহিত একটা পাকাপাকি সম্বন্ধ ভারত ও চীন উভয় দেশের পক্ষেই সুমঙ্গল,— আর আপনার দ্বারাই সেই সম্বন্ধ গ্রথিত হইতে পারে।

এবার Modern Reviewতে দেখিলাম যে আমাদের বন্ধু Thompson সাহেব তাঁহার একখানি নূতন গ্রন্থে ("The Other Side of the Medal") লিখিয়াছেন, "the most widely read of these monthlies (i.e., Indian monthlies— meaning the Modern Review) has always seemed to me a study in steady conscienceless misrepresentation" ব্যাপারখানা কি— আমি কিছুই বুঝিলাম না।

Thompson সাহেবের চিঠিপত্র অনেক দিন হইতেই পাই না— দোষ অবশ্য আমারই— অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সহিত পত্রালাপ কোনকালেই আমার সন্তোষজনক হয় না— সুতরাং Thompson সাহেবের এতটা চটিবার কারণ কি অবগত নই।

Mussolinির যে চিঠি Modern Reviewএ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে বুঝিলাম যে চীনদেশের মতো ইটালিদেশও আপনাকে আকর্ষণ করিতেছে। তবে সমসাময়িক ইটালি হইতে চীনের টান— অন্ততঃ চীনের দাবী— বোধ হয় বেশী।

আশা করি আপনার কর্ণবেদনার উপশম হইয়াছে। ও আজকাল আপনার শরীর সুস্থ ও সবল হইয়াছে। ভারতে থাকিয়া আপনাকে East ও West এই দুই hemisphereএরই দায় আপনাকে ঠেকাইতে হইতেছে। ইহাতে শরীর ভাঙ্গিলেও শরীরের অপরাধ নাই— কিন্তু আনন্দের বিষয় মন আপনার অটুট রহিয়াছে।

পত্রোত্তরের অপেক্ষায় রহিলাম।

আপনার
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল

বাঙ্গালোর
১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বর্গপ্রয়াণের[১] পর আপনাকে অবান্তর বিষয়ে পত্রলিখিতে কুন্ঠিত ছিলাম। আমি চিরকালই বাহ্যপ্রক্রিয়ায় অনিচ্ছুক, সুতরাং শোকপ্রকাশ করিয়া লিখি নাই। ঋষিবরের দৃশ্যজগৎ হইতে অন্তর্ধান মুহ্যমান শোকের বিষয়ও নহে। তিনি অন্তর্জগতে চির উদিত হইলেন, সেখানে আর অস্তগমন নাই। তিনি এই মানব যাত্রায় পথপ্রদর্শক হইয়া আমাদের সাথে সাথে মহাপ্রয়াণে চলিবেন। আর হারাইবার নয়।

মহীশূরের মহারাজা এতদিনে বোধহয় কলিকাতায় পঁহুছিয়াছেন। সুতরাং আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবার আর কোন বাধা নাই।

এখানে এমন কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত ও রাষ্ট্রীয় বন্দোবস্ত আবশ্যক হইয়াছে যে এ বৎসর গ্রীষ্মের সময় আমার মহীশূর ছাড়িবার কোন সুযোগ নাই। এই পাঁচ বৎসর ধরিয়া যে University Reorganisation নানা বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও খাড়া করিয়াছি, তাহার জন্য Executive Council, Legislative Council ও Representative Assemblyতে Budget estimates মঞ্জুর করাইবার

---

১ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মৃত্যু : ১৯ জানুয়ারি ১৯২৬

জন্য আমাকে March মাস হইতে August পর্য্যন্ত নিত্য সংগ্রাম করিতে হইবে। সেই সংগ্রামে যদি জয়ী হই, তাহা হইলেই আমার মহীশূর আগমন সার্থক,— না হইলে আমার গত পাঁচ বৎসরের শ্রম উদ্যম চেষ্টা সকলই ব্যর্থ। দক্ষিণভারতে দলাদলির বিকার অত্যন্ত প্রবল— উন্মাদ বলিলেই হয়। University শিক্ষার প্রসার ও কতকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ দলের অনভিপ্রেত— তা ছাড়া স্বার্থ ও জ্ঞানান্ধতা ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার বৈরী।

একটা সংগ্রামের ব্যাপার এখন আমার পৃষ্ঠভঙ্গ দিলে চলিবে না। তবে মহারাজার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইলে ভালই। University সংক্রান্ত বিষয়গুলি মিটিলে আমার ভারতসম্বন্ধে কর্তব্য পালনের জন্য ইউরোপ যাত্রার বিষয় আপনার মত জানাইলে বোধ হয় সকল দিক বজায় থাকিতে পারে।

ঢাকায় আপনি Philosophy of Art সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার একটি summary কাগজে পড়িলাম। কি ভাবের সম্পদে কি ভাষার মহিমায় ইহা অমর— itself an imperishable movement of art!

আপনার
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল

রবীন্দ্রনাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথের অপর দুটি পত্র দ্রষ্টব্য : বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ১৪ সংখ্যা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল　　　　শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা-উৎসবে সভাপতি ব্রজেন্দ্রনাথ

ডিসেম্বর ১৯২১

PURE Art is sincere and disinterested no less than the 'Will to Good,' but in appraising either or in laying down the norm, it would be 'pathological' to appeal to any emotion other than the emotion of contemplating the beautiful or the good. No doubt, all emotions are proper plastic stuff for constructions in aesthetics as well as ethics ; but as building material, experience in all its forms is intrinsically valuable,— ideation, imagination, instinct, no less than emotion. But none of these enter into the norm.

What does enter into the norm and test of Poetry is not emotional 'exaltation,' imaginative 'transfiguration' or disinterested 'criticism,' but in and through them all, the creation of a Personality with an individual scheme of life, an individual outlook on the universe.

Judged by the above criterion, Tagore's poetic achievement is characteristically complete. His early poems are an exercise in emotional 'exaltation.' To this he soon added the art of imaginative 'transfiguration' (as in Urvasi). In his maturer achievement, he developed the criticism of life without sacrificeing either exaltation or transfiguration. Finally in his consummate later art, he was summed up all these elements and achieved the supreme mastery,— the creation of a Personality with an individual scheme of life, an individual outlook on the Universe.

BRAJENDRANATH SEAL.

Bombay.

(Golden Book of Tagore, 1931)

বিশ্বভারতী

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

এই আশ্রমের গুরুর অনুজ্ঞায় ও আপনাদের অনুমতিতে আমাকে যে সভাপতির ভার দেওয়া হল তাহা আমি শিরোধার্য করে নিচ্ছি। আমি এ ভারের সম্পূর্ণ অযোগ্য। কিন্তু আজকের এই প্রতিষ্ঠান বিপুল ও বহুযুগব্যাপী। তাই ব্যক্তিগত বিনয় পরিহার করে আমি এই অনুষ্ঠানে ব্রতী হলাম। বহু বৎসর ধরে এই আশ্রমে একটা শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এই ধরনের এডুকেশনাল এক্‌স্‌পেরিমেন্ট্‌ দেশে খুব বিরল। এই দেশ তো আশ্রম-সংঘ-বিহারের দেশ। কোথাও কোথাও 'গুরুকুল'এর মতো দু-একটা এমনি বিদ্যালয় থাকলেও এটি এক নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত। এর স্থান আর কিছুতে পূর্ণ হতে পারে না। এখানে খোলা আকাশের নীচে প্রকৃতির ক্রোড়ে মেঘরৌদ্রবৃষ্টিবাতাসে বালকবালিকারা লালিতপালিত হচ্ছে। এখানে শুধু বহিরঙ্গ-প্রকৃতির আবির্ভাব নয়, কলাসৃষ্টির দ্বারা অন্তরঙ্গপ্রকৃতিও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় জেগে উঠেছে। এখানকার বালক-বালিকারা এক-পরিবার-ভুক্ত হয়ে আচার্যদের মধ্যে রয়েছে। একজন বিশ্বপ্রাণ পার্সনালিটি এখানে সর্বদাই এর মধ্যে জাগ্রত রয়েছেন। এমনিভাবে এই বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। আজ সেই ভিত্তির প্রসার ও পূর্ণাঙ্গতা সাধন হতে চলল। আজ এখানে বিশ্বভারতীর অভ্যুদয়ের দিন। 'বিশ্বভারতী'র কোষানুযায়িক অর্থের দ্বারা আমরা বুঝি যে, যে 'ভারতী' এতদিন অলক্ষিত হয়ে কাজ করছিলেন আজ তিনি প্রকট হলেন। কিন্তু এর মধ্যে আর-একটি ধ্বনিগত অর্থও আছে— বিশ্ব ভারতের কাছে এসে পৌঁছবে, সেই বিশ্বকে ভারতীয় করে নিয়ে আমাদের রক্তরাগে অনুরঞ্জিত ক'রে ভারতের মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত ক'রে আবার সেই প্রাণকে বিশ্বের কাছে উপস্থিত করব। সেই ভাবেই বিশ্বভারতীর নামের সার্থকতা আছে।

একটা কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে— ভারতের মহাপ্রাণ কোন্‌টা। যে মহাপ্রাণ লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে তাকে ধরতে গিয়ে আমরা যদি বিশ্বের সঙ্গে কারবার স্থাপন ও আদানপ্রদান না করি তবে আমাদের আত্মপরিচয় হবে না। Each can realize himself only by helping others as a whole to realize themselves এ যেমন সত্য, এর converse অর্থাৎ others can realize themselves by helping each individual to realize himselfও তেমনি সত্য। অপরে আমার লক্ষ্যে পথে, যাবার পথে, যেমন মধ্যবর্তী, তেমনি আমিও তার মধ্যবর্তী; কারণ আমাদের উভয়কে যেখানে ব্রহ্ম বেষ্টন করে আছেন সেখানে আমরা এক, একটি মহা ঐক্যে অন্তরঙ্গ হয়ে আছি। এ ভাবে দেখতে গেলে বিশ্বভারতীতে ভারতের প্রাণ কী তার পরিচয় পেতে হবে, তাতে করে জগতের যে পরিচয় ঘটবে তার রূপে আত্মাকে প্রতিফলিত দেখতে পাব।

আমি আজ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। আজ জগৎ জুড়ে একটি সমস্যা রয়েছে। সর্বত্রই একটা বিদ্রোহের ভাব দেখা যাচ্ছে— সে বিদ্রোহ প্রাচীন সভ্যতা, সমাজতন্ত্র, বিদ্যাবুদ্ধি, অনুষ্ঠান, সকলের বিরুদ্ধে। আমাদের আশ্রম দেবালয় প্রভৃতি যা-কিছু হয়েছিল তা যেন সব ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। বিদ্রোহের অনল জ্বলছে, তা অর্ডার-প্রগ্রেস'কে মানে না, রিফর্ম চায় না, কিছুই চায় না। যে মহাযুদ্ধ হয়ে গেল এই

বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে তার চেয়ে বড়ো যুদ্ধ চলে আসছে, গত মহাযুদ্ধ তারই একটা প্রকাশ মাত্র। এই সমস্যার পূরণ কেমন করে হবে, শান্তি কোথায় পাওয়া যাবে, সকল জাতিই এর উত্তর দেবার অধিকারী। এই সমস্যায় ভারতের কী বলবার আছে, দেবার আছে?

আমরা এত কালের ধ্যানধারণা থেকে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তার দ্বারা এই সমস্যা পূরণ করবার কিছু আছে কি না। য়ুরোপে এ সম্বন্ধে যে চেষ্টা হচ্ছে সেটা পোলিটিকাল অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশনের দিক দিয়ে হয়েছে। সেখানে রাজনৈতিক ভিত্তির উপর ট্রীটি, কন্‌ভেন্‌শন, প্যাক্ট্-এর ভিতর দিয়ে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা হচ্ছে। এ হবে এবং হবার দরকারও আছে। দেখছি সেখানে মাল্‌টিপ্‌ল্ অ্যালায়েন্‌স্ হয়েও হল না, বিরোধ ঘটল। আর্‌বিট্রেশন কোর্ট্ এবং হেগ-কন্‌ফারেন্সে হল না, শেষে লীগ অব নেশন্‌স্-এ গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। তার অবলম্বন হচ্ছে limitation of armaments। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, এ ছাড়া আরও অন্য দিকে চেষ্টা করতে হবে; কেবল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক দিকে এর চেষ্টা হওয়া দরকার। Universal simultaneous disarmament of all nations-এর জন্য নূতন হিউম্যানিজমের রিলিজ্যস মুভ্‌মেন্‌ট্ হওয়া উচিত। তার ফলস্বরূপ যে মেশিনারি হবে তা পার্লামেন্‌ট্ বা ক্যাবিনেটের ডিপ্লোম্যাসির অধীনে থাকবে না। পার্লামেন্‌ট্‌সমূহের জয়েন্‌ট্ সিটিং তো হবেই, সেইসঙ্গে বিভিন্ন peopleএরও কন্‌ফারেন্‌স্ হলে তবেই শান্তির প্রতিষ্ঠা হতে পারে। কিন্তু একটা জিনিস আবশ্যক হবে— massএর life, massএর religion। বর্তমান কালে কেবলমাত্র individual salvatian-এ চলবে না; সর্বমুক্তিতেই এখন মুক্তি, না হলে মুক্তি নেই। ধর্মের এই mass life-এর দিকটা সমাজে স্থাপন করতে হবে।

ভারতের এ সম্বন্ধে কী বাণী হবে। ভারতও শান্তির অনুধাবন করেছে, চীনদেশও করেছে। চীনে সামাজিক দিক দিয়ে তার চেষ্টা হয়েছে। যদি social fellowship of man with man হয়, তবেই internationalএ peace হবে, নয়তো হবে না। কন্‌ফ্যুসিয়সের গোড়ার কথাই এই যে, সমাজ একটা পরিবার শান্তি সামাজিক ফেলোশিপের উপর স্থাপিত; সমাজে যদি শান্তি হয় তবেই বাইরে শান্তি হতে পারে। ভারতবর্ষে এর আর-একটা ভিত্তি দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে অহিংসা মৈত্রী শান্তি। প্রত্যেক individualএ বিশ্বরূপদর্শন এবং তারই ভিতর ব্রহ্মের ঐক্যকে অনুভব করা; এই ভাবের মধ্যে যে peace আছে ভারতবর্ষ তাকেই চেয়েছে। ব্রহ্মের ভিত্তিতে আত্মাকে স্থাপন করে যে peace compact হবে তাতেই শান্তি আনবে। এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় চীনদেশের সোশ্যাল ফেলোশিপ এবং ভারতের আত্মার শান্তি এই দুইই চাই, নতুবা লীগ অব নেশন্‌স্-এ কিছু হবে না। গ্রেট ওঅরের থেকেও বিশালতর যে দ্বন্দ্ব জগৎ জুড়ে চলছে, তার জন্য ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে বিশ্বভারতীকে বাণী দিতে হবে।

ভারতবর্ষ দেখেছে যে, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে যে state আছে তা কিছু নয়। সে বলেছে যে, নেশনের বাইরেও মহা সত্য আছে, সনাতন ধর্মেই তার স্বাজাত্য রয়েছে। যেখানে আত্মার বিকাশ ও ব্রহ্মের আবির্ভাব সেখানেই তাহার দেশ। ভারতবর্ষ ধর্মের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই extra-territorial nationalityতে বিশ্বাস করেছে। এই ভাবের অনুসরণ করে লীগ অব নেশন্‌সের ন্যাশনালিটির ধারণাকে সংশোধিত করতে হবে। তেমনি আত্মার দিক দিয়ে extra-territorial sovereigntyর ভাবকে স্থান দিতে হবে। এমনিভাবে Federation of the World স্থাপিত হতে পারে, এখনকার সময়ের

উপযোগী করে লীগ অব নেশন্‌সে এই extra-territorial nationalityর কথা উত্থাপন করা যেতে পারে। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দিক দিয়ে এই বাণী দেবার আছে। আমরা দেখতে পাই যে, বৌদ্ধ প্রচারকগণ এই ভাবটি প্রচার করেছিলেন যে, প্রত্যেক রাজার code এমন হওয়া উচিত যা শুধু নিজের জাতির নয়, অপর সব জাতির সমানভাবে হিতসাধন করতে পারবে। ভারতের ইতিহাসে এই বিধিটি সর্বদা রক্ষিত হয়েছে, তার রাজারা জয়ে পরাজয়ে, রাজচক্রবর্তী হয়েও, এমনি করে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধকে স্বীকার করেছেন।

সামাজিক জীবন সম্বন্ধে ভারতবর্ষের মেসেজ কী। আমাদের এখানে গ্রুপ ও কম্যুনিটির স্থান খুব বেশি। এরা intermediary body between state and individual। রোম প্রভৃতি দেশে রাষ্ট্রব্যবস্থার ফলে স্টেট ও ইন্‌ডিভিজুয়ালে বিরোধ বেধেছিল ; শেষে ইন্‌ডিভিজুয়ালিজমের পরিণতি হল অ্যানার্কিতে, এবং স্টেট— মিলিটারি সোশ্যালিজ্‌মে গিয়ে দাঁড়ালো। আমাদের দেশের ইতিহাসে গ্রামে বর্ণাশ্রমে এবং ধর্মসংঘের ভিতরে কম্যুনিটির জীবনকেই দেখতে পাই। বর্ণাশ্রমে যেমন প্রতি ব্যক্তির কিছু প্রাপ্য ছিল, তেমনি তার কিছু দেয়ও ছিল, তাকে কতকগুলি নির্ধারিত কর্তব্য পালন করতে হত। Community in the individual যেমন আছে তেমনি the individual in the communityও আছে। প্রত্যেকের ব্যক্তিজীবনে গ্রুপ পার্সনালিটি এবং ইন্‌ডিভিজুয়াল পার্সনালিটি জাগ্রত আছে, এই উভয়েরই সমান প্রয়োজন আছে। গ্রুপ পার্সনালিটির ভিতর ইন্‌ডিভিজুয়ালের স্বাধিকারকে স্থান দেওয়া দরকার। আমাদের দেশে ত্রুটি রয়ে গেছে যে, আমাদের ইন্‌ডিভিজুয়াল পার্সনালিটির বিকাশ হয় নি, co-ordination of power in the stateও হয় নি। আমরা ইন্‌ডিভিজুয়াল পার্সনালিটির দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, ব্যূহবদ্ধ শত্রুর হাতে আমাদের লাঞ্ছিত হতে হয়েছে।

আজকাল য়ুরোপে group principleএর দরকার হচ্ছে। সেখানে political organiza'ion, economic organization, এসবই group গঠন করার দিকে যাচ্ছে। আমাদেরও এই পথে সমস্যাপূরণ করবার আছে। আমাদের যেমন য়ুরোপের কাছ থেকে স্টেটের centralization ও organization নেবার আছে তেমনি য়ুরোপকেও group principle দেবার আছে। আমরা সে দেশ থেকে economic organizationকে গ্রহণ করে আমাদের village communityকে গড়ে তুলব। কৃষিই আমাদের জীবন-যাত্রার প্রধান অবলম্বন, সুতরাং ruralizationএর দিকে আমাদের চেষ্টাকে নিয়োগ করতে হবে। অবশ্য আমি সেজন্য বলছি না যে, town lifeকে develop করতে হবে না ; তারও প্রয়োজন আছে কিন্তু আমাদের ভূমির সঙ্গে প্রাণের যোগ-সাধন করতে হবে। ভূমির সঙ্গে owner-shipএর সম্বন্ধ হলে তবে স্বাধীনতা থাকতে পারে। কারখানার জীবনও দরকার আছে, কিন্তু ভূমি ও বাস্তুর সঙ্গে individual ownershipএর যোগকে ছেড়ে না দিয়ে large-scale production আনতে হবে। বড়ো আকারে energyকে আনতে হবে, কিন্তু দেখতে হবে— কলের energy মানুষের আত্মাকে পীড়িত অভিভূত না করে, যেন জড় না করে দেয়। সমবায়প্রণালীর দ্বারা হাতের কলকেও দেশে স্থান দিতে হবে। এমনিভাবে economic organizationএ ভারতকে আত্মপরিচয় দিতে হবে। আমাদের স্ট্যাণ্ডার্ড্‌ অব লাইফ এত নিম্ন স্তরে আছে যে, আমরা decadent হয়ে মরতে বসেছি। যে প্রণালীতে efficient organizationএর নির্দেশ করলাম তাকে না ছেড়ে বিজ্ঞানকে আমাদের

প্রয়োজনসাধনে লাগাতে হবে। আমাদের বিশ্বভারতীতে তাই, রাষ্ট্রনীতি সমাজধর্ম ও অর্থনীতির যে যে ইন্‌স্টিট্যুশন পৃথিবীতে আছে, সে-সবকেই স্টডি করতে হবে, এবং আমাদের দৈন্য কেন ও কোথায় তা বুঝে নিয়ে আমাদের অভাব পূরণ করতে হবে। কিন্তু এতে করে নিজের প্রাণকে ও সৃজনীশক্তিকে যেন বাইরের চাপে নষ্ট না করি। যা-কিছু গ্রহণ করব তাকে ভারতের ছাঁচে ঢেলে নিতে হবে। আমাদের সৃজনীশক্তির দ্বারা তারা coined into our flesh and blood হয়ে যাওয়া চাই।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির স্কীম অব লাইফ আছে কিন্তু তাদের ইতিহাস ও ভূপরিচয়ের মধ্যেও একটি বৃহৎ ঐক্য আছে, এই বিভিন্নতার মধ্যেও এক জায়গায় unity of human race আছে। তাদের সেই ইতিহাস ও ভূগোলের বিভিন্ন environmentএর জন্য যে life values সৃষ্ট হয়েছে, পরস্পরের যোগাযোগের দ্বারা তাদের বিস্তৃতি হওয়া প্রয়োজন। এই লাইফ-স্কীমগুলির আদান-প্রদানে বিশ্বে তাদের বৃহৎ লীলাক্ষেত্র তৈরি হবে।

আমাদের জাতীয় চরিত্রে কী কী অভাব আছে, কী কী আমাদের বাইরে থেকে আহরণ করতে হবে? আমাদের মূল ত্রুটি হচ্ছে, আমরা বড়ো একপেশে— ইমোশনাল। আমাদের ভিতরে will ও intellectএর মধ্যে, সব্‌জেক্‌টিভিটি ও অব্‌জেক্‌টিভিটির মধ্যে চিরবিচ্ছেদ ঘটেছে। আমরা হয় খুব সব্‌জেক্‌টিভ্‌, নয়তো খুব য়ুনিভার্সাল। অনেক সময়েই আমরা য়ুনিভার্সালিজ্‌মের বা সাম্যের চরম সীমায় চলে যাই, কিন্তু differentiationএ যাই না। আমাদের অব্‌জেক্‌টিভিটির পূর্ণ বিকাশ হওয়া দরকার। প্রকৃতিপর্যবেক্ষণ ও অব্‌জার্‌ভেশনের ভিতর দিয়ে মনের সত্যানুবর্তিতাকে ও শৃঙ্খলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমাদের intellectএর characterএর অভাব আছে, সুতরাং আমাদের intellectual honestyর প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। তা হলেই দেখব যে, কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়েছে। অন্য দিকে আমাদের moral ও personal responsibilityর বোধকে জাগাতে হবে, Law, Justice ও Equalityর যা লুপ্ত হয়ে গেছে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে— এসকল বিষয়ে আমাদের শিক্ষা আহরণ করতে হবে। আমাদের মধ্যে বিশ্বকে না পেলে আমরা নিজেকে পাব না। তাই বিশ্বরূপকে প্রতিষ্ঠিত করে আমরা আত্মপরিচয় লাভ করব এবং আমাদের বাণী বিশ্বকে দেব।

এ দেশে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, কিন্তু সেখান থেকে cast iron ও rigid standardized product তৈরি হচ্ছে। শান্তিনিকেতনে naturalnessএর স্থান হয়েছে, আশা করি বিশ্বভারতীতে সেই spontaneityর বিকাশের দিকে দৃষ্টি থাকবে। য়ুনিভার্সিটিকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলা যেতে পারে। এশিয়ার genius য়ুনিভার্সাল হিউম্যানিজ্‌মের দিকে, অতএব ভারতের এবং এশিয়ার interestএ এরূপ একটি য়ুনিভার্সিটির প্রয়োজন আছে। পূর্বে যে সংঘ ও বিহারের দ্বারা ভারতের সার্থকতা-সাধন হয়েছিল, তাদেরই এ যুগের উপযোগী ক'রে, সেই পুরাতন আরণ্যককে বিশ্বভারতী রূপে এখানে পত্তন করা হয়েছে।

বিশ্বভারতী পরিষদ্‌-সভার প্রতিষ্ঠা-উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ

শান্তিনিকেতন। ৮ পৌষ ১৩২৮

'বিশ্বভারতী' (১৩৫১) গ্রন্থে সংকলিত

পত্রালাপ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর · আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

ওঁ

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

অধ্যাপক লেভি আমাদের আশ্রমে অধ্যাপনার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন তাঁহার পত্র পাইয়াছি। এই পত্রে আপনাদের নিমন্ত্রণের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আপনার সহিত পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি এবং আমরা তাঁহাকে যে পথখরচ দিয়াছি তাহার অর্দ্ধাংশ কলিকাতা য়ুনিভার্শিটি হইতে বহন করিবার সম্মতি আপনি দিয়াছেন। অধ্যাপক মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রীর যাতায়াতের খরচা ছয় হাজার টাকা আমরা পাঠাইয়াছি। ইহার তিন হাজার টাকা যদি অনুগ্রহ করিয়া দেন তবে আমরা তাঁহার আগমনের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি। আপনি জানেন এখানকার সমস্ত ব্যয়ভার একলা আমারই 'পরে— ইহা আমার সামর্থ্যের অতিরিক্ত। এই জন্যই আশা করি আপনাদের আনুকূল্য হইতে বঞ্চিত হইব না। ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ ও বিদেশ হইতে অনেক ছাত্র এখানে আসিবে— তদুদ্দেশে অতি সত্বর গৃহ নির্মাণ ও অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহের প্রয়োজন ঘটিয়াছে। এই জন্য উদ্বিগ্ন চিত্তে আপনাদের শরণাপন্ন হইলাম। আমাদের এই অনুষ্ঠানকে আপনার নিজের জ্ঞান করিয়া ইহার ভার যদি লাঘব করেন তবে কৃতজ্ঞ হইব। ইতি ৩রা কার্তিক ১৩২৮।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Gangaprasad House
Madhupur
E. I. R.

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র পাইলাম। অধ্যাপক লেভি আমার পত্রেরও উত্তর দিয়াছেন। পূজার ছুটী বলিয়া এখন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রহিয়াছে। আমি শীঘ্রই কলিকাতায় ফিরিয়া সিণ্ডিকেটকে আপনার পত্রের মর্ম জানাইয়া টাকার ব্যবস্থা করিব। কাহারও কোন আপত্তির সম্ভাবনা দেখি না। শান্তিনিকেতনের উন্নতিকল্পে কোনরূপ সহায়তা করিতে পারিলে আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিব।

আপনি আমার বিজয়ার নমস্কার ও সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। ইতি ৪ঠা কার্তিক ১৩২৮।

ভবদীয়

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়

ওঁ

জোড়াসাঁকো
কলিকাতা

বহুমানভাজনেষু—

সাদর সম্ভাষণ পূর্বক নিবেদন—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পরীক্ষায় বাংলার অন্যতম পরীক্ষক পদ গ্রহণ জন্য যখন আমার নিকট প্রস্তাব আসিল তখন তাহা গ্রহণ সম্বন্ধে আমার মনে দ্বিধা জন্মিয়াছিল। কারণ একাজে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তা ছাড়া মোটের উপর পরীক্ষা ব্যাপারের 'পরেই আমার অশ্রদ্ধা আছে। যাহা হউক এই প্রস্তাব উপলক্ষ্যে আপনি আমার প্রতি সমাদর প্রকাশ করিয়াছেন চিন্তা করিয়া ইহা আমি সংকোচ সত্ত্বেও স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম।

তদনুসারে দীনেশবাবু[১] যখন আমার নিকট কয়েকটী প্রশ্ন রচনা করিয়া উপস্থিত করিলেন তখন দেখা গেল সেগুলি কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক আশ্রয় করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। যাঁহারা এই সকল গ্রন্থ লইয়া শিক্ষকতা করেন তাঁহারা এরূপ পরীক্ষকতার যোগ্যপাত্র। আমি এই গ্রন্থগুলি ভাল করিয়া পড়ি নাই, ইহাদের বিষয় সম্বন্ধেও যথোচিত পরিচয় রাখিনা অর্থাৎ যাঁহাদিগকে পরীক্ষা করা হইতেছে আমি তাঁহাদের অপেক্ষাও পরীক্ষণীয় বিষয়ে অল্পশিক্ষিত। এ স্থলে এরূপ কার্যভার গ্রহণ আমার পক্ষে অনুচিত। অতএব আপনার কাছে আমার সানুনয় আবেদন এই যে এই পদ হইতে আমাকে নিষ্কৃতি দিবেন এবং এরূপ কাজে আমাকে অক্ষম জানিয়াই ক্ষমা করিবেন। ইতি ১১ই আষাঢ় ১৩৩০।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১ দীনেশচন্দ্র সেন

আশুতোষ ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসুকুমার সেন

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা হাইকোর্ট— এই ছিল আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দুটি পক্ষ অথবা বিচরণভূমি, যাই বলি না কেন। আশুতোষের পাবলিক লাইফ্ এর বাইরে প্রায় শেষ পর্যন্ত কিছু ছিল না। প্রায় বলছি এই জন্যে যে শেষজীবনে তিনি সাহিত্যের দু-একটি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন। কিন্তু এসব কাজে তাঁর চরিত্রের অথবা চিন্তার কোনো বিশেষত্ব পরিস্ফুট নয়। অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আবাল্য বিদ্যালয়ভীত আর আযৌবন উকিল-আদালত-সন্ত্রস্ত। এ দু জন মনীষীর বিচরণক্ষেত্রের পরিধিস্পর্শ ঘটবারও কোনো সম্ভাব্যতা ছিল না। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ অল্প কিছুকালের জন্যে সাধারণ্যে প্রকাশ্য ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আশুতোষ স্বাভাবিক কারণেই সে আন্দোলন থেকে অত্যন্ত দূরে ছিলেন। এমনকি সে আন্দোলন যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্জনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল তখন তিনি সে আন্দোলনের বিরুদ্ধেই গিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-বর্জনের সংকল্প শুধু যে স্বদেশীর জন্যেই হয়েছিল তা নয়, কতকটা হয়েছিল লর্ড কর্জনের সমর্থিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিলের বিরোধিতার জন্যও বটে। আশুতোষ এই বিলের প্রবল সমর্থক ছিলেন। সেই সমর্থনের পথেই উচ্চশিক্ষার নেতা রূপে তাঁর প্রবেশ। সে কারণে তিনি দেশের নেতাদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে অপ্রিয় হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বিরুদ্ধে ছিলেন, তবে অন্য কারণে। তিনি চেয়েছিলেন আমাদের দেশের ছেলেরা আমাদের দেশের অবস্থার অনুযায়ী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষালাভ করবে, তা না হলে শিক্ষার অপচয় কিছুতেই বন্ধ হবে না। আশুতোষ যথাসম্ভব সর্বান্তকরণে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সমর্থন করতেন। তাঁর চেষ্টা ছিল সেই শিক্ষাকে প্রসারে এবং গভীরতায় বিস্তার করতে। সে বিস্তারের জন্যে তিনি শিক্ষার বোঝা হাল্কা (এবং পরীক্ষার ভার লঘু) করতে দ্বিধা করেন নি। এদিক দিয়ে হয়তো আশুতোষ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপন্থার দিকেই চলেছিলেন অজ্ঞাতসারে। এবং উল্টা পথে। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন শিক্ষাকে সহজগ্রাহ্য ও সর্বাত্মক করতে, পরীক্ষাকে তিনি একরকম বাদই দিতে রাজি ছিলেন।

আশুতোষের পরিধিতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবেশ ঘটল তাঁর নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির উপলক্ষ্যে। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সংবাদ সরকারি ভাবে ঘোষিত হবার আগেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে উপাধি (D. Litt.) দেবার সিদ্ধান্ত করেছিলেন, সে কথা হয়তো ঠিক। তবে এ কথাও হয়তো বেঠিক নয় যে ইংরেজি গীতাঞ্জলির যশ (এবং নোবেল প্রাইজ পাবার কানাঘুসা) বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম কর্তৃপক্ষের— চান্সেলর লর্ড হার্ডিঞ্জের এবং রেক্টর লর্ড কারমাইকেলের— অবগতিতে আগেই এসেছিল (অথবা সেক্রেটারি অব্ স্টেট্ তাঁদের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন)।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বিশ্ববিদ্যালয় নমোনমঃ করে স্বীকার করলেন, কিন্তু বাংলা লেখক বলে তাঁর মূল্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিদ্যার অধিকারীদের দ্বারা তবুও স্বীকৃত হল না। আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব বিদ্যারই যথাসম্ভব খোঁজখবর রাখতেন এবং সব বিভাগের তত্ত্বাবধান করতেন কিন্তু বাংলা বিদ্যার করতেন না। তার কারণ তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা মহাবিদ্যা নয়, বিদ্যাও নয়, অর্ধবিদ্যা মাত্র। ম্যাট্রিকুলেশন, ইণ্টারমিডিয়েট ও বি. এ. পরীক্ষায় একটিমাত্র পত্র, তার অধ্যয়ন। পরীক্ষার্থীদের বাংলায়

এক শ মার্কের একটিমাত্র পত্রের পরীক্ষা দিতে হত, এবং সে পত্রের জন্যে অধ্যয়ন ছিল নিষ্প্রয়োজন এবং অধ্যাপন আরও নিষ্প্রয়োজন। (শেষকালে কিন্তু আশুতোষই বাংলাকে মহাবিদ্যারূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন)। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সম্পর্কে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র দায়িত্ব ছিল ওই তিনটি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরী ও সেসব পত্রের উত্তর দেখা। এ কাজের ভার যাঁদের উপর তখন প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে ন্যস্ত ছিল তাঁরা রবীন্দ্রনাথের লেখার সম্বন্ধে বেশ শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতেন না। তাঁরা নোবেল প্রাইজে অভিভূত এবং ডি. লিট্. ডিগ্রিতে বিচলিত হন নি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিন জন বিখ্যাত ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই বিশেষ সমাবর্তন-অনুষ্ঠানে ডিগ্রি পেয়েছিলেন। পথে ঘাটের সাধারণ লেখাপড়া জানা লোকের, তাঁদের বিদ্যার বিষয়ে যেমন অনুকম্পাশ্রিত উপেক্ষা দৃষ্টি ছিল, মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাবুদ্ধির বিষয়েও প্রায় সেই রকম ধারণা ছিল।

সেইজন্যে, যখন দেখছি পরের বছরেই (১৯১৪) পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে রবীন্দ্রনাথের রচনার অংশ তুলে দিয়ে বলা হচ্ছে, 'শুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন ভাষায় পুনর্লেখন কর' (*Rewrite in correct and chaste Bengali*), তখন খুব বিস্ময় জাগে না। (আগেই বলেছি তখন বাংলা বিদ্যার খোঁজ আশুতোষ বেশী রাখতেন না, তাই এ ব্যাপারে তাঁকে দোষী করা যায় না।)

আশুতোষের তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ভেট (contact) হল জগত্তারিণী পদক-প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে। রবীন্দ্রনাথ কনভোকেশনে গিয়েছিলেন (১৯২২) পদক নিতে। (অ্যাকাডেমিক পরিচ্ছদে লাল-গাউন-পরা তাঁর যে শালপ্রাংশু সমুজ্জ্বল মূর্তি সে কনভোকেশনে সেনেট-হলে দেখেছি, এখনও তা যেন চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। বিধ্বস্ত সেনেট হলের সঙ্গে সে মূর্তি মনে গাঁথা হয়ে আছে।)

জগত্তারিণী-পদক-সম্মানের অল্প কিছুকাল আগে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছেন, তারও কিছু আগে আশুতোষ পোস্টগ্রাজুয়েট অধ্যাপনা-গবেষণা প্রবর্তন করেছেন। উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে মনীষীদ্বয় সমান্তরাল পথ ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ অভিনব বিশ্ববিদ্যালয় গড়ছেন— আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়-সর্বস্ব। সুতরাং এখন এঁদের মধ্যে যেন একটু, এখন যাকে বলে 'আত্মিক' যোগাযোগ, তাই ঘটল। আশুতোষ রবীন্দ্রনাথকে খয়রার রাজার এনডাউমেন্ট তহবিলের অন্যতম ট্রাস্টি করে নিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে এই একটিমাত্র University Bodyর মেম্বর হয়েছিলেন। তিনি খয়রা বোর্ডের একটিমাত্র মিটিঙে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯২৬ কি ১৯২৭ সালে মনে নেই, খয়রা বোর্ডের যে মিটিঙে সুনীতিবাবুর[১] পাঁচ বছরের মেয়াদের পর চাকরী পাকা করবার কথা ছিল, সেই মিটিঙে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন, দেখেছি। তখন কিন্তু আশুতোষ জীবিত ছিলেন না। তখন ভাইসচ্যানসেলর ছিলেন বিচারপতি গ্রীভ্‌স্। আশুতোষের মৃত্যুর পর ইনিই ম্রিয়মাণ পোস্টগ্রাজুয়েট বিভাগগুলিকে স্থায়িত্বের পথে তুলে দিয়ে বাঁচিয়ে গিয়েছিলেন। সে কথা এখন আমাদের অনেকেরই স্মরণে নেই। (অল্পকাল পূর্বে গ্রীভ্‌স্ পরলোকগমন করেছেন। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমি শ্রদ্ধা জানাই।)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষই রবীন্দ্রনাথকে বক্তৃতা দিতে আহ্বান করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ

---

১ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রথম বক্তৃতা দিয়েছিলেন ১৯২৪ সালে, আশুতোষের মৃত্যুর দু-এক মাস আগে। আশুতোষের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ তিনটি রীডারশিপ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বক্তৃতার স্থান ছিল দ্বারভাঙ্গা বিলডিঙে দোতালার হল, তখনকার লাইব্রেরী রিডিং রুম। সে বক্তৃতায় আশুতোষ সভাপতিত্ব করেছিলেন। বাংলা ভাষায় রীডারশিপ বক্তৃতা দেওয়া (তখন রীডারশীপ বক্তৃতা দিতে বিদেশী নামী পণ্ডিতদেরই ডাকা হত) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এইই প্রথম।

আশুতোষ নিজের টাকা দিয়ে দুটি উল্লেখযোগ্য এনডাউমেণ্ট স্থাপন করেছিলেন, মায়ের নামে জগত্তারিণী পদক আর বড়মেয়ের নামে কমলা বক্তৃতামালা। রবীন্দ্রনাথ এ দুটিরই লাভের সম্মান পেয়েছিলেন। জগত্তরিণী পদক তিনিই প্রথম পান, তবে কমলা বক্তৃতায় তিনি প্রথম নন। এ বক্তৃতা দিয়েছিলেন তিনি ১৯৩৪ সালে।

আশুতোষের মৃত্যুর পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায় নি। বিশ্বভারতীকে উপলক্ষ্য করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর সহযোগিতা বেড়ে গিয়েছিল। এফিলিয়েটেড ইন্‌স্টিটিউশন না হলেও বিশ্বভারতীর ছাত্রদের ইণ্টারমিডিয়েট ও বি. এ. পরীক্ষা দেবার অধিকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দিয়েছিলেন। এ অধিকার আর কোনো প্রতিষ্ঠান কখনো পেয়েছে বলে জানি নে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনো অধ্যাপক সপ্তাহান্তিকে একদিন কি দুদিন বিশ্বভারতীতে পড়াবার অনুমতি পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংযোগ নিবিড়তম হয়েছিল ১৯৩২-৩৪ সালে। তখন রবীন্দ্রনাথ দু বছরের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন[২] এবং সে অনুসারে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

আশুতোষের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শেষ দেখা হয়েছিল তাঁর অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের চীন যাত্রারম্ভের পূর্বদিনে (২০ মার্চ ১৯২৪)। সেদিন অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ তাঁর আলিপুরস্থিত সরকারি বাসভবনে এই উপলক্ষ্যে প্রীতিসম্মিলন আহ্বান করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় তখন প্রশান্তবাবুর অতিথি হয়ে আলিপুরে ছিলেন। সে সম্মিলনে আশুতোষ এসেছিলেন। তাঁর এক প্রবল প্রতিপক্ষও এসেছিলেন— তিনি রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

আশুতোষ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ভিন্নতা নানা দিক দিয়েই ছিল। তবুও তাঁদের মধ্যে যে মিল ছিল তা সর্বদা স্পষ্ট না হলেও গভীর। দুজনেই ছিলেন কর্মী ও কর্মপ্রিয়, দুজনেরই উদ্দেশ্য ছিল মানুষগড়া। উদ্দেশ্য যেখানে এক সেখানে যাত্রাপথ যতই দূরাবস্থিত হোক না কেন সে পথ হয় সমান্তরাল চলবে নয় এক ক্ষেত্রে এসে মিলবে। আশুতোষ ও রবীন্দ্রনাথের পথ সমান্তরাল চলেছিল। বলতে পারি মিলেও ছিল— বাংলা ভাষার স্বীকৃতিতে ও প্রতিষ্ঠায়।

রবীন্দ্রনাথ দু বার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ কনভোকেশনে যোগ দিয়েছিলেন। এক বার (১৯২২) জগত্তারিণী পদক নিতে, আর-এক বার (১৯৩৭) কনভোকেশন বক্তৃতা দিতে। সে বক্তৃতার গোড়ায় যা তিনি বলেছিলেন তা উদ্ধৃত করি—

---

২ বাংলা বিভাগের প্রধান রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকের পদ এই সময়ে খালি হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ কোনো এক ব্যক্তিকে এই পদে নিয়োগ না করে পদটিকে দ্বিধাবিভক্ত করে দুজনকে দেন। দু বছরের পর রবীন্দ্রনাথকে পুনর্নিয়োগ করা হয় নি। রবীন্দ্রনাথ হলেন ৫০০ টাকা মাইনের বিশেষ অধ্যাপক আর খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রচলিত গ্রেডে দ্বিতীয় অধ্যাপক।

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবি-সম্মান-বিতরণের বার্ষিক অনুষ্ঠানে আজ আমি আহূত। আমার জীর্ণ শরীরের অপটুতা এই দায়িত্বভার গ্রহণের প্রতিকূল ছিল। কিন্তু অদ্যকার একটি বিশেষ গৌরবের উপলক্ষ আমাকে সমস্ত বাধার উপর দিয়ে আকর্ষণ করে এনেছে। আজ বাংলাদেশের প্রথমতম বিশ্ববিদ্যালয় আপন ছাত্রদের মাঙ্গল্যবিধানের শুভকর্মে বাংলার বাণীকে বিদ্যামন্দিরের উচ্চ বেদীতে বরণ করেছেন। বহুদিনের শূন্য আসনের অকল্যাণ আজ দূর হল।"[৩]

রবীন্দ্রনাথ যে কতটা দূরদর্শী ও বিবেচক ছিলেন তা 'বাংলাদেশের প্রথমতম বিশ্ববিদ্যালয়' কথা থেকেই বোঝা যায়। কেন বলেন নি 'ভারতবর্ষের প্রথমতম বিশ্ববিদ্যালয় ?'

আশুতোষ শক্তিমান পুরুষ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও শক্তিমান পুরুষ ছিলেন। কিন্তু দুজনের শক্তির প্রকাশ রূপ ভিন্ন। তবে দুজনের চিন্তা একটি কেন্দ্রবিন্দুতে সংলগ্ন হয়েছিল। সে হল জ্ঞানের উপর অসীম আস্থা, জ্ঞানার্জনের প্রতি অপরিসীম অনুরাগ।

---

৩ ছাত্রসম্ভাষণ, শিক্ষা

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ১৮৬৪-১৯৩৮

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

আকাশের এক একটা জায়গায় নক্ষত্রেরা ভিড় করে। জাতির ভাগ্যাকাশও বুঝি ঐ রকম। এক একটা বিশেষ মুহূর্তে মনীষীরা আবির্ভূত হন। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আমাদের জাতীয় জীবনে ঠিক এইরকম ঘটনা ঘটেছিল। আকাশের দলবাঁধা নক্ষত্রের মতো কয়েকজন মনীষী জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখন। উনবিংশ শতাব্দীর সেই জ্যোতিষ্কদের অন্যতম আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। তবে সাধারণ জ্যোতিষ্কের মতো নির্দিষ্ট কোনো কক্ষপথে পরিভ্রমণ করেন নি তিনি। জ্ঞান-বিজ্ঞান বা সাহিত্য-সংস্কৃতির কোনো একটা বিশেষ শাখায় পারদর্শিতা অর্জন করেন নি। জ্ঞানজগতের নতুন নতুন নীহারিকালোক তাঁর গন্তব্যস্থল। দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতি, চিকিৎসা, গণিত সবকিছুই তাঁর নখদর্পণে। এমন মনস্বী, বহু বিচিত্র জ্ঞানলোকের এমন একনিষ্ঠ অভিযাত্রী এ যুগে বিরল। এ যুগ স্পেসালিজেশানের যুগ। এখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো একটি শাখার বিশেষ একটি প্রশাখায় পারদর্শিতা দেখালেও পণ্ডিত নামে অভিহিত হওয়া যায়। বহু শাস্ত্রের বহুবিধ শাখাপ্রশাখায় ব্যুৎপত্তি লাভ করতে হয় না। তাই এ যুগের এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। বহু বিদ্যার বহু বিচিত্র জ্ঞানালোকে তাঁর জ্ঞানের প্রদীপ দেদীপ্যমান। বহু জ্ঞানের পুণ্য-স্পর্শে তাঁর জীবনভূমি মহিমময়। জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সেই মহিমময় জ্ঞানতপস্বীর জীবনকথা ও কর্মসাধনার ইতিবৃত্ত অনুসরণের চেষ্টা চলছে। বিশ্বকোষের হাজার প্রবন্ধের আকর যিনি, তাঁর পরিচয়কে তুলে ধরবার প্রয়াস চলছে একটি দু'টি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে। কিন্তু ক্ষুদ্র কোনো প্রবন্ধের সীমিত গণ্ডীতে তাঁর সত্যিকারের পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। আসল বিশ্বকোষকে পাওয়া যাবে না সেখানে। বিশ্বকোষ-পাঠের ভূমিকাটুকুই জানা যাবে শুধু।

আজ থেকে এক শত বৎসর আগেকার কথা। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত পরিবারে ব্রজেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মহেন্দ্র শীল সে যুগের এক বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টের উকিল হিসেবে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছিলেন তিনি। শোনা যায়, তখনকার প্রধান বিচারপতি পিকক সাহেব তাঁকে সমীহ করে চলতেন। কিন্তু মহেন্দ্র শীলের মন ওতে ভরে নি। ওকালতি ব্যবসায়ের জয়মাল্য তাঁকে খুশি করতে পারে নি। তাঁর মন পড়ে থাকত দর্শন আর গণিতের রাজ্যে। কখনও বা ভাষা-চর্চায় মেতে উঠতেন তিনি। নিবিষ্টচিত্তে বিদেশী ভাষা শিখতেন। এই ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি সাফল্য অর্জন করেছিলেন। বহু ভাষাবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন নিজেকে। ইংরাজি ফরাসি জার্মান ইতালীয় ও স্পেনীয় ভাষায় দখল ছিল তাঁর। তিনি অগস্ত কোমতের দর্শন পড়েছিলেন মূল ফরাসি থেকে। আইনেও তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। কিন্তু সেই পাণ্ডিত্যের তিনি অপব্যবহার করেন নি। অর্থ নয়, জ্ঞানোপার্জনই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। যখন যা কিছু পড়েছেন তন্ন তন্ন করে পড়েছেন। যখন যা কিছু জেনেছেন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জেনেছেন। মহেন্দ্র শীলের জানার এই অদম্য স্পৃহা, জ্ঞানার্জনের এই বিপুল আগ্রহ তাঁর দ্বিতীয় পুত্র ব্রজেন্দ্রনাথের মধ্যে সংক্রামিত হল। ছোটবেলা থেকেই দেখা গেল, জ্ঞানের রাজ্যে ব্রজেন্দ্রনাথ অল্পে

তুষ্ট নন। এক সঙ্গে অনেকখানি না জানলে, একবারে অনেক কিছু না পড়লে কোনোমতেই পরিতৃপ্ত হন না তিনি।

ব্রজেন্দ্রনাথ তখন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। স্কুলে পড়েন। হঠাৎ একদিন বীজগণিতের নেশায় ধরল তাঁকে। গ্রীষ্মের ছুটিতে সমগ্র বীজগণিত আয়ত্ত করে ফেললেন। ব্রজেন্দ্রনাথের কাণ্ড দেখে বাড়ির লোকেরা, বন্ধুরা—সকলেই অবাক। মাস্টার-মশাইরা সবিস্ময়ে তাকালেন এই প্রতিভাবান ছাত্রটির দিকে। কিন্তু ছাত্রটির ভ্রূক্ষেপ নেই কোনোদিকে। স্কুলপাঠ্য বীজগণিত শেষ করে তখন সে চাইছে উচ্চতর গণিতের রাজ্যে প্রবেশ করতে। অথচ সুযোগ জুটছে না কোনোমতেই। সংসারের চরম দারিদ্র্য কিশোর ব্রজেন্দ্রনাথকে গ্রাস করতে চাইছে। পিতা বেঁচে নেই। মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। স্ত্রী-পুত্রদের ফেলে রেখে গেছেন চরম দুর্দশার মধ্যে। ব্রজেন্দ্রনাথ তখন সাত বছরের বালক। অনন্যোপায় হয়ে মাতুলালয়ে আশ্রয় নিলেন তিনি। সঙ্গে রইলেন অগ্রজ রাজেন্দ্রনাথ। কিন্তু মাতুলালয়ের অবস্থাও ভালো ছিল না। তাই দুঃখ-দৈন্যের সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম করে কিশোর ব্রজেন্দ্রনাথকে এগোতে হ'ল। ছোটবেলা থেকেই বিত্তের অভাব তিনি পূর্ণ করলেন চিত্তের খোরাক জুটিয়ে। এন্‌ট্রান্স্ পরীক্ষা অবধি গণিত-বিদ্যার এক আনন্দময় জগতে নিমগ্ন করে রাখলেন নিজেকে। এন্‌ট্রান্স্ পরীক্ষায় তিনি বৃত্তি পেলেন। তারপর ভর্তি হলেন জেনারেল এসেম্ব্রী ইন্‌স্টিটিউশনে।

এবার নতুন দুই জগতের সন্ধান পেলেন তিনি। সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়লেন। এতদিন যেমন ছিল গণিত, এখন তেমনি হল সাহিত্য ও দর্শন। এবার তিনি নিত্য নূতন বই-পড়ায় মেতে উঠলেন। এখন আর বইয়ের অভাব নেই। কলেজ-গ্রন্থাগার আছে, আর আছেন অধ্যক্ষ ড. হেস্টি। ব্রজেন্দ্রনাথের জীবনে এই অধ্যক্ষের অবদান গভীর ও ব্যাপক। তাঁকে সাহিত্য ও দর্শন-চর্চায় তিনিই প্রথম অনুপ্রাণিত করেন। নিত্য নূতন বইয়ের সন্ধান দিয়ে এই তরুণ জ্ঞানান্বেষীকে উৎসাহিত করেন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ এক বিচিত্র মানুষ। জ্ঞানরাজ্যের বিশেষ কোনো দিক তার মনকে দীর্ঘকাল ধরে রাখতে পারে না। তাই দেখি, জেনারেল এসেম্ব্রী ইন্‌স্টিটিউশনের পাঁচ বছরের ছাত্রজীবনে তিনি সাহিত্য ও দর্শন যেমন পড়ছেন, তেমনি পড়ছেন ইতিহাস, আইনশাস্ত্র এমন কি ভাষাতত্ত্ব। ব্রজেন্দ্রনাথের অধ্যয়ন সম্বন্ধে বিচিত্র সব কাহিনী প্রচলিত আছে। একটির কথা বলি এখানে। ব্রজেন্দ্রনাথ তখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। অধ্যক্ষ ড. হেস্টির কাছে লজিক পড়েন। একদিন দেখা গেল, অধ্যক্ষের হাতে দুরূহ একটি লজিকের বই। ব্রজেন্দ্রনাথের লোভী দৃষ্টি গিয়ে পড়ল বইটির উপর। অনেক চেষ্টা করেও সে লোভ কোনোমতেই দমন করতে পরেলেন না তিনি। ড. হেস্টির কাছে গিয়ে বললেন, তিনি ও বইটি পড়তে চান। তরুণ ছাত্রের কথা শুনে হেস্টি তো অবাক। বই দিতে প্রথমটায় রাজী হলেন না তিনি। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথও ছাড়বেন না। বার বার ঐ একই অনুরোধ করতে লাগলেন তিনি।

শেষ অবধি নাছোড়বান্দা ব্রজেন্দ্রনাথেরই জয় হ'ল। ড. হেস্টির কাছ থেকে বইটি আদায় করে তিনি ছাড়লেন। বাড়ি গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই পড়া শুরু করলেন। তিন দিনে বই শেষ। তারপর হেস্টিকে বইটি ফেরত দিতে গিয়ে বললেন যে ও বই তার পড়া হয়ে গেছে।

কথা শুনে হেস্টি অবাক।

কিন্তু পাকা শিক্ষাবিদ্ তিনি। ছাত্রদের চটকদার কথায় ভোলেন না। তাই ব্রজেন্দ্রনাথকে পরীক্ষা

দিতে হল। মৌখিক পরীক্ষা। ড. হেস্টি প্রশ্ন করছেন একটার পর একটা। জবাব দিচ্ছেন শ্রুতিধর ব্রজেন্দ্রনাথ। অনর্গল মুখস্থ বলে যাচ্ছেন সে বইয়ের বিভিন্ন অংশ। ড. হেস্টি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। এমন ছাত্র তিনি জীবনে দেখেন নি। এই ঘটনার পর থেকেই ড. হেস্টির সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথের যোগসূত্র ক্রমে নিবিড় ও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল।

শুধু ড. হেস্টির কথাই বা বলি কেন, যখন যেখানে পড়েছেন ব্রজেন্দ্রনাথ, সেখানেই শিক্ষকরা তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছেন। স্কুলে মুগ্ধ হয়েছেন মাষ্টার মশাইরা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকরা। বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্-এ পড়বার সময়েও অধ্যাপকদের অকুণ্ঠিত স্নেহ-প্রীতি লাভ করেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ।

এম্. এ. পাশ করার পর তিনি অর্থশাস্ত্র, সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দুদর্শন পাঠ করতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ একদিন মেতে উঠলেন ভূ-বৃত্তান্ত-চর্চায়। কিন্তু যখন যা পড়েছেন তিনি, অভিনিবেশ সহকারে পড়েছেন, তন্নতন্ন করে পড়েছেন। এক কথায় সর্ববিদ্যা-বিশারদ তিনি। একবার এক ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে দেখলেন, তিনি রাশি রাশি ম্যাপ আর চার্ট ছড়িয়ে নিয়ে বসেছেন। তন্ময়চিত্তে অধ্যয়ন ক'রে চলেছেন দক্ষিণ-আমেরিকার ভূ-প্রকৃতি।

অধ্যয়নের বিস্ময়কর গভীরতা ও বিশালতা ছিল তাঁর। যখন যা' পড়তেন তিনি, খুঁটিয়ে পড়তেন। যখন যা' জানতেন, তলিয়ে জানতেন। ইংরেজি সাহিত্য পড়বার সময় তিনি স্কটল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডের দুর্বোধ্য পল্লীগাঁথাগুলো পর্যন্ত আয়ত্ত করেছিলেন। বিদেশী ভাষার চর্চা করতে গিয়ে একসঙ্গে অনেক রকম ভাষা শিখেছিলেন তিনি। দর্শনশাস্ত্র পড়বার সময় ইয়োরোপ ও ভারতবর্ষের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের প্রায় সমস্ত গ্রন্থ পড়েছিলেন। আর অসাধারণ ছিল তাঁর স্মৃতিশক্তি ও কর্মনিষ্ঠা। একবার পড়েই সব কিছু মনে রাখতে পারতেন তিনি। একবার দেখেই বুঝতে পারতেন, কোন কাজটি কিভাবে করলে সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে।

এই কর্মনিষ্ঠা ছিল বলেই ব্রজেন্দ্রনাথের কর্মজীবনও গৌরবময়। তাঁর কর্মজীবন শুরু হল কলকাতার জেনারেল এসেম্ব্লী ইন্‌স্টিটিউশনে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ঐ কলেজের অধ্যাপক হলেন তিনি। তারপরে হলেন ফেলো। কয়েকমাস পর তিনি কলকাতার সিটি কলেজে কাজ নিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই শিক্ষাবিদ্ হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। এই তরুণ অধ্যাপকের বিদ্যাবত্তা ও সহৃদয়তায় ছাত্ররা হল মুগ্ধ। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, যখন যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে গিয়েছেন ব্রজেন্দ্রনাথ, সেখানেই ছাত্রদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করেছেন। পাণ্ডিত্য, গাম্ভীর্য ও অহঙ্কারের কৃত্রিম পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে ছাত্রদের সঙ্গে কোনোদিন তিনি ব্যবধান রচনা করেন নি। তাই সর্বত্রই তিনি নিরহঙ্কারী ছাত্র-বান্ধব হিসেবে সকলের ভালোবাসা পেয়েছেন। স্বদেশে জেনারেল এসেম্ব্লী ইন্‌স্টিটিউশান ও সিটি কলেজের অধ্যাপক (১৮৮৪-৮৫) হিসেবে পেয়েছেন, বহরমপুর কলেজ (১৮৮৭-৯৬) ও কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ (১৮৯৬-১৯১৩) হিসেবে পেয়েছেন, পেয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যাহয়ের মেণ্টাল ও মরাল সায়ান্সে ও দর্শনের পঞ্চম জর্জ অধ্যাপক (১৯১৩-১৭) হিসেবে। প্রবাসেও আদর্শ শিক্ষাবিদ্ হিসেবে ব্রজেন্দ্রনাথ যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পেয়েছেন, খুব কম আচার্যের জীবনেই তেমন ঘটে। কি নাগপুরে মরিস্ কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ হিসেবে (১৮৮৫-৮৭), কি মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে (১৯২১-৩০) সর্বত্রই ছাত্রদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-প্রীতি লাভ করেছেন তিনি।

নাগপুরের মরিস কলেজে ব্রজেন্দ্রনাথ অল্প কিছুদিন কাজ করেছিলেন। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি সেখানকার ছাত্রদের হৃদয়-জয়ে সমর্থ হন। মরিস কলেজে ব্রজেন্দ্রনাথের সাফল্যের পরিচয় দিতে গিয়ে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস লিখেছেন,

"কিন্তু সেই অল্পকালের মধ্যে তিনি নাগপুরের ছাত্রজগতে এরূপ প্রিয় হইয়াছিলেন যে, বোধ হয় আজ পর্যন্ত কোনো অধ্যাপক সেরূপ হইতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। বিদ্যাতে বল, বিনয়ে বল, কোমল স্বভাবে বল তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকে মায়াজালে বাঁধিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"[১]

মরিস কলেজে মায়াজাল; মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়েও মায়াজাল। মহীশূরের উপাচার্য হিসেবে কাজ করার সময়েও ব্রজেন্দ্রনাথের কর্মদক্ষতা, চরিত্র-গৌরব ও স্নেহপ্রীতিতে ওখানকার ছাত্রসমাজ থেকে সুরু ক'রে জনসাধারণ এমনকি রাজ্য সরকার পর্যন্ত নানাভাবে উপকৃত হয়েছিল। উপাচার্য থাকবার সময়ে তিনি শিক্ষার উন্নয়নের জন্যে যে পরিকল্পনা রচনা করেন, তা'তে প্রাথমিক থেকে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট অবধি সকল স্তরের শিক্ষাই স্থান পেয়েছিল। প্রতি স্তরের শিক্ষার শেষে ছাত্রদের বৃত্তিমূলক ও কার্যকরী শিক্ষাদানের সুযোগ ঐ পরিকল্পনায় ছিল। এ ছাড়া মহীশূরে থাকবার সময় তিনি যে শাসনতান্ত্রিক কাঠামো তৈরি করেন, তা'তে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের চিত্র ছিল; ছিল সংখ্যালঘুদের অধিকারের কথা। মহীশূরের শিল্পপ্রতিষ্ঠান সমূহকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য ও অনুপ্রেরণা দানের পরিকল্পনাও তিনি করেছিলেন। এ থেকে অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

সুদীর্ঘ নয় বৎসরকাল ব্রজেন্দ্রনাথ মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা দিক দিয়ে উন্নতি হয়েছিল। এ ছাড়া ব্রজেন্দ্রনাথ কাউন্সিলের অতিরিক্ত সদস্য (১৯২৫-২৬) হিসেবে, মহীশূর সরকারের শিক্ষা-পরামর্শদাতা এবং শিক্ষা-বোর্ড ও রাজ্যের গণতান্ত্রিক সংস্কার কমিটির সভাপতি (১৯২২-২৩) হিসেবেও ঐ রাজ্যের সেবা করেছেন। মহীশূরে ব্রজেন্দ্রনাথের কর্ম-সাধনার ও চিন্তাক্রমের সামগ্রিক পরিচয় দিতে গিয়ে প্রবাসী-সম্পাদক মন্তব্য করেছিলেন,

"তিনি মহীশূর রাজ্যের কন্‌স্টিটিউশন্ বা ভিত্তিভূত ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে মন্তব্য লেখেন, তাহা রাজনীতি বিষয়ে তাঁহার বিস্তৃত ও প্রগাঢ় জ্ঞান এবং চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য ও আদর্শ সম্বন্ধেও তিনি মৈসুর বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠন উপলক্ষে যাহা লিখিয়াছেন, সমুদয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদয় কর্মীর তাহা পাঠ করা উচিত।"[২]

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মহীশূর সরকার আচার্য শীলকে "রাজতন্ত্রপ্রবীণ" উপাধি প্রদান করেন।[৩] ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী ব্রজেন্দ্রনাথ মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল। তাই মহীশূরের রাজ্য-সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে তাঁর প্রভূত প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তিনি কাজে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন। অবসর-গ্রহণের পর রাজ্যের বহুবিধ কল্যাণ-কর্মে ব্রজেন্দ্রনাথের অবদানের কথা সবিস্তারে উল্লেখ ক'রে, এক রাজকীয় ইস্তাহারে মহীশূর সরকার লিখেছিলেন,

---

১ বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী (৩য় ভাগ, ১৯৩১) পৃ ১১৭।

২ প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৩

৩ ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩৩৫, পৃ. ১৫৭।

"তিনি আগাগোড়াই অদম্য উৎসাহ এবং অনন্যসাধারণ কর্তব্যনিষ্ঠা সহকারে কাজ করিয়াছেন। শুধু মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে নহে, রাজ্যের সাধারণ এবং কারিগরী শিক্ষার উন্নতিসাধনে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য এবং অভিজ্ঞতা যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। ৬ বৎসর পূর্বে মহারাজার ইচ্ছানুসারে মহীশূর রাজ্যের শাসনতন্ত্রে যে সমস্ত সংস্কার প্রবর্তিত হয় তদ্বিষয়ে স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ যথেষ্ট সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন, এই সম্পর্কে তাহার বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন। তিনি রাজ্যের যে প্রভূত সেবা করিয়াছেন তাহার পুরস্কার স্বরূপ মহারাজা তাঁহাকে 'রাজতন্ত্রপ্রবীণ' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। ভারত গভর্ণমেণ্টও তাঁহাকে 'নাইট' উপাধি দিয়া তাঁহাদের গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। মহারাজা প্রার্থনা করেন, স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল অবসর গ্রহণ করার পর শান্তিতে কালযাপন করিবেন।"[৪]

কিন্তু মনে যেন রাখি, পূর্ণ অবসর ব্রজেন্দ্রনাথ কোনোদিনই গ্রহণ করেন নি। তাঁ'র কর্মসাধনার পরিধি ছিল বিরাট। শুধুমাত্র চাকুরীর নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি তিনি। তাই দেখি, মহীশূরের উপাচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মঙ্গলামঙ্গলের কথা চিন্তা করছেন, বাংলাদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ে ভাবছেন, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে বিভিন্ন ব্যাপারে সাহায্য করছেন।[৫] এ সম্বন্ধে ১৩৩৩ সালের শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসীর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখা হয়েছিল—

"পরলোকগত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করিবার সময় নানা বিদ্যা-বিষয়ে যেরূপ জ্ঞানের পরিচয় দিতেন, তাহার অনেকটা শীল মহাশয়ের সহিত পরামর্শের ফল।"

এ ছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের প্রেসিডেণ্ট মাইকেল স্যাড্‌লার আচার্য শীলের কাছে নানা ভাবে ঋণী। মাইকেল স্যাড্‌লার লিখেছিলেন—

"He was indeed guide, philosopher and friend to me. More than fifteen years have passed since we last met in the flesh. But the feeling of his presence is still in my mind." [৬]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আচার্য শীলের সুদীর্ঘকালের যোগাযোগ ছিল। এই প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-কানুন প্রস্তুতের জন্যে গঠিত 'সিমলা কমিটি'র (১৯০৫) তিনি ছিলেন অন্যতম সভ্য।

কিন্তু স্মরণে যেন রাখি, শিক্ষার ক্ষেত্রেই শুধু নয়, মানবধর্ম ও সংস্কৃতির বৃহত্তর কর্মসাধনার সঙ্গেও তিনি নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে রোমে অনুষ্ঠিত ওরিয়েণ্টালিস্ট্‌ কংগ্রেসের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিনিধি। এ ছাড়া ১৯১১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রথম বিশ্বজাতি কংগ্রেসের[৭] অধিবেশন উদ্বোধন করেন তিনি। নৃতত্ত্ব ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় পারদর্শিতার জন্যে তিনি ঐ কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন। সেখানে অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন তিনি। অনন্য মনস্বিতায় পাশ্চাত্ত্য জগতকে মুগ্ধ করেন।

---

৪ বঙ্গবাণী, ফেব্রুয়ারী ১৯৩০।

৫ Modern Review: January, 1939.

৬ Modern Review: January, 1936.

৭ First Universal Races Congress

স্বদেশের ধর্মসাধনা ও কর্মযজ্ঞের সঙ্গেও ব্রজেন্দ্রনাথের বরাবর সংযোগ ছিল। ১৩৪৩ সালের ফাল্গুন মাসে রামকৃষ্ণদেবের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে যে সর্বধর্ম-সম্মেলন হয়, আচার্য শীল তার উদ্বোধনী ভাষণ দেন।[৮] আচার্য শীল পরমহংস দেবকে সাক্ষাৎভাবে জানতেন এবং তিনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের সতীর্থ ও বন্ধু।

এ ছাড়া স্বদেশের ধর্মকর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহু বিচিত্র সভা-সম্মেলনের সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। কখনও সংস্কৃতি-সম্মেলনে ভাষণ দিচ্ছেন তিনি,[৯] কখনও ঐতিহাসিক-সংস্থা[১০] বা অর্থনীতিবিদ্‌দের সম্মেলনে[১১] জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করছেন, কখনও বা পৌরাণিকদের সভায়[১২] সভাপতির ভাষণ দিচ্ছেন, কখনও আবার দূরপ্রাচ্য থেকে আগত চিকিৎসক-সভ্যদের কাছে ভারতীয় ঔষধের গুণাগুণ বর্ণনা করছেন।

সভা-সমিতিতে প্রদত্ত এসব অভিভাষণ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন, সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন বলেই সকল জায়গা থেকে ব্রজেন্দ্রনাথের ডাক আসত। কিন্তু যত জানতেন ব্রজেন্দ্রনাথ, তত লিখতেন না। তাঁর জ্ঞানের পরিধির তুলনায় রচনার পরিমাণ খুবই অল্প। তিনি যেন বইয়ের জগতে হারিয়ে গেছেন—"Lost in books"; কিন্তু তা সত্ত্বেও বলব, অল্প যা কিছু লিখেছেন তিনি, তারই মধ্যে তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য ও অনন্য মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, আচার্য শীল নিজে যা ভালোভাবে জানতেন না, যা'র সত্যতা সম্বন্ধে তিনি সুনিশ্চিত নন, তা নিয়ে কোনোদিন তিনি কোনো মন্তব্য প্রকাশ করেন নি। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "The Positive Science of the Ancient Hindus"-এর[১৩] ভূমিকায় তিনি লিখেছেন,

"I have not written one line which is not supported by the clearest texts."

এ মন্তব্য আচার্য শীলের সকল মননশীল রচনা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। তবে এ গ্রন্থে জ্ঞানের যে 'দুর্গম ঊর্দ্ধে', যে 'সমুচ্চ মহিমায়' তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, মননশীল সাহিত্য-রচনার ইতিহাসে তা এক অক্ষয় গৌরবের অধিকারী। খৃষ্টপূর্ব ৫০০ থেকে ৫০০ খৃষ্টাব্দ অবধি হিন্দুদের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ। প্রকৃতি-বিজ্ঞানের চর্চায় এবং বৈজ্ঞানিক সূত্র ও চিন্তাধারার গঠনে হিন্দুদের অবদান যে গ্রীকদের চেয়ে নগণ্য নয় এবং হিন্দুদের এই বিজ্ঞানচেতনার প্রভাব যে সমগ্র প্রাচ্যে এমনকি পাশ্চাত্ত্য দেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল, আচার্য শীল এখানে তা প্রতিপন্ন করেছেন। তবে হিন্দু-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদনের প্রয়াস অপেক্ষা তাদের মূল বিজ্ঞান-সাধনার কথাই এই গ্রন্থে প্রাধান্য পেয়েছে। এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞানে প্রাচীন হিন্দুদের ধ্যান-ধারণা, শব্দবিজ্ঞান, উদ্ভিদজীবন সম্বন্ধে হিন্দুদের জ্ঞান, হিন্দুমতে জীবজন্তুর শ্রেণীবিভাগ, হিন্দু শারীরবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা এবং

---

৮ আচার্য শীলের ভাষণ ১৩৪৩ সালের এপ্রিল সংখ্যা মডার্ন রিভিয়ুতে প্রকাশিত হয়েছিল।

৯ ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় সংস্কৃতি-সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতা। Indian Research Institute (1936).

১০ মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজে ঐতিহাসিকদের কাছে প্রদত্ত ভাষণ।

১১ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই মহীশূরে অনুষ্ঠিত অর্থনীতিবিদ্‌ সম্মেলনে প্রদত্ত অভিভাষণ।

১২ ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই আগস্ট তারিখের আলোচনা।

১৩ ১৯৫৮ সংস্করণ। মতিলাল বারাণসী দাস প্রকাশিত।

পরিশেষে হিন্দু-চিন্তার বৈজ্ঞানিক রীতি। একদিকে ভারতের প্রাচীনতম যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং অপরদিকে আধুনিক যুগের নবতম বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথের পরিচয় কত গভীর ছিল, এই গ্রন্থটি পড়লে তা জানা যায়। আধুনিক যুগের চিন্তার আলোকে প্রাচীনকালের বিজ্ঞান-চর্চার এমন সুস্পষ্ট পরিচয় আচার্য শীল ছাড়া আমাদের দেশে আর একজন মাত্র লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি হলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তবে "A History of Hindu Chemistry"-র প্রথম[১৪] ও দ্বিতীয় খণ্ডে[১৫] আচার্য রায় প্রাচীন যুগের বিজ্ঞান-চর্চার ইতিহাস-রচনার যে রীতি অনুসরণ করেছেন, তা সাধারণ পাঠকদের কাছে কিছুটা জটিল ও দুর্বোধ্য মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আচার্য শীল তাঁর বক্তব্য বিষয়কে আরও অনেক সহজ ও সরল ক'রে পাঠকদের কাছে তুলে ধরেছেন। আচার্য শীলের ভাষা, রচনারীতি, অধ্যায়-বিভাগ,—সব কিছুই সুন্দর ও সুপরিকল্পিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, আচার্য রায়ের Hindu Chemistry-র একটি বিস্তৃত অংশ[১৬] ব্রজেন্দ্রনাথের লেখা। সে অংশ অবশ্য ব্রজেন্দ্রনাথের Positive Sciences-এও স্থান পেয়েছে। কিন্তু Hindu Chemistry-র বিষয়-বিভাগ ও পরিকল্পনার দিকে তাকালে মনে হয়, ব্রজেন্দ্রনাথের অধ্যায়টি সংযুক্ত না হলে এ গ্রন্থ অপূর্ণ থেকে যেত।

এ ছাড়া গণিত নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রেও ব্রজেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অপরিসীম। বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ থাকার সময় তিনি রচনা করেন "A Memoir on the Coefficients of Numbers" (1891)। 'Theory of Number' সম্বন্ধে সুচিন্তিত আলোচনা আছে এতে। গণিতপ্রিয় কিশোর ব্রজেন্দ্রনাথ যৌবনে গণিতবিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্বকে কিভাবে অধিগত করেছিলেন, এ গ্রন্থে তার পরিচয় মিলবে। আর সাহিত্য-সমালোচনা সম্বন্ধে তাঁর প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও অভিনব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মিলবে "New Essays in Criticism" (1903) নামক গ্রন্থে। এ গ্রন্থে সংকলিত কীট্‌স্ সম্বন্ধে লেখা[১৭] প্রবন্ধটির একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি। অতি অল্পকথায় কীট্‌সের কবি-ধর্মকে ব্রজেন্দ্রনাথ কিভাবে প্রকাশ করেছেন, এ থেকে তার পরিচয় মিলবে। ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> "His poems, which are the outer symbols of a rich and varied mental history, have appeared as a sensuous panorama, a vista—boundless it may be—of sense-born imagination and appetite-born love".

"Rammohun Roy The Universal Man" (1956) ব্রজেন্দ্রনাথের আর-এক বিস্ময়কর কীর্তি। এ গ্রন্থটি হল রামমোহন রায় সম্পর্কে প্রদত্ত তাঁর দু'টি বক্তৃতার সংকলন। প্রথম বক্তৃতাটি তিনি দেন ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে। বাঙ্গালোরে রামমোহন রায়ের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এ আলোচনাটি করেন তিনি। দ্বিতীয় বক্তৃতাটি রামমোহনের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ৩১ শে ডিসেম্বর কলকাতায় প্রদত্ত হয়। রামমোহনের জীবনদর্শন নিয়ে এমন পরিপূর্ণ ও গভীর আলোচনা আর কেউ করেন নি। রামমোহনের উপর বিভিন্ন প্রকার ধর্মচিন্তার প্রভাব, নবযুগের পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার

---

১৪ Second edition. Revised and enlarged ; London, 1907.

১৫ Second edition. Revised and enlarged ; Calcutta, 1925.

১৬ বলবিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে হিন্দুদের ধারণা এবং হিন্দুদের বৈজ্ঞানিক রীতি নামক দু'টি অধ্যায়।

১৭ এ প্রবন্ধটির রচনাকাল ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ।

প্রভাব, বেদান্তদর্শনের সঙ্গে রামমোহনের যোগসূত্র, রামমোহনের বিশ্বাসভিত্তি, ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিগত ধর্ম, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সমন্বয়-সাধনা, শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কার এবং রামমোহনের বিশ্বমানবতাবোধ এখানে আলোচিত। এ আলোচনা থেকে নূতন এক রামমোহনকে আবিষ্কার করি আমরা; আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির নবজাগরণ-পর্বের পথিকৃৎকে খুঁজে পাই। এ ছাড়া ব্রজেন্দ্রনাথ যে ধর্মচিন্তার কত গভীরে অনুপ্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন "Comparative Studies in Vaishnavism and Christanity" (1899) নামক গ্রন্থে তার পরিচয় সুস্পষ্ট। আর সমাজবিজ্ঞানে তাঁর বিপুল পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর আছে দুই খণ্ডে প্রকাশিত 'Positive background of Hindu Sociology' (1914, 1921) নামক গ্রন্থে।[১৮]

এ ছাড়া বিশ্ব[১৯] ও ভারত-সংস্কৃতি[২০] সম্বন্ধেও তাঁর বহু রচনা আছে। দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মে তিনি যে কি বিপুল পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন, তার পরিচয় মিলবে, গীতার অনুবাদ ও ভাষ্য-রচনায় এবং রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্বন্ধে লেখা তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে। রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রেও তাঁর দৃষ্টি যে কতটা সুদূরপ্রসারী ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'British India and the Indian States'[২১] নামক রচনাটিতে। রাজনীতির ক্ষেত্রে আচার্য শীলের চিন্তাধারা বিপিনচন্দ্র পালকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।[২২]

আচার্য শীলের জীবন ও রচনা নিয়ে আলোচনা করলে দেখি, এইভাবে জ্ঞানজগতের বহু বিচিত্র দিক এবং স্বদেশ ও স্বজাতির বহু বিচিত্র সমস্যা নিয়ে তিনি ভেবেছেন, বলেছেন, লিখেছেন। কিন্তু সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য-রচনায়ও আচার্য শীল যে বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন, সে কথা আজ আমরা অনেকেই ভুলতে বসেছি। "The Quest Eternal" নামক গ্রন্থে সাহিত্যিক ব্রজেন্দ্রনাথকে খুঁজে পাওয়া যাবে। এটি হল ইংরেজীতে লেখা একখানি দার্শনিক কবিতার বই। তিনটি স্বতন্ত্র দার্শনিক অনুসন্ধান-সূত্র কবিতার আকারে এখানে বাণীবদ্ধ। মূল দার্শনিক চিন্তাক্রমকে কবিতার মধ্য দিয়ে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন—

> Art Thou the Prima Mater,
> Mother of Heaven and Earth?
> Ādyā-Shakti, Prakriti,[২৩]
> Or timeless, spaceless Aditi,[২৪]
> Witness of Time's birth?

---

১৮ এ গ্রন্থটি বি. কে. সরকারের সঙ্গে তিনি যুগ্মভাবে লেখেন।

১৯ Race Origins, Universal Races Congressএর ভাষণ এবং ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা 'War'.

২০ Three ideals : Modern Review, 1937.

২১ Modern Review : January, 1931.

২২ Modern Review : January, 1939.

২৩ সাংখ্য দর্শনের মতে এই প্রকৃতি থেকেই চেতন-অচেতন সব কিছুর সৃষ্টি।

২৪ ঋগ্বেদে অনন্তের প্রতীক।

এ বইটি ব্রজেন্দ্রনাথের যুবক-বয়সে লেখা। রচনাকাল ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু এটি প্রকাশিত হয় রচনার প্রায় ৪৫ বৎসর পরে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে। ব্রজেন্দ্রনাথ তখন কলকাতায় থাকেন। নানা রোগ-শোকে তিনি তখন জর্জরিত। স্ত্রী ইন্দুমতী গত হয়েছেন বহুদিন আগেই। একমাত্র কন্যা সরযূবালাও অকালে বিধবা হয়েছেন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথের জীবন আলোচনা করলে দেখি, জ্ঞান-জগতের আনন্দ-নিকেতনের অভিযাত্রী হয়ে বার বার জীবনের সকল দুঃখ-কষ্ট শোক-তাপ তিনি ভুলতে চেয়েছেন। এবং নিজে যে পথে শান্তি ও আনন্দ পেয়েছেন, আপন জনকেও পরিচালিত করেছেন সে পথে। বিধবা কন্যা সরযূবালাকে পাঠিয়েছেন বিলেতে, উচ্চশিক্ষা লাভের জন্যে।

তাই বলে ব্যক্তিগত দুঃখ-শোক কোনোদিন এই জ্ঞান-তপস্বীকে বিচলিত করতে পারে নি। সমস্ত অভাব-অভিযোগ ও বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও তিনি আপন জীবনের জ্ঞানের প্রদীপটিকে অনির্বাণ রেখেছিলেন।

মনস্বী ব্রজেন্দ্রনাথের এই একনিষ্ঠ জ্ঞান-সাধনা দেশের সুধী-সমাজের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৯ শে ডিসেম্বর ভারতীয় দর্শন-কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজন করা হল এক মহতী সম্বর্ধনা-সভার। উপলক্ষ, আচার্য শীলের ৭২ বৎসর পূর্তি। ঐ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ নীলরতন সরকার। রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে আচার্য শীলের উদ্দেশ্যে একটি অনুপম কবিতা[২৫] রচনা করে পাঠালেন।

এদিকে ব্রজেন্দ্রনাথের জীবনপ্রদীপ ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছিল। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর তিনি সকল প্রশস্তি ও প্রীতি-শ্রদ্ধার জগৎ থেকে চিরবিদায় নিলেন। সারা জীবনের সুকঠিন সাধনায় জ্ঞানের দুর্গম ঊর্ধ্বে উঠেছিলেন যে মহাতপস্বী তিনি মহাপ্রস্থান করলেন আরও দুর্গমতর ও ঊর্ধ্বতর কোনো এক অদৃশ্যলোকে। এই জ্ঞানসাধকের তিরোধানে বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষ সত্যিকারের একজন পণ্ডিত ও পরিপূর্ণ এক মানুষকে হারাল। আজ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বহু-বিচিত্র শ্রদ্ধার্ঘ্যের মধ্য দিয়ে সেই হারিয়ে যাওয়া জ্ঞান-তপস্বীকে নতুন করে খুঁজে পাবার চেষ্টা চলছে। কিন্তু আসল বিশ্বকোষ-প্রতিমকে অমন করে জানা যাবে কি? বিশ্বকোষের ভূমিকায় কি মূলের সত্যিকার পরিচয় মিলবে? জ্ঞানজগতের নব নব বিচিত্রলোকে যে জগৎপথিক অভিসারে বেরিয়েছেন, তাঁর যাত্রা-পথের নিশানা মিলবে কি?

২৫ মূল কবিতাটি ১৩৪২ সালের মাঘ সংখ্যা প্রবাসীতে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। মডার্ন রিভিয়ুতে (জানুয়ারী ১৯৩৬) কবিতাটির ইংরেজি তর্জমা প্রকাশিত হয়।

বিশ্বভারতী পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে উক্ত কবিতাটি মুদ্রিত হয়েছে।—স. বি-ভা-প

আদিশূরের কাহিনী

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

বাংলাদেশের ব্রাহ্মণসমাজে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাঁহাদের মধ্যে এবং বাংলার কায়স্থ ও বৈদ্যসমাজে কয়েকটি বংশকে কুলীন অর্থাৎ বংশমর্যাদায় উচ্চস্তরবর্তী গণ্য করা হয়, তাহা সকলেই অবগত আছেন। কুলপঞ্জিকার কিংবদন্তী অনুসারে সেনবংশীয় রাজা বল্লালসেন (আ° ১১৫৮-৭৯ খ্রী°) কর্তৃক বাংলার সমাজে কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল। কিন্তু সেন আমলের কোনো গ্রন্থ বা তাম্র-শাসনাদিতে কৌলীন্য প্রবর্তন বিষয়ক কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। তাই খ্যাতনামা ঐতিহাসিকগণ কুলপঞ্জিকার সাক্ষ্যে নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই।

কতকগুলি কুলপঞ্জিকায় পশ্চিম দেশের কান্যকুব্জ কিংবা কোলাঞ্চ নামক স্থান হইতে কুলীন ব্রাহ্মণের আদিপুরুষদিগের বাংলায় আগমন সম্পর্কিত একটি কাহিনী পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, তাঁহাদের পাদুকা ও ছত্র বহনকারী ভৃত্যরূপেই কুলীন কায়স্থের পূর্বপুরুষেরা এদেশে আসিয়াছিলেন। কুলপঞ্জিকার কাহিনী অনুসারে আদিশূর নামক জনৈক নরপতির আমন্ত্রণে ঐ ব্রাহ্মণগণ ভৃত্যবর্গসহ বাংলায় আসিয়া বাস স্থাপন করেন। এদেশে তৎকালে যজ্ঞাদি সম্পাদনে পারদর্শী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব ছিল বলিয়াই নাকি আদিশূর পশ্চিম হইতে ব্রাহ্মণ আনাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা এই কাহিনীতেও আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। তবে এখনও এদেশে আদিশূরের কাহিনীতে বিশ্বাসবান্ লেখকের অভাব নাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত প্রাচীন বাংলার প্রামাণ্য ইতিহাসে কুলপঞ্জিকার আদিশূর কাহিনী সমালোচিত হইয়াছে। বিভিন্ন কুলপঞ্জিকায় রাজা আদিশূরের বিবরণ ঠিক একরূপ দেখা যায় না। তাঁহার বংশপরিচয়ে সর্বত্র ঐকমত্য নাই। আবার কোথাও তিনি বাংলা ও উড়িষ্যার নরপতিরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন; কোথাও বা তাঁহাকে অঙ্গ, কলিঙ্গ, কর্ণাট, কেরল, কামরূপ, সৌরাষ্ট্র, মগধ, মালব, গুর্জর প্রভৃতি দেশের অধিপতি বলা হইয়াছে। কোনো গ্রন্থে দেখা যায়, আদিশূরের রাজধানী ছিল গৌড়ে; আবার অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, তিনি বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতেন। যে যজ্ঞাদি কার্য সম্পাদনের জন্য আদিশূর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে বাংলায় আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কুলপঞ্জিকায় অন্ততঃ ছয়টি বিভিন্ন মত দেখা যায়। আবার যে ব্রাহ্মণেরা এদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের নামেরও তিনটি স্বতন্ত্র তালিকা পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণদিগের আগমনের তারিখ সর্বত্র একরূপ নহে। বিভিন্ন কুলপঞ্জিকায় ৬৫৪, ৬৭৫, ৮০৪, ৮৫৪, ৮৬৪, ৯১৪, ৯৫৪, ৯৯৪ এবং ৯৯৯ শকাব্দ উহার তারিখ হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল কারণে স্পষ্টই বুঝা যায়, কুলপঞ্জিকার আদিশূর কাহিনী সর্বৈব সত্য হইতে পারে না। তবে ইহার মূলে সামান্য মাত্রও ঐতিহাসিক সত্য আছে কিনা, তাহা বিবেচ্য।

আধুনিক উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত কান্যকুব্জ, কোলাঞ্চ (ক্রোড়াঞ্চ), শ্রাবস্তি, মুক্তাবস্তু প্রভৃতি স্থান আদিমধ্যযুগে পণ্ডিত ব্রাহ্মণের বাসস্থানরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ঐ অঞ্চলের ব্রাহ্মণেরা বাংলাদেশ ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে গিয়া স্থানীয় রাজগণের নিকট হইতে ভূমিদান লাভ করিতেন এবং তত্তৎস্থানে

বসতি স্থাপন করিতেন। সে যুগের তাম্রশাসনে ইহার অনেক প্রমাণ আছে। আমরা অন্যত্র দেখাইয়াছি যে, বরেন্দ্রীদেশের উত্তরভাগে বর্তমান হিলি-বালুরঘাট অঞ্চলে পাহুনিযোজন নামক যে প্রাচীন জনপদ অবস্থিত ছিল, উত্তর প্রদেশের শ্রাবস্তিবাসী বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ সেখানে বাস স্থাপন করায় কালক্রমে উহার নাম শ্রবস্তি হইয়া যায়। যাহা হউক, এই অবস্থায় যদি আদিশূর নামক কোনো নরপতির আমন্ত্রণে কয়েকজন ব্রাহ্মণ কোনো এক সময়ে এদেশে আসিয়াছিলেন বলিয়া স্বীকার করাও যায়, তথাপি কেবলমাত্র তাঁহাদের উত্তর পুরুষগণেরই কৌলীন্যভাগী হইবার কোনো কারণ ছিল, এরূপ মনে করা কঠিন।

প্রবন্ধান্তরে আমরা দেখাইয়াছি যে, মধ্যযুগের মৈথিল ব্রাহ্মণ সমাজে যেভাবে কৌলীন্যের উদ্ভব হইয়াছিল, একাদশ শতাব্দীর তৃতীয়পাদে প্রদত্ত তৃতীয় বিগ্রহপালের বনগাঁও তাম্রশাসনে তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। ইহা হইতে জানা যায়, স্থানীয় মৈথিল ব্রাহ্মণেরা কোলাঞ্চ হইতে আগত ব্রাহ্মণদিগের সহিত আপনাদের রক্ত সম্পর্ক গর্বের সহিত প্রচার করিতেন এবং কোলাঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া জামাতাকে সম্পত্তিদানপূর্বক মিথিলাবাসী করিতে ব্যগ্র ছিলেন। তৃতীয় বিগ্রহপালের জনৈক মৈথিল ব্রাহ্মণ কর্মচারী সগর্বে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রপিতামহী একজন কোলাঞ্চ ব্রাহ্মণের পৌত্রী ছিলেন। আবার তিনি স্বীয় জায়গীরের অন্তর্গত একটি গ্রাম কোলাঞ্চাগত জনৈক ব্রাহ্মণ যুবককে দান করিয়াছিলেন। এই যুবক নরসিংহ নামক পণ্ডিতের ছাত্র এবং মীমাংসা, ব্যাকরণ ও তর্কশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার গোত্র শাণ্ডিল্য, প্রবর শাণ্ডিল্য-অসিত-দেবল এবং শাখা ছন্দোগ।

কৌলীন্য প্রথার জন্য বাংলাদেশ মিথিলার নিকট ঋণী, একথা কেহ কেহ বলিয়াছেন। আমরাও অপর একটি প্রবন্ধে দেখাইতে চাহিয়াছি যে, রাঢ়ীয় কুলীন সমাজের গাঙ্গুলী বা গঙ্গোপাধ্যায় মৈথিল গঙ্গৌলী মূলগ্রামীয় ব্রাহ্মণবংশের সহিত অভিন্ন। ইহাতে বাংলার কৌলীন্যপ্রথার সহিত মিথিলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সূচিত হয়।

বাংলাদেশের রাঢ় অঞ্চলে আদি মধ্যযুগে শূরবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন, তাহার প্রমাণ আছে। এই রাজবংশের রণশূর ও লক্ষ্মীশূর নামক দুইজন ক্ষুদ্র নৃপতির নাম জানা গিয়াছে। শূরবংশীয়া রাজকুমারী বিলাসদেবী সেনসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা বিজয়সেনের মহিষী এবং সুপ্রসিদ্ধ বল্লালসেনের জননী ছিলেন। কিন্তু রাঢ়ের এই শূররাজবংশে আদিশূর নামক কোনো নরপতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার কোনো প্রমাণ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। অথচ নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে মিথিলা অঞ্চলে জনৈক আদিশূরের রাজত্বের কিছু প্রমাণ আছে।

মৈথিল পণ্ডিত বাচস্পতিমিশ্রের 'ন্যায়সূচি' ৮৯৮ সংবৎ অর্থাৎ ৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। তাঁহার 'ন্যায়কণিকা' মণ্ডনমিশ্রকৃত 'বিধিবিবেক' গ্রন্থের টীকা। এই 'ন্যায়কণিকা'য় বাচস্পতি আদিশূর নামক সমসাময়িক নরপতির সম্পর্কে বলিয়াছেন— 'নিজভুজবীর্যমাস্থায় শূরানাদিশূরো জয়তি'। উল্লিখিত আদিশূর সম্ভবতঃ তদানীন্তন পাল সম্রাটের সামন্তরূপে মিথিলা-বরেন্দ্রী অঞ্চলের কোনো অংশ শাসন করিতেন। তাঁহার কোনো অজ্ঞাত কৃতকর্মের ফলে কুলপঞ্জিকায় কৌলীন্যপ্রথার উৎপত্তি বিষয়ক কাহিনীর সহিত তাঁহার নাম জড়িত হইতে পারে। কিন্তু কাহিনীটি যে মূলতঃ দক্ষিণ ভারত হইতে আমদানী করা হইয়াছিল, এইরূপ সন্দেহের কারণ আছে।

এ প্রসঙ্গে কন্নড, তেলুগু ও তামিলভাষী অঞ্চলে প্রচলিত কয়েকটি কিংবদন্তীর উল্লেখ করা যাইতে

পারে। এগুলির মধ্যে একটি তামিল উপকথার সহিতই আদিশূর কাহিনীর সাদৃশ্য সর্বাপেক্ষা অধিক।

কর্ণাটদেশের হাঙ্গলপ্রান্তীয় কদম্বরাজগণের লেখমালা অনুসারে কদম্বকুলের প্রতিষ্ঠাতা ময়ূরবর্মা কিংবা ত্রিলোচনকদম্ব হিমালয় অঞ্চল হইতে দক্ষিণ ভারতে গিয়াছিলেন এবং অহিচ্ছত্র নগর হইতে সদাচার-সম্পন্ন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আনাইয়া কুন্তলদেশে অর্থাৎ কর্ণাটকে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন। আবার বর্তমান আন্ধ্র প্রদেশে সদ্‌ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে মধ্যযুগীয় পল্লবরাজগণের লেখমালায় বলা হইয়াছে যে, ত্রিলোচনপল্লব নামক নরপতি অহিচ্ছত্র হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া শ্রীপর্বত বা শ্রীশৈলের পূর্বদিকে তাঁহাদিগকে স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই দুইটি কাহিনী একরূপ এবং ইহাদের অনৈতিহাসিকতায় কিছুমাত্র সন্দেহের কারণ নাই। প্রকৃতপক্ষে ময়ূরবর্মা বা ত্রিলোচনকদম্ব এবং ত্রিলোচনপল্লব ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহেন।

তামিলভাষী অঞ্চলে উচ্চশ্রেণীর অব্রাহ্মণ জাতিগুলিকে প্রধানতঃ কারুশিল্পী ও কৃষকভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। এই শ্রেণীদ্বয়ের নাম 'বামহস্ত' এবং 'দক্ষিণহস্ত'। 'বামহস্ত' (তামিল 'ইডঙ্গৈ') সমাজের উৎপত্তি সম্পর্কে মধ্যযুগীয় তাম্রশাসনাদিতে কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। চোলবংশীয় নরপতি তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গের রাজত্বকালীন (১১৭৮-১২১৬ খ্রী°) একখানি লেখ হইতে আমরা এতদ্বিষয়ক একটি কিংবদন্তী জানিতে পারি। বলা হইয়াছে যে, অরিন্দম নামক প্রাচীন চোল নৃপতি অন্তর্বেদী দেশ হইতে পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আনাইয়া তামিলভাষী অঞ্চলে স্থাপন করিয়াছিলেন এবং 'বামহস্ত' জাতিগুলির পূর্বপুরুষগণ তাঁহাদেরই পাদুকা ও ছত্রবাহী ভৃত্যরূপে দক্ষিণ ভারতে আসিয়া বর্তমান তিরুচিরাপল্লি (ত্রিচিনোপলী) জেলার পাঁচটি গ্রামে বসতি স্থাপন করে। রাজা অরিন্দম ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহেন। কিন্তু তৎকর্তৃক অন্তর্বেদীদেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে তদীয় ভৃত্যবর্গের সহিত চোলদেশে স্থাপন করিবার কাহিনীর সহিত আদিশূরের আমন্ত্রণে কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের বাংলায় আগমনের কাহিনীটির আশ্চর্যজনক মিল কাহারও দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 'ত্রিকাণ্ডশেষ' সংজ্ঞক অভিধানের মতে অন্তর্বেদীর অপর নাম কুশস্থলী এবং কান্যকুব্জ ও কুশস্থল একই স্থানের নাম। সুতরাং চোল রাজ্য এবং বাংলাদেশে বাসস্থাপনকারী ব্রাহ্মণ ও শূদ্রগণের আদিবাস একই অঞ্চলে অবস্থিত ছিল।

বাংলা বিহারের পালবংশীয় সম্রাটেরা অনেকেই দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূট রাজগণের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। এই সূত্রে অনেক দক্ষিণভারতীয় রাজপুত্র ও সেনানায়ক পালরাজগণের সামন্ত বা কর্মচারীরূপে পূর্বভারতে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিতে' তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। আবার দেবপালের সময় (আ° ৮১০-৫০ খ্রী°) হইতে পাল সেনাদলে কর্ণাটদেশীয় সৈন্যের স্থান হইয়াছিল। পরবর্তীকালে পাল সম্রাট্‌গণ চোলদেশ হইতেও সেনা সংগ্রহ করিতেন বলিয়া জানিতে পারি। এদিকে বাংলার সেনরাজগণ মূলতঃ কর্ণাটদেশীয় ছিলেন। যেমন ভারতের মুসলমান রাজাদিগের সভায় পৃথিবীর সর্বাঞ্চলের মুসলমান সমাদরের সহিত আশ্রয় পাইত, সেনরাজসভায় সেইরূপ অনেক দক্ষিণ-ভারতীয়ের স্থান হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সূত্রে তামিলদেশের অরিন্দম কাহিনীটি বাংলায় প্রবেশ করিয়া পরবর্তীকালে আদিশূরের কিংবদন্তীতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। আদিশূরের কাহিনী অরিন্দমকাহিনীর ন্যায় প্রাচীন নহে। বাংলাদেশ হইতে গিয়া আদিশূরের গল্পটি চোলদেশে

অরিন্দমের উপকথায় পরিণত হইয়াছিল, এরূপ অনুমানের কোনো কারণ নাই। যাহা হউক, সকল দিক বিবেচনা করিয়া মনে হয়, আদিশূর কর্তৃক কান্যকুব্জ বা কোলাঞ্চ হইতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আনয়ন এবং বল্লালসেন কর্তৃক পরবর্তীকালে তাঁহাদের উত্তরপুরুষগণকে কৌলীন্য মর্যাদা দান, এই কাহিনীদ্বয়ের মূলে ঐতিহাসিক সত্য কিছু নাই। বরং দক্ষিণভারতীয় বল্লালের সহিত কৌলীন্য সৃষ্টির সম্পর্ক কল্পনায় তৎসম্পর্কিত আদিশূর কাহিনীর উপর দক্ষিণ ভারতীয় প্রভাব সূচিত হয় কিনা, তাহা বিবেচ্য।

কোনো কোনো বৈদ্য কুলপঞ্জিকায় বলা হইয়াছে যে, বল্লালসেন নামক বৈদ্যজাতীয় জনৈক প্রাচীন নরপতি বাংলার বৈদ্যসমাজে কৌলীন্য প্রবর্তিত করিয়াছিলেন এবং এই বৈদ্যজাতি মনুসংহিতায় উল্লিখিত অম্বষ্ঠ জাতির সহিত অভিন্ন। ইহা যদি সত্য হইত, তবে সমস্ত বৈদ্যকুলপঞ্জিকাতেই ইহার উল্লেখ থাকিত। কিন্তু কবিকণ্ঠহারের 'সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা' এবং ভরতমল্লিকের 'চন্দ্রপ্রভা'তে এই সম্বন্ধে ঐকমত্য দেখা যায় না। বাংলাদেশ ব্যতীত ভারতের অন্যত্র চিকিৎসাব্যবসায়ীরা কোনো নির্দিষ্ট জাতিতে পরিণত হন নাই। আমরা প্রবন্ধান্তরে দেখাইতে চাহিয়াছি যে, দক্ষিণ ভারতের ক্ষৌরকারগণ বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ নামে পরিচিত এবং আদি মধ্যযুগে তাহাদের বাংলাদেশে বসতি স্থাপনের সহিত এদেশে সঙ্ঘবদ্ধ বৈদ্যজাতি গড়িয়া উঠিবার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে।*

---

* বর্তমান প্রবন্ধে যে সকল পূর্বালোচিত বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, তজ্জন্য পাঠকগণ নিম্নলিখিত প্রবন্ধাবলী পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন।—

1. Spread of Aryanism in Bengal, *Journal, Asiatic Society*, Letters, Vol. XVIII, 1952, pp. 171ff.
2. The Ambashtha Jati, *Journal, U. P. Historical Society*, Vol. XVIII, pp. 148ff.
3. Bangaon Plate of Vigrahapala III, Regnal Year 17, *Ep. Ind.*, Vol. XXIX, pp. 48ff; cf. Vol. XXX, pp. 42-43.
4. The Kolagallu and Kudatini Inscriptions, 967 and 971 A.D., *Indian Historical Quarterly*, Vol. XXXVI, pp. 194ff.
5. A Sanskrit-Maithili Document of the time of Muhammad Shah, A.D. 1730, *Proceedings, Indian Historical Records Commission*, Vol. XVIII, pp. 87ff. ইত্যাদি

ভুতুড়ে জগৎ

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

জগতের অন্তঃস্থল খুঁজতে খুঁজতে, খুঁড়তে খুঁড়তে আজ আমরা এমন একটা স্তরে বা লোকে পৌঁছে গিয়েছি যাকে বৈজ্ঞানিকেরা নিজেরাই নাম দিয়েছেন "ভুতুড়ে"— কেন, কি হেতু, কি ধরণে ভুতুড়ে সেই ইতিবৃত্ত একটু বলতে চেষ্টা করব আজ।

একটু আদি পর্ব থেকেই শুরু করি তবে। জড়ের যে অন্তিম অবিভাজ্য কণা— অণোরণীয়ান্,— যা দিয়ে গড়া এই বিশ্বসৃষ্টি তার দুটি গুণ থাকা দরকার— হয় দুটি ; না হয় অন্ততঃ একটি। এ গুণ হল, ১. ভর (mass)[১], আর ২. বৈদ্যুতমাত্রা। জড়ের মূলকণা সর্বোপরি প্রধান তিনটি— এই তিনটির নানা পরিমাণের সংযোগে তৈরি বিচিত্র জড়-জগৎ। তিনটির নাম ১. প্রোটন, ২. নিউট্রন, ৩. ইলেকট্রন। প্রোটনের দুটি গুণই আছে, ভর ও বৈদ্যুতমাত্রা ; নিউট্রনের একটি গুণ, ভর ; আর ইলেকট্রনেরও আছে একটি গুণ কার্যত, বৈদ্যুতমাত্রা, (ভর প্রায় নাস্তি— প্রোটন অথবা নিউট্রনের ভরের দু' হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র)। তবে প্রোটনের বৈদ্যুতমাত্রা হল যোগ (পজিটিভ), আর ইলেকট্রনের হল বিয়োগ (নেগেটিভ)।

কণাদের আবিষ্কার-ইতিহাস এক বিচিত্র ব্যাপার। প্রথমে এরা অনুমিত হয়, সম্ভাবনা হিসাবে, তার পর কার্যত এদের অস্তিত্ব প্রমাণ হয়। পরিচিত কণাদের গতিবিধির মধ্যে কিছু ফাঁক প্রথমে লক্ষিত হয়, একটা কিছু গরমিল ধরা পড়ে, তখন সেই ফাঁকটি বন্ধ করবার জন্যে প্রথমে কল্পিত হয় একটা বস্তু— যে গুণ কর্ম আকারের বস্তু হলে ফাঁকটি ঠিক ঠিক বুঁজে যায় (a round peg in a round hole)। জ্যোতিষ-জগতে অনেক গ্রহ এই ভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে— নেপচুন, প্লুটো, আরও অনেকে গণিতের সন্তান।

বলেছি, তিনশ্রেণীর মূলকণা দিয়ে বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির অর্থাৎ সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের আরম্ভ। কিন্তু পর পর আরও কতগুলি জুটে গেল। চতুর্থ এক কণা বিপুল কোলাহল, একটা যুগান্তরই ঘটিয়েছে বিজ্ঞান-জগতে ; নাম হল মেসন (meson) ; এর আবিষ্কর্তা নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত জাপানি বৈজ্ঞানিক ইউকাওয়া (YuKawa)।

মেসনের আবিষ্কার-কাহিনী এখানে বলি একটু। আবিষ্কারের ইতিহাস যা সচরাচর হয় বলেছি ; একটা ফাঁক বা গর্ত আবিষ্কার আর সেই গর্ত পূরণ করবার উপায়-অন্বেষণ বর্তমান ক্ষেত্রে এ চিত্রটি বেশ সুন্দর দেখা যাবে।

আমরা এসে পৌঁছেছি পরমাণুর কেন্দ্রে, আবিষ্কার করেছি কেন্দ্রটি শুধু প্রোটন (বা প্রোটন-সমষ্টি) নয়, তা হল প্রোটন এবং নিউট্রন এ দুয়ের সমবায়। প্রত্যেক বিশেষ মৌলিকের (element)।

পরমাণু-কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যা একই অপরিবর্তনীয় ; কিন্তু নিউট্রনের সংখ্যা বিভিন্ন হতে পারে। কোনো মৌলিক কণার প্রোটন ও ইলেকট্রন সংখ্যা সমান। এই সংখ্যাই (atomic number)

---

১ Mass = ভর ; Weight = ভার, ওজন।

মৌলিকের স্থান নির্ধারিত করে মৌলিকের তালিকায়— এক নম্বর হল হাইড্রোজেন আর শেষ প্রান্তে ইউরেনিয়াম (যা হল অ্যাটম বোমার মশলা), নম্বর বিরানব্বই— বিরানব্বইর পরেও কয়েকটি মৌলিকের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্তু তারা একান্ত ক্ষণস্থায়ী— নৈমিষিক। একই মৌলিক কণার ভার বিভিন্ন রকমের হতে পারে এই নিউট্রনের সংখ্যার ন্যূনাধিক্যের জন্য— এদের নাম isotope, আইসোটোপ (সমগোত্রীয়)। এরই ফলে পাই যাকে বলা হয় ভারী জল[২]— যে রকম জলের প্রয়োজন অ্যাটম-বোমা তৈরি করবার জন্য। প্রোটন হল ভারী আর যোগ-বিদ্যুতমাত্রিক আর নিউটন হল ভারী বটে কিন্তু বিদ্যুত-মাত্রাবর্জিত। এখন প্রশ্ন উঠল, এই যে দু-রকম কণার সংযোগে পরমাণু-কেন্দ্র, এরা পরস্পর সংযুক্ত ও সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে কোন শক্তির বলে, কোন মধ্যবর্তীর সহায়ে? যার কল্যাণে এরা দুটিতে মিলেমিশে একাত্ম হয়ে আছে কেন্দ্রের মধ্যে তা নিশ্চয়ই বিভীষণ জোরালো হবে। দুটিকে পৃথক করতে কি পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করতে হয় তা দিয়ে বুঝতে পারি। যে শক্তিব্যয়ে দুটি মৌলিকে মিশে একটা রাসায়নিক সংযোগ ঘটায় অথবা বিপরীত প্রক্রিয়ায় একটা রাসায়নিক যৌগিককে ভেঙে বিশ্লিষ্ট করা যায়, তার চেয়ে সহস্র গুন বেশি শক্তির প্রয়োজন পরমাণু-কেন্দ্র বিশ্লেষণের জন্য।

এমন একটা শক্তি বা বস্তু কি আছে তবে? জাপানি বৈজ্ঞানিক অনেক হিসেব-নিকেশ করে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে পৌছলেন যে এমন একটা পদার্থকণা দরকার যার ভর থাকবে ইলেকট্রন আর প্রোটনের ভরের মাঝামাঝি, তবে তার বৈদ্যুতমাত্রা বিভিন্ন ধরণের হতে পারে, যোগ বিয়োগ বা শূন্য। এ রকম কণা বাস্তবিক ও তৈরি হল এবং বাস্তবেও মিলে গেল। এরই নাম বলেছি মেসন।

কিন্তু মেসনের গোষ্ঠী খুঁজতে খুঁজতে আরও বিবিধ কণা পাওয়া গিয়েছে। বৈদ্যুতমাত্রার পার্থক্য ছাড়াও ভর হিসাবে দুই শ্রেণীর মেসন আবিষ্কার হয়েছে, ১. যেগুলি বেশি ভরের, তাদের নাম পিয়ন বা পাই মেসন (Pion-Pi Meson) আর ২. যেগুলি কিছুটা কমভরের, তারা হল মুয়ন বা মিউমেসন (Mu Meson)। নিউট্রন বা প্রোটনের চেয়েও অনেক বেশি ভারী কণা পাওয়া গিয়েছে যাদের নাম হয়েছে 'হাইপেরন' (Hyperon)।[৩] তবে সবচেয়ে মজার এক কণা পাওয়া গিয়েছে শেষপ্রান্তে যার বৈদ্যুতমাত্রা শূন্য এবং ভরও শূন্য— অর্থাৎ বস্তু হিসাবে প্রায় নাস্তি। এরা আলো-কণার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, আলো-কণাও বৈদ্যুত-মাত্রাশূন্য এবং ভরশূন্য— তবে আলো-কণার স্থিতি আছে, স্থায়িত্ব আছে, এদের তা নেই। কি আছে তবে? এ সব কণা বা বিন্দু পরিমাণে যেমন অণুতম এদের স্থিতিও তেমনি নৈমিষিক অর্থাৎ এক সেকেণ্ডেরও লক্ষ বা কোটি ভাগের এক ভাগ। এই গণনাও এক বিচিত্র ব্যাপার। এরা যেন জ্যামিতিক বিন্দু, আছে একটা অলক্ষিত শক্তি বা গতি-অশরীরী প্রভাবসম্পন্ন এই অ-পদার্থকেই বলা হয় ভুতুড়ে বিন্দু, এদের নিয়েই ভুতুড়ে জগৎ। আরও বলছি পরে এ সম্বন্ধে।

---

২ হাইড্রোজেন পরমাণু-কেন্দ্র গঠিত শুধু একটি প্রোটন দিয়ে আর তার চারদিকে ঘুরছে একটিমাত্র ইলেকট্রন। ভারী হাইড্রোজেন (deuterium) হবে যখন প্রোটনটির সঙ্গে থাকে একটি নিউট্রন। দুটি নিউট্রনও থাকতে পারে প্রোটনটির সঙ্গে —এ হবে আরও ভারী হাইড্রোজেন (tritium) পরমাণু। বলেছি প্রত্যেক মৌলিক পরমাণুতে প্রোটন-সংখ্যা ও ইলেকট্রন-সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে। প্রোটন-সংখ্যা বেশি হলে (সুতরাং ইলেকট্রন-সংখ্যাও বেশি হবে) পরমাণুটি পরিবর্তিত হয় আর একটি মৌলিকে যেমন দুটি প্রোটন (সুতরাং দুটি ইলেকট্রন) হলে তা আর হাইড্রোজেন থাকে না, হয়ে পড়ে হিলিয়াম।

৩. নিউট্রন ও প্রোটনকে বলা হয় নিউক্লিয়ন (Nucleon) বা "কেন্দ্রিণ", পরমাণুর কেন্দ্রগত কণা বলে।

এই রকমে দুই জাতীয় মূলকণা আবিষ্কৃত হল, এক, বস্তু-কণা আর এক মশলা-কণা, অর্থাৎ ইঁট জাতীয় আর সুরকি জাতীয়—এক, খণ্ডাংশ প্রত্যঙ্গ উপাঙ্গ উপাদান আর তা জুড়বার জন্য উপকরণ। বস্তু হল তিনটি, ১. ইলেকট্রন, ২. প্রোটন, ৩. নিউট্রন; আর মশলা হল ১. মেসন এবং মেসন-জাতীয়, ২. ফোটন (Photon) বা আলো-কণা। সুরকির বেঁধে রাখবার কাজ কিরকম? মেসন হল সুরকি। প্রোটন ও নিউট্রনকে মেসন কিরকমে বেঁধে রাখে? পরমাণু-কেন্দ্র প্রোটন (+নিউট্রন) আর তার চার দিকে ঘুরছে যে ইলেকট্রন, এদের বৈদ্যুতমাত্রা বিভিন্ন-জাতীয় (যোগ এবং বিয়োগ)। এই হেতু এরা পরস্পরে আকৃষ্ট; ফলে পরমাণু অটুট অখণ্ড থাকে, বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে না। মেসন প্রোটন নিউট্রনকে বেঁধে রাখে আর-এক রকমে। সে প্রোটন থেকে নিউট্রনে এবং নিউট্রন থেকে প্রোটনে চলাফেরা করে (মাকুর মত কি মাকড়সার মত), একটা জাল তৈরি করে দেয় দুই কণার মধ্যে যাতে তারা বাঁধা পড়ে।

এখন আরও একটু গভীর গহনে প্রবেশ করতে হবে। কারণ কণাদের আরও বিচিত্র স্বভাব রয়েছে। শুধু দুই শ্রেণীর নয়, ইঁট ও সুরকি— দুই ধর্মের, বিপরীত ধর্মের কণা রয়েছে, বাদী ও বিবাদী, পক্ষ ও বিপক্ষ, সহজ ও বিপরীত। সহজ হল সহজ অবস্থায় সচরাচর যে গুণ-ধর্মের কণা পাওয়া যায়, বিপরীত হল বিপরীত গুণ-ধর্মের কণা। এই বৈপরীত্য নির্ধারিত হয় তিন রকমে— ১. বৈদ্যুতমাত্রা দিয়ে, ২. ভর দিয়ে এবং ৩. গতিমুখ দিয়ে। প্রথম যে বিপরীত কণা তা আবিষ্কার হয় বহুপূর্বে, ইলেকট্রনের বিপরীত— ইলেকট্রনের ভর নেই কিন্তু আছে বিয়োগ-বিদ্যুৎ; কিন্তু পাওয়া গেল এমন কণা যার ভর নাই বটে কিন্তু আছে যোগ-বিদ্যুৎ। এর নাম দেওয়া হল পজিট্রন। ফলত আলো-কণা বিশ্লেষণ করেই পাওয়া গেল পজিট্রন ও ইলেকট্রন (জল যেমন অক্সিজেন+হাইড্রোজেন)। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন একসঙ্গে মিলিয়ে তার ভিতর দিয়ে যদি বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালিয়ে দেওয়া যায় তবে তা জলে পরিণত হয়, সেই রকম পজিট্রন আর ইলেকট্রন একসঙ্গে মিলিয়ে যদি সেকেণ্ডে পৌনে দুই লক্ষ মাইল (প্রায়) বেগে চালিয়ে দেওয়া যায় তবে তা দেখা যায় আলো-কণারূপে।[৪] ইলেকট্রনের বিবাদী (anti) হল তবে পজিট্রন, প্রোটনের বিবাদী কি হবে? হবে ভারী ইলেকট্রন। আর নিউট্রনের বেলায় কি হবে? বিবাদী নিউট্রন কি? পূর্বে বলেছি এক কণা আছে, নিউট্রনের মত যার কোনো বৈদ্যুতমাত্রা নাই কিন্তু নিউট্রনের আছে যে ভর তাও নেই এর। একেই বলেছি, এরই নাম দেওয়া হয়েছে ভুতুড়ে কণা (Ghost particle), নিউট্রিনো। কিন্তু নিউট্রিনো নিউট্রনের বিবাদী নয়, নিউট্রন ও নিউট্রিনো বাদী পক্ষে, বিবাদী পক্ষে হবে anti-নিউট্রন, anti-নিউট্রিনো। এই বিবাদীকণা দুটি নিয়ে যায় আর এক রহস্য পর্যায়ে। কণার গতিমুখের রহস্য। গ্রহের মত কণারও আছে দুটি গতি, প্রতি কণার একটা কক্ষ আছে তাই ধরে চলে, যেমন ইলেকট্রনেরা একটা প্রোটনকে ঘিরে চলতে থাকে, পৃথক পৃথক কক্ষে; কিন্তু তাদের গতি এক দিকে অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার মত দক্ষিণাবর্ত। প্রত্যেক কণার আছে আবার নিজের চার দিকে ঘূর্ণন— গ্রহেরই মত লাট্টুর পাক যেমন। তবে এই যে ঘূর্ণি বা পাক

৪ আলো-কণা একটু বিচিত্র রকমের বস্তু-জড়ের সীমানা ছাড়িয়ে গিয়েছে অথচ সম্পূর্ণ অ-জড় হয়ে যায় নি— রূপান্তরিত জড় (dematerialised matter— জড়ত্বমুক্ত জড়)। জড়ের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তার উপর কাজ করে— আইনস্টাইনের পরীক্ষায় তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে— সুদূর তারা থেকে আলো-রেখা সূর্যের পাশ দিয়ে যায় যখন তখন যায় সূর্যের কাছ ঘেঁষে বেঁকে— অর্থাৎ সূর্য তাকে আকৃষ্ট করে— জড় যেমন জড়বস্তুকে আকৃষ্ট করে।

দুই দিক দিয়ে হতে পারে বাঁ দিক দিয়ে কি ডান দিক দিয়ে, ঘড়ির কাঁটার মত কিংবা তার বিপরীত। নিউট্রনের এবং নিউট্রিনোর ঘূর্ণি হল দক্ষিণাবর্ত, এদের বিবাদী কণার ঘূর্ণি হল বামাবর্ত।

এই যে ঘূর্ণি, কণাকে তা দেয় একটা বিশেষ গুণ বা ধর্ম। এর দৌলতেই তার হয় চৌম্বকশক্তি। তবে সকল কণারই যে ঘূর্ণি আছে তা নয়, ঘূর্ণিহীন কণাও আছে। তবে ঘূর্ণির পরিমাণ হতে পারে আবার দুরকমের, পুরোপুরি গোটা একটা ঘূর্ণি অথবা অর্ধ ঘূর্ণি। আলো-কণার হল পূর্ণ ঘূর্ণি আর প্রোটন, ইলেকট্রন, নিউট্রন, মেসনের এক এক শ্রেণী যাদের নাম Mu Meson বা মুয়ন (Muon) এদের সকলেরই অর্ধ-ঘূর্ণি। ভারী মেসন (যাদের বলেছি Pi Mason বা পিয়ন) তাদের ঘূর্ণি নেই। যাদের অর্ধ-ঘূর্ণি তাদের নাম দেওয়া হয়েছে ফেরমিয়ণ (Fermion), ইতালীয় বৈজ্ঞানিক ফের্মির (Fermi) নামে। আর যাদের ঘূর্ণি পুরো পাক বা ঘূর্ণি আদৌ নাই তাদের নাম বোসন। (Boson) আমাদের স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুর (Bose) নাম থেকে।[৫]

কণাদের বস্তুর দিকটা বলেছি এতক্ষণ, তাদের শক্তির দিকটাও এখন তবে কিছু বলতে হয়। বস্তুর দিক দিয়ে পেয়ে গিয়েছি এমন কণা যা প্রায় অ-বস্তু বা নির্বস্তু; কিন্তু শক্তিবেগ সকলেরই আছে কোনো না কোনো রকমে।

আধুনিক বিজ্ঞান তিন রকম শক্তিবেগের সন্ধান পেয়েছে : এক, সবচেয়ে প্রকট, সবচেয়ে ক্ষীণবল, সবচেয়ে দূরগামী— এ হল যাকে সাধারণতঃ বলা হয় মাধ্যাকর্ষণ, তবে শুধু পার্থিব আকর্ষণ নয়, এ হল বিশ্বাকর্ষণ (gravitation)। এ আকর্ষণ বিশ্বাকাশের মধ্যে অবস্থিত ছোটবড় সকল জড়পিণ্ডের পরস্পরের আকর্ষণ। এর পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্পতর ; এর জোর নির্ভর করে পিণ্ডের আকার ও ভরের উপর। দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তিবেগ হল বৈদ্যুতিক এবং চৌম্বিক ; এদের শক্তি বেশি, ক্রিয়াবল অধিকতর কিন্তু সংকীর্ণতর সীমানা বা পরিধির মধ্যে আবদ্ধ, এদের ক্ষেত্র প্রথমটির মত দূরগামী নয়। তৃতীয় শ্রেণী হল আদি-পরমাণুগত শক্তি— পরমাণুর কেন্দ্রগত কণাদের মধ্যে যে শক্তি অন্তর্লীন বা প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল। এই শক্তি সর্বাপেক্ষা শক্তিমান— আণবিক বোমা এর পরিচয়। এই শক্তির বলেই এই শক্তিকে সক্রিয় করে আশ্রয় করে আমরা আজ ব্যোমচারী গ্রহগামী হয়ে উঠেছি ; কিন্তু এই শক্তির উদ্ভব বা আদিকেন্দ্র অতি সংকীর্ণ বিন্দুর মধ্যে।

আধুনিক বিজ্ঞানের সমস্যা চলেছে এই শক্তিত্রয়কে কিরকমে একই শক্তিতে পরিণত করা যায়, একই সূত্রের মধ্যে এই ত্রি-ধারাকে বেঁধে রাখা যায় ; যেমন আর-এক দিকে আনুষঙ্গিক সমস্যা হল কিরকমে কণা ও তরঙ্গের ধর্মকে মিলিয়ে ধরা যায়। জড়ের মূলরূপ পরমাণু বা অতি-পরমাণু, কিন্তু এরা শুধু কণামাত্র অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম জড়খণ্ড মাত্র নয়, তারা আবার এক-একটি তরঙ্গের মত। এই দুই তথ্যকে কিরকমে এক তথ্যের মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া যায়। এ গবেষণার পাকা মীমাংসা এখনও হয় নি। আইনস্টাইন একটা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন— তাঁর ক্ষেত্রতত্ত্ব, কিন্তু এখনও এ সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হয়ে ওঠে নি। আইনস্টাইনের সিদ্ধান্ত

---

৫ "অবশ্য এ কথা উল্লেখ করা ভাল যে 'ফের্মিয়ন' ও 'বোসন' নাম শুধু আদি ও অন্ততম কণাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। কেন্দ্রীন-ই হোক, আর অণু, পরমাণুই (Molecule, atom) হোক— যে কোনো কণার সমগ্র ঘূর্ণিমান যদি শূন্য অথবা কোনো পূর্ণসংখ্যা (১, ২, ৩ ইত্যাদি) হয়, তবে তার নাম হবে 'বোসন' ; অপর পক্ষে, ঘূর্ণসংখ্যা অর্ধের বিজোড় গুণিতক (যেমন ১½, ২½,...) হলে, কণাটিকে বলা হবে 'ফের্মিয়ন'।"

আমার অনৈক বৈজ্ঞানিক পাঠক-বন্ধুর মন্তব্য।

এই কণা বা ঢেউ বা মূল শক্তিত্রয়ের স্বরূপ হল একটা ক্ষেত্রে বা দেশের প্রসারে টান বা আকুঞ্চনমাত্র। আধুনিক নিউট্রিনো কতকটা এই রকম সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত দেয়। বলেছি নিউট্রিনোর ভর নাই, বিদ্যুতমাত্রা নাই, এবং কণার আর একটা যে গুণ, ঘূর্ণি (আত্মপ্রদক্ষিণ) তা পর্যন্ত নাই। তবুও তা একটি শক্তির কেন্দ্র এবং এই শক্তি আকাশের একটা জট বা আকুঞ্চন ছাড়া আর কি হবে? আকাশ যেখানটায় একটু কুঁচকে গিয়েছে, সেখানে একটা টান পড়েছে, তাই বস্তুকণারূপে তরঙ্গরূপে প্রকর্ষণরূপে প্রতিভাত হয়।

আধুনিকের, আধুনিকতমের পরমকৌতূহলকর গবেষণা হল যাদের আমরা বলেছি বিবাদী-কণা তাদের নিয়ে। এদের ঠিক ঠিক কি সার্থকতা, কি কার্যকারিতা?

ক্ষুদ্র হোক, সূক্ষ্ম হোক, অস্থায়ী হোক, ভুতুড়ে হোক— সব কণাকেই প্রয়োজনীয় উপাদান বলে গ্রহণ করতে হয়— সৃষ্টির ইমারতটি গড়ে তুলবার জন্যে; ধরে রাখবার জন্যে এদের অস্তিত্ব; কিন্তু বিবাদী-কণাদের কি আবশ্যকতা? তাদের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি কি ব্যতিক্রম ঘটায় বা ঘটাতে পারে? মুখ্য দু-একটা বিবাদীকণার কার্যকারিতা বা সার্থকতা ধরা যায় কিন্তু বাকি আর সকল প্রায় ধোঁয়াটে রহস্য। কখনও বলা হয় এই বিবাদী বা বামা-কণাগুলি বর্তমান জড়-সৃষ্টির সামান্য অংশ, তবে একদিন হয়তো এদের পরিমাণ আরও বেশি ছিল, উভয়ে ছিল সমান সমানই। আবার এমনও বলা হয়, এদেরই পরিমাণ হয়তো ছিল বেশি কিম্বা এরাই ছিল সর্বেসর্বা— দক্ষিণা-কণাগুলি যদি স্থিতিলাভ করে থাকে, স্থায়ী হয়ে থাকে তবে তার অর্থ বামা-কণাই দক্ষিণা-কণায় পরিণত হয়েছে। সৃষ্টির বিবর্তন অর্থ এই পরিণাম-ধারা। সৃষ্টির সৃষ্টি সম্বন্ধে একটা মতবাদ ছিল ও আছে যে আদিতে জড়-জগৎ ছিল একটা ধূম্ররূপ চলচঞ্চল নীহারিকা। ক্রমে তা সংহত হয়েছে, যা ছিল বিক্ষিপ্ত অস্থির তা একত্রিত হয়েছে স্থিরতর ঘনতর হয়ে উঠেছে— সেই আদি নীহারিকা কি এই বিবাদী-কণার সমষ্টি নয়? অনেকেই আবার বলেন এই বিবাদী-কণার সমষ্টি নিয়ে একটা সৃষ্টি (galaxy) হয়তো এখনও অনন্তের বুকে, ব্যোমের কোথাও কোনো কোণে রয়েছে।

বিশ্বসৃষ্টির একটা ধর্ম একটা বিশিষ্ট গতি আজকাল আবিষ্কৃত হয়েছে, নির্ধারিত হয়েছে তা হল সম্প্রসারণ (expansion)। বিশ্বের জড়-সমষ্টিটা ক্রমেই প্রসারিত হয়ে চলেছে, এর উপাদানগুলি ছড়িয়ে পড়ছে, তাদের পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান বেড়ে চলেছে। মনে হয় যেন আদিতে এক সময়ে সৃষ্টি ছিল একটা সংহত পিণ্ড যাকেই বলা হয় ব্রহ্মাণ্ড, অর্থাৎ অণ্ডাকৃতি, তা ফেটে যেন বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে, খণ্ডিত উপকরণগুলি বিক্ষিপ্ত হয়ে চলে গিয়েছে, ক্রমাগত দূর হতে দূরে সরে চলেছে। এ একটা বিস্ফোরণের মত— হয়তো এর স্বরূপ হল আদি মূল-কণা-শক্তির বিচ্ছুরণ যেমন এখনও সূর্যমণ্ডলে এ রকম একটি ক্রিয়া চলেছে।

কিন্তু একটা বিচিত্র কথা উঠেছে এই যে সম্প্রসারণ, এ শুধু কেন্দ্রস্থ কণাগত বিস্ফোরণ নাও হতে পারে— বৃহত্তর পিণ্ডের মধ্যে পরস্পরের কেবল কি আকর্ষণই আছে? মাধ্যাকর্ষণ কেবল আকর্ষণই?— বিবাদী জড়-কণার মত বিবাদী মাধ্যাকর্ষণশক্তির (anti-gravity) সম্ভাবনা আছে বলা শুরু হয়েছে— গ্রহ-নক্ষত্ররা কেবল টেনে ধরে না, ঠেলেও দেয় পরস্পরকে যদিও এখন পর্যন্ত এ সিদ্ধান্তের স্পষ্ট প্রমাণ দুর্লভ, কেবল জল্পনা।

ফলত এই রূপ কাল্পনিক গবেষণা বেশ চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। আচ্ছা, এই যত বিবাদী কণা বা শক্তি কেবল এদেরই নিয়ে তৈরি একটা জগৎ যদি থাকে তবে তার স্বরূপ ও স্বধর্ম কি হয়? বিবাদীদের

মণ্ডল কি শূন্য নয়, প্রলয় নয়, সব বিয়োগ-মাত্রার সমাহার স্থষ্টি না বিনষ্টি? তবে কথা অন্য রকমেরও হতে পারে।

দুটি শ্রেণীর নাম স্বম্বাদী জগৎ ও বিবাদী জগৎ না হয় দিলাম, এদের লক্ষণ (চিহ্ন, sign) বিভিন্ন, যোগ ও বিয়োগ (positive and negative), কিন্তু ধর্ম কর্ম কি একই হবে না? তুলনা করা হয় প্রতিবিম্বের উদাহরণ দিয়ে—আয়নাতে আমরা প্রতিবিম্ব যখন দেখি তখন তা হয় বিপরীত— ডান দিক প্রতিফলিত হয় বাম দিক হয়ে, বাম দিক দেখা দেয় ডান দিক হয়ে। আসলে ও প্রতিবিম্বতে, উভয়ের গতিবিধিতে নিয়মে কিছু পার্থক্য আছে? সহজ হিসাবে মনে হয় কিছু নাই কিন্তু সন্দেহ তোলা হয়েছে, কিছু আছে। অন্য দিকে বলেছি, অন্য সন্দেহও রয়েছে, বিবাদী কণার জগৎ অর্থ স্থষ্টি নয়, বিনষ্টি। আমরা জানি বৌদ্ধরা এক পরম শূন্য আবিষ্কার করেছিলেন, তা হল উর্ধ্বে চিন্ময় শূন্যতা— আধুনিক বিজ্ঞান দেখছি না কি, অধোভাগে তার প্রতিবিম্ব বা সহচররূপে আবিষ্কার করেছে প্রায় এক মৃণ্ময় শূন্য?

একটা গহন অনিশ্চয়তার মধ্যে নিশ্চিতের বিজ্ঞানে আমাদের ক্রমে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে দিয়েছে প্রায়— মানুষী চেতনার সেই সুপ্রাচীন ঔপনিষদিক— বিচিকিৎসা— "আছে কি নাই" সংশয়— আজ আবার দারুণ ঘোরালো হয়ে দেখা দিয়েছে।

অসিতকুমার হালদার

১৮৯০-১৯৬৪

অসিতকুমার হালদার ১৮৯০ - ১৯৬৪

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

অসিতকুমারের রচনা ভারতীয় ক্লাসিক শিল্পপরম্পরার পটভূমিতে বিচার করা চলে না। কারণ, প্রাচীন শিল্পরীতি-পদ্ধতি প্রয়োগ করার বিশেষ কোনো চেষ্টা তিনি কখনোই করেন নি। অসিতকুমারের শিল্পে সাহিত্যগত উপাদান যথেষ্ট থাকলেও ভারতের প্রাচীন গৌরব অথবা আধ্যাত্মিক জীবন প্রকাশ সে ক্ষেত্রে যৎসামান্য। অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে অসিতকুমার গ্রহণ করেছিলেন চিত্রের আঙ্গিকগত উপাদান, অপর দিকে রবীন্দ্রকাব্য এবং সমসাময়িক সাহিত্যগত ভাবধারা বর্ণে রেখায় ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস তাঁর প্রথম দিকের রচনাতে বহুক্ষেত্রে পাওয়া যাবে।

অসিতকুমারের ক্ষেত্রে সাহিত্যগত উপাদান স্বীকৃত হয়েছিল কবিজনোচিত ভাবপ্রকাশের চেষ্টা থেকে। এই কারণেই তাঁর রচনাতে রূপকরীতি প্রবর্তনের চেষ্টা দেখা দিয়েছিল। রূপক-রচনার বিশেষ কোনো পরম্পরা ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা দেখি না। সাহিত্যের মাধ্যমেই রূপকরীতি আধুনিক ভারতীয় শিল্পে আত্মপ্রকাশ করেছে বলা চলে। অসিতকুমার বাংলার সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সঙ্গে যেমন ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন তেমনি বাল্যকাল থেকে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের। কাজেই রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব অসিতকুমারের রচনাতে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। তাই দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যগত ভাব তিনি যেভাবে বারংবার রূপায়িত করার চেষ্টা করেছিলেন, অনুরূপ চেষ্টা সমকালীন কোনো শিল্পী করেন নি।

পরবর্তীকালে বাংলা শিল্পের যে রূপকধর্মী চিত্র রচনার চেষ্টা তার মূলে ছিল অসিতকুমারের প্রভাব। যদিও একসময় রূপকসৃষ্টির জন্যই অসিতকুমার জনপ্রিয় হয়েছিলেন, কিন্তু আজকের দিনে তাঁর রূপকধর্মী রচনার আবেদন নিঃশেষ হয়ে গেছে। রবীন্দ্রকাব্য অনুসরণে রচিত চিত্র যথা—

'যদিও দিন যাবে' 'আমার সকল কাটা ধন্য হয়ে গোলাপ হয়ে ফুটবে' অথবা 'সুরের আগুন' ইত্যাদি রচনার স্থায়ী মূল্য বর্তমান কালে যৎকিঞ্চিৎ বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। আজকের দিনে রসিকের কাছে অসিতকুমারের রূপকধর্মী ছবির আবেদন যতই সামান্য হোক্-না কেন, তাঁর শিল্প-প্রতিভার অনুশীলন বা অনুসরণ করতে হলে শিল্পীর মনের এই গতি সম্বন্ধে অবশ্যই আমাদের পরিচিত থাকা প্রয়োজন। রূপক-রচনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অসিতকুমারের ইংরাজি চিঠির সারমর্ম এখানে দেওয়া গেল।—

শিল্পীর মতে নিছক রূপসৃষ্টি সার্থক শিল্পীর আদর্শ হতে পারে না। সত্য ও সুন্দরকে রূপায়িত করাই শিল্পীর লক্ষ্য। সত্য ও সুন্দর শিল্পীর অন্তরলোকে এক হলেও শিল্পসৃষ্টির পথে এই সত্য ও সুন্দরের পরিবর্তে অনেকক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে স্থূল বাস্তবতা। এই স্থূল বাস্তবতা সম্বন্ধে শিল্পী যখন সচেতন হন তখন তিনি রুদ্র রূপে তার সেই সৃষ্টিকে নির্মূল করে ধ্বংস করেন।[১]

---

১ Modern Indian Painting, Volume Two. Asit Kumar Haldar by James H. Cousins and Ordhendra Coomar Ganguly. Page—Fourteen.

শিল্পীর মোহভঙ্গ ছবিতে উপরোক্ত আইডিয়া রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন অসিতকুমার। শিল্পী অসিতকুমারের ধারণা অনুযায়ী শিল্পসৃষ্টি সম্ভব কিনা সে তর্কের অবতারণা না ক'রে যদি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির পরিচয় নেওয়া যায় তা হ'লে আমরা লক্ষ্য করব যে, তিনি যে ক্ষেত্রে সহজাত শিল্পচেতনার সাহায্যে অনবদ্য রূপ সৃষ্টি করেছেন তারই সাহায্যে আধুনিক শিল্পের ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

কাজেই তত্ত্বের আলোচনা বাদ দিয়ে শিল্পী অসিতকুমারের রচনা সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে। অসিতকুমারের শিল্পপ্রতিভার উজ্জ্বল প্রকাশ তাঁর তরুণ বয়সের কয়েকখানি ছবিতে লক্ষ্য করা যাবে।

'নর্তকী' 'সীতা' 'মাতা যশোদা' এই তিনখানি ছবিতে অসিতকুমারের প্রতিভার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ লক্ষ্য করা অসংগত নয়। পরিচ্ছন্ন রেখা, সরল বর্ণবিন্যাস ও ততোধিক অনাড়ম্বর গঠনের সাহায্যে কমণীয় জীবনের প্রকাশ করেছেন শিল্পী। 'সীতা' বা 'মাতা যশোদা' এই নাম মুছে দিলে রসিকের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে নারীজীবনের দুটি দিক। পৌরাণিক পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা কোথাও নেই, আকারে-প্রকারে ক্লাসিক পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা শিল্পী করেন নি। অনায়াসে ফুটে উঠেছে নারীজীবনের দু-টি ঘনিষ্ঠ পরিচয়। অপর দিকে 'নর্তকী' রেখাচিত্রটিতে নারীদেহের গতি-হিল্লোলের ঘনিষ্ঠ পরিচয় অনায়াসে প্রকাশ পেয়েছে। উপরোক্ত ছবি-কয়খানিতে আঙ্গিক ও আবেদনের যে পথ, পরবর্তী কালে সকল সার্থক রচনাতেই সেই পথ ও অনুরূপ সরল আঙ্গিক শিল্পী প্রয়োগ করেছেন। এই কারণে উপরোক্ত ছবি-কয়খানি অসিতকুমারের শিল্পপ্রতিভার পাকা বুনিয়াদ বলে গ্রহণ করা সংগত।

উপরোক্ত ছবি-কয়খানির আঙ্গিক বা উদ্দীপনা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কোনো রূপসৃষ্টি অসিতকুমারের প্রথমজীবনের রচনাতে পাওয়া যাবে না। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, শিল্পী নিজেকে আবিষ্কার করেছেন সর্বপ্রথম উপরোক্ত কয়খানি ছবির মাধ্যমে।

অসিতকুমার রবীন্দ্রনাথের নিকট-আত্মীয়। প্রধানতঃ এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের সকল রকমের শিল্প -বিষয়ক চিন্তা ও কর্মের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন অতি অল্পবয়স থেকে। বিচিত্রা সভা স্থাপনের কালে এবং শিল্পশিক্ষকরূপে ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ১৯১২ সালের কাছাকাছি থেকে। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যোগ ক্রমে ঘনিষ্ঠতর হয়ে দেখা দিল ১৯১৯ সালে।

১৯১৯ থেকে ১৯২৩ এই অল্পকাল অসিতকুমারের শিল্পীজীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত, কারণ এই সময়ে অসিতকুমারের শিল্প যেমন নূতন গতি পেয়েছিল, তেমনি দেখা দিয়েছিল তাঁর শিল্পসৃষ্টির নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ।

অসিতকুমারের শিল্পীমন কোন্ পথে চলেছিল তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য পাওয়া যাবে 'রাসলীলা' 'কুনাল' ও 'রাইরাজা' এই তিন খানি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আকারের ছবিতে। শরতের মেঘের মত হাল্‌কা উত্তাপহীন বর্ণের সাহায্যে যে রূপলোক সৃষ্টি করেছেন সে ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম স্পর্শকাতর গীতিধর্মী মনের প্রকাশ থাকলেও সাহিত্যগত বিষয় রূপায়িত করবার কোনো প্রকার চেষ্টা নেই। শিল্পী প্রথমজীবনে 'নর্তকী' রেখাচিত্রের সাহায্যে যে ছন্দের সন্ধান পেয়েছিলেন, তারই পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ 'রাসলীলা' ছবি।

'রাসলীলা' চিত্র রচনার অনধিককাল মধ্যে রচিত হয় 'কুনাল' চিত্র। এই করুণ কাহিনী শিল্পী যখন পরিকল্পনা করেছিলেন, সেই সময়ে শান্তিনিকেতনে সিংহলবাসী বৌদ্ধ শ্রমণদের যাতায়াত শুরু হয়। বৌদ্ধ

সুরের আগুন

শিল্পী অসিতকুমার হালদার

শ্রমণদের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই পরিকল্পনার অন্তরালে ছিল না এমন বলা যায় না। অন্ধ কুনালকে ঘিরে বিষণ্ন রোরুদ্যমান ও নিরাসক্ত বৌদ্ধ শ্রমণদের মানসিক অবস্থা প্রকাশ করার চেষ্টা শিল্পী করেছেন। চিত্রের বিষয় এমনি যে সে ক্ষেত্রে বর্ণসমাবেশের কোনো অবকাশ নেই। সম্ভবতঃ এই কারণেই শিল্পী তাঁর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছেন মুখের ভাবভঙ্গি ফুটিয়ে তুলতে। এই ভাবের নাটকীয় পরিবেশ শিল্পী পূর্বে বা পরে রচনা করেন নি। 'কুনাল' চিত্রে বাস্তবতার যে খোলাখুলি ইঙ্গিত তারই স্পষ্টতর প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় 'রাইরাজা' ছবিতে।

'রাইরাজা' চিত্রে নৃত্যরত পুরুষদেহের সুডোল গঠন সতেজ দেহভঙ্গি এবং বিভিন্ন আকারের সমাবেশ অসিতকুমারের শিল্পে যেমন আকস্মিক তেমনি অপ্রত্যাশিত। অসিতকুমারের রচনাতে পৌরুষের প্রকাশ উপরোক্ত চিত্রে যতটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অনুরূপ দৃষ্টান্ত তাঁর রচনাতে দৈবাৎ প্রকাশ পেয়েছে। নারী ও পুরুষের ভাবগত সংঘাত এই চিত্রে মূল বিষয় বলা অসংগত হবে না। রাইরাজা চিত্রে বর্ণের উত্তাপ ও উজ্জ্বলতা যে তেজের সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে তারও তুলনা শিল্পীর রচনাতে বেশি লক্ষ্য করা যায় না। যে আঁটসাঁট বাঁধন উপরোক্ত ছবি তিনখানিতে প্রকাশ পেয়েছে অনুরূপ দৃঢ় বাঁধুনি এই সময়ের প্রায় সকল রচনাতে বর্তমান।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, 'নিগরু রাজকুমারী' 'শিকারী' ইত্যাদি চিত্র।

শান্তিনিকেতনের জীবনে অসিতকুমারের রূপকধর্মী চিত্রের সংখ্যা অল্প। এই প্রসঙ্গ তাঁর শ্রেষ্ঠ রূপক চিত্র 'মেঘের খেয়া' উল্লেখ করতে হয়। আকাশপথে নৌকায় ভেসে চলেছে এক পূর্ণযুবতী নারী, এই অসম্ভব কল্পনাকে শিল্পী বাস্তব প্রতীতির মধ্যে উত্তীর্ণ করতে চেষ্টা করেছেন আশ্চর্য বর্ণব্যঞ্জনার সাহায্যে। বর্ষার আকাশের রূপ যেমন স্নিগ্ধ, তেমনি সত্য এই চিত্রে রূপায়িত নারীদেহের কোমল নতোন্নত ভাব। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রকাশের বিশেষ প্রয়াস অসিতকুমারের রচনাতে তেমন স্পষ্ট হয়ে কোনোদিনই ধরা পড়ে নি। মেঘের খেয়া ছবিটি সে দিক দিয়ে একটি ব্যতিক্রম বলা চলে।

শান্তিনিকেতনের জীবনে অসিতকুমার ধারাবাহিক ভাবে বহুসংখ্যক ছোট আকারের রেখাচিত্র রচনা করেছিলেন। গ্রাম্যজীবন অবলম্বনে রেখাচিত্রাবলীর কোনো কোনো ক্ষেত্রে রিজা আব্বাস পরম্পরা অনুযায়ী উজ্জ্বল বিশুদ্ধ রঙের ছোঁয়াচ পাওয়া গেলেও এই ছবিগুলির সর্বপ্রধান আবেদন রেখা। বীরভূমের মুক্ত পরিবেশে শহরের মানুষ অসিতকুমারের মনের নূতন দরজা খুলে গিয়েছিল, তারই সাক্ষ্য এই সময়ের রেখাচিত্র। 'গ্রাম্যজীবন' এই নামের সাহায্যে ছবিগুলিকে বুঝতে অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কারণ সকল ক্ষেত্রে গ্রাম্য পরিবেশ পাওয়া যায় না। পরিবর্তে আমরা পাই নরনারী-শিশু-পরিবৃত সরল পারিবারিক জীবনের অতি অন্তরঙ্গ পরিচয়। বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতি কল্পনা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এ তিনের সমন্বয় রেখার ইঙ্গিতে একটি নির্দিষ্ট পথে প্রকাশিত হয়েছে। ধারাবাহিক রেখাচিত্রের আশেপাশে এমন কতকগুলি রেখাচিত্র পাওয়া যায় যা শিল্পী অসিতকুমারের সার্থক রচনার অন্যতম বলে চিহ্নিত করা চলে, যেমন— 'বীণাবাদিনী' বীণা হাতে নারীমূর্তি অসিতকুমারের রচনার নানা স্থানে পাওয়া যায়। 'কি সুর বাজে আমার মনে' 'সুরের আগুন' 'বিষয়ী' (বুড়োথাকুন ঘরের কোণে) 'আপদ বিদায়' ইত্যাদি চিত্রের সঙ্গে উপরোক্ত রেখাচিত্রের তুলনার সাহায্যে শিল্পীর নূতন উদ্দীপনার লক্ষণ ধরা পড়ে।

সংক্ষিপ্ত ইউরোপ-ভ্রমণ শেষ করে অসিতকুমার ১৯২৩ সালে অল্পকালের জন্য জয়পুর আর্ট স্কুলের

অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। ১৯২৪ সালে লক্ষ্ণৌ আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষপদ গ্রহণের কাল থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শিল্পী লক্ষ্ণৌ শহরে কাটিয়েছিলেন। বহু ধারায় বিভক্ত কর্মজীবনের আবর্তের মধ্যে থেকেও তাঁর শিল্পীজীবনের গতি বন্ধ হয় নি। লক্ষ্ণৌয়ের জীবনে অসিতকুমার যে সকল চিত্র রচনা করেছেন সেগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা সম্ভব না হলেও কতকগুলি বিশেষ বিশেষ প্রবণতার উল্লেখ প্রয়োজন।

অসিতকুমারের শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনোপ্রকার অস্থিরতার বা সংশয়ের ভাব ছিল না। শেষজীবনের রচনার ক্ষেত্রে সেই দৃঢ়-নিঃসংশয়তা শিল্পী সম্ভবতঃ হারিয়ে ফেলেছিলেন। পরিবর্তে রচনায় প্রকাশিত হয়েছে উদ্বেগ, সংশয়। হয়তো শিল্পী নূতন করে নিরীক্ষাপরীক্ষার দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন অথবা কোনো অজ্ঞাত কারণে অসিতকুমার নানা পথে অসমাপ্ত অভিযান চালিয়েছেন, সে বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসায় পৌঁছনো এই মুহূর্তে সম্ভব নয়।

অসিতকুমারের নূতন প্রচেষ্টার পরিচয় ল্যাকসিট নামে পরিচিত কতকগুলি চিত্রে। বিষয় ও আঙ্গিক গত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শিল্পীর উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা গেল—

> "এই লাক্ষারঞ্জিত চিত্রাভাসের প্রণালী আমার নিজস্ব আবিষ্কার। জলরঙে কাঠের পাটার উপর ছবি এঁকে তার উপর লাক্ষা চড়িয়ে পাকা করার রীতির নাম নিয়েছিলুম 'Lacsit' এবং এ বিষয় 'রূপলেখা' পত্রিকায় ইংরাজিতে বিবরণ লিখেছিলুম। কাঠের গাঁটের দাগ অবলম্বন করে কতকগুলি অদ্ভুত-কিম্ভুত চিত্র তখন (১৯২৯এ) এঁকেছিলুম।"[২]

কাঠের ফলকে লাক্ষা রঙে অঙ্কিত ছবিগুলিতে শিল্পীর রূপকসৃষ্টির চরম আত্মকেন্দ্রিক ও অনেক পরিমাণে খেয়ালীভাব আত্মপ্রকাশ করেছে।

জড়ানো পাঁকানো নানাভাবে রেখা বিন্যাসের সাহায্যে যে অদ্ভুত-কিম্ভুত আকার কাঠের ফলকে ফুটে উঠেছে সেগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপির কাটাকুটির নক্‌শার মিল অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে অনুকরণের চেষ্টা আছে এ কথা কোনোক্রমে বলা চলে না। খেয়ালের খেলার মধ্য দিয়ে ক্রমে ল্যাকসিট্ রচনাতে রূপসাদৃশ্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ধারালো কালো-সাদার বিশেষ চেতনা পরবর্তী ল্যাকসিট রচনার বৈশিষ্ট্য। অসিতকুমার পরবর্তী জীবনে ভারতীয় দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা শুরু করেছিলেন।

অধ্যয়ন ও আলোচনার পথে নূতন অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি প্রকাশ করার চেষ্টা পরবর্তী জীবনে তাঁর বহু রচনাতে পাওয়া যায়। সচেতনভাবে প্রতীক সৃষ্টির চেষ্টা এই সময়ের কতকগুলি রচনাতে লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টান্ত Cosmos in the Making—1944, Vishwarupa—1944, Lord's Hide and Seek—1959.

উপরোক্ত ছবি এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য ছবিতে শিল্পী বর্ণপ্রয়োগের যে পথ উদ্ভাবন করেছেন তার নূতনত্ব সহজেই ধরা পড়ে। অসংলগ্ন, বিচ্ছিন্ন, এলোমেলো ছড়ানো বস্তুসমাবেশ সুররিয়ালিস্ট শিল্পীদের রচনার কথা মনে করিয়ে দেয়। Cosmos in the Making ছবিতে অসংলগ্ন বস্তুস্থাপনা শিল্পীর অভিপ্রায়কে যতটা সার্থক করতে সক্ষম হয়েছে হয়তো অন্য রচনাতে ততটা নয়। অভিজ্ঞ শিল্পীর সকল দক্ষতার

---

২ রবিতীর্থে, পৃ ১৫৮

সাহায্যে রচিত এই ছবিগুলিতে খেয়ালী মনের ভাব যথেষ্ট থাকলেও নিরীক্ষাপরীক্ষার আন্তরিক চেষ্টার নিদর্শনরূপে উপরোক্ত শ্রেণীর ছবিগুলি স্মরণীয়।

রোমান্টিক আদর্শ থেকে যেমন আত্মপ্রকাশ করেছে আধুনিক ইউরোপে সিম্বলিজ্‌ম্‌ ও স্যুররিয়ালিজ্‌ম্‌, তারই সঙ্গে তুলনা করা চলে অসিতকুমারের রোমান্টিক প্রবণতার পরিণতি পরবর্তীকালের উপরোক্ত রচনা।

অসিতকুমারের প্রথমজীবনের রূপক ছিল ল্যাকসিট রচনা ও উপরোক্ত রচনার সাহায্যে শিল্পীর অন্তর্দ্বন্দ্বের একটি সুস্পষ্ট ধারণা সহজেই লক্ষ্যগোচর হয়। সার্থক শিল্পীর জীবনে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অন্তর্দ্বন্দ্বের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বহু ক্ষেত্রে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রভাবে নূতন পথ খুলে যায় শিল্পীর সামনে। অসিতকুমার এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সাহিত্যের প্রভাব বহু পরিমাণে ত্যাগ করে বর্ণ-উজ্জ্বল রূপলোকে উত্তীর্ণ হয়েছেন, তার সাক্ষাৎ এই সময়ের সার্থক বা ব্যর্থ রচনার নানাস্থানে বর্তমান। যেমন অসিতকুমার নূতন পথের সন্ধান করেছেন, অপরদিকে তাঁর সহজাত প্রেরণার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় অসংখ্য রচনাতে।

অসিতকুমারের রচনা যে রবীন্দ্রকাব্য ও জটিল আইডিয়ার পথ ছেড়ে অপেক্ষাকৃত বাস্তব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হতে চলেছে তার সাক্ষ্য পেতে অসুবিধা হয় না। 'চাঁকের আড়ালে'— 1959, The modern Art School— 1959, 'অঙ্গুলীমালা', 'যীশুখৃষ্ট' ইত্যাদি রচনাতে শিল্পীর আত্মপ্রত্যয়ের কোনো অভাব নেই। বরং বলা চলে গীতিধর্মী ভাবনা এবং সূক্ষ্ম ইঙ্গিতকারী অনুভূতি স্বাধীন সত্তায় উপনীত হয়েছে।

ভিত্তিচিত্রের উপযোগী ছবি অসিতকুমার অল্পই রচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্ণৌ আর্ট স্কুলের দেয়ালে জয়পুর পদ্ধতিতে করা তাঁর বৃহৎ আয়তনের পরিকল্পনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভিত্তি-চিত্রে বস্তু-সমাবেশের আঁটসাঁট বাঁধুনি এ ক্ষেত্রে রক্ষিত হয় নি বলেই বৃহৎ আয়তন সত্ত্বেও এই ছবিকে ভিত্তিচিত্রের সমগোত্রীয় করা হয়তো চলে না। আকবরের দরবারী শিল্পীদের রচিত ফতেপুর সিক্রি নির্মাণ ছবি থেকে শিল্পী সম্ভবতঃ উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। এই কারণেই ছোট ছবির প্রভাব থেকে উপরোক্ত রচনা সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে নি।

আয়তন ও আঙ্গিকের নূতন নিরীক্ষাপরীক্ষার অতিরিক্ত কোনো অভাবনীয়তা এই চিত্রে লক্ষ্য করা যায় না। সংক্ষেপে এই ভিত্তিচিত্র শিল্পীর শ্রেষ্ঠ রচনার অন্তর্ভুক্ত করা সংগত কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট মতবিরোধের সম্ভাবনা আছে।

অসিতকুমারের শিল্পজীবন শুরু হয়েছিল রেখাগত আঙ্গিকের মাধ্যমে এবং জীবনের প্রায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রেখাত্মক গুণই তাঁর চিত্রে সর্বপ্রধান অবলম্বন ছিল। রেখামণ্ডিত ছোট আয়তনে সূক্ষ্মভাব প্রকাশের ক্ষমতা অসিতকুমার কোনোদিনই সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেন নি। একান্ত নিজস্ব শিল্পীর এই দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বনে এবং অনাড়ম্বর ভাবে রচিত হয়েছে অসিতকুমারের শ্রেষ্ঠ রচনা। পৌরুষ অথবা নাটকীয় ভাব অপেক্ষা রচনাতে সার্থক ও সত্য হয়ে প্রকাশিত হয়েছে নারীদেহের কমনীয়তা। রূপের মাদকতা প্রকাশের ক্ষেত্রে অসিতকুমারকে অতুলনীয় বলা যায়।

শিল্পী আঙ্গিক-চর্চার দিকে বিশেষ কোনো প্রয়াস কখনই করেন নি। তাঁর আঙ্গিকের ক্ষেত্রে কোনো-প্রকার জটিলতা বা আয়াসসাধ্য কৌশল উদ্ভাবন করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না।

আঙ্গিকের ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের দ্বারা তিনি সম্পূর্ণ প্রভাবান্বিত। অবনীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত আঙ্গিক অসিতকুমার আধুনিক ভারতীয় শিল্পের চূড়ান্ত পরিণতি বলে মনে করতেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই আঙ্গিকের বিবর্তন বা পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নি। জটিল আইডিয়া অথবা সূক্ষ্ম ভাব প্রকাশের জন্য যতটুকু আঙ্গিক অপরিহার্য ততটুকুতেই শিল্পী তুষ্ট ছিলেন।

অপরদিকে আঙ্গিক সম্বন্ধে শিল্পীর মনোভাব স্পষ্ট করার জন্য তাঁর একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা গেল—"যখন প্রকৃতির মধ্যেই একটি বিশেষ ছন্দ (বর্ণে ও রেখায়) নিহিত আছে এবং পার্থিব ব্যাপার নিয়েই যখন চিত্রকরের কারবার তখন চিত্রকরের পক্ষে তারই ছন্দকে উপলব্ধির দ্বারা রেখা ও রঙে ফোটানোই হল কাজ। প্রাকৃতিক বস্তুর স্বাভাবিক আবরণকে বিকৃতি করার তাৎপর্য কি?" —(পৃ: ১০০)। পরিণত বয়সের এই উক্তি থেকে স্পষ্টই ধরা পড়ে, শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা বা অপরিহার্যতা শিল্পী স্বীকার করেন নি। প্রকৃতির ছন্দের সঙ্গে পার্থিব বস্তুর সম্বন্ধ স্থাপনের কালে অসিতকুমার রূপান্তর অপেক্ষা রূপাভাস প্রধান বলে ধারণা করেছিলেন। এই কারণেই রেখাই তাঁর চিত্রে ছন্দের প্রতীকরূপে দেখা দিয়েছিল। রচনার ক্ষেত্রে আঙ্গিকগত আলোচনা করতে হলে অসিতকুমারের শিল্পে রেখাপ্রয়োগ সম্বন্ধে বারংবার উল্লেখ করতে হয়।

ধাঁচে ফেলা রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতি ছাড়া অসিতকুমারের রচনাতে রেখাঙ্কনের রীতি প্রায় একই রকম। ভারতীয় রেখাচিত্রের পরম্পরা সঙ্গে তাঁর রেখার ধাতুগত কোনো সম্বন্ধ নেই। বলা যেতে পারে, এটি তাঁর নিজস্ব অবদান। বস্তু বা প্রকৃতির ছন্দ সম্বন্ধে শিল্পীর ধারণার ইঙ্গিত দিয়েই রেখা তার স্বাধীন সত্তা হারিয়ে ফেলে।

পরিশিষ্ট

যে পরিবেশে অসিতকুমারের শিল্পী-জীবনের সূচনা হয়েছিল তার পরিবর্তন ঘটেছে নানা ভাবে। অপর দিকে যে আদর্শ তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে অনুসরণ করেছিলেন, সেই আদর্শেরও মূল্য কমে এসেছে বর্তমান কালে। এই কারণে অসিতকুমার সম্বন্ধে কোনো একটি চূড়ান্ত মত এই মুহূর্তে উপস্থিত করা সম্ভব নয়। অসিতকুমারের কবি-জনোচিত ভাব ও ভাবনা যে ক্ষেত্রে রূপে রেখায় সত্য হয়ে আত্মপ্রকাশ করে নি, সে ক্ষেত্রে বহু উজ্জ্বল সম্ভাবনা ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে। আঙ্গিকের সঙ্গে এই ব্যর্থতার সম্বন্ধ যৎসামান্য। তার অপরিণত সৃষ্টির মূলে আছে কবি-জনোচিত ভাব ও শিল্পী-জনোচিত ভাষার সংঘাত। অসিতকুমারের কবিমন যে ক্ষেত্রে তীব্র আবেগের দ্বারা চালিত হয়েছে সে ক্ষেত্রে তিনি অনবদ্য ভাবময় রূপ সৃষ্টি করতে অনায়াসে সক্ষম হয়েছেন।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্থষ্টি ও স্রষ্টা

লীলা মজুমদার

অবনীন্দ্রনাথ যখন খুব ছোট, বাড়ির অন্যান্য ছোট ছেলেদের সঙ্গে তাঁকেও নর্ম্যাল স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল। স্কুলে যেতে ছেলের ভারি আপত্তি, রোজ সকালে কান্নাকাটি, মাটিতে গড়াগড়ি এবং অবশেষে চাকরদের দ্বারা চ্যাংদোলা করে অপিসযান গাড়িতে তোলা, গাড়ির দরজা টেনে স্কুলযাত্রা। তার পর অকস্মাৎ মুক্তিলাভ।

ইংরেজি ক্লাসে মাস্টার উচ্চারণ শেখান 'পাডিং', ছেলে বলে 'পুডিং, ও আমরা রোজ খাই'— মাস্টারও ছাড়েন না, ছেলেও মানে না। ছেলের শক্তি কম, অতএব বেত্রাঘাতে এ পালার সমাপ্তি। পরদিনই অবনীন্দ্রনাথের বাবা ছেলেকে স্কুল ছাড়িয়ে বাড়িতে যদু ঘোষাল মাস্টার-মশায়ের কাছে পড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। সকালে পড়াশুনো, কিন্তু দীর্ঘ বেকার দুপুর আর কাটতে চায় না।

অন্দরমহলে ঢুকতে গেলে তাড়া খেয়ে ফিরে আসতে হয়। বাবার পোষা গোলাপী কাকাতুয়ার সামনে দাঁড়ালেই সে ঝুঁটি তুলে পালক ফুলিয়ে ঠোকরাতে আসে। পোষা কুকুর কামিনীও দেখলেই সরে পড়ে। ছোট্ট এক জোড়া পোষা বাঁদর, শখের হরিণ, কিন্তু কারো কাছে এগুবার জো নেই। শেষ অবধি ছেলেটা একলা থাকা ধরল। বুড়ো-বয়সে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"তবে একলা থাকার গুণ আছে একটা। দেখতে শুনতে শেখা যায়। ঐ অমনি করে একলা থাকতে থাকতেই চোখ আমার দেখতে শিখল, কান শব্দ ধরতে লাগল।··· মানুষ পশু পাখি সঙ্গী পেলেম না কাউকেই। ঐ অতবড় বাড়িটাই তখন আমার সঙ্গী হয়ে উঠল ; নতুন রূপ নিয়ে আমার কাছে দেখা দিল। এখানে ওখানে উঁকিঝুঁকি দিয়ে তখন বাড়িটার সঙ্গে আমার পরিচয় হল। জোড়াসাঁকোর বাড়িকে যে কত ভালো-বেসেছি। বলি যে ওবাড়ির ইঁট-কাঠগুলোও আমার সঙ্গে কথা কয়!"

অবনীন্দ্রনাথ বলছেন—"এই পৃথিবীতে যখন মানুষের ছেলে পদার্পণ করে তখন সে একেবারে খালি হাতে আসে না, সঙ্গের সাথী করে নিয়ে আসে শুধু একটুখানি পিপাসা।" আসলে এই পিপাসাটিই সব ; সমস্ত শিল্প ও সাহিত্যসৃষ্টির মূলে এই পিপাসা। এই দেখবার ইচ্ছা, জানবার ইচ্ছা, বুঝবার ইচ্ছা, তার পর সব দেখা জানা বোঝা পেরিয়ে আরো গভীরে যাবার ইচ্ছা।

স্কুল-থেকে-ছাড়া-পাওয়া ছোট অবনীন্দ্রনাথ টেবিলের তলায় শুয়ে শুয়ে টেবিলের তলায় মাকড়সার জালের কারিকুরি দেখেন। বন্ধ খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে দেখেন দিনের আলো কেমন লম্বা হয়ে দেয়ালে পড়ছে, তার মধ্যে, বাইরে যে মানুষ হেঁটে যাচ্ছে তার ছায়া পড়ছে। বলছেন, "রঙিন এক এক খানি ছবির মতো তারা আলোর রাস্তা ধরে চলতে চলতে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।··· তখনো সব দেখতুম, একমনে দেখতুম। এই দেখতে যখন আরম্ভ করলুম তখন আর একলা থাকতে খারাপ লাগত না।"

এই হল সৃষ্টিকারদের নিয়ম, দুনিয়াকে তারা সঙ্গী করে নেয়। শুধু ছবি কেন, বিরাট বাড়ির সারাদিনের জীবনযাত্রার এক-একটি সময়ের এক-একটি শব্দও ছিল। ভোরে চেরাগ হাতে লম্বাদাড়ি একটা লোক খিড়কি দোরে 'মুশকিল আসান' বলে হাঁক দিত। দুপুরে শোনা যেত একজনের ডাক—

কুয়োর ঘটি তোলা! সন্ধ্যেবেলা বেলফুলওয়ালা বেলফুল হেঁকে যেত। রাত্রে "ছাদের উপরে ভোঁদড় চলে বেড়ায়, সেই চলার শব্দে গল্প তৈরি হয় মনের ভিতরে, ব্রহ্মদত্যি হাঁটছে, জটেবুড়ি কাশছে।" আরও রাতে নন্দ ফরাসের ঘর থেকে বেহালার প্যাঁ-পোঁ শোনা যায়। এই শেষ শব্দ। তার পর কখন রাত কেটে যায়, ভোর হয়ে যায়, চোখ না মেলেই শোনা যায় সামনে ঘোড়া দলাই-মলাই হচ্ছে, তার টপ-টপ ধপ-ধপ আর সঙ্গেসঙ্গে আবার সেই বেহালার প্যাঁ-পোঁ।

শুধু শব্দ কেন, নানা রকম গানের আসর বসত বাড়িতে, অবনীন্দ্রনাথের বাবার বড় শখ। ওস্তাদি গান, বৈঠকি গান, কীর্তন, কিছুই বাদ যেত না। ছবির চর্চাও ছিল— বাবা ছবি আঁকতেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছবি আঁকতেন, তবে সেদিকে ছোটছেলেরা ঘেঁষতে পেত না। অবনীন্দ্রনাথের ছবি দেখার স্বাদ মিটত তাঁর ছোটপিসিমার ঘরে; কতরকম ছবি সেখানে, দেশীধরণে তেলরঙের ছবি। শ্রীকৃষ্ণ পায়েস চুরি করছেন, শকুন্তলা সখীদের সঙ্গে বেড়াচ্ছেন, মদন ভস্ম হচ্ছেন— এইসব। আর ছিল কৃষ্ণনগরের সুন্দর সব পুতুল।

কিন্তু মুশকিল ছিল, শুধু বাইরেটা দেখে দেখে মন উঠত না, ভিতরটা কেমন তাও দেখতে চেষ্টা করা চাই। এদিকে ছেলের হাতে খেলনা দেখলেই মা বলেন— 'ঐরে! এবার গেল জিনিসটা, ভিতর দেখতে গিয়ে ভাঙবে ওটা!'

আর ছিল এক তলায় সিঁড়ির নীচে একটা এঁদো বন্ধ ঘর, তিন পুরুষের যত রাজ্যের ফেলে-দেওয়া কাজ-ফুরুনো আসবাবে ভর্তি। বাতিদান, ফুলদানি, কাঁচের ঘেরাটোপ, ঝাড়লণ্ঠন। অবনীন্দ্রনাথের এই ছিল পরীস্থান। ঝাড়পোঁছের সময় যেই না তালা খোলা হল অমনি ভিতরে সেঁদিয়ে এটা দেখা, ওটা নাড়া; একটু ধুলো ওড়ে, খানিকটা টুংটাং শব্দ হয়, সর্বাঙ্গে শিহরন লাগে। তার পরে নন্দ ফরাস টেনে ঘর থেকে বের করে দিয়ে আবার দোরে তালা দেয়। বহুদিন বাদে এই ছবি আবার ফুটে ওঠে 'বুড়ো আংলায়', সিন্দুকের চাবির ফুটো দিয়ে রত্ন দেখার মধ্যে।

ছেলের দুরন্তপনার শেষ নেই, যা দেখে তাই নিয়ে নাড়াচাড়া করবে। খাঁচা ভরা ক্যানারি পাখি ছেড়ে দেয়; লাল মাছের গামলায় রঙ গুলে দেয়, মাছ মরে ভেসে ওঠে; ছুতোর মিস্ত্রীদের বাটালি নিয়ে হাত কেটে একাকার করে।

যে বাড়িতে অবনীন্দ্রনাথের প্রায় সারাজীবন কেটেছিল সেটি দ্বারকানাথের সাবেক বসতবাটি নয়, সাবেক বাড়িকে সকলে মহর্ষিভবন বলত। এটি হল তারি পাশে দ্বারকানাথের বৈঠকখানা-বাড়ি। এইখানে কত যে নাচ-গান-অভিনয় হয়েছে তার ঠিক নেই। বড় বড় জুড়ি এসে থামত, শহরের হোমরাচোমরা লাট-বেলাট পর্যন্ত গান শুনতে অভিনয় দেখতে আসতেন। অবনীন্দ্রের বাবা গুণেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁদের অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে যেতেন; উর্দিপরা বেয়ারারা সুগন্ধ ছিটিয়ে ঘর উঠোন আমোদিত করে দিত। আর ছোট্ট রবীন্দ্রনাথ সামনের বাড়ির বারান্দা থেকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন। অবনীন্দ্রনাথ তখনো জন্মান নি। অবনীন্দ্রনাথের সময় অবধি এইভাবেই চলে আসছিল।

তার পর শোনা যায় রবীন্দ্রনাথদের আগেকার ঐশ্বর্যে খানিকটা ভাঁটা পড়েছিল; কিন্তু তখনো এ সরিকের বিলাসিতার অন্ত ছিল না, এঁদের অবস্থা মনে হয় অপেক্ষাকৃত ভালোও ছিল। অবনীন্দ্রনাথের

ঠাকুরদাদা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ছোট ভাই; রবীন্দ্রনাথ হলেন অবনীন্দ্রনাথের কাকা; তাঁর বড় শ্রদ্ধা-ভক্তি ভালোবাসার 'রবিকা', অনেক বিষয়ে তাঁর আদর্শস্থানীয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চাইতে বছর দশ এগারোর বড়ও ছিলেন।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য ছেলেদের মতো এ বাড়িতেও শিল্পসংস্কৃতির বড় আদর ছিল; কিন্তু গুণেন্দ্রনাথদের সময়ে ভারতীয় সংস্কৃতি নিজস্ব একটা বলিষ্ঠ রূপ নেয় নি। সে গৌরবের অনেকখানি জমা ছিল রবীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথের জন্যে। তাঁদের পূর্ববর্তীরা যে শিল্পসংস্কৃতির সমাদর করতেন তার জন্মস্থান ইউরোপ, বিশেষ করে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স।

সেখান থেকে অবনীন্দ্রনাথের বাবা জ্যাঠারা হাজার হাজার টাকা খরচ করে ঘর সাজাবার আসবাব, বাগানবাড়ির জন্যে মূর্তি, ফোয়ারা ফরমায়েস দিতেন। এদিকে কিন্তু বাড়ির জীবনযাত্রা চলত সাবেকি চালে। অন্দরমহল ছিল, বারমহল ছিল। এঁরা ব্রাহ্ম হন নি, কাজেই ঠাকুরঘর পূজাপার্বণ রামায়ণ-পাঠ ইত্যাদি বিলাতী খানার সঙ্গে সমানে তাল রেখে চলত।

অবনীন্দ্রনাথরা ছিলেন ছয় ভাই-বোন। বড়দা গগনেন্দ্রনাথ, মেজদা সমরেন্দ্রনাথ, তারপরে অবনীন্দ্রনাথ, তার পরে সুনয়নী তার পরে বিনয়নী দুটি বোন। বিনয়নীর কন্যা প্রতিমাকে পরে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিবাহ করেন। সুনয়নী ছিলেন স্বনামধন্যা চিত্রশিল্পী। তার পর একটি ছোট ভাই ছিল, চিরকালই বড় রোগা, গেলও চলে অতি অল্প বয়সে, বাপকে শোকসাগরে ভাসিয়ে।

সারাদিন সমস্ত বাড়িটা যেন গমগম করত, মা বাবা বড়মা জ্যাঠা পিসি মাষ্টারমশাই, সরকার মশাই, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, বিশাল চাকরমহল। চারদিকে একটা সেকালের জমিদার বাড়ির আবহাওয়া। হরেক রকম বাইরের লোক হরেক রকম নতুন খেলা দেখিয়ে পকেটে টাকা ফেলে চলে যেত। কেউ এক মণ রসগোল্লা খেল, কেউ খেল একটা গোটা পাঁঠার কাঁচা মাংস, সবাই তাকে বললে রাক্ষস, কেউ দেখাল লাঠিবাজি। কেউ এল আতর নিয়ে, কেউ মণিমাণিক্য; দরজি এল, স্যাকরা এল। গাইয়ে, বাজিয়ে, সং, ভিকিরি, এখানকার জীবনযাত্রায় প্রত্যেকেরি একটা স্থান ছিল।

মাঝেমাঝে ঘোড়ায় টানা ছোট্ট গাড়ি করে বেড়াতে যাওয়া হত; কোন্নগরের বাগানবাড়িতে যাওয়া হত। চেয়ে চেয়ে দেখতেন অবনীন্দ্র কোথায় মাকড়সার জালের মতো মিহি ধোঁয়ার আবরণের মধ্যে দিয়ে পাড়াগাঁর ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে; নাকে আসত পোড়ামাটির গন্ধ। কোথায় মেয়েরা পুকুরে নেমেছে নাইতে, ছেলেরা বই নিয়ে লাল মেটে রাস্তা দিয়ে পাঠশালায় যাচ্ছে, মুদি দোকানের ঝাঁপ তুলছে, বাঁশঝাড়ে আলো ঝিলমিল করছে, ধানক্ষেতের প্রকাণ্ড সবুজ, তার পরে কোতরঙের ইঁটখোলায় ইঁটের পাঁজায় আগুন ধরিয়েছে— তার পরেই উঁচু ঢালুর উপরে ছোট সাদা বাগানবাড়িখানি। সামনে দাঁড়িয়ে বুড়ো চাটুজ্যেমশায় অভ্যর্থনা করছেন, তাঁর লম্বা সাদা দাড়ি, মাথায় ঝুঁটি বাঁধা, হাতে গেঁটেবাঁশের লাঠি, ধবধবে গায়ের রঙ।

এই গন্ধ, এই দৃশ্য, এই কোমল অভ্যর্থনা চিরদিনের জন্যে ছোটছেলেটির অসম্ভব দরদী মনের একান্ত নিজস্ব সামগ্রী হয়ে রইল। বহুকাল পরে এসব ছবি হয়ে, গল্প হয়ে, মাটির নীচের ঘুমন্ত মূল থেকে যেমন সময় হলে মোমের মতো কোমল মিহি সাদার উপরে বেগ্‌নি নকশাকাটা ভুঁইচাঁপা ফুল ফোটে,

তেমনি কোমল তেমনি সুন্দর তেমনি বুকভরা ভালোবাসা নিয়ে ফুটে উঠেছিল। এ জিনিসের কি কোনো তুলনা হয়?

কোন্নগরে মা-বাবাকে বড় কাছে পাওয়া যেত, তাঁরা গঙ্গার ধারে চাতালে বসতেন, ছেলেমেয়েরা বসত সিঁড়ির ধাপে। ফুলগাছে থাকত রেশমি গুটি, প্রজাপতির গায়ে সুতো বেঁধে ঘুড়ির মতো ওড়ানো যেত। চাটুজ্যেমশাই একদিন বললেন রাত্রে কাঁঠালতলায় কাঠবেড়ালের বিয়ে হবে। রাত জেগে অবনীন্দ্রনাথ দেখেন কাঁঠালতলায় সত্যি যেন বিয়েবাড়ির রোশনাই; ও যে জোনাকিপোকার মেলা সে আর তখন কে জানে।

জন্মের সময় সঙ্গের সাথী করে সেই যে একটুখানি পিপাসা আনার কথা বলেছিলেন শিল্পী, সে আর তাঁকে কোনোমতে রেহাই দিল না। এক দিন কোন্নগরের কুঁড়েঘর এঁকে ফেললেন। তাদের চালগুলো কেমন গোল হয়ে নেমে এসেছে, বিলাতী ছবি আঁকার বইএর মতো যেন রুল দিয়ে টানা নয়। এই তো আমাদের দেশের কুঁড়ে, একে বিলিতী বইওয়ালারা কোথায় পাবে? হঠাৎ যেন বাংলা-দেশ হাত বাড়িয়ে শিশু-চিত্রকরের ডান হাতে নিজের হাতে নাড়া বেঁধে দিলেন। যা ছিল এতদিন শুধু চোখের মধ্যে জমা করা, এবার তা হাতের মুঠোর মধ্যে আস্তে আস্তে নিজেকে ধরা দিতে শুরু করে দিল।

সাত বছর বয়স থেকে চাকররা ছেলেদের আদবকায়দা শেখাতে শুরু করল। পরে বড় হয়ে ছেলেরা বিশ্বেশ্বর হুঁকোবরদারের কাছ থেকেই তামাক খেতেও শিখল। তোষাখানায় চাকরদের আড্ডা, সেখানে রস জমে বড় ভালো। মণিখুড়োর নতুন জুতো লুকিয়ে বিশ্বেশ্বর ভালোমানুষ সেজে বসে আছে, এদিকে সে তো খুঁজে খুঁজে হয়রান! এমন সময়ে কর্তামশায়ের গড়গড়ার মুখনল একেবারে নিখোঁজ! বিশ্বেশ্বর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল, এখুনি হয়তো গড়গড়া চেয়ে বসবেন কর্তা! মণি-খুড়ো বলে— 'কই, দেখি নি তো কিছু, সেই ইস্তক এইখানে বসে হুঁকোই খাচ্ছি! কাল দেখলে তো জুতোজোড়া কেমন বেমালুম লোপাট! খুঁজে দেখ, পাবে হয় তো, যাবে কোথায়?'

খুঁজতে খুঁজতে বিশ্বেশ্বর বলে— 'আরে এই তো আপনার জুতো,' আর অমনি মণিখুড়োও বলে— 'আরে ঐ যে ঐ কোণায় তোমার মুখনল চকচক করছে!'

এই রসবোধ অবনীন্দ্রনাথের মনটাকে একেবারে আপ্লুত করে রাখত, ওঁর লেখায় ওঁর রেখায় তার কত যে পরিচয় পাওয়া যায়। ছোট একটুখানি চাপা হাসির মতো কলমের ডগায় ডগায় তুলির আঁচড়ে আঁচড়ে সে ফেরে।

আস্তে আস্তে কচি শিল্পীর চোখে আর মনে সৃষ্টির রস দানা বাঁধতে লাগল। হোলিখেলা হত ওঁদের বৈঠকখানাতেও অনেক খরচ করে, আবার দেউড়িতেও হত কম খরচে। অবনীন্দ্রনাথ বলছেন— "বৈঠক-খানায় শখের দোল শৌখিনতার চূড়ান্ত— সেখানে লটকনে ছোপানো গোলাপি চাদর, আতর, গোলাপ, নাচ, গান, আলো, ফুলের ছড়াছড়ি। কিন্তু সত্যি দোল-উৎসব করত দরোয়ানরাই—উদ্দণ্ড উৎসব, সব লাল, চেনবার জো নেই, সিদ্ধি খেয়ে চোখ দুটো পর্যন্ত সবার লাল। দেখলেই মনে হত হোলি খেলা এদেরি। শখের খেলা নয়। যেন যারা রক্তের হোলি খেলতে জানে, এ তাদেরি খেলা। কৃত্রিম কিছু নেই।"

এমনি করে ঐ জাঁকজমকে, আদবকায়দায় ভরা শৌখিন বাড়িতে বসে অবনীন্দ্রনাথ নিজের মনের মধ্যে অকৃত্রিমের মন্ত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। সত্যিকার যে পিপাসা, সে পৃথিবীর বুক ফেটে ঝ'রে-পড়া ঠাণ্ডা মিষ্টি জল ছাড়া আর কিছুতে মেটে না। শিল্পসৃষ্টির রহস্যের অনেকখানিই এইখানে। ঐ বাড়ির আনাচে-কানাচে প্রাণের পাখি বাসা বেঁধে থাকত। ঘরে বৈঠকখানায় বাবুরা, তোষাখানায় চাকররা, বারান্দায় বাগানে ছেলের দল; পোষা পাখি, কুকুর, হরিণ, বাঁদর, লাল মাছ; গাছের মগডালে চিলের বাসা, ঘুলঘুলিতে প্যাঁচা, দেয়ালে টিকটিকি, আরসোলা, পোকামাকড়, কোনো কিছুই এড়িয়ে যেত না অবনীন্দ্রনাথের চোখ।

মাথার উপরে বাপ-জ্যাঠারা ছিলেন নিরাপত্তার বিশাল ছাতা ধরে; অভাব-অনটনের ছায়াটুকু কোথাও পড়তে পেত না। চাকররা পর্যন্ত শৌখিনের চূড়ান্ত। ছোট ভাইটি অকালে মারা গেলে অবনীন্দ্রনাথের বাবা জোড়াসাঁকোর বাস তুলে দিয়ে তাঁর পলতার বাগানবাড়িতে ছেলেমেয়ে নিয়ে উঠে গেলেন। সেখানে গিয়েই জায়গাটার চেহারা বদলে ফেললেন। যা ছিল বন, সে হয়ে উঠল উপবন। নতুন বাড়ি উঠল, পুরোনোর সংস্কার হল, লাল রাস্তা হল, মূর্তি বসল, ফোয়ারা হল, সুন্দর ফটক তৈরি হল, তারের গাছঘরে কত যে অরকিড ফুল আর নানারকম দুষ্প্রাপ্য পাখি, তার ঠিক নেই।

সুখে সংসার যেন টইটম্বুর, গগন যাবে বিলেতে, বিনয়নীর বিয়ে ঠিক, পলতার বাগানে মস্ত পার্টি হবে। চার দিক সাজানো হল, অতিথিরা বহুদিন থাকবে; কেক মিষ্টান্ন ফলফুল আতর গোলাপে চারদিক ভরে গেল; বাবুর্চি খানসামা, নাচ গান, রবীন্দ্রনাথের গান, বিলাতী কায়দায় টোস্ট প্রস্তাব, দামী মদের গেলাস ছুঁড়ে ছুঁড়ে ভাঙা— এমন পার্টি সচরাচর দেখা যায় না। পার্টি শেষে বাবা অতিথি-অভ্যাগতদের হাসিমুখে বিদায় দিয়ে, সেই যে অসুখে পড়লেন আর উঠলেন না। বাইরে প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল সেদিন, আর ঘরে গুণেন্দ্রনাথ স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের শেষ একবার দেখে নিয়ে চোখ বুজলেন।

বহুদিন পরে সেদিনের কথা অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "সেইদিন থেকে ছোটোবেলাটা যেন ফুরিয়ে গেল।" ফুরিয়ে গেলেও তার রসটি গিয়ে বুকের মধ্যে জমা হয়ে রইল।

তার পরে এল বড় হবার পালা, তবু মাথার উপরে দুই দাদা থাকাতে বড় হওয়াটা তেমন মর্মান্তিক হয় নি। বাড়িতে গানবাজনা অভিনয়ের আসর তেমনি চলে, দক্ষিণের বারান্দার বুড়োর দল আস্তে আস্তে যে যার বিদায় নেন, নতুনরা এসে আসর জাঁকায়। লোকজন শিল্পী কারিগর গাইয়ে বাজিয়ে বাজিকর তেমনি আসা-যাওয়া করে। একটা লোক এসে ফুঁ দেয় আর অমনি ঘরবাড়ি ফুলের গন্ধে ভরে যায়। কেউ আসে মোগল আমলের ছবি ফুলদানি ভাঙা ব্রঞ্জ বিক্রী করতে, কেউ আনে খোদাই-করা পান্না। অমনি সুন্দরের সন্ধানী শিল্পীরা ঝুঁকে পড়েন। অবনীন্দ্রনাথ বলতেন, শিল্পীমাত্রেই সংগ্রহকারী। টুকিটাকি সুন্দর জিনিস তুলে রাখবে আলমারিতে। আর সুন্দর ফুল পাখি সূর্যোদয় প্রাকৃতিক দৃশ্য জমা করে রাখবে মনের মধ্যে। দরকার হলেই এসব টেনে এনে কাজে লাগাবে। আর দরকার যদি না হল তো রইল জমা। অবনীন্দ্রনাথের মাঝে মাঝে মনে হত এই সুন্দরের সংগ্রহ মনের মধ্যে নিয়ে এ জন্ম থেকে বোধহয় জন্মান্তরে যাওয়া যায়। তাই শিল্পীরা সুন্দরের চোখ নিয়েই জন্মান।

শিল্পীর বাকি যেটুকু শিক্ষা দরকার, সে আর কদিন লাগে? নিজেই বলছেন, "বেশি দিন না, ছ মাস,

আমি শিখিয়েছিও তাই। ছ মাসে আমি আর্টিস্ট তৈরি করে দিয়েছি। এর বেশি সময় লাগা উচিত নয়। এরি মধ্যে যাদের হবার হয়ে যায়— আর যাদের হবে না তাদের বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত।"

অর্থাৎ ছবি আঁকা অন্তরের জিনিস, ছ মাসে তার প্রকাশের পথ খুলে যাওয়া উচিত। ধরে বসে জোর করে হাত তৈরি করলেই শিল্পী তৈরি হয় না। ছাত্র ছবি আঁকবে, মাস্টারমশাই শুধরে দেবেন, ওভাবে শিল্পী তৈরি হয় না। মাস্টারমশাই শুধু ছাত্রের নিজেকে প্রকাশ করার পথটি খুলে দেবেন। ছাত্র নিজের মনের ভাব নিজে আঁকবে। সে যেমন মনে মনে দেখেছে তেমনি আঁকবে; হাজার ওস্তাদ মাস্টার হলেও ছাত্র যেন কখনো তাঁর চোখের দৃষ্টি ধার করে না দেখে, নিজের স্বকীয়তা না হারায়।

এই যে নিজের সত্তা, সৃষ্টিকারের এই হল সবচেয়ে বড় সম্পদ। তবে কায়দা জিনিসটি শিখতে হয়। অবনীন্দ্রনাথকেও সে রকম ভাবে কোনো মাস্টারমশাই ছবি আঁকা শেখান নি। একজন দিল্লীওয়ালা এসে দাদাদের হাতির দাঁতের উপরে ছবি আঁকা শেখাতেন। সেখানে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথও হয়তো বসে কায়দাটা শিখে নিলেন। স্কুলের ড্রইং ক্লাসে কিছু কিছু আঁকার অভ্যাস হয়েছিল। তার পর সারা জীবনই হাতে রঙ তুলি। সংস্কৃত কলেজের অনুকূলবাবুর কাছে লক্ষ্মী-সরস্বতী আঁকা শিখেছিলেন। বহুদিন পরে বলছেন, "বলতে গেলে সেই-ই আমার প্রথম শিল্পশিক্ষার মাস্টার, সূত্রপাত করিয়ে দিয়েছিল ছবি আঁকার"। বড় কষ্টে ছবি আঁকা শিখতে হয়েছিল, কিন্তু সাহিত্যরচনা হল তেমনি সহজে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ, তাঁর সব আদর্শ মাথা পেতে গ্রহণ করছেন, বাংলা ভাষা নিয়ে আন্দোলন, বিদেশী পোশাক বর্জন, রাখি-বন্ধন উৎসব পালন, স্বদেশী শিল্পের উন্নয়ন, কোনো কিছু থেকে বাদ যাচ্ছেন না। একবার কবির শখ হল জোড়াসাঁকোর এক তলায় একটা স্কুল করবেন। সেখানে মাস্টারি করবার জন্য অবনীন্দ্রের ডাক পড়ল, আনন্দের সঙ্গে সাড়া দিলেন।

একদিন রবীন্দ্রনাথ বললেন, "তুমি লেখো-না, যেমন করে তুমি মুখে গল্প কর, তেমনি করেই লেখো।··· ভাষায় কিছু দোষ হয়, আমিই তো আছি।"—ব্যস, ঐটুকু ভরসা পেয়েই হয়ে গেল। এক ঝোঁকে 'শকুন্তলা' লেখা হয়ে গেল। এই তাঁর প্রথম রচনা। রবীন্দ্রনাথ মনোযোগ দিয়ে পড়েও কোনো সংশোধন করলেন না। প্রস্ফুটিত ফুলের আবার কাটাছাঁটা কি? অবনীন্দ্রনাথ বলছেন, "সেই প্রথম জানলুম, আমার বাংলা বই লেখবার ক্ষমতা আছে। এত যে অজ্ঞতার ভিতরে ছিলুম, তা থেকে বাইরে বেরিয়ে এলুম। মনে বড় ফুর্তি হল, নিজের উপরে মস্ত বিশ্বাস এল। তার পর পটাপট লিখে যেতে লাগলুম— 'ক্ষীরের পুতুল' 'রাজকাহিনী' ইত্যাদি। সেই যে উনি সেদিন বলেছিলেন, 'আমিই তো আছি' সেই জোরেই আমার গল্প লেখার দিকটা খুলে গেল।"

সাহিত্যের উপকরণ আর শিল্পের উপকরণ তো আর আলাদা নয়, সে তো ছোটবেলা থেকেই মনের মধ্যে জমা ছিল; কি তুলির আগায়, কি কলমের ডগায় কত সহজে কত সুন্দর হয়ে সে প্রকাশ পেয়েছে।

ছবি আঁকার কথা বলতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, তুলিটি জলে ডুবিয়ে রঙে ডুবিয়ে মনে ডুবিয়ে তবে ছবি আঁকতে হয়। নইলে ছবি আঁকা হতে পারে কিন্তু শিল্পসৃষ্টি হয় না। সাহিত্যরচনার বেলাতেও তাই, যে ভাব সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে অনুভব করা না যায়, যার প্রতি নিজেরই আস্থা নেই, তাই দিয়ে সাহিত্যরচনা হয় না।

শিল্পীদের মন হয় বড় স্পর্শকাতর, অন্যের চোখে যা ধরা পড়ে না, শিল্পী সেটি ঠিক লক্ষ্য করে। অন্যে যেটি ভুলে যায়, শিল্পীর মনের সংগ্রহে তা চিরকালের মতো জমা হয়ে থাকে। কবে পুরী থেকে গিয়েছিলেন কোণারকে, সারারাত ফিকে চাঁদের আলো দিয়ে ধোয়া বালির প্রান্তরের উপর দিয়ে পালকি চেপে, তারি ছবি অপরূপ হয়ে ফুটল 'ভূতপত্‌রীর দেশে'।

ছোটবেলায় চাকরদাসীরা নাওয়াত-খাওয়াত গল্প বলত, শাসন করত, আদর করত, ভয় দেখাত, ঘুম পাড়াত, আবার ঘুম থেকে তুলে নিয়ে মুখ হাত ধুইয়ে, দুধ গরম করে এনে খাওয়াত। সারাজীবন কেটে গেলেও মনের মধ্যে তাদের জন্যে কোমল একটি জায়গা ধরা রইল। বাড়ি গেল ঘর গেল জমিদারি গেল ; মনের মধ্যে শিল্পী হাতড়ে দেখেন, সে জায়গাটা ফাঁকা তো নয়, রাজার ঐশ্বর্য দিয়ে ঠাসা। চাকরদাসীরা কবে চলে গেছে, তাদের মনে করে 'মাসি' বইখানিতে অবনীন্দ্রনাথ বলছেন—

"এমন শত কাজের শত জনা ছিল—
কেউ আমায় কাঁধে চাপিয়ে ঘোড়া হয়েছিল,
কাঠের দোলনায় ঝাঁকানি দিয়ে
নাট্-সাহেবের পালকি চাপিয়েছিল,
তিনতলার ছাদে তুলে ধরে দু হাতে
চাঁদামামাকে চিনিয়েছিল,
পুকুরঘাটে, কাগাবগাকে,
পানকৌটিকে, বেনেবউটিকে,· ·

কাজেতে যেমন খেলাতে তেমন মজবুত
ছিল তারা বড় অদ্ভুত।
না চাকর, না নফর, না বাঁদী, না দাসী,
তা কে ছিল ভেবে পাই নে, মাসি।"

যে সত্যিকার শিল্পী, ছবি ফোটে তার মনের মাটিতে, বাইরের উপকরণের খুব বেশি দরকার হয় না। রঙ্গ করে বলতেন শিল্পী, রঙ তুলি না পেলে খড়ি, খড়ি না পেলে গেরিমাটি নয়তো কয়লা, কয়লাও না পেলে দু হাতের দশটি আঙুলের ডগা, তার বেশি কিই বা লাগে ? অসুখে ভুগছেন, ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে আকাশে মেঘের খেলাই দেখছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বলছেন—

"কত রূপ দেখতে পেতুম তাতে— বাড়ি ঘর বন জঙ্গল, পশু পাখি, নদী পাহাড়, যেন মানসসরোবরের রূপ ভেসে উঠত চোখের সামনে। একবার মনে হয়েছিল এই মেঘেরই এক সেট ছবি আঁকি। কত আলপনা ভেসে যাচ্ছে, মেঘের গায়ে গায়ে।"

আরো বলছেন ছবির দুর্লভ জন্মস্থান প্রসঙ্গে—

"কাগজের দিকে তাকিয়ে থাকলেও অনেক সময় নানা জিনিস দেখা যায়। জাপানীরা তো যে কাগজে আঁকবে সেই কাগজটি সামনে নিয়ে বসে বসে দেখে ; তার পর তাতে আঁকে।"

জাপানী শিল্পী টাইকানের কথা বলছেন, রঙ কালি গুলে সে পাশে তুলি রেখে দোজানু হয়ে বসে

কাগজের দিকে চেয়ে থাকত। "তারপর এক সময়ে তুলিটি হাতে নিয়ে কালিতে ডুবিয়ে দু-চারটে লাইন টেনে ছেড়ে দিলে, হয়ে গেল একখানি ছবি। কাগজেই ছবিটি দেখতে পেত; দু-একটি লাইনে তা ফুটিয়ে দেবার অপেক্ষা মাত্র থাকত।" অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও লোকে এ কথা বলেছে যে ওঁর ছবি দেখে মনে হয় না কেউ ওগুলোকে রঙ তুলির সাহায্যে এঁকেছে, মনে হয় ওগুলো নিশ্চয়ই আগে থাকতেই ছিল!

মানুষের চারিদিকে প্রসারিত থাকে অসীম সম্ভাবনায় পূর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, স্রষ্টিকার দুটি-একটি রেখা, কি শব্দ, কি কথা মিলিয়ে তাদের একসঙ্গে মিলিয়ে দেন মাত্র। এত কম কথায় স্রষ্টির রহস্যের মর্মকথাটি পৃথিবীর কম লেখকই বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন।

ঐ টাইকানকে মনীষী ওকাকুরা ভারতে পাঠিয়েছিলেন। এঁর কাছে অবনীন্দ্রনাথ লাইন-ড্রইং শিখেছিলেন। শুধু হাতের কাজটুকুই নয়, সেই কাজ উপভোগ করবার মনের চোখও আস্তে আস্তে তৈরী করতে হয়েছিল। এই মনের চোখটি না থাকলে সাহিত্যরচনাও হয় না। এক টুকরো রেশমে এক টুকরো কয়লা দিয়ে দু-চারটে আঁচড় কেটে একটা পালক দিয়ে দিব্যি করে ঝেড়ে দিয়ে, টাইকান বলত— এই নাও, ছবি হয়ে গেল।— প্রথম প্রথম সে ছবি যেন চোখেই দেখতে পেতেন না অবনীন্দ্র, পরে দেখার অভ্যাস হয়ে গেলে, ছবিগুলি ভালো লাগতে আরম্ভ হয়ে গেল।

সাহিত্যের বেলায় কিন্তু এমন কোনো শিক্ষানবিশি করতে হয় নি, অর্থাৎ আলাদা করে আর সাহিত্য-চর্চার পাঠ নিতে হয় নি। চোখ দেখতে শিখেছে, কান শুনতে শিখেছে, মন বুঝতে শিখেছে, তার আবার সাহিত্যরচনা শিখবার বাকি রইল কি? এমনি করে এর ওর কাছ থেকে ছবি আঁকার পাঠ চলতে লাগল, জল রঙ তেল রঙ— এমন কি ছবি যে বাঁধায় তার কাছ থেকে সোনার জল বসানো— সব শেখা চলতে লাগল। তারি মধ্যে কবে অবনীন্দ্রনাথ সাবালকের পদ পেয়ে গেছেন, কর্মচারীরা বলে, ছোটবাবু ঘরে এলে লোকে উঠে দাঁড়ায়। এক সময় বিয়েও হয়েছে, একটি দুটি ছেলেমেয়েও হল, শিল্পীর মন এসবকেই মেনে নেয়, তবু সাংসারিক বিষয়গুলি কোনো দিনই মন জুড়ে পেতে পারে না।

আস্তে আস্তে অসাধারণ শিল্পী বলে তাঁর খ্যাতি জমতে লাগল। বিলিতীর অনুকরণ ছেড়ে যেদিন থেকে দেশী ধরণে দেখতে শুরু করেছিলেন, সেদিন থেকে আর ফিরে তাকাতে হয় নি। গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে এ দেশের রুচির ধারাই বদলিয়ে দিলেন। ভারতীয় শিল্পকলার নবজন্ম হল। সে শিল্পের ধারা শুধু ছবির রাজ্যে আবদ্ধ রইল না— গানেতে, নাটকে, ঘর সাজানোতে, মেয়েদের ও পুরুষদের সাজপোশাকে, সামাজিক অনুষ্ঠানে সব কিছুতে সঞ্চারিত হতে লাগল। এখন যাকে ভারতীয় শিল্প বলা হয়, এঁদের কোলেই তার জন্ম, এঁদের কাছেই সে লালিত।

অবনীন্দ্রনাথের লেখা বইগুলির একটি দুর্লভ বিশেষত্ব হল যে অতি বড় গুণী শিল্পী না হলে এসব বই লেখা হত না। এ ধরণের বই অন্ততঃ বাংলাভাষাতে আর চোখে পড়ে না। জীবনটাই যেন একটা অফুরন্ত ছবির নকশা, কোন পরম শিল্পীর হাতে গোটানো একটি লিপি, যার না আছে আরম্ভ না আছে শেষ। কি ডান হাতে কি বাম হাতে তার পাক যতই খোলা যায়, কেবলি প্রকাশিত হতে থাকে নব নব চিত্রে উন্মেষিত নিত্য নতুন ভাবে বিকশিত বিশ্বপ্রাণের লীলা। যেমন ছবিতে, তেমনি লেখাতে।

শিল্পী না হলে কে ভাবতে পারত 'নালকে'র গল্প? ছোট একটি ছেলে ধ্যাননেত্রে কেবলই দেখে যাচ্ছে বুদ্ধদেবের জীবনের ঘটনাগুলি, একের পর এক। যেখানেই এতটুকু বর্ণনা দিয়েছেন শিল্পী অমনি সেই গুটি-কতক কথা দিয়ে একটি করে ছবি তৈরি হয়েছে। কি সব বর্ণনা, কি সহজ, কি স্পষ্ট। "নদীর ওপারেই মেঠো রাস্তা— সবুজ শাড়ির সাদা পাড়ের মতো সরু, সোজা। সেই রাস্তায় চাষার মেয়েরা চলেছে ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে। তাদের পরনে রাঙা শাড়ি, হাতে রুপোর চুড়ি, পিঠের উপরে ঝুলিবাঁধা কচি ছেলেটি ঘুমিয়ে আছে হাত-দুটি মুঠো করে। একটুখানি ঠাণ্ডা বাতাস নদীর দিক থেকে মুখে এসে লাগল। একটা চিল অনেক উঁচু থেকে ঘুরতে ঘুরতে আস্তে আস্তে একটা গাছের ঝোপে নেমে গেল।"— এ ছবিটি যেন কত দিনের কত দেখার পরম দেখা হয়ে চোখের সামনে রূপ নেয়। আরো কত ছবি আছে 'নালকে'র পাতায় পাতায় কথার লাইনের মাঝে মাঝে।

"পুন্না গোয়ালের দরজা খুলে এক কোণে একটি পিদিম জ্বালিয়ে গোরুগুলিকে দুইতে বসেছে। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় গোরুগুলির শীত লেগেছে, তারা একটু ভয় খেয়েছে, চঞ্চল হয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখছে— এতরাত্রে কে দুধ নিতে এল! কিন্তু পুন্না যেমন তাদের পিঠে বাঁ হাতটি বুলিয়ে নাম ধরে ডাকছে, অমনি তারা স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছে।" এমন প্রস্তুতি ও প্রতীক্ষার ছবি শিল্পী নইলে কে আঁকবে? আজ বুদ্ধদেবের দেখা পাওয়া যাবে, তাঁর জন্য পরমান্ন তৈরি হবে। আজ একটি বিশেষ দিন। এ তারই ছবি।

চিত্রশিল্পীদের সব চেয়ে বড় রহস্য হল, নিজের অন্তরকে উজাড় করে দিয়ে তাঁরা ছবি আঁকেন, কিন্তু নিজেরা থাকেন সর্বদা ছবির বাইরে কোনো অলক্ষ্য অন্তরীক্ষে। অবনীন্দ্রনাথের গল্প লেখাতেও তাই; এমন একটা নৈর্ব্যক্তিক অন্তরঙ্গতা সাহিত্যক্ষেত্রে খুঁজে পাওয়া দায়। কোথাও কোনো তর্কের জাল পাতা নেই, নিজের মত পেশ করা নেই, অথচ কি যে অনির্বচনীয় অন্তরঙ্গতা।

অবনীন্দ্রনাথের রচনা পড়লে এ কথাই বারবার মনে পড়ে। কোনো গভীর অনুভূতিকে সংজ্ঞা দিয়ে, নির্দেশ দিয়ে, রেখার বন্ধন দিয়ে, সীমিত করে রাখা যায় না। নানান অপ্রত্যাশিত ও অভাবনীয় দিক দিয়ে তার বিকাশ হয়। তার সত্তা তৈরি হয় অনেকগুলি পরস্পরবিরোধী ভাব দিয়ে, তার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারাই পৌরুষের প্রমাণ। 'আলোর ফুলকি' এই বিষয়ে একটি গল্প। এমন প্রেমের গল্প বিশ্বসাহিত্যে কমই আছে। কাহিনী নতুন নয়, ফরাসী লেখক এডমন্দ রোস্তাদের গল্পের ভাব নিয়ে লেখা কিন্তু এই ধার-করা কাঠামোতেও অবনীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য ঝলমল করছে। রূপে রসে শব্দে গন্ধে স্পর্শে ভরা এ এক অপূর্ব ভালোবাসার কাহিনী। এই বইতে প্রেমতত্ত্বের এমন একটি মর্মান্তিক সত্যের কথা আছে যা সব পাঠক হয়তো সহজে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হবেন না। প্রেম হল যৌবনের বিলাস, কিন্তু প্রৌঢ়বয়সের একমাত্র অবলম্বন। যখন বিশ্বের সমস্ত আসক্তির অন্তরের শূন্যতা প্রমাণ হয়ে যায়, তখন প্রেম ছাড়া আর দাঁড়াবার জায়গা থাকে কোথায়?

মুরগিদের বিষয় গল্প। আধাবয়সী কুঁকড়োর ঘরে চার-চারটে বউ আছে, বুড়ি মা আছে, ঘরকন্নায় কোনো ত্রুটি নেই, তবু তাঁর বুকটি ফাঁকা। একমাত্র সান্ত্বনা রোজ ভোরে উঁচু টিলার উপরে দাঁড়িয়ে পূবমুখি হয়ে তিনি ডাক দেন তবে সূর্যের ঘুম ভাঙে, তবে না আলো হয়, পৃথিবীতে প্রাণের সাড়া জাগে, দিনের কাজ শুরু হয়। কুঁকড়োর বিশ্বাস একদিন তিনি না ডাকলে সূর্যোদয় হবে না, দুনিয়া ছারখার হবে। কুঁকড়োর পৌরুষের গর্ব

খর্ব করবে বলে সোনালি বনমুর্গি তাঁর চোখ ঝেঁপে দিয়ে সূর্যোদয়ের মুহূর্তটিকে পার করে দিলে, কুঁকড়ো দেখলেন তিনি ডাকলেন না তবু সূর্যোদয় হল।

"একি! একি!" বলে কুঁকড়ো চোখ ঢাকলেন। সোনালি বললে, "পূবদিক কারু হুকুম মানে না, দেখলে তো?" কুঁকড়ো ঘাড় হেঁট করে বললেন—"সত্যিই বলেছ। মন সেও হুকুম মানে, কিন্তু পূবদিক, সে কারু নয়। আজ আমি বুঝেছি কেউ কারু নয়।" সেই নিজেকে বোঝার সঙ্গে সঙ্গে কুঁকড়ো জীবনকে জন্মকে সম্মান দিলেন। বললেন—

"এইখানেই জানলেম যে এক স্বপন ভেঙে যায়, আরেক স্বপন এসে দেখা দেয়। স্বপনের সঙ্গে নিজেও ভেঙে পড়া নয়, কিন্তু জেগে ওঠা, নতুন আলোয়, নতুন আশা নিয়ে।"

সমস্ত পার্থিব প্রেমের প্রতীক এই গল্প, সমস্ত অপার্থিব পৌরুষের জয়গান। এইখানে নিজেকে অনেকখানি ধরা দিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ।

যে নিদারুণ অতৃপ্তি কবিদের জীবনকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দেয়; অবনীন্দ্রনাথের বেলায় কি জানি কেমন করে সে কোমল স্নিগ্ধ মধুর অথচ প্রবল হয়ে এসেছে। রূপকে যে মুঠোয় করে ধরে রাখতে হয় না, অবনীন্দ্রনাথ ছবি লেখেন, তাই এ কথা তাঁর অজানা নেই। প্রাণে যার প্রদীপ জ্বলে, চারদিককে সে উদ্ভাসিত করে, পোড়ায় না।

'পথে বিপথে'র প্রথম প্রকাশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগে। শিল্পীর শরীর ভালো যাচ্ছিল না, ডাক্তারের পরামর্শে রোজ স্টিমারে করে গঙ্গার হাওয়া খেতে যেতেন। সঙ্গী থাকত পুরোনো বন্ধু অবিনাশ আর জাহাজে দেখা কত শত ক্ষণিকের বন্ধু। কুয়াশা ঠেলে জাহাজও যেমন আস্তে আস্তে এগোয় কল্পনাও তার মায়াজাল বিস্তার করে অবুকে সুদ্ধ অবিনকে সুদ্ধ জড়িয়ে ফেলে। তখন সম্ভব অসম্ভবের আর কোনো তফাত থাকে না। *সেই তখনকার চিন্তাগুলি অপরূপ সব গল্প হয়ে দেখা দিয়েছে।* নানা রকম ভালোবাসার গল্প, ছবিকে ভালোবাসা ছড়িকে ভালোবাসা পাখিকে ভালোবাসা মানুষকে ভালোবাসা। যে ভালোবাসার তৃষ্ণায় মা-হারা ছোটছেলের মুখের মা ডাক বনের পাখিও শিখে নেয়।

'ঘরোয়া' আর 'জোড়াসাঁকোর ধারে'তেও নিজের কথা লিখেছেন শিল্পী। 'জোড়াসাঁকোর ধারে' বইখানির ভূমিকায় অবনীন্দ্রনাথ লিখছেন, "মুখের কথা লেখার টানে ধরে রাখা সহজ নয়, প্রায় বাতাসে ফাঁদ পাতার মতো কঠিন ব্যাপার।" 'ঘরোয়া' আর 'জোড়াসাঁকোর ধারে' দুটিই মুখের কথার বই। সত্তর বছরের অবনীন্দ্রনাথ বাতাসে ফাঁদ পেতে সেকালের একটা গোটা জীবনযাত্রাকে ধরে ফেলেছেন।

বই দুটিতে তফাত আছে। 'ঘরোয়া' হল রবীন্দ্রনাথদের বিষয়ে গল্প, অবনীন্দ্র সেখানে যেন কেবলমাত্র সূত্রধারের চেয়ে বড় ভূমিকা নিতে অনিচ্ছুক। 'জোড়াসাঁকোর ধারে' একান্ত নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী, বাবা জ্যাঠা মা মাসি দাদা ভাইবোন চাকরবাকর পশুপাখি আর সবটাকে ঘিরে পাঁচ নম্বরের বাড়ির কোমল ছায়াখানি। জীবনযাত্রা এখানেও চলে অনেকখানি কবিগুরুদের বাড়িতেও যেমন চলে, কিন্তু পারিবারিক আবহাওয়াটা এখানে যেন অনেক বেশি অন্তরঙ্গ। এই বই দুটি থেকে অবনীন্দ্রনাথের প্রায় গোটা জীবনের মূল ঘটনাগুলিকে সঞ্চয় করা যায়। একটা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অবনীন্দ্রনাথ অনেক বেশি সুখী ছিলেন, সেটি হল নিজের মাকে এবং নিজের স্ত্রীকে অনেক বেশি

করে অন্তরঙ্গ সঙ্গীরূপে পেয়েছিলেন। বিধাতা কবির জীবনকে এই দুটি প্রভাব থেকে অনেকখানি বঞ্চিত করেছিলেন। তাই 'ছেলেবেলা'য় যে কোমল স্নেহের সুরটি পাই না, 'জোড়াসাঁকোর ধারে' তাকে পাই। এই একই কারণে হয়তো কবি কত সহজে, শুধু সহজে কেন, কত আগ্রহের সঙ্গে জোড়াসাঁকো থেকে নিজেকে নির্বাসিত করেছিলেন, আর অবনীন্দ্রনাথের মাথার উপর থেকে যখন বাড়ি বিক্রী হয়ে গেল, তখনো তিনি সেখানকার ইঁটকাঠ আঁকড়ে অনেকদিন পড়ে রইলেন। এরাই-না তাঁর ছোটবেলাকার বন্ধু ও খেলার সঙ্গী, এখানকার প্রত্যেকটি ইঁট-না তাঁর সঙ্গে কথা কইত।

শেষ পর্যন্ত বাড়ি ছেড়ে যেতে হল। সেই বাড়ি ছাড়ার ব্যথায় কলম ডুবিয়ে লেখা হল 'মাসি'। অন্য বইয়ের তুলনায় 'মাসি' তেমন কিছু নামকরা বই নয়, অনেকেই হয়তো বইটি পড়েনও নি, নামও শোনেন নি। এই বইএর মধ্যে তিনটি গল্প আছে, মাসি, বনলতা, হাতেখড়ি। তাদের মধ্যে দিয়ে, বিশেষ করে প্রথম গল্পে, বিশাল একটি মন-কেমন-করা অতীতকাল এসে ধরা দেয়; ডালপালাবহুল ঠাকুরবাড়ির বিশাল অতীত নয় এ, এ হল অবনীন্দ্রনাথের একান্ত নিজস্ব একটা অতীত। সে তাঁর বড় প্রিয় জিনিসপত্র মানুষজন নিয়ে এসে পাঠকের মনকে আকুল করে তোলে।

এইখানেই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা, অন্যের মনে সাড়া জাগাতে পারে কি না। ছবি-আঁকিয়ের চোখ দিয়ে দেখা এই অতীতকাল, টুকরো টুকরো মনে-রাখা কথা হয়ে স্মৃতিপটে ফুটে ওঠে না, সমগ্র একখানি হারানো কাল হয়ে, তার রাশি রাশি অকিঞ্চিৎকর খুঁটিনাটি নিয়ে, যা আর ফিরে পাবার নয় তার জন্যে পাঠকের মনকেও ব্যগ্র ব্যাকুল করে তোলে। যা ছিল নিতান্ত অবনীন্দ্রনাথের মনের ব্যথা তা সবাকার অতি পরিচিত, অতি গোপনে বুকের মধ্যে পুষে রাখা বিরাট দুঃখ হয়ে দেখা দেয়। অথচ গল্পে হাসিঠাট্টা মেশানো ছোট ছোট কয়েকটি কথা ছাড়া আর কোনো উপকরণ নেই। গল্পে আছে অনেকদিন পর অবু যেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে গেছে, গিয়ে দেখে সব শূন্য হা-হা করছে সেখানে।

"এমন কাউকে দেখি না যে শুধিয়ে জানি, মাসি কোথায়। মাসি মাসি ব'লে ডেকে ডেকে গলা চিরে গেল। একবার মনে হল অন্দরবাড়ির দিকটায় কে যেন ডাকল 'মাসি গো মাসি'। তার পরেই যে-চুপ সেই-চুপ, নিঃসাড়া পুরী। ছুটলুম অন্দরের দিকে, বলি মাসির যদি দেখা পাই সেখানে। দালান, দরদালান, গলিঘুঁজি, চাকর-দাসীদের ঘর পেরিয়ে পালকিদোরের সামনে যেয়ে দেখি, মাসি, সেই যে আমাকে সময়-ভোলা ঘড়িটি দিয়েছিলে, আর আমি যেটিকে ভোলানাথের ঘড়ি নাম দিয়ে ঠিক পালকিদোরের উপরে বসিয়ে দিয়েছিলেম, সেটা ঠিক তেমনি বসে আছে— ঝ্যালেগাঁথা, চাঁদ-ওঠার দিকে চেয়ে। দেখে সাহস হল, তবে হয়তো মাসিও আছে। একছুটে দোতলায় উঠে গেলেম তোমার ঘরে, মাসি। কোথায় মাসি! খালি ঘর চুপচাপ সবুজ খড়খড়ি বন্ধ করে অঘোরে পড়ে আছে।"

এই যে ব্যথায় বিধুর ছেলেমানুষিতে ভরা বই এর তুলনা নেই। হাসিকান্না পৃথিবীতে জড়াজড়ি করে থাকে, তাতে যে বিহ্বল হয়ে পড়ে সে দেখে শুধু হাসিটুকু কিম্বা কান্নাটুকু, শিল্পী দেখে সব একাকার। অবনীন্দ্রনাথের সব দেখাই এই শিল্পীর দেখা।

অত ভালোবাসার জোড়াসাঁকোর বাড়ি ছেড়ে শিল্পী কিছুদিন শান্তিনিকেতনে আচার্যরূপে, কিছুদিন

বরানগরে বাগানবাড়ি ভাড়া করে ছিলেন। মাসির বাড়ির বর্ণনায় যেন এই বরানগরের বাড়িখানির ছায়া দেখা যায়।

জোড়াসাঁকোর ধারের শেষ কটি পংক্তিতে শিল্পী বলছেন "আমারও যাবার সময়ে যা দুধারে ছড়িয়ে যা দুধারে ছড়িয়ে দিয়ে গেলুম তোমরা তা থেকে দেখতে পাবে, জানতে পাবে, কত ঘাটে ঠেকেছি, কত পথে চলেছি, কি সংগ্রহ করেছি ও সংগ্রহের শেষে নিজে কি বকশিশ পেয়ে গেছি।

"এতকাল চলার পরে বকশিশ পেলুম আমি তিন রঙের তিন ফোঁটা মধু।"

লোকে তাঁকে বলত বড়লোকের ছেলে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ছেলে বড় শৌখিন, বড় বিলাসী, কাজকর্ম নেই, নানান শখের জিনিস কেনে, গানবাজনা শোনে, নাটকে যোগ দেয়, ছবি আঁকে। কিন্তু কাজ বলতে যদি চাকরি বোঝায়, তাও যে একেবারে কোনোদিন করেন নি, এমনও নয়। আর্ট স্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপ্যালের কাজ করেছিলেন কিছুদিন, হ্যাভেল সাহেবের পাল্লায় পড়ে। অবিশ্যি যেই মনে হয়েছিল ঐ বুঝি সরকারী চাকরি করতে গিয়ে স্বাধীনতায় বাধা পড়ল, অমনি চাকরিতে ইস্তফা।

লোকে যাকে নিষ্কর্মা বলত, সেই ছেলেটি জীবনের একটি মুহূর্তও বৃথা চলে যেতে দেয় নি; যখন আর কিছু পারে নি তখনো মাকড়সার জালের নকশাটি, মেঘের খেলাটুকু অমনি মনের মধ্যে জমা করে নিয়ে ছিল।

শিল্পী একবার পাহাড়ে গিয়েছিলেন হাওয়া বদল করতে; সেখানে দেখেন পাহাড়ের উপরে মজুররা কাজ করছে— পথ কাটা, জিনিস তোলা, নানারকম ভারি কাজ। দলের সঙ্গে একটি করে বাড়তি লোক থাকে, তাকে বলে 'ফালতো'। দরকারের সময় সে ঠেকা দেয়, কাজ ফুরুলে অমনি তাকে সর্দার ডেকে নেয়। 'পথে-বিপথে' বইখানি শেষ করে, শিল্পী লিখছেন অবরোহণের পালা।—"চলা বলা সব বন্ধ করে, যা কিছু কুড়োবার কুড়িয়ে, যা কিছু গুড়োবার গুড়িয়ে বসেছি। পাহাড়ের নীচে থেকে কুলির সর্দার চীৎকার করে ডাকছে 'ফাল্‌তো, ফাল্‌তো, হারে রে বেকার কুলি!' "

প্রাণের প্রয়োজনে ঠেকা দেবার বাড়তি মানুষটি কাগজ কলম রঙ তুলি গুছিয়ে নিয়ে ডাক পড়লেই যাবার জন্যে তৈরি।

সৃষ্টি ও স্রষ্টার কথা বলতে গেলে এই কটি কথাই বলতে হয়। ছোটবেলাটি কেটেছিল বিশাল পুরীতে, যা-কিছু দেখবার শুনবার সব দেখেশুনে মনের মধ্যে পুঁজি করে। চোখ ফুটল, হাত খুলল, মনের পুঁজি অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার হয়ে রইল, তার এতটুকু ক্ষয় নেই। যেখানে গেছেন এই মনের সম্পদ সঙ্গে গেছে, শেষ পর্যন্ত তাঁর স্বকীয়তাকে এতটুকু ম্লান হতে দেয় নি।

এই তো গেল সৃষ্টি ও স্রষ্টার গূঢ় সম্বন্ধের কথা। সৃষ্টিকারের হাতের রচনা শুধু পার্থিব উপকরণ দিয়ে তৈরি হয় না, তার আসল উপাখ্যান স্রষ্টার মন। ছোটবেলা থেকে অবনীন্দ্রনাথের এই মনটি তৈরি হতে শুরু করেছিল, স্কুলে যাওয়া বন্ধ হলে পর, নিজের নৈঃসঙ্গ ঘুচোবার জন্যে যখন তিনি জোড়াসাঁকোর বাড়ি বাগান পশুপাখি কীটপতঙ্গকে দেখতে শিখলেন, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে শিখলেন। বাড়ির আবহাওয়া থেকেই কল্পনাশক্তি পুষ্ট হতে লাগল। শিল্পীর চোখ ফুটল। এই হল প্রথম পাঠ।

শৌখিন জীবনযাত্রার মধ্যে থেকে বালক অবনীন্দ্রনাথ অকৃত্রিমের মন্ত্র পেলেন। শিল্পসাধনার এই হল দ্বিতীয় পাঠ। তার পরে আস্তে আস্তে হাতও খুলে যেতে লাগল। শিক্ষাগুরু পেলেন রবীন্দ্রনাথকে,

তাঁর প্রেরণায় সাহিত্যরচনা শুরু হয়ে গেল বড় আনন্দে, বড় সহজে। শিল্পীর মনে ছোটবেলাকার ছবিগুলি সব জমা হয়ে আছে, সেইখানেই সাহিত্যের উপাদান পাওয়া গেল। গল্প জন্মায় ছবি ফোটে সৃষ্টিকারের মনের মাটিতে, সেই মাটি তৈরি হয়ে গেলে আর ভাবনা থাকে না।

মনের জমিতে চাষ হয়েছিল ভালো, উত্তম দৃষ্টান্ত পেয়েছিলেন, যেমন শিল্প ও সাহিত্যের তেমনি স্বদেশীয়ানারও প্রেরণা পেয়েছিলেন, স্বদেশী শিল্পের দিকে মন ফিরেছিল।

অবনীন্দ্রনাথের রচনা সবই শিল্পীর মনের কথা, তাই ছবিগুলি যেমন বাঙ্ময়, গল্পগুলিও তেমনি চিত্রময়। সৃষ্টিকারের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা পাঠকের মনে দর্শকের মনে সাড়া জাগানো, সেও এসে অবনীন্দ্রের হাতের মুঠিতে ধরা দিল, কত সহজে, কত স্বাভাবিকভাবে। এই সাধনা চলল সারা জীবন।

শান্তিনিকেতন

ডবলিউ. ডবলিউ. পিয়রসন

বাঙালি ছেলেদের আর-একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল শিশুদের প্রতি তাদের সহজাত আকর্ষণ। সাধারণ একটি ইংরেজ ছেলেকে যদি ছোটো ভাইয়ের যত্নআত্তি করতে বলা হয়, তা হলে তার দুর্দশার একশেষ হবে; আর যদি ছোটো বোনকে নিজের বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী সভায় নিয়ে যাবার কথা বলা হয় তা হলে বোধ হয় লজ্জায় সে মাটির সঙ্গে মিশিয়েই যাবে। কিন্তু বাংলা দেশের যে-কোনো জায়গায় যাওয়া যাক্‌ না কেন নজরে পড়বেই এদেশের ছেলেরা শিশুদের কত ভালোবাসে, তাদের সেবাযত্ন করতে বা তাদের সঙ্গে খেলাধুলো করতে এখানকার ছেলেদের কখনও ক্লান্তি নেই। শান্তিনিকেতনে দেখেছি, ছেলেরা শুধুমাত্র কোনো ছোটো শিশুর মনোরঞ্জন করার আনন্দেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার প্যারামবুলেটার ঠেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এতে কোনো কৃত্রিমতা নেই, আর এটা যে আমাদের বিদ্যালয়ের ছেলেদের বেলাই বিশেষ সত্য তাও নয়। শান্তিনিকেতনের আদ্যবিভাগের ছাত্রেরা কবির শিশু দৌহিত্রটিকে[১] যদি ক্লাসে নিয়ে আসতে পারে তা হলে তাদের আনন্দ আর ধরে না। যে-গাছের তলায় ক্লাস বসে তার কাছাকাছি আকর্ষণযোগ্য কোনো কিছু না ঘটলে চার বছরের সেই শিশুটি সারা ক্লাস চুপচাপ বেশ গম্ভীর মুখেই বসে থাকে। অনেক সময় দেখেছি, বড়ো ছেলেদের মধ্যে কেউ কোনো অধ্যাপকের বছর তিনেকের একটি ছেলের হাত ধরে ফুটবল মাঠের দিকে যাচ্ছে, আর শিশুটি তার বয়স্ক সাথীটির সঙ্গে দুনিয়ার সব বিষয় নিয়ে বক বক করে চলেছে। আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তু ধারণ করার মতো একটি বিশেষ মনোভাবও বাঙালি ছেলেদের আছে। *এজন্যই* এ কথা বিশ্বাস করা সহজ যে আশ্রমের পরিবেশের মধ্য দিয়েই ক্রমে আধ্যাত্মিক জীবনচর্যা বিকশিত হয়ে উঠবে। উদাহরণ-স্বরূপ এ কথা উল্লেখ করা যায় যে, সকাল-সন্ধ্যায় নীরব নিশ্চল হয়ে মৌন প্রার্থনায় বসে থাকার অভ্যাস ছেলেদের কাছে ক্লান্তিকর মনে হয় না। তার ফলে এখানকার কমবয়সী ছেলেরাও কবির যে-সব ভাষণের মর্ম গ্রহণ করতে পারে, এ পরিবেশে থাকার সুযোগ নেই বলে কলকাতার স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষেও তা কঠিন। এখানকার ছেলেরা সূক্ষ্ম যন্ত্রের মতো ক্ষুদ্রতম প্রভাবেই সাড়া দিতে পারে। এ কারণে অপর পক্ষের নির্দয় ব্যবহার বা অবিবেচনার ফলে বাঙালি ছেলেরা যে পরিমাণ ব্যথিত হয় বেদনার কারণের অনুপাতে তা দৃশ্যত অনেক বেশি। সম্প্রতি কলকাতায় সরকারী এবং অন্যান্য কয়েকটি কলেজের ছাত্রদের প্রতি অধ্যাপক শ্রেণীর সহানুভূতির অভাবে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তাতেও এ কথা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু সহানুভূতি এবং সদয় ব্যবহারে এরা আরও দ্রুত সাড়া দেয়। যে-কোনো শিক্ষাকার্যে শিক্ষকের সফলতা নির্ভর করে ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতির উপর। পৃথিবীর অন্য যে-কোনো দেশের তুলনায় বাংলা দেশের পক্ষে এ-কথা বেশি সত্য।

শেষ করার আগে, শান্তিনিকেতনের আধ্যাত্মিক পরিবেশ সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। আধ্যাত্মিক 'পরিবেশ' কথাটি আমি ইচ্ছে করেই ব্যবহার করেছি। কারণ এখানে বিশেষ কোনো গোঁড়া মতবাদ

---

১ নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রচার করা হয় না। ছাত্রদের আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য তাদের নিজস্ব সহজাত প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করাই এখানকার আদর্শ। এ-কাজে অধ্যাপকদের ব্যক্তিগত প্রভাবেরও সহায়তা প্রত্যাশা করা হয়। আর সহায়তা প্রত্যাশা করা হয় বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সান্নিধ্যের নীরব অথচ নিত্যপ্রভাবের। ভারতবর্ষে প্রকৃতিই আধ্যাত্মিক সত্যের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরু বলে স্বীকৃত।

আশ্রম বা ধর্মচিন্তার নিভৃত নিবাসরূপে শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শান্তিকামীরা এখানে এসে মানসিক প্রশান্তি এবং ধ্যানধারণার সুযোগ পাবেন এই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন যে তাঁর আদর্শের পরিণতির পথে এই স্থানেই তিনি পরিপূর্ণ সহায়তা পাবেন। সেজন্য তাঁর বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তিনিও এ-স্থানটিই নির্বাচন করেছিলেন। মহর্ষির জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও পরিণত বয়সে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। এখন তাঁর পঁচাত্তর বছর বয়স। তিনি নির্জন তপস্যা এবং ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে গ্রন্থরচনায় সময় অতিবাহিত করছেন। গত কুড়ি বৎসর ধরে এখানে বাস করছেন বলে তিনি যেন ছাত্রদের মতোই আশ্রমজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। নববর্ষের দিনে বা অন্য কোনো বিশেষ দিনে ছাত্র এবং অধ্যাপকেরা এই তপস্বীকে প্রণাম নিবেদন করতে যান। সন্ধ্যাবেলার পড়ন্ত আলোতে তাঁর গৃহে গিয়ে তাঁর সঙ্গে বসে গভীর আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সৌভাগ্য যদি হয় তবে তার তুলনা নেই।

সকাল সন্ধ্যায় মৌন প্রার্থনার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করেছি। উপাসনার ঘণ্টা বাজলেই ছেলেরা আসন হাতে করে বাইরে চলে যায়। তারপর গাছের তলায় বা খোলা মাঠে বসে পনের মিনিট ধরে মৌনভাবে চিন্তা করে। মৌন হয়ে বসে থাকে বলাই বোধ হয় সংগত কারণ চিন্তার বিষয় সম্বন্ধে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। চিন্তার পদ্ধতি সম্বন্ধেও কোনো নির্দেশ নেই। এই বাক্‌সংযমের উদ্দেশ্য হল তাদের চিন্তার ধারাকে নিজস্ব অভিপ্রায় খুঁজে নেবার সুযোগ দেওয়া, আর মৌন থাকার পর তারা যে সংস্কৃত মন্ত্রটি আবৃত্তি করে তার মর্মে পৌঁছে দেওয়া। অনেক ছাত্র এখান থেকেই মৌন প্রার্থনায় অভ্যস্থ হয়ে যায়, এটাই এর সবচেয়ে বড়ো তাৎপর্য। সকাল সন্ধ্যার এই মৌন উপাসনা ছাড়াও প্রতি সপ্তাহে একদিন বা দুদিন উপাসনা হয়। কবি উপস্থিত থাকলে তিনিই ছাত্রদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন। কবির অনুপস্থিতিতে কোনো অধ্যাপক ভাষণ দেন আর ছাত্রেরা সমবেতভাবে সংস্কৃত মন্ত্র আবৃত্তি করে। এই ভাষণের বিষয়গুলি নানা ধরণের; তাদের মধ্যে অনেকগুলি 'শান্তিনিকেতন' নামে ধারাবাহিকভাবে বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ প্রকাশও করেছেন। উদাহরণ-স্বরূপ পুরাতন বৎসরের শেষ সন্ধ্যায় কবির একটি ভাষণের উল্লেখ করছি। আমি সে-ভাষণের অনুলেখন করে নিয়েছিলাম। উপাসনা হয়েছিল সূর্যাস্তের পর। শুভ্র বসনে সজ্জিত কতগুলি মূর্তি যেন কবির চারদিকে ঘিরে মন্দিরের গৃহতলে বসেছিল, তাদের ঠিক সামনে অস্পষ্ট আলোকে তাঁর দেহরেখা ফুটে উঠেছিল।

তিনি আরম্ভ করেছিলেন এই বলে: পুরাতন বর্ষ যখন শেষ হয়ে যায় তখন সমাপ্তির মধ্যে যে বেদনা আছে সেটাই বিশেষ করে আমাদের মনকে অধিকার করে। কিন্তু যদি উপলব্ধি করতে পারি যে সমাপ্তির মধ্যে শুধু শূন্যতা নেই, পূর্ণতাও আছে তা হলে সমাপ্তিও আনন্দমধুর হয়ে উঠে। যে জীর্ণ অভ্যাসের সংস্কার প্রতিদিন আমাদের চারিদিকে আবরণ সৃষ্টি করতে থাকে, সমাপ্তির লীলার মধ্যেই সেগুলিকে পরিত্যাগ করে আমরা পূর্ণতর এবং প্রশস্ততর জীবন চর্যায় উত্তীর্ণ হবার অবকাশ লাভ করি। যদি ধ্রুব প্রতিষ্ঠাভূমি

থেকে দেখতে পাই তা হলে বুঝতে পারি যে মৃত্যুর পরিসমাপ্তির মধ্যেও এই পূর্ণতা আছে। মৃত্যু প্রকৃতপক্ষে অমৃতকেই আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত করে। স্বেচ্ছায় অন্ধ হয়ে না থাকলে আমাদের দৃষ্টি থেকে সে কিছুই আবৃত করে রাখে না, কিছুই গোপন করে না। যে অনুষ্ঠান ও রীতি চারদিক থেকে আবৃত করে জীবনের অমৃতকে নিষ্পিষ্ট করছে তাকে বিদীর্ণ করে ফেলার মধ্যে আনন্দই আছে, বেদনা নেই। ইয়োরোপের যে যুদ্ধ আজ মৃত্যুর দ্বারা অগণিত পরিবারকে ক্লিষ্ট করছে, তাও যুগসঞ্চিত সংস্কারের স্থবিরত্ব থেকে উদ্ধার করে মানবপ্রকৃতির নিত্য সত্যকেই উন্মোচিত করে দিচ্ছে। জীবনের যে স্রোত ক্ষণে ক্ষণে নিশ্চল হয়ে যায়, অবরোধ মুক্ত হয়ে তাই আবার নূতন নূতন ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে।

মৃত্যু যখন আমাদের অতি প্রিয়জনকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় তখনই জগতকে আমরা পরিপূর্ণরূপে দেখতে পাই, অভ্যস্থ বস্তুপুঞ্জের অন্তরালে তার প্রকৃতরূপটি আমাদের চোখে আর আচ্ছন্ন হয়ে থাকে না। মৃত্যুর আবির্ভাবে সমস্ত পৃথিবী আমাদের কাছে যেন স্থচীভেদ্য অন্ধকারে পূর্ণ হয়ে যায় কিন্তু সে অন্ধকার বস্তুভার মুক্ত।

স্থতরাং বর্ষশেষের ভাষণে থাকে পরিবর্তনের আনন্দ এবং তাকে গ্রহণের মধ্য দিয়ে পূর্ণতর জীবনের প্রত্যাশা ও উপলব্ধির বাণী।

এ ভাষণটির মতোই কবির ভাষণ সর্বদাই এরকম নূতন আলোকপাতের নিদর্শনে পরিপূর্ণ থাকে। আমি শুধু তার সংক্ষিপ্ত পরিচয়মাত্র দিতে পেরেছি। তবে এর থেকেই ভাষণগুলির বিষয়বস্তুর একটা ধারণা পাওয়া যাবে। অনেকগুলির বিষয় ছেলেদের বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু তাতে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নেই কারণ সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করতে পারলেও, তারা সর্বদাই অবচেতনভাবে বক্তার দৃষ্টিভঙ্গিকে আয়ত্ত করতে চেষ্টা করছে।

ইংলণ্ড থেকে একজন শিক্ষক শান্তিনিকেতনের শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলেন। কবি তাঁকে যে পত্র লিখেছিলেন সর্বশেষে সেটি উদ্‌ধৃত করছি। আমার বক্তব্যের এর চেয়ে ভালো উপসংহার আর হতে পারত না। তিনি লিখেছিলেন, "ছাত্রদের অধ্যাত্ম সংস্কারে দীক্ষিত করব, বোলপুরে বিদ্যালয় স্থাপনের এই ছিল আমার প্রধান-উদ্দেশ্য। সৌভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষের তপোবন বিদ্যালয়গুলির আদর্শ আমাদের সামনে ছিল। ব্রহ্মের মধ্যে আত্মোপলব্ধির সাধনাই এইসব বিদ্যালয়ের লক্ষ্য ছিল, অনন্তকে আস্বাদের আকাঙ্ক্ষা বিদ্যালয়গুলির পরিবেশের মধ্যে বিধৃত হয়ে ছিল। আধ্যাত্মিক সম্পর্কের মধ্যে শিক্ষক এবং ছাত্রেরা বেড়ে উঠতেন বলেই ভগবানের অস্তিত্ব তাঁদের উপলব্ধিগোচর ছিল। এটা তাঁদের কাছে উপর থেকে চাপানো ধর্মবিশ্বাস অথবা শুষ্ক তাত্ত্বিক ধারণার মতো ছিল না।

"আমার উদ্দেশ্য ছিল, এমন একটি বিদ্যালয় স্থাপন করব যেটি হবে একধারে বাসগৃহ এবং দেবমন্দির, সেখানে অধ্যাপনা পূজারত জীবনযাত্রারই অঙ্গ।

"এই স্থানটি আমি বেছে নিয়েছিলাম কারণ শহরের বিক্ষিপ্ততা থেকে দূরে ব্রহ্মোপলব্ধির সাধনায় একটি মহৎ জীবনের উপস্থিতি এই স্থানটিকে পবিত্র করেছে।

"এ কথা ভাববেন না যে আমার লক্ষ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু আমার আদর্শ আজকের জীবনযাত্রার বিকৃত ছন্দোপতনের মধ্য দিয়েও ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠছে। অধ্যাত্মক্ষেত্রে অন্যকে শিক্ষিত করে তোলার কথা যেমন অপ্রাসঙ্গিক, এক্ষেত্রে সফলতার পরিমাপেরও তেমনি কোনো মাপকাঠি নেই। এখানে

আমার বিদ্যালয়ের আমাদের সফলতার নিদর্শন পাওয়া যাবে অধ্যাপকদের আত্মাধিক বিকাশের মধ্যে। এসব ক্ষেত্রে কোনো একজনের নিজস্ব প্রাপ্তি আশেপাশের অন্য সকলকেও বিত্তবান্ করে তোলে। গৃহকোণে একটি দীপ জ্বললেই সমস্ত গৃহ আলোকিত হয়।

"প্রকৃতির সাহচর্য এবং সর্বজীবের প্রতি সহানুভূতির অনুশীলনের মধ্য দিয়ে ছাত্রেরা এ লক্ষ্যের দিকে প্রথম পদক্ষেপ করার সহায়তা লাভ করে। সংগীতও তাদের বিশেষভাবে সহায়তা করে। এ সংগীত শুষ্ক নীতিমূলক স্তবগান নয়। এর মধ্যে রচয়িতার গভীর আনন্দানুভূতি মিশে আছে। সন্ধ্যায় যেদিন চাঁদ উঠে বা বর্ষাকালে যেদিন বৃষ্টির জন্য ক্লাস ছুটি হয়ে যায় তখন ছাত্রদের অবসর শুধুমাত্র এই গানগুলির দ্বারাই পূর্ণ হয়ে উঠে। এর থেকেই বুঝতে পারবেন এগুলি তাদের জীবনকে কি ভাবে প্রভাবিত করছে। সকাল ও সন্ধ্যায় পনের মিনিট করে সময় নির্দিষ্ট আছে। তখন ছাত্রেরা বাইরে খোলা জায়গায় বসে তাদের মনকে উপাসনার জন্য প্রস্তুত করে। আমরা তাদের পাহারা দিই না, তারা তখন কি চিন্তা করে সে-সম্বন্ধে প্রশ্নও করি না। তাদের নিজের উপর, স্থান এবং কালের প্রভাবের উপর এবং অভ্যাসের নির্দেশের উপর আমরা একান্তভাবে নির্ভর করি। এ কার্যে প্রকৃতির অবচেতন প্রভাব, স্থানমাহাত্ম্য এবং আমাদের পূজারত জীবনযাত্রাই আমাদের প্রধান অবলম্বন। প্রত্যক্ষ শিক্ষাদানের উপর ততটা প্রাধান্য নেই।"

এই চিঠির মধ্যে শান্তিনিকেতনের আদর্শের যে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা এবং আশ্রম স্থাপনের উদ্দেশ্যের যে নিগূঢ় অভিব্যক্তি আছে, তাকে ব্যাখ্যা করার শক্তি আমার নেই।

অনুবাদ শ্রীঅমিয়কুমার সেন

সংশোধন

বর্ষ ২১ সংখ্যা ১ : চিত্রপরিচয়

পৃ ৬১ রবীন্দ্রসমীপে জওহরলাল চিত্রটি ১৯৩৬ সালে শ্রীনিকেতনে গৃহীত

পৃ ৬৮ রবীন্দ্রনাথ সহ জওহরলাল চিত্রটি ১৯৩৯ সালে নেহরুর চীনযাত্রার প্রাক্কালে জোড়াসাঁকোয় গৃহীত

বর্তমান সংখ্যা

পৃ ১১০ পাদটীকা : বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ১৪ সংখ্যা ৪

পত্রাবলী সি. এফ. এণ্ডরুজকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পঞ্চম পর্ব

লোহিত সাগর, ২৪শে মে ১৯২০

আজ সন্ধ্যায় সুয়েজে পৌঁছব। এখন থেকেই শীত করতে শুরু করেছে। বুঝতে পারছি, আমরা সত্যিই পৃথিবীর একটি নূতন অংশে এসে পৌঁছেছি। এ দেশ আমাদের দেশের দেবতার নয়, অন্য দেবতার শাসনের অধীনে। আমাদের হৃদয় এখানে আগন্তুকের সংকোচ বোধ করে। এমনকি, এখানকার আবহাওয়াও আমাদের খাপ খায় না। এখানকার লোকেরা চায় যে, আমরা তাদের হয়ে যুদ্ধ করব, আর তাদের জন্য কাঁচা মাল সরবরাহ করব। কিন্তু এদের দ্বারপ্রান্তে আমাদের স্থান— ওপরে লেখা থাকে— এশিয়ার অনধিকার প্রবেশকারীদের অভিযুক্ত করা হবে। এসব কথা মনে এলে আমার ভাবনাগুলিতে পর্যন্ত শীতের কাঁপন লাগে আর শান্তিনিকেতনের রৌদ্রস্নাত ঘরখানার জন্য আমার মন কেমন করতে থাকে।

আজ সোমবার। আগামী রবিবার সকালে আমাদের স্টিমার মার্সাই পৌঁছবে। কিন্তু এখন থেকেই আমি দেশে ফেরার জন্য দিন গুনছি। আমি জানি ফেরার পথে যখন দেখব, এডেনের ন্যাড়া পাহাড়গুলি আঙুল তুলে ভারতের দিকে পথের নির্দেশ দিচ্ছে, তখন আমার মনে আনন্দের শিহরণ লাগবে।

লণ্ডন, ১৭ই জুন ১৯২০

সময়ের যেমন অভাব, তেমন অভাব চিনি আর মাখনের, আর এমন একটি নির্জন জায়গার যেখানে গুছিয়ে বসে একটু ভাবতে পারি, নিজেকে যাতে খুঁজে পাই।

আমার কাছ থেকে বড়ো চিঠি তো আশাই করবেন না— অন্য কিছুও আশা করবেন না। সামাজিক কর্তব্য ঝড়ের বেগে আমার ওপর এসে পড়েছে। পশ্চিমপবনের ওপর যেমন বন্দনাগান (Ode To West wind) রচিত হয়েছিল, তেমনি এর ওপরও একটা লেখা চলতে পারে। একটু সময় পেলে আমি চেষ্টা করতে রাজী আছি। প্রিয়ার গালের একটি তিলের বদলে কবি হাফেজ বোখারা সমরখন্দের সমস্ত ঐশ্বর্য দিতে সম্মত ছিলেন। আমি শান্তিনিকেতনে আমার ওই কোণটুকুর বদলে সমস্ত লণ্ডন শহরকে দিয়ে দিতে পারি। কিন্তু লণ্ডনও যেমন আমার নয়, বোখারা সমরখন্দের সব ঐশ্বর্যও পারস্যের কবির নিজস্ব ছিল না। তাই আমাদের এই দানে খরচও যেমন কিছু নেই, এতে ফলও কিছু লাভ হবে না।

কাল আমি অক্সফোর্ডে যাচ্ছি। তারপরে আরও নানান জায়গায় ঘুরব। একটা চায়ের নেমন্তন্ন আছে, বিশেষ করে আমারই জন্য, তাই এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে হবে। লণ্ডনের রাস্তায় গাড়িচাপা পড়া ভিন্ন আর কোনো অজুহাতেই সেখানে না গিয়ে পারি নে। সত্যি এটা ভেবে আমি অবাক হই, দিনে অন্ততপক্ষে চারবার গাড়িচাপা না পড়ে আমি ফিরি কি করে? কাগজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত যদি এভাবে লিখেই চলি, তবে আমার সময়ের অভাব এ কথা কে বিশ্বাস করবে? তাই তাড়াতাড়ি আপনাকে বিদায় জানাই।

লণ্ডন, ৮ই জুলাই ১৯২০

রোজই ভাবি, আপনাকে একখানা চিঠি লিখব। কিন্তু কি করি, মজ্জাগত ঢিলেমি যে বাধা দেয়। দিনগুলি কাজের চাপে প্রায় কামানের গোলার মতো ভারী হয়েছে। বিশ্রাম যে মোটে পাই না, তা বললে মিথ্যে বলা হয়। কিন্তু আমার দুরদৃষ্ট, সম্পূর্ণ বাধাহীন এমন অবসর পাই নে, যেটা কাজে লাগাতে পারি। কাজেই সেই বিরতিগুলো বৃথাই নষ্ট হয়।

অন্য আর সকলের চেয়ে বেশি ভালো করে আপনি জানেন যে, কিছু না করার ভার কত দুর্বহ। কিন্তু বাইরে থেকে আমাকে দেখলে কোনো ক্ষতির চিহ্নমাত্রও চোখে পড়বে না, কারণ শরীর যে আমার অসম্ভব রকম ভালো।

পিয়ার্সন নিয়মিতভাবে আপনাকে সব খবর সরবরাহ করে যাচ্ছে আশা করি। সে সঙ্গে থাকায় আমার যে কত সাহায্য হয়েছে বুঝতেই পারেন। আর দেখছি, কবির তত্ত্বাবধানের যে গুরু দায়িত্ব তা পালন করার ক্ষমতা ওর চমৎকার। ওকে দেখে মনে হচ্ছে, ও যেন স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্তি। তাছাড়া ওর স্বপ্নগুলোও অতি মনোহর। যেমন ধরুন, কাল রাতে ও স্বপ্ন দেখেছে, কুমড়োর মতো বড়ো বড়ো স্ট্রবেরী ফল কিনছে। ওর স্বপ্নের অদ্ভুত সজীবতাই এতে প্রমাণ হয়।

আমাদের স্কুলের ছুটি শেষ হয়েছে জানি। ছাত্ররা ফিরে এসেছে। ওদের গান ও হাসির শব্দে আশ্রম মুখর। বর্ষা নেমে সেই আনন্দ আরো বাড়িয়ে তুলেছে। আহা, দুখানা ডানা যদি আমি পেতাম। ছেলেদের সবাইকে আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানাবেন।

লণ্ডন, ১২ই জুলাই ১৯২০

কাল আপনার এক বোন এসে অন্য বোনটির ভালো থাকার খবর যখন দিয়ে গেলেন, আমি কত যে আশ্বস্ত হলাম, আর তখন কী আনন্দ যে আমার হল, কি বলব! তাঁদের সম্বন্ধে উদ্‌বেগের কোনো কারণই নেই, একথা তিনি বারবার করে বলে গেলেন। আর জানালেন, তাঁরা তাঁদের নতুন বাড়িতে বেশ আরামেই আছেন। আমি তাঁকে আপনার সব খবরই দিয়েছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ কথা তাঁকে জোর দিয়ে বলতে পারলাম না যে, শরীরের প্রতি আপনি যত্ন নিন।

ইউরোপের নানা জায়গা থেকে ক্রমাগত আমার আমন্ত্রণ আসছে। জানি, সেসব জায়গায় গেলে তাঁরা আমাকে বিপুল সম্বর্ধনা জানাবেন। এখন আমি ক্লান্ত, দেশে ফেরার জন্য মন আমার ব্যাকুল। আমার আকাশচারী ভাবনাগুলো সমুদ্রের এপারে যে তাদের নীড় খুঁজে পেয়েছে তা জানতে পেরে আমি মনে জোর পাচ্ছি। সুদূর পূর্বদেশের একটি কণ্ঠস্বর এদেশের অত্যধিক কর্মব্যস্ত মানুষদের কানে পৌঁছে তাদের মনে আন্তরিক ভালোবাসা ও আগ্রহ জাগিয়েছে এটা কিছু কম আনন্দের বিষয় নয়।

এই ব্যাপারটি নিয়তই আমার মনে বিস্ময় জাগায়। সে যাই হোক, মানুষের চিন্তা ও কাজ যেখানে প্রাণের সাড়া পায়, সেখানে যে সে সত্যতর ও পূর্ণতর জীবন যাপন করে, তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই। যখন আমি প্রতীচীতে থাকি, তখনই সবচেয়ে বেশি করে অনুভব করি যে, সজীব মনের রাজ্যে প্রবেশ করেছি। এখানে এসে আমার আকাশ, আমার আলো আর বিশ্রাম আমি হারিয়ে ফেলি। কিন্তু এরা আমাকে চায়, আর প্রকাশও করে যে, আমাকে ওদের প্রয়োজন। তাই ওদের সংস্পর্শে এসে আমি নিজেকে মেলে ধরতে পারি।

কয়েক বছর পরে, সম্ভবতঃ আমার চিন্তাধারায় এদের আবেদন নাও থাকতে পারে। তখন আমার ব্যক্তিত্বের মূল্যও হয়ত এদের কাছে কমে যাবে। কিন্তু তাতে কিই বা আসে যায়? গাছ তার পাতাগুলো ঝরিয়ে দেয়। কিন্তু যতক্ষণ থাকে, তারাই সূর্যরশ্মিকে গাছের অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দেয়, আর ততক্ষণ তাদের কণ্ঠে বনের বাণীই শোনা যায়।

তেমনি পাশ্চাত্যের মনুষ্যসমাজে আমার যে সংযোগ, তা প্রাণেরই যোগ। সে যোগ ছিন্ন যখন হবে, তখনও এ সত্যটি টিকে থাকবে যে আমার জীবন কিছু আলোর রশ্মি সেখানে নিয়ে গিয়ে, তা সেখানকার চিৎসত্তায় পরিণত করে দিয়েছে। আমাদের জীবনের পরিধি ক্ষুদ্র, সুযোগও কম। তাই সেখানেই আমাদের চিন্তার বীজ বোনা চাই, যেখান থেকে তার দাবি আসে, আর যেখানে একদিন তার ফসল ফলবে।

লণ্ডন, ২২শে জুলাই ১৯২০

পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষে (Houses) যে ডায়ার বিতর্ক হল, তার ফলে ভারতের প্রতি এদেশের শাসকবৃন্দের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে আমার মনে বেদনার সঞ্চার করেছে। এতে বোঝা গেল, ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিরা আমাদের প্রতি যতই অমানুষিক অত্যাচার করুন না কেন, এতে পার্লামেণ্টের সদস্যদের মনে বিন্দুমাত্রও ক্রোধের সঞ্চার হয় না। আবার এসব সদস্যদের মধ্য থেকেই তো আমাদের শাসকরা নির্বাচিত হন।

সেই নৃশংস অত্যাচারের যে নির্লজ্জ সমর্থন তাদের সংবাদপত্রে ও ভাষণে প্রকাশ পেয়েছে, তা বীভৎস। ইংরেজের অধীনে থাকার যে অবমাননা, তার বোধ গত পঞ্চাশ বছর কি তারও আগের থেকে প্রতি মুহূর্তে আমাদের মনে ক্রমশঃ কঠিনতর হচ্ছে। কিন্তু তখনও একটা সান্ত্বনা এই ছিল যে, ইংরেজ জাতের ন্যায়পরতায় আমাদের বিশ্বাস ছিল। ধারণা ছিল তাদের চিত্ত ক্ষমতালোলুপতায় বিষাক্ত হয় নি কারণ সমগ্র জাতির মনুষ্যত্ব সেখানে পরাধীনতার চাপে নিষ্পেষিত নয়।

অথচ সেই বিষ প্রকৃতই অনেক গভীরে প্রবেশ করেছে, তা ব্রিটিশ জাতির মর্মস্থল আক্রমণ করেছে। তাদের মহত্তর প্রকৃতির কাছে আমাদের যে আবেদন; সেই আবেদনের সাড়াও ক্রমশঃ কমতে থাকবে। আশা করি, আমার দেশবাসীরা এতে নিরাশ না হয়ে, দৃঢ়তাও অপরাজেয় সাহসের সঙ্গে তাঁদের পূর্ণশক্তি দেশের সেবায় লাগাবেন।

যা ঘটে গেছে তাতেই প্রমাণ হয়েছে যে, আমাদের মুক্তি আমাদের নিজেদেরই হাতে। একটি জাতির মহত্তের ভিত্তি কখনও দীনাত্মার অবজ্ঞার কৃপণ দানের ওপর নির্ভর করে না। একের সার্থকতার পথে বাধা সৃষ্টি করাই যখন অপরের স্বার্থ, সেই স্বার্থসর্বস্ব লোকদের মুখাপেক্ষী হয়ে উন্নতির রাস্তা খোঁজে আপন শক্তিতে আস্থাহীন ব্যক্তিরাই। দুঃখ ও আত্মত্যাগের কঠিন পথেই সার্থকতা আসে। যে শক্তি দুঃখবিপদকে তুচ্ছ করে, সেই অমৃতময় শক্তি আমাদের নিজেদের মধ্যেই আছে। তারই জোরে আমরা সব শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলো লাভ করি।

লণ্ডন, ১লা অগস্ট ১৯২০

শহরের তরঙ্গক্ষুব্ধ জীবন থেকে অনেকটা দূরে এই বাড়িটির সবচেয়ে ওপর তলায় আমরা রয়েছি। জানালায় বসে কেনসিংটন গার্ডেনসের দিকে তাকিয়ে দূরে গাছের চূড়ায় যেমন কম্পমান পত্রপল্লব দেখতে

পাই, সেই ভাবে লণ্ডনের রাস্তার কলরোলের স্পন্দনটি যেন দূর থেকে আমাকে ছুঁয়ে যায়। লণ্ডনের খারাপ আবহাওয়া দীর্ঘদিন ধরে যা কষ্ট দিয়েছে, এতদিনে যেন তার অবসান হল। ভোরের সূর্যের আলো যেন ঘুমভাঙা চোখের দুটি ভারী পাতা মেলে একটি ছোট্ট শিশুর মতো ছিন্ন মেঘের আড়াল থেকে মিষ্টি হেসে আমায় অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

সকাল প্রায় সাতটা বাজে। পিয়ার্সন আর আমাদের দলের অন্যান্য সকলে দরজা জানলার খড়খড়ি নামিয়ে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। লণ্ডনে আজই আমার শেষ দিন। তার জন্য আমার দুঃখ নেই। বরং আজই যদি বাড়ি ফিরতে পারতাম তো আরো ভালো হত। সেইদিন এখনো সুদূরে অস্পষ্ট, তাই বেদনাবোধ করছি।

লণ্ডন, ৪ঠা অগস্ট ১৯২০

হঠাৎ প্ল্যানের বদল হওয়ায়, আমরা এখনও লণ্ডনে আটকে রয়েছি। আগামী পরশুদিন আশা করছি, লণ্ডন ছাড়তে পারব। এখন লোকে জানে যে, আমরা চলে গেছি। আর আপনাদের লণ্ডনের আবহাওয়াও আর তেমন কষ্ট দিচ্ছে না, তাই এই শেষ দুটি দিন আমি খুব বিশ্রাম পেয়েছি। আপনি জানেন কিনা জানি না, শেষ মুহূর্তে আমরা নরওয়ে যাবার সংকল্প ত্যাগ করেছি, যদিও টিকিট পর্যন্ত কেনা হয়ে গিয়েছিল। আমার মনের অস্থিরতাই এর কারণ বলে আপনি ধরে নেবেন জানি।

পুনশ্চ— ডঃ গেডিস সম্বন্ধে এই মাত্র এই কথা ক'টি লিখলাম— ভারতবর্ষে প্রথম যখন ডঃ পেট্রিক গেডিসকে দেখি, তখন তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নয়, বরং বিজ্ঞানের বহু উর্ধ্বে তাঁর যে পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে দেখেছি, তাতেই মুগ্ধ হয়েছি। অধীত বিদ্যা তাঁর মানবত্বের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেছে। তাঁর মধ্যে বৈজ্ঞানিকের যথার্থতার সঙ্গে আছে ঋষির দূরদৃষ্টি। সাঙ্কেতিক ভাষায় তাঁর চিন্তাগুলিকে স্পষ্টরূপ দেবার কাজে তাঁর শিল্পীসুলভ দক্ষতা আছে। মানুষের প্রতি ভালোবাসা তাঁকে মানবসত্যের প্রতি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন করেছে, আর এমন কল্পনাশক্তি দিয়েছে যাতে পৃথিবীর যান্ত্রিক দিক নয় শুধু, প্রাণের অনন্তরহস্যও তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

প্যারিস, ১৩ই অগস্ট ১৯২০

আমি প্যারিসে এসেছি, এখানে থাকব বলে নয়, এর পরে কোথায় যাব তা স্থির করার জন্য। আকাশে সূর্যের প্রদীপ্ত কিরণ আর বাতাসে উল্লাসের দোলা লেগেছে। সুধীর রুদ্র স্টেশনে আমাকে আনতে গিয়েছিলেন, আমাদের সব ব্যবস্থাও তিনিই করেছেন। আমাদের আমেরিকা যাবার আগে পিয়ার্সন কয়েক সপ্তাহের জন্য ওর মায়ের কাছে গেছে। আমি তাই এখন সুধীরের হাতে, তিনি আমাকে যথেষ্ট যত্ন করছেন। প্যারিস এখন শূন্য। এখানে যাদের সঙ্গে দেখা করতে চাই, তাদের সঙ্গে দেখা হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। ইংলণ্ডে থাকার সময়টা বৃথাই নষ্ট হয়েছে। আপনাদের পার্লামেণ্টে পাঞ্জাবের ডায়ার-বিতর্ক, তাছাড়াও ভারতের প্রতি এদের উদ্ধত ঘৃণা ও অবহেলার যত সব পরিচয় পেয়েছি, তাতে মনে অত্যন্ত বেদনা জেগেছে। ইংলণ্ড ছেড়ে আসতে পেরে যেন বেঁচেছি।

প্যারিসের কাছে, ২০শে অগস্ট ১৯২০

ফ্রান্সের একটি অতি সুন্দর জায়গায় একটি চমৎকার গ্রামে এসেছি ও পেয়েছি সহজ মানুষের পরিচয়। এবার আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছি, মানুষের জীবনের চরম সত্য হল, ভাবের জগতেই তার প্রকৃত বাস।

সেখানে ধুলোর টানে তাকে নীচে নামতে হয় না। সে বুঝতে পারে যে, তার মধ্যে আছে আত্মিক শক্তি। ভারতবর্ষে আমরা সংকীর্ণ স্বার্থের খাঁচায় বাস করি। আমাদের যে ওড়বার ডানা আছে তা আমরা বিশ্বাসই করি না, কারণ আমাদের ওড়ার আকাশ হারিয়ে গেছে। আমরা কিচিরমিচির করি, লাফাই আর ক্ষুদ্র জায়গায় বদ্ধ থেকে একে অন্যকে ঠোকরাই। আমাদের দারিদ্র্য যেখানে খণ্ডিত ও ক্ষুদ্র, আমাদের জীবনের ক্ষেত্র যেখানে অতি সীমিত, সেখানে চরিত্রে ও চিত্তে মহত্ত্ব আনা সত্যিই কঠিন। আমাদের চারিদিকে যে সংকীর্ণতার প্রাচীর রয়েছে তার ভাঙা ফাটলের মধ্য দিয়ে জীবনবৃক্ষের শুষ্কপ্রায় ডালগুলো বাইরের আলোহাওয়ার দিকে এগিয়ে গিয়ে সজীব হোক, আর এই তরুর মূল মরুবালুকার স্তর ভেদ করে অফুরন্ত জলের ঝরনায় মিশে যাক। এখন আমাদের সব চেয়ে বড়ো সমস্যা হল, চারি দিকের বেষ্টনী যত সংকীর্ণই হোক না কেন, আত্মার মুক্তি পেতে হবে। অদৃষ্টের নিরন্তর পরিহাসকে অবজ্ঞা করতে পারলে তবেই মনুষ্যত্বের ধর্ম রক্ষা পাবে।

ভারতের এই তপস্যার প্রতীক হল শান্তিনিকেতন। আমরা ওখানে থেকেও অনেক সময় আমাদের লক্ষ্য যে কত মহৎ তা ভুলে যাই। তার কারণ ভারতের জনগণ বিস্মৃতি ও তুচ্ছতার অন্ধকারে অবলুপ্ত। আমাদের চার দিকে এমন আলো, এমন পরিপ্রেক্ষণী নেই যাতে করে আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের আত্মা মহৎ। তাই আমরা এভাবে চলি, যেন চিরকাল ক্ষুদ্র হয়ে থাকাই আমাদের নিয়তি।

আর্দেনিস, ২১শে অগস্ট ১৯২০

ফ্রান্সের একটা সুরম্য জায়গায় রয়েছি। কিন্তু কাপড়-ভর্তি সব ট্রাঙ্ক হারিয়ে এসে কে কবে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে পেরেছে বলুন। চার দিককার গাছগুলোর মতো দর্জির শরণ না নিয়েও যদি ভব্যতা রক্ষা হত, তবে তাদের সঙ্গে পুরোপুরি আত্মীয়তা বোধ করতে কিছুমাত্র বাধা ছিল না। পোল্যাণ্ডে কি আয়র্ল্যাণ্ডে কি মেসোপটেমিয়ায় কি ঘটছে, তার কোনো গুরুত্ব এখন আর আমাদের কাছে নেই। এখন সব চেয়ে দরকারী কথা হল, প্যারিস থেকে আসার পথে মালগাড়ি থেকে আমাদের দলের সব ট্রাঙ্কগুলি কোথায় খোয়া গেছে।

তাই সমুদ্র, নবোদিত ও অস্তগামী সূর্যের আর তারাভরা নিঝুম রাতের যতই মহিমাগান করুক, প্রাচীন ড্রুইডদের মতো আমার চারপাশের বনস্পতিরা যতই পাহাড়ের উপর খাড়া দাঁড়িয়ে আকাশে দু'বাহু মেলে আদিম প্রাণের জয়গান করুক, আমাদের কিন্তু তাড়াতাড়ি প্যারিসে ফিরে গিয়ে ভদ্রতা রক্ষার জন্য দর্জি ও ধোবার হাতে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

এইমাত্র আপনার চিঠি পেয়ে কিছুক্ষণের জন্য মনে হল আশ্রমমাতা আমাকে সস্নেহে বুকে চেপে ধরেছেন। এই যে অনেকদিনের জন্য তাঁর কাছ থেকে আমার বিচ্ছেদ এতে আমার মন যে কত ভারাক্রান্ত হয়, আপনাকে কি বলব? তবুও আমি জানি, সমগ্র বিশ্ববাসীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক যদি সত্যে ও প্রেমে বেড়ে না ওঠে, তবে আশ্রমের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক পূর্ণতা লাভ করবে না।

প্যারিস, ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯২০

আপনার চিঠি পেলে আমার মনের চারপাশে শান্তিনিকেতনের পরিবেশটি তার বর্ণে, শব্দে, গতিতে ভরপুর হয়ে জেগে ওঠে। সেখানকার ছেলেদের প্রতি আমার ভালোবাসা নীড়-সন্ধানী বিহঙ্গের মতো সমুদ্র অতিক্রম করে আশ্রমের দিকে পাড়ি দেয়। আপনার চিঠিগুলো আমার কাছে মহামূল্যবান সম্পদের

মতো— এর প্রতিদানে যে কিছু দিতে পারি, সে ক্ষমতা আমার নেই। কারণ এখন আমার মন পশ্চিমের দিকে মুখ ঘুরিয়েছে, তাই তার যা কিছু দেবার, স্বভাবতই সেদিকে যাচ্ছে। সেজন্য আপাততঃ আপনার সঙ্গে চিঠিপত্রে আমার যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে গেছে, গ্রীষ্মের ক্ষীণস্রোত কোপাই নদীটিরই মতো। তবে আমি জানি, শান্তিনিকেতনের মূল যদি আমি পশ্চিমের মাটিতেও প্রেরণ করতে না পারি, তবে সে তার পত্রপুষ্পের সম্ভার পূর্ণ করতে পারবে না। নিষ্ঠুর অবিচারে ক্ষুব্ধ হয়ে আমরা ইউরোপকে সর্বতোভাবে ত্যাগ করতে চাই এবং তাতে আমরা নিজেদেরই অপমান করি। আমরা কলহও করব না, প্রতিশোধও নেব না— ক্ষুদ্রতার বদলে কিছুতেই ক্ষুদ্র আচরণ করব না। দেশের সেবায় আমাদের সমগ্র ব্যক্তিত্বের চিন্তার ও ভাবের সম্পদ উৎসর্গ করার এই তো সময়। শিবম্ ও অদ্বৈতমের বিরুদ্ধে যে অপরাধ করেছি, তার জন্যই আমরা দুঃখভোগ করছি। শাস্তি যা পেলাম, তার প্রতিবাদ করতেই আমাদের সব শক্তি ব্যয় করে ফেলছি। নিজেদের দোষ-ত্রুটি সংশোধনের জন্য কিছুই তো বাকি রাখছি না। নিজের কর্তব্য সমাধা হলে, তবেই অন্যের স্খলনের জন্য তিরস্কারের অধিকার জন্মে— তার আগে নয়।

পাঞ্জাবের ব্যাপার এবার আমাদের ভোলা চাই। কিন্তু এ কথা যেন কখনও না ভুলি যে নিজেদের ঘরের সংস্কার না করলে উপর্যুপরি এ ধরনের বিপর্যয়ে অপদস্থ হতেই হবে। সমুদ্রতরঙ্গের প্রতি লক্ষ্য না করে নিজের নৌকো যথেষ্ট মজবুত কিনা, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আমাদের দেশের রাজনীতি বড়োই নিম্নস্তরের। তার দুটি পায়ের মধ্যে একটি শীর্ণ, নড়বড়ে ও পঙ্গু হয়ে পড়েছে— অন্যটি তাকে টেনে নিয়ে বেড়াবে, এই অপেক্ষায় আছে। এই পা দুটির মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নেই। তাই আমাদের রাজনীতিও লাফিয়ে খুঁড়িয়ে এমনভাবে চলে যা হাস্যকর। এই অসম সহযোগীর কখনও অনুনয়, কখনও বা ক্রোধের অভিব্যক্তি আমাদের চরম দুর্বলতারই পরিচয়। অসহযোগ যদি স্বাভাবিকভাবে আমাদের রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিবাদ হিসেবে আসে, তবে তা হবে মহীয়ান, কিন্তু সেটা যদি ভিক্ষারই নামান্তর মাত্র হয়, তবে আমাদের তা ত্যাগ করাই কর্তব্য।

ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের দ্বারা সর্বাগ্রে আমাদের নিজেদের জীবনে ও চিত্তে পূর্ণ সহযোগ স্থাপিত হওয়া চাই। তবেই অসহযোগ স্বতঃস্ফূর্ত হবে। ফল যখন সম্পূর্ণ পেকে ওঠে, সেই সত্যের চরিতার্থতার মধ্য দিয়েই তার স্বাধীনতা আসে।

শত শতাব্দী ধরে আমাদের সামাজিক জীবনের যেসব বাধা আমাদের আত্মোপলব্ধির পথে প্রতিবন্ধক হয়েছে, তার অপসারণের জন্য আমাদের দেশমাতা ব্যাকুল হয়ে তাঁর সন্তানদের সহযোগ কামনা করছেন। দেশকে যে আমার নিজের বলে দাবি করব, তার জন্য সর্বাগ্রে চাই প্রেমে আত্মবিসর্জন, আর সেটা পেতে হলে পূর্ণ সহযোগই প্রয়োজন। তখনই অন্যদের এই কথাটি বলার অধিকার আমাদের জন্মাবে যে, আমাদের নিজেদের ব্যাপারে তোমাদের মাথা গলাবার কোনো প্রয়োজন নেই। এই কাজের জন্য চাই ন্যায়নিষ্ঠ প্রেম। মহাত্মা গান্ধীর জীবনেই এর প্রকাশ সবচেয়ে বেশি এবং সারা পৃথিবীতে একমাত্র তিনিই কেবল জনসাধারণের মনে তা সঞ্চার করতে পারেন।

আমাদের দেশের রাজনীতির জীর্ণ তরণীকে ক্ষুব্ধ তরঙ্গের অভিঘাত সহ্য করতে হয়। তারই উপর ভর করে এই অমূল্য শক্তির অপচয় হবে, এটা সত্যিই দুঃখের বিষয়। কারণ আমাদের জীবনের আদর্শ হল— আত্মিক শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে মুমূর্ষুর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা। বাইরের প্রতিকূল অবস্থার জন্য বাহ্যিক

জিনিসের বিরাট অপচয় তো আছেই, কিন্তু এ ধরনের আত্মিক অপচয় বড়ই মর্মবিদারক— তাছাড়া নৈতিক বিচারেও এই অভিযানটি অনুচিত। সাত্ত্বিক শক্তিকে তামসিক শক্তিতে পরিণত করা খুবই গর্হিত।

হল্যাণ্ডে যাবার দিন ঘনিয়ে এল। সেখান থেকে বক্তৃতা দেবার অনেক আহ্বান এসেছে। কিন্তু আমি এখনও তৈরি হতে পারি নি। এখন আমি লেখায় ব্যস্ত— বিষয়টি হচ্ছে পূর্বপশ্চিমের মিলন। প্যারিস ছাড়ার আগে সেটা শেষ হবে আশা করি।

প্যারিস, ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯২০

জার্মানী থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে সেখানে যাবার সঙ্কল্প করেছিলাম কিন্তু একদেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া আজকাল এমন কঠিন হয়ে পড়েছে, সেই বাসনা তাই আমাকে ত্যাগ করতেই হল। বিশেষ করে ফ্রান্স থেকে জার্মানী যাবার পথে বিস্তর বাধা। হল্যাণ্ড থেকে ফেরার পথে অন্তত হামবুর্গ ঘুরে আসার চেষ্টা করব। জার্মানীকে সহানুভূতি জানানো দরকার— আমার সে সুযোগ হবে আশা করি।

কয়েকদিন আগে মোটরে করে আমাকে Rheimsও ফ্রান্সের আরো কয়েকটি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ দেখানো হয়েছিল। সে অতি করুণ বেদনাদায়ক দৃশ্য। এ জায়গাগুলোকে নতুন করে গড়ে তুলতে অনেক সময় ও প্রভূত প্রয়াসের দরকার। মানুষ যখন আধ্যাত্মিক আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়, যখন তার মানুষের সঙ্গে মানবিক সম্পর্ক একেবারে নষ্ট হয়ে যায়, তখন সে মিলন-মূলক পূর্ণতা থেকে বিচ্যুত হয় এবং ধ্বংসের কাজে ভয়াবহ আনন্দ পায়।

এসব বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলে মানুষ বুঝতে পারে ধ্বংসের প্রবৃত্তিকে কী ভাবে সমাজে বশে রাখা হয়েছে এবং সে প্রবৃত্তিকে ঊর্ধ্বায়িত করে নব নব সৌন্দর্যপ্রকাশের কাজে নিয়োজিত করার চেষ্টা হয়েছে। তখন আমরা জানতে পারি পাপগ্রহ উল্কার মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত, সেগুলি পূর্ণেরই ভগ্ন অংশ। মহৎ আদর্শের মতো একটি বিরাট গ্রহের আকর্ষণ পেলে তবে সৃষ্টির মধ্যে শান্তভাবে মিলতে পারে।

কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক আদর্শেরই সেই আকর্ষণের ক্ষমতা আছে যার জোরে এই বিদ্রোহী খণ্ডগুলিকে পূর্ণতার রূপ দিতে পারে। এই অশুভ শক্তিগুলোকে দানবীয় বলা চলে। তাদের কল্যাণে পরিণত করতে পারে কেবল সৃজনের সংযত তানলয়। আমাদের শিব হলেন প্রলয়ঙ্কর শক্তির দেবতা— তাঁর অনুচরগুলি মৃত্যুরই দূত— অথচ তিনিই আবার শিবম্, পরম মঙ্গল। পাপকে অস্বীকার করা নয়, তার উপরে প্রভুত্ব স্থাপন করাই হল পুণ্য। সৃষ্টির সকল বিরোধবৈষম্যের মধ্যে সুষম ছন্দ আসে শিবশঙ্করের পরম বিস্ময়কর নৃত্যের বশেই।

সত্যিকার শিক্ষা বলতে বুঝি এই অলৌকিক শক্তি, এই সৃজনের আদর্শ। শান্তি বা শৃঙ্খলা বাইরে থেকে যা চাপানো হয়, তা নেতিবাচক। শিবই হলেন শিক্ষাগুরু, ধ্বংসাত্মকতাকে ধ্বংস করার, বিষ পান করার ক্ষমতা কেবল তাঁরই আছে। ফ্রান্সের অন্তরে যদি শিব বিরাজিত থাকেন, তবেই সে অশুভকে শুভ করে তুলতে পারে তার ক্ষমা করার শক্তিতে। সেই ক্ষমাই তাকে অমর করবে, যে আঘাত তাকে হানা হয়েছে, তার থেকে রক্ষা করবে।

এ পথ কঠিন তা জানি। তবু এই-ই মুক্তির একমাত্র পথ। সৃজনের আদর্শই কেবল ধ্বংসের হাত

থেকে বাঁচাতে পারে। এ আধ্যাত্মিক আদর্শ, প্রেমের আদর্শ, ক্ষমার আদর্শ। ভগবৎ প্রেমের ধারা নিরন্তর ঝরছে বলেই তো সৃষ্টি এমন মধুর।

মৃত্যুর অন্তরে আছে জীবনের অবিরাম আনন্দের লীলা। ব্যক্তিগত জীবনেও আমরা কি তা জানি না? এই অপূর্ব সুন্দর পৃথিবীতে আমাদের বাঁচার কি অধিকার আছে? তাকে কি আমরা দগ্ধ করি না, ধ্বংস করি না? তবু ভগবানের এই সৃজনীশক্তিই কি তাঁর সৃষ্টিতে আমাদের নিজস্ব স্থান দেয় নি? অন্য মানুষকে বিচার করতে গিয়ে আমরা যেন সে কথা না ভুলি।

প্যারিস, ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯২০

দেখছি অসহযোগ নিয়ে, আমাদের দেশের লোকেরা উগ্রভাবে মেতে উঠেছে। এই আন্দোলনও বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের মতো একটা কিছু হয়ে দাঁড়াবে। এরকম ভাবের আবেগকে যদি ভারতব্যাপী স্বাধীন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার কাজেই বিশেষ করে লাগানো হত তো কত ভালো হত!

মহাত্মা গান্ধীই এ কাজের সত্যিকারের অধিনায়ক হোন। বিশেষভাবে দেশের সেবার জন্যই তিনি আহ্বান করুন, আত্মত্যাগের জন্য আবেদন জানান। তাতেই প্রেম ও সৃজনভাব লোকের মনে জাগবে। আমার দেশের লোকের সঙ্গে ভালোবাসা ও সেবার মধ্য দিয়ে সহযোগের আদেশ যদি তিনি দেন, আমি তাঁর পায়ের কাছে বসে তাঁর কথামত কাজ করতে রাজী আছি। ক্রোধের আগুন' জেলে দিয়ে তা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেবার কাজে আমার পৌরুষের ক্ষয় কিছুতেই করব না।

মাতৃভূমির প্রতি এই অন্যায় আচরণ ও অপমানের বর্ষণে আমার মনে যে ক্ষোভ আসে না তা তো নয়। কিন্তু আমার সেই ক্রোধ যেন প্রেমের অগ্নি হয়ে জ্বলে। তার থেকে যে পূজার প্রদীপ জ্বলবে, তা আমি স্বদেশের দেবতার মধ্য দিয়ে আমার জীবনদেবতাকে উৎসর্গ করব।

আমার নৈতিক ক্ষোভের পূতশক্তিকে দেশময় ক্রোধের আগুন জালাবার কাজে যদি লাগাই, তবে তা হবে মনুষ্যত্বের প্রতি অবমাননা। এ যেন যজ্ঞের বেদীর আগুন নিয়ে ঘর জ্বালাতে যাবার মতো কাজ।

এণ্টওয়ার্প, ৩রা অক্টোবর ১৯২০

হল্যাণ্ডে প্রায় দু'সপ্তাহ কাটালাম। আমার প্রতি এ দুটি সপ্তাহের বদান্যতা প্রচুর। একটি বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। সেটি হল— এই ছোটো দেশটির সঙ্গে শান্তিনিকেতনের একটি হৃদয়ের যোগাযোগের পথ খোলা হয়েছে। সেই পথটিকে প্রশস্ত করে উভয়ের মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্পদের আদান-প্রদানের ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে। আমাদের এই যাত্রার ফলে ইউরোপ আমাদের খুব কাছে এসে গেছে। আমার শান্তিনিকেতনের বন্ধুরা যদি বুঝতেন যে কথাটা কত সত্য, আর এ জিনিসটি কত মূল্যবান। এখনই আমি সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট করে বুঝতে পারছি যে শান্তিনিকেতন এই বিরাট বিশ্বেরই অঙ্গ, আর আমাদের সেই মহা-সৌভাগ্যের উপযুক্ত হতে হবে।

আমরা ভারতবাসীরা প্রাত্যহিক ছোটোখাটো বিরুদ্ধতার মধ্যেই আমাদের সজ্ঞান মনকে আবদ্ধ রাখি, কারণ সেগুলি ভুলে থাকা আমাদের পক্ষে খুবই কঠিন। কিন্তু অধ্যাত্মজীবনের পথ ও শেষ লক্ষ্য এ সজ্ঞান মনের মুক্তির উপরেই নির্ভর করে। তাই রাজনীতির এই ধুলোর ঘূর্ণিহাওয়ার থেকে শান্তিনিকেতনকে রক্ষা করাই চাই।

আমি গতকাল সকালে এণ্টওয়ার্পে এসেছি। সেখান থেকেই লিখছি। এবার ব্রাসেলসে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছি। সেখানেও যাবার নেমন্তন্ন আছে। তারপরে আবার প্যারিসে ফিরব।

লণ্ডন, ১৮ই অক্টোবর ১৯২০

পরিপ্রেক্ষণীর পরিবর্তনে আমাদের সত্যদৃষ্টিরও পার্থক্য হয়। রাজনৈতিক ঝড়ে যে মানসিক মূঢ়তা চতুর্দিক আচ্ছন্ন করেছে, তার ফলেই ভারতের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গী সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। কোনো কোনো রাজনীতিবিদ সমস্যার দ্রুত সমাধানের চিন্তা করেন, এবং কাজে নামতেও দেরি করেন না। তাঁদের কাজ হল, দ্রুত সাফল্য লাভের জন্য ভ্রান্ত পথেই এগিয়ে যাওয়া— সঙ্গে থাকে রাজনৈতিক-প্রতিষ্ঠান-রূপ ভারী ভারী ট্যাঙ্ক। কিন্তু সর্বমানবের সর্বকালের প্রয়োজনও তো কিছু কিছু আছে। সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের মধ্যেও সেই সিদ্ধির পথ খুঁজতে হয়। সাহিত্য ও সাংবাদিকতার মধ্যে অনেক তফাৎ। সাংবাদিকতারও প্রয়োজন আছে, আর অসংখ্য লোকে তার সেবাও করে। কিন্তু তা যদি সাহিত্যের আলোককে চেপে রাখতে চায় তবে তা নবেম্বর মাসের লণ্ডনের কুয়াসারই সৃষ্টি করবে যার ফলে সূর্য্যালোক গ্যাসের আলো হয়ে দাঁড়াবে।

চিরন্তন মানবের অন্তর্নিহিত সত্যকে প্রকাশ করাই হল শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্য। 'অসতো মা সদ্‌গময়' এই প্রার্থনা যুগে যুগে ধ্বনিত হবে। এমন কি যখন সব দেশের ভৌগোলিক সত্তা বা নাম পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়ে যাবে তখনও এই প্রার্থনা টিঁকে থাকবে। এখন যদি আমি সাময়িক ক্ষোভের বশবর্তী হই বা জনতার দাবি মেনে নিই, তবে তাতে আমার প্রভু যিনি তাঁর উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিয়ে তাঁর সম্পদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়।

আমার প্রভু এই যে মূলধন আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছেন, তার শোষণের জন্য আমার দেশবাসীরা উচ্চরবে আবেদন জানাবে জানি। কারণ তাদের কাছে বর্তমানের প্রয়োজনটিই সর্বাপেক্ষা প্রধান। যতই যা হোক, আপনি জানেন, আমার গুরুদায়িত্ব আমাকে বহন করতেই হবে। অনন্তের বুকের মধ্যে যে চিরশান্তি বিরাজ করছে, যে কোনো অবস্থায় শান্তিনিকেতন সেই ধনকেই লালন করবেই। ভিক্ষায় বা কাড়াকাড়িতে আমরা সামান্যই লাভ করি। কিন্তু আপন সত্যে নিষ্ঠা থাকলে, যা চাই তার চেয়েও বেশি পাই। আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার যা, তা পেয়েছি কেবল আমার মধ্যে যা সত্য তার স্বতঃস্ফূর্ত এবং নিষ্কাম প্রকাশের মধ্য দিয়েই। ফলের কামনায় কখনও সে প্রয়াস করি নি— সে ফলের মহিমার যত ব্যঞ্জনাই থাক।

ভূমিকা

যে চিঠিগুলি উদ্ধৃত করা বাকি রয়েছে, সেগুলির ক্রম অব্যাহতই ছিল। আমি তবু তাদের কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। ইউরোপ ও আমেরিকায় দীর্ঘদিন ভ্রমণকালে তিনি এগুলি লিখেছিলেন। সেবার উইলিয়ম পিয়ার্সন তাঁর সহগামী হয়েছিলেন।

মহাযুদ্ধের ফলে দুঃখদুর্দশার অন্ধতমিস্রায় পৃথিবী ব্যাপ্ত হল। তা দেখে রবীন্দ্রনাথের মনে ক্রমশঃ এই আকাঙ্ক্ষা বদ্ধমূল হল যে, শান্তিনিকেতন আশ্রমে একটি শান্তির নীড় গড়তেই হবে। সেখানে পূর্বদেশ ও পশ্চিমদেশের লোকেরা নিবিড় ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অধ্যয়ন ও কর্মের ক্ষেত্রে সহযোগী হয়ে চলবে।

এশিয়ার ধর্মসংস্কৃতিগুলি বিচ্ছিন্নভাবে চতুর্দিকে ছড়ানো রয়েছে। এখানে তাদের মিলিত করে সংহতভাবে পৃথিবীর সামনে উপস্থিত করবেন— এই অভিলাষই সর্বপ্রথমে তাঁর মনে ছিল। কিন্তু তাঁর উদার দূরদৃষ্টি তো কোনো সংকীর্ণ ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকতে পারে না। সমগ্র মানবসমাজই তাঁর দৃষ্টির পরিধির মধ্যে এল। ১৯১৮ আর ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে অনেক জায়গায় তাঁর ভ্রমণের সঙ্গী হয়ে গিয়েছি। সে সময় ভারতবর্ষের চতুর্দিক তিনি পরিক্রমা করেছেন, খুঁজে বেড়িয়েছেন কেবল এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে মানুষের অগ্রগতি সম্বন্ধে তাঁর চিন্তার বীজ রোপণ করা ও তাতে ফল ফলানো চলে। এই ভ্রমণের সময়ই আমি লক্ষ্য করেছি তাঁর জীবনের প্রধান আদর্শটি কিভাবে ধীরে ধীরে মূর্ত হল। সমগ্র পৃথিবীর লোকের জন্য শান্তিনিকেতনের দ্বার উন্মুক্ত থাকবে, পূর্ব ও পশ্চিম থেকে যাঁরাই শান্তি ও শুভবুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আসবেন, তাঁরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে এখানে সমান শ্রদ্ধার আসন পাবেন।

যে প্রতিষ্ঠান এভাবে সমগ্র বিশ্বকে আতিথ্য দেবে, তার নাম দিলেন তিনি বিশ্বভারতী। সংস্কৃতে বিশ্ব কথার মানে খুব উদার অর্থেই সমগ্র জগৎ। ভারতী কথার প্রতিশব্দ দেওয়া কঠিন, তবে তাতে বোঝায় জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সংস্কৃতি। সর্বজাতি ও সর্বধর্মের লোকের জন্য বিশ্বভারতী একটি জ্ঞানের আলয় হবে। এই ভাবধারা কবি উপনিষদ থেকেই গ্রহণ করেন। প্রাচীন ভারতের তপোবনের কথাই তাঁর মনে ছিল। সে তপোবনের আতিথ্য সকলের জন্যই প্রসারিত ছিল, প্রেমে ও সৌভ্রাত্রে তা পরিপূর্ণ। তাঁর একটি প্রসিদ্ধ ভাষণ হল 'তপোবনের শিক্ষা'। তাঁর অন্য একটি ভাষণেরও উপসংহারে তিনি বলেন— "আমাদের পূর্বপুরুষগণ একটি শুচিশুভ্র আসন পেতে রেখেছিলেন। তাতে সখ্যে ও ভ্রাতৃত্বে বিশ্বভুবনের লোক সমবেত হোক— এই আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেখানে বিরোধের অবকাশ নেই। কারণ আমন্ত্রণটি শান্তম্‌, শিবম্‌ ও অদ্বৈতমেরই নামে। সব সংগ্রামের মর্মস্থলে বসে তিনি শান্ত, সব ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে প্রকাশিত তিনি শিব, সমস্ত সৃষ্টিবৈচিত্র্যের মধ্যে তিনি এক ও অদ্বিতীয়। প্রাচীন ভারতে এই চিরন্তন সত্যটি তাঁরই নামে প্রচারিত হয়েছিল—

আত্মবৎ সর্বভূতানি যঃ পশ্যতি, স পশ্যতি।"

এই মহান আদর্শকে পূর্ণরূপ দেবার জন্য আরেকবার ইউরোপ আর আমেরিকায় যাওয়া কবির প্রয়োজন হল। তাঁর পরিকল্পনায় পাশ্চাত্যের সমর্থন তিনি চেয়েছিলেন, আর আশ্রমে তাঁদের আমন্ত্রণ জানানোও দরকার ছিল। কিন্তু ঠিক যে মুহূর্তে তিনি যাত্রার উদ্‌যোগ করছেন, পাঞ্জাবে এমন সব ঘটনা ঘটল, যা কিছুকালের জন্য সব পিছিয়ে দিল। দাঙ্গা হল, তার প্রতিহিংসা নেওয়াও শেষ হল। অমৃতসরের খবর যখন এল, তখন আমি তাঁর সঙ্গে কলকাতাতেই ছিলাম। সেই সময় তাঁর মনের যে গভীর বেদনা দেখেছি, তা কোনোদিনই ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। রাতের পর রাত কেটে যাচ্ছে, তাঁর চোখে ঘুম নেই। অবশেষে এই ঘটনার প্রতিবাদস্বরূপ নাইটহুড ত্যাগ করে তবে তিনি কিছুটা শান্ত হলেন। সে সময় মনে হচ্ছিল অমৃতসর তাঁর সব আশাভরসা নির্মূল করে দিয়েছে।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে মানবতার প্রতি অন্যায় আচরণে তাঁর কবিমন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ঘটনাটিকে চিরকালের জন্য স্থায়িত্ব দেবার উদ্দেশ্যে সেই স্থানে যখন স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে তোলার প্রস্তাব উঠল, তখন তিনিই তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। ঠিক সেই রকম কয়েক বছর আগে জাপানেও একবার

তাঁকে পাহাড়ে খোদাই করার জন্য একটি ছোট কবিতা লিখে দিতে বলা হয়েছিল। সেও ছিল একটি রক্তপাতের করুণ কাহিনী। তাকে স্মরণীয় করার জন্য তিনি লিখলেন—

They hated and killed and men praised them, But God in shame hastened to hide its memory under the green grass.

ওরা রোষে ভাইয়ের বুকে ছুরি হানল— তবু মানুষ সেই বীরত্বের জয়ধ্বনি করল— কিন্তু সৃজনবিধাতা সেই কলঙ্কস্মৃতি অন্তরাল করার জন্য সবুজ ঘাসের আস্তরণ বিছিয়ে দিতে ব্যগ্র হলেন।

এই বিষয়গুলির উল্লেখ করলাম আমি শুধু এই কারণে যে পরের চিঠিগুলো লেখার সময় তাঁর মনে এই চিন্তাধারাই কাজ করছিল। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে কবি যখন বহুদিন পরে আবার ইউরোপে যান, তখন তাঁর মনের স্থৈর্য ফিরে পেয়েছিলেন। পাশ্চাত্যের মনের স্বাভাবিক ঔদার্যে তাঁর যে বিশ্বাস ছিল, সে বিশ্বাসকে অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়েই যেতে হয়েছিল। তাঁর মগ্নচৈতন্যের গভীর গহনে পাঞ্জাবের ঘটনার ক্ষতচিহ্ন তখনও লুপ্ত হয় নি। তাই বম্বে থেকে তার স্টিমার যখন ছাড়ল, আমি গভীর উদ্‌বেগ নিয়ে আশ্রমে ফিরলাম।

অনুবাদ শ্রীমলিনা রায়

সাংস্কৃতিকী। প্রথম খণ্ড। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। বাক্-সাহিত্য, কলিকাতা ৯। পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি। শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা ১২। ছয় টাকা।

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'সাংস্কৃতিকী' বইটি ভারতীয় এবং বহির্ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে বারোটি প্রবন্ধের সংকলন-গ্রন্থ। এই প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এইজন্য আপাতদৃষ্টিতে এতে কোনো ধারাবাহিকতা পাওয়া যাবে না। এখানে যেমন 'তাও' ধর্ম ও 'সুফী অনুভূতি ও দর্শন' সম্বন্ধে প্রবন্ধ আছে, তেমনি আছে, 'যবদ্বীপের মহাভারত' 'রামায়ণ' এবং 'কুরল্'; 'দরাপ খাঁ গাজী' 'অল্-বীরূনী ও সংস্কৃত' যেমন আছে, তেমনি আছে 'রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা' 'কোল-জাতির সংস্কৃতি' 'মণিপুর-পুরাণ' 'শিল্প-কলা' প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের আলোচনা। এই বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা এবং গভীরতা অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ব্যাপক জিজ্ঞাসা এবং মনীষার পূর্ণ-পরিচয় দিচ্ছে। বস্তুত কোনো প্রবন্ধে তথ্য অপূর্ণ কি না, কিংবা কোনো ভুল তথ্য দেওয়া হল কি না, এসব বিচার পণ্ডিতজনেরা অবশ্য করবেন, কিন্তু এ কথা সর্বদাই মনে রাখা ভালো যে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধ শুধু তথ্যের জন্যই পঠিতব্য নয়। অজস্র এবং অজ্ঞাতপূর্ব তথ্যে পাঠকেরা সহজেই অভিভূত হবেন, কিন্তু সেই সঙ্গে আর-এক বিষয়েও পাঠক একটি উদার দৃষ্টি লাভ করবেন— বিশ্বের মানবসংস্কৃতির অন্তর্নিহিত সংযোগ এবং ঐক্য। তিনি কেবল তথ্যব্যবসায়ী নন কিংবা প্রচলিত অর্থে গবেষক নন; তথ্যের আলোচনা তিনি করেন এই উদার সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর গভীর বিশ্বাসকেই প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্যে।

গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে যখন তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের আবিষ্কার হয়েছিল তখন থেকেই চিন্তার জগতে এক নতুন দিগন্ত দেখা দিল। একই মানবগোষ্ঠী পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার তুলনামূলক আলোচনার দ্বারাই এটা ক্রমপরিস্ফুট হল। ক্রমে সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং বিন্যাস সম্পর্কেও ধারণা গড়ে উঠতে থাকল। মানুষের ভাষা তো শুধু শব্দসমষ্টি নয়, তার সঙ্গে জড়িত থাকে জাতির চিন্তা কল্পনা— এক কথায় তার মানসসম্পদ, তার ঐহিক এবং আধ্যাত্মিক ভাবনা। সেদিক দিয়ে শব্দ ও ভাষা অধ্যয়ন আমাদের নিয়ে যেতে পারে নানা গভীরতর জিজ্ঞাসায়। এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় প্রবেশ করে এক জাতির চিন্তাধারাকে অন্য জাতির মধ্যে বহন করে নিয়ে যায়, কখনও এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় অর্থান্তরিত হয়ে যায়। প্রাচীন মূল শব্দটি কখনও পরবর্তী পরিবর্তিত বিভিন্ন ভাষার শব্দার্থের ঐক্য দ্যোতিত করে। এইসব বিষয় বিচারের দ্বারা অনেক আশ্চর্য সংবাদ বা সিদ্ধান্ত লাভ করা যায়। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যখন বলেন—

'এই পুরূরবা-উর্বশীর ঋক্‌গুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের "উর্বশী"র মহীয়সী কল্পনার কতকগুলি বীজ যেন বিদ্যমান। "উর্বশী" নামটির মৌলিক অর্থ সম্ভবতঃ ইহাই ছিল— উরু অর্থাৎ প্রচুর বা পূর্ণ, বশ অর্থাৎ কামনা যাহার, বা যাহার জন্য (উরু+√বশ্+ঈ)। প্রাচীন গ্রীক ভাষায় ইহার প্রতিরূপ হইবে

*Euru-wekia—*Eurekia। এই হিসাবে *"উরু-বশী—উর্-বশী, উর্বশী" শব্দের অর্থ হইতে পারে The World's Desire—রবীন্দ্রনাথের কথায় "বিশ্ববাসনা"।'

কিংবা যখন বলেন—

'রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার পরিকল্পনার মধ্যে গ্রীকদেবী Aphrodite আফ্রোদীতে ও আফ্রোদীতেকে আশ্রয় করিয়া পরবর্তী ইউরোপীয় সাহিত্যে (বিশেষ করিয়া গ্যোটে হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যে) বিশ্বমধ্যে লীলায়িত সর্বসুন্দরী দেবীশক্তির যে আবাহন ও অনুধ্যান চলিয়াছে তাহারও প্রভাব আছে। আফ্রোদীতে প্রেমের ও কামের দেবী; তিনি মানবসম্পর্কের উর্ধ্বে অবস্থিত অনৈতিক আকর্ষণ-শক্তি; জগতের সমস্ত সৌন্দর্যের বিগ্রহস্বরূপা তিনি। (আফ্রোদীতে নামটির সংস্কৃত প্রতিরূপ "*অভ্রদত্তা" হইতে পারে—"অভ্র বা মেঘের দান"—এই অর্থে।...)'।

তখন লেখকের বক্তব্যকে 'দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ' বলে রসব্যসায়ীরা অপ্রয়োজনীয় মনে করতে পারেন কিন্তু মানুষের চিন্তার একটি অখণ্ড ঐক্য অনুসন্ধানের এই চেষ্টায় মুগ্ধ হতেই হয়। রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' কবিতাকে লেখক একান্ত ব্যক্তিগত উদ্ভাবন বলে মনে করেন না। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় একটি জাতির ঐতিহ্য মুকুলিত। সে জাতি বিশ্বজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। মানুষকে এই সমগ্রতার দৃষ্টিতে দেখবার প্রতিভাই সুনীতিকুমারের প্রতিভা। সত্য কথা বলতে কি, এই ভাবে দেখতে পারাই যথার্থতঃ সংস্কৃতি। এই গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 'সংস্কৃতি'। প্রবন্ধটি মূল্যবান্। লেখক সভ্যতা ও সংস্কৃতি শব্দ দুটির অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। প্রাচীন কাল থেকে শব্দার্থের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যমান্ কি ভাবে বদলায় তার চমৎকার দৃষ্টান্ত এই প্রবন্ধে আছে।

অধ্যাপক সুনীতিকুমারের এই মানবসংস্কৃতি-কেন্দ্রিক দৃষ্টির পরিচয় আমরা আলোচ্য বইয়ের অন্যান্য প্রবন্ধেও সমভাবেই পাই। এই বৃহৎ ঐক্যকে তিনি খুঁজেছেন বলেই অল্-বীরূনীর প্রতি তিনি অসীম শ্রদ্ধাশীল এবং এই জন্যেই বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে সূফী প্রভাবকে মেনে নিতে তাঁর দ্বিধা নেই। এই দুই বিষয়েই তাঁর ইংরেজিতে লেখা প্রামাণ্য প্রবন্ধ অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে। চীন দেশের ধর্ম 'তাও'কে বৈদিক 'ঋত' শব্দের সমার্থক মনে করে তিনি খুশি হন এমন কি দরাপ খাঁ গাজী যদিও একদা হিন্দুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন তবু তাঁর রচিত 'সুরধুনি মুনিকন্যে' শ্লোক তাঁকে অভিভূত করে এবং তাঁর সম্বন্ধে অনুসন্ধানে উৎসাহিত করে। যতদূর জানি বাংলা ভাষায় দরাপ খাঁ গাজী সম্বন্ধে এটিই পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। যবদ্বীপে রামায়ণ ও মহাভারতের প্রচার তাঁর এই চিন্তাপ্রকৃতিকে পুষ্ট করে, কোলজাতির সঙ্গে আর্যজাতির জাতিগত বিভিন্নতা থাকলেও দুই সভ্যতার পারস্পরিক সমন্বয় ও মিশ্রণকে আবিষ্কার করে তিনি কৌতূহল নিবৃত্ত করেন। এই মানব-সমগ্রতার দৃষ্টি ও মনন আধুনিক যুগের বোধহয় সর্বোত্তম দান। এ যুগের কবি দার্শনিক রাষ্ট্রনেতা এই বাণীরই সাধনা করেছেন। অধ্যাপক সুনীতিকুমারের মধ্যে এই যুগসংস্কৃতিকেই ইতিহাস-সত্যের ভাষায় রূপ পেতে দেখি। একদিকে তিনি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ছাত্র, আর-এক দিকে তিনি রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরী সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির গোষ্ঠীভুক্ত।

'সাংস্কৃতিকী' বইটির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এর রচনা ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের বাইরের নানা বিষয় নিয়ে লেখা হলেও মূলত ভারতচিত্তের মর্মবাণীই প্রতি রচনার কেন্দ্রে ধ্বনিত। ভারত-সংস্কৃতিকে লেখক গভীর ভাবে শ্রদ্ধা করেন, ভারতবর্ষের বাণীর সঙ্গে যুক্ত করেই বিশ্বের দানকে তিনি অন্তরে গ্রহণ

করবার পক্ষপাতী। লেখক দেখিয়েছেন ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে শাশ্বত আদর্শ— সমন্বয়পন্থা, তত্ত্বানুসন্ধিৎসা এবং অহিংসা। এই কয়টি লক্ষণ আছে বলেই ভারতীয় আদর্শে অবিচল থেকে বিশ্ববৈচিত্র্যকে স্বীকার ও গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছে। যে-কয়টিকে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির লক্ষণ বলে নির্দেশ করেছেন তরে মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা নেই। সেইজন্যেই এই সাংস্কৃতিক বিচারটাই তাঁর কাছে সত্যকার বিচার। অসাধারণ পাণ্ডিত্য বহুশ্রুতত্ব এবং স্মৃতিশক্তির পরিচয় বইয়ের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকলেও লেখকের মনোভাব মোটেই পণ্ডিতী নয় আর্থাৎ অন্য মত বা অন্য দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি অবজ্ঞা করেন নি, অন্যের ত্রুটি দেখাবার বা সমালোচনা করবার মনোভাব নিয়ে তিনি অগ্রসর হন নি। শ্রদ্ধার সঙ্গে বোঝা এবং গ্রহণের জন্যেই তিনি এই বিচিত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছন। তিনি বলেন—

'সংস্কৃতি জীবনের সঙ্গে জড়িত— সেইজন্য এর চরম রূপ কোনও এক সময়ে চিরকালের জন্য বলে দেওয়া যেতে পারে না। জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা ও সংস্কৃতিও গতিশীল ব্যাপার। ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি যুগে যুগে নোতুন নোতুন ভাবপরম্পরা আত্মস্মাৎ করবার চেষ্টা করেছে, সমর্থও হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা আর সংস্কৃতি তার বিশিষ্ট রূপ পাবার পরে, এ দেশে ইসলামী সংস্কৃতির আবির্ভাব হ'ল। এই সংস্কৃতির মধ্যে যা সনাতন আর বিশ্বমানবের গ্রহণযোগ্য সেটা হচ্ছে এর অন্তর্গত স্ফী দৃষ্টিকোণ, স্ফী আধ্যাত্মিক অনুভূতি।· ·এই মিশ্র ভারতীয় সংস্কৃতিতে এখন আবার আধুনিক ইউরোপের সংস্কৃতির স্থূল সূক্ষ্ম নানা ভাবধারা এসে মিশেছে।· ·আমাদের আদর্শ হওয়া চাই এক মৌলিক বিশ্বসংস্কৃতি, বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক আবেষ্টনী অনুসারে বিভিন্ন জাতির ঐতিহ্য ভাষা প্রভৃতির বৈচিত্র্যকে আশ্রয় করে বহুরূপ হয়ে যা বিরাজ করবে, আর পৃথিবীর তাবৎ মানবজাতি বা মানবসমাজকে তাদের সহজ সাধারণ মানবিকতার প্রতিষ্ঠায় সম্মিলিত ক'রে এক ক'রে তুলবে।'

সাহিত্য-আলোচনার দুটি দিক— একটি তথ্যবিচার অন্যটি রসবিচার। রসবিচার দুরূহ কাজ, যদিও সচরাচর ব্যক্তিগত রুচির উপর নির্ভর করেই রসবিচার করতে দেখা যায়। সাহিত্যের তথ্যবিচারও কম দুরূহ নয়, এতে বুদ্ধিবৃত্তি ছাড়াও প্রয়োজন পরিশ্রমের। অনেকে এই কাজটিকে নিম্নতর দায়িত্ব বলে মনে করেন কিন্তু সকল শিক্ষিত ও সভ্য সমাজই এই শ্রমসাপেক্ষ কাজটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে এবং শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন। নিছক ব্যক্তিগত রুচিকে আশ্রয় করে সমালোচনার আদর্শ শিক্ষিত সমাজে বিগ্রতপ্রায়। বিভিন্ন পাঠ, তুলনামূলক বস্তুবিচার, শব্দপ্রয়োগের নানা বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন সময়ের প্রাচীন পুথির বিচিত্র ইতিহাস, জনরুচির সাক্ষ্য— প্রভৃতি বহু তথ্যগত উপাদানের সাহায্যে সমালোচনাকে বস্তুনিষ্ঠ করবার প্রয়াস পাশ্চাত্য দেশে দেখা যায়। বাংলা সাহিত্যের এই দিকটি কিছু অপূর্ণ, এ কথা স্বীকার করতে হবে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য নিয়ে কিছু কাজ অবশ্য হয়েছে, কিন্তু সে কাজে শ্রমের পরিচয় থাকলেও তদতিরিক্ত প্রয়াস না থাকায় তা আদর্শ হয়ে উঠতে পারে নি। বলা বাহুল্য ব্যতিক্রম সব সময়েই স্বীকার্য।

এ বিষয়ে অভিযোগ করবার পূর্বে এ কথাও ভেবে দেখা দরকার, তরুণ গবেষকদের পরিচালিত করতে পারে এ রকম নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে কিছু আছে কি না। ইংরেজিতে ***An Introduction to Research in English Literary History*** অথবা ***The Principle of Training for Historical Investigation*** জাতীয় বইয়ের অভাব নেই। কয়েক বছর আগে পুণার ভাণ্ডারকর

রিসার্চ ইনস্‌টিটিউট থেকে মহাভারত গ্রন্থ-সম্পাদনার অভিজ্ঞতা ও পদ্ধতি সম্পর্কে একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলায় একটি সুবিস্তৃত মধ্যযুগীয় সাহিত্য থাকা সত্বেও এবং এ বিষয়ে দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' রচনার সময় থেকেই অবহিত হওয়া সত্বেও গবেষণা ও সম্পাদনা -পদ্ধতি সম্পর্কে সে রকম কোনো বই আমরা পাই নি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ প্রভৃতি স্বর্গত পণ্ডিত এবং শ্রীসুশীলকুমার দে, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুকুমার সেন প্রভৃতি জীবিত পণ্ডিতগণ উৎকৃষ্ট সাহিত্য-গবেষণা করলেও তাঁদের অভিজ্ঞতা তাঁরা লেখেন নি। ফলে, নবীন সাহিত্য-গবেষকরা অনেক সময়েই পথ খুঁজে পান না। এই অভাবের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের 'ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি' একটি মূল্যবান্ বই।

লেখক সুদীর্ঘকাল বাংলা পুথিপত্র আলোচনা করে কাটিয়েছেন, সংস্কৃত ভাষায় তিনি সর্বজনপরিচিত পণ্ডিত— সে-সম্বন্ধে তাঁর বহু মৌলিক কাজ বাংলার বাহিরেও পণ্ডিতমহলে স্বীকৃত হয়েছে। বাংলা ভাষা সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা পরিমাণে যথেষ্ট হলেও বিক্ষিপ্ত। বর্তমান গ্রন্থটি এই রকম 'বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমাদের ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক্ সম্বন্ধে' প্রকাশিত আলোচনার সংকলনগ্রন্থ। লেখকের কথায়, বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে কয়েকটি প্রবন্ধ বেছে নিয়ে আলোচ্য গ্রন্থটি প্রস্তুত হয়েছে। এই বইতে আমাদের ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির নানা দিক নিয়ে আলোচনা আছে বটে, কিন্তু বইখানা পড়ে গেলে মোটামুটি একটা ঐক্য চোখে পড়বে— লেখক বস্তুত বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে কাজ করবার দিক্ নির্দেশ করতে চেয়েছেন। সেই দিক দিয়ে বইটি বাংলায় দুর্লভ History and Study of Scholarship জাতীয় বই। বিশেষ করে শেষের চারটি প্রবন্ধ 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য চর্চা' 'পুথির কথা' 'পুথির শেষ কথা' 'সেকালে পণ্ডিতের আদর' থেকে মধ্যযুগীয় পুথি ও পুথি সম্পাদন সম্পর্কে বহু তথ্যের সন্ধান পাই। প্রথম দিকের কয়েকটি প্রবন্ধ বাংলা ব্যাকরণ এবং অভিধান -সম্পর্কিত। এ সম্বন্ধে কিছু মতভেদ পণ্ডিতদের মধ্যে থাকবেই কিন্তু লেখক এখানে এ বিষয়ে যে সমস্যা এবং সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন তার মূল্য অবশ্যস্বীকার্য।

'ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি' শৌখিন পাঠকের জন্য রচিত নয়। কিন্তু তা বলে শুধু যে প্রত্নতত্ত্বরসিকদের জন্যই এই বই তা নয়। 'সংস্কৃতি' বলতে যে মূল্যসন্ধান বোঝায় তার নানা সূত্রপাত এতে আছে। এমন কয়েকটি প্রবন্ধ এতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে যা বিশেষ অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে খুবই কৌতূহলের বিষয় হবে। যেমন 'আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য' 'সংস্কৃত সাহিত্যে মুসলমানের প্রেরণা' 'বাংলার পুরাণকাহিনী' 'বত্রিশ সিংহাসনের নবীন রূপ' 'চোরের পাঁচালি' 'বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ'। এই প্রবন্ধগুলি বিবরণাত্মক এবং তথ্যাশ্রয়ী, কিন্তু পরোক্ষে এগুলি ভারতীয় এবং বঙ্গ সংস্কৃতির নানা দিক উদ্‌ঘাটিত করে। মুসলমান লেখকরা সংস্কৃত ভাষায় লিখতে গেলেন কেন? তাঁরা কি হিন্দুদের মধ্যে নিজেদের ধর্মীয় সংস্কৃতি প্রচার করতে চেয়েছিলেন? অথচ তাঁদের রচনার বিষয় কিছু ইসলামী ছিল না। হিন্দুরা রাজকার্যের ভাষা হিসাবে ফারসীকে গ্রহণ করলেও এই ভাষায় হিন্দু সংস্কৃতি প্রচারের কিছু চেষ্টা করেছেন কি? 'বাংলার পুরাণ-কাহিনী' থেকেও অনুরূপ নানা প্রশ্ন তোলা যায়। বাংলা রামায়ণ মহাভারত মঙ্গলকাব্য পাঁচালিতে নানা নীতিমূলক কাহিনী প্রচলিত আছে যেগুলি সংস্কৃত পুরাণ বা কাব্যে নেই। লেখক বলছেন, 'দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী সংকলিত ও আলোচিত হইলে পুরাণকাহিনীর প্রাচীন ধারা

আবিষ্কার করা সম্ভবপর হইবে— সংস্কৃত পুরাণসাহিত্যের মূলসূত্রও খুঁজিয়া বাহির করার সম্ভাবনা দেখা দিবে।'

এ বিষয়ে অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর ঔদার্য বিশেষভাবেই লক্ষণীয়। সংস্কৃত ভাষাতে যা লেখা তাই একমাত্র প্রামাণ্য এবং গ্রাহ্য, অন্য সবই অস্বীকার্য, এ রকম গোঁড়ামি তাঁর নেই। বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দ-আলোচনাতে তাঁর উদারতার পরিচয় বিশেষভাবেই পরিস্ফুট। 'বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ' এরকম আর-একটি অতিশয় মূল্যবান প্রবন্ধ। যেসব ধর্মীয় এবং নৈতিক আদর্শ আমাদের জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে সেসব ব্রাহ্মণদের দ্বারাই সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে, বাংলা ভাষাতে এই উচ্চতর চিন্তা বা দর্শন আলোচিত হয় নি। আধুনিক যুগের আগে বাংলা ভাষার সেই মর্যাদা ছিল না, এ কথা যদি সাধারণভাবে সত্য হয়ে থাকে, তবে 'বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ' প্রবন্ধটি এ বিষয়ে নতুন তথ্য দেবে সন্দেহ নেই। লক্ষ করবার বিষয়, লেখক বলছেন—

'সংস্কৃতের অনুবাদ বলিয়া এই সকল গ্রন্থের ভাষা একটু সংস্কৃত ভাবাপন্ন তথাকথিত পণ্ডিতী বাংলা। তবে কোন গুরুগম্ভীর বিষয়ের আলোচনা এ সমস্ত পুস্তকে নাই— সাধারণ লোকের বাইরে পণ্ডিতসমাজে ইহাদের বিশেষ আদর ছিল না।'

বাংলা দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত বহু বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা এই বইতে আছে। 'চোরের পাঁচালি' বা 'রেলভ্রমণের প্রাচীন চিত্র' যেমন কৌতুক ও তথ্য পূর্ণ রচনা 'বর্তমান বাংলা নাটকের সহিত সংস্কৃত নাটকের সম্বন্ধ' 'ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর কথা' 'বত্রিশ সিংহাসনের নবীন রূপ' তেমনি গুরুত্ব ও চিন্তা -পূর্ণ। লেখকের যথাযথ তথ্যসংগ্রহের নৈপুণ্য আদর্শরূপে বিরাজিত থাকবে সন্দেহ নেই। সেই সঙ্গে লেখকের গদ্যটিও উল্লেখযোগ্য।

ভবতোষ দত্ত

স্বরলিপি

তুমি যে আমারে চাও আমি সে জানি।
কেন যে মোরে কাঁদাও আমি সে জানি ॥
এ আলোকে এ আঁধারে কেন তুমি আপনারে
ছায়াখানি দিয়ে ছাও আমি সে জানি ॥
সারাদিন নানা কাজে কেন তুমি নানা সাজে
কত সুরে ডাক দাও আমি সে জানি।
সারা হলে দে'য়া-নে'য়া দিনান্তের শেষ খেয়া
কোন্ দিক পানে বাও আমি সে জানি ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

II সা রা গা -া । গধা ধা পা -ক্ষপা । গা -মা -রা -া । -া -া -গা -মা I
তু মি যে ০ আ০ মা রে ০০ চা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ও

I গা রা সা -ধ্া । সা -া -া -রগা । গা -া -া -া । -া -া -া -া I
আ মি সে ০ জা ০ ০ ০০ নি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I গা গপা পা -া । পা পক্ষা পক্ষা -না । ধক্ষা-ধপা-ক্ষা-পা । -া -া -া -া I
কে ন০ যে ০ মো রে০ কাঁ০ ০ দা০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ও

I সা সা সরা -ন্া । সা -া -া -রগা । গা -া -া -া । -া -া -া -া II
আ মি সে০ ০ জা ০ ০ ০০ নি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

গা গা II {পা -ক্ষা ধা -পা । ধা -র্সা র্সা -া । র্সা -না র্রসা -া । পা -র্সা র্সা -না I
এ আ লো ০ কে ০ এ ০ আঁ ০ ধা ০ রে ০ কে ০ ন ০

I না -ধা ধা -া । ধা -না পধা -না । ধনা -ধা ধপা -া । (-া -া গা গা)} I
তু ০ মি ০ আ ০ প০ ০ না০ ০ রে ০ ০ ০ এ আ

। পা -ক্ষা পা -না I না -ধা ধা -পা । পা -ক্ষা ^ধপা -ক্ষা । গা -া -া -া ।
ছা ০ য়া ০ খা ০ নি ০ দি ০ য়ে ০ ছা ০ ০ ০

। -া -া -া -া I সা সা সরা -ন্া । সা -া -া -রগা । গা -া -া -া ।
০ ০ ০ ও আ মি সে০ ০ জা ০ ০ ০০ নি ০ ০ ০

। -া -া -া -া II
০ ০ ০ ০

সা সা II {সা -া -ঋা -া । -া -া ঋা ঋা । ঋা -সা সা -া । -া -া সা পা I
সা রা দি ০ ০ ০ ০ ন্ না না কা ০ জে ০ ০ ০ কে ন

I পা -া পা -া । পা -ক্ষা ^ধপা -ক্ষা । গা -মা গা -া । -া -া গা ক্ষা I
তু ০ মি ০ না ০ না ০ সা ০ জে ০ ০ ০ ক ত

I পা-ক্ষধা পা-ক্ষা । গা -া -ঋা -া । সা -া -া -া । -া -া -া -া I
স্ ০০ রে ০ ডা ০ ০ ক্ দা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ও

I সা সা সঋা -ন্া । সা -ঋা -া -জ্ঞ^ঋসা । সা -া -া -া । -া -া (-া -া)} I গা গা I
আ মি সে০ ০ জা ০ ০ ০০০ নি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ সা রা

I {পা -ক্ষা ধা -পা । ধা -র্সা সা -া । র্সা -না ^র্রর্সা -া । পা -র্সা র্সা -না I
হ ০ লে ০ দে ০ য়া ০ নে ০ য়া ০ দি ০ না ন্

I না -াঃ -ধঃ ধা । ধা -া -ধনর্সা -না । ধনা -ধা ^ধপা -া । (-া -া গা গা)} I
তে ০ ০ র শে ০ ০০০ ষ্ থে০ ০ য়া ০ ০ ০ সা রা

। পা -ক্ষা -পা -না I ধা -া -পা -া । পা -ক্ষা ধপা -ক্ষাপা । গা -া -া -া ।
কো ॰ ॰ ন্ দি ॰ ॰ ক্ পা ॰ নে ॰ ॰ বা ॰ ॰ ॰

। -া -া -া -া I সা সা সরা -ন্া । সা -া -া -রগা । গা -া -া -া ।
॰ ॰ ॰ ও আ মি সে॰ ॰ জা ॰ ॰ ॰॰ নি ॰ ॰ ॰

-া -া -া -া II II
॰ ॰ ॰ ॰

সম্পাদকের নিবেদন

সমবয়সী ব্যক্তির কাছ থেকে শ্রদ্ধা লাভ করা বড় কঠিন কথা। রবীন্দ্রনাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রায়-সমবয়সী, কিন্তু উভয়ে উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁরা তাঁদের সম্পর্কটি খুব সহজ ক'রে নিতে পেরেছিলেন, কেননা দার্শনিক ছিলেন কাব্যের অনুরক্ত এবং কবি ছিলেন দর্শনের অনুরাগী। তাঁদের সম্পর্কটি উভয়ের ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, উভয়ের কর্মগত বিষয়ের মধ্যে এই সম্পর্ক ছিল ব্যাপ্ত। এই সংখ্যায় মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও ব্রজেন্দ্রনাথের পত্র নূতন ক'রে এর সাক্ষ্য দেবে। 'জ্ঞানের দুর্গম ঊর্ধ্বে সমুচ্চ মহিমায়' যিনি আরোহণ করেছেন তিনি কবির কাব্য গীতাঞ্জলি'র অন্তরঙ্গ কথা নিয়ে চিন্তা করছেন, এবং রবীন্দ্রকাব্যে "গীতাঞ্জলি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ জিনিস আছে (from the point of view of Art)"— এ কথা তিনি তখনই ঘোষণা করতে পেরেছেন যখন এই কাব্যগ্রন্থটি নোবেল পুরস্কার অর্জন করে বিশ্বময় অভিনন্দিত হচ্ছে। ব্রজেন্দ্রনাথ যেমন রবীন্দ্রপ্রতিভা হৃদয়ঙ্গম করেন রবীন্দ্রনাথও তেমনি ব্রজেন্দ্রমনীষা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এইজন্য বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা-উৎসবে তিনি সভাপতি-রূপে বরণ করে এনেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথকেই। সে সময়ে (১৯২১) দেশে ব্রজেন্দ্রনাথের চেয়ে প্রখ্যাত আরও অনেকে অবশ্যই ছিলেন, এবং তাঁদের কাউকে এই সম্মানের আসন দিলে অন্যভাবে প্রতিষ্ঠানটির অনেক সুবিধে হয়তো হতে পারত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেসব সুবিধের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে বিদ্যাপীঠের উদ্‌বোধনের ভার অর্পণ করলেন একজন বিদ্বজ্জনকেই।

বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা-উৎসবে ব্রজেন্দ্রনাথ সভাপতিরূপে যে ভাষণ দেন আমরা এই সংখ্যায় সেটি পুনর্মুদ্রণ করলাম। এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য রচনা মুদ্রণ করে আমরা আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের জন্মশতবার্ষিক-উৎসব উদ্‌যাপন করলাম।

জন্মশতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে আমরা আরও একজন মনস্বীর কথা স্মরণ করেছি, তিনি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। বাংলা ভাষাকে মর্যাদার আসন দিয়ে তিনি বঙ্গভাষী-মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে আছেন। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন-মহাশয় লিখিত প্রবন্ধে এ বিষয়ে এবং রবীন্দ্রনাথ ও আশুতোষ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা আছে। রবীন্দ্রনাথ ও আশুতোষের মধ্যে যে পত্রবিনিময় হয়, এই উপলক্ষে আমরা তার কয়েকটি মুদ্রণের সুযোগ গ্রহণ করেছি।

সম্প্রতি অসিতকুমার হালদার মহাশয় লোকান্তরিত হয়েছেন। তাঁর সম্বন্ধে শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের রচনা প্রকাশ করে আমরা পরলোকগত শিল্পীকে স্মরণ করলাম।

স্বীকৃতি

অসিতকুমার হালদার -অঙ্কিত অনন্ত যাত্রা বহুবর্ণ চিত্রটি ও শিল্পীর প্রতিকৃতি-চিত্রটি শ্রীযুক্তা অতসী বড়ুয়ার সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সুরের আগুন চিত্রটি শান্তিনিকেতনের কলাভবনের সৌজন্যে মুদ্রিত।

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সম্বন্ধে লিখিত রবীন্দ্রনাথের কবিতার এবং রবীন্দ্রনাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথের পত্রাবলীর পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত।

সহ-সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

পুরাতন সংখ্যা

বিশ্বভারতী পত্রিকার পুরাতন সংখ্যা কিছু আছে। যাঁরা সংখ্যাগুলি সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক, তাঁদের অবগতির জন্য নিম্নে সেগুলির বিবরণ দেওয়া হল—

¶ প্রথম বর্ষের মাসিক বিশ্বভারতী পত্রিকার চার সংখ্যা, একত্র ১'০০।

¶ তৃতীয় বর্ষের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা, প্রতি সংখ্যা ১'০০।

¶ পঞ্চম বর্ষের দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, প্রতি সংখ্যা ১'০০।

¶ অষ্টম বর্ষের প্রথম তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, প্রতি সংখ্যা ১'০০।

¶ নবম বর্ষের প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, প্রতি সংখ্যা ১'০০।

¶ ষষ্ঠ সপ্তম দশম একাদশ ও চতুর্দশ বর্ষের সম্পূর্ণ সেট পাওয়া যায়। প্রতি সেট ৪'০০, রেজেষ্ট্রী ডাকে ৬'০০।

¶ পঞ্চদশ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা ৩'০০, বাঁধাই ৫'০০ ; তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, প্রতিটি ১'০০।

¶ ষোড়শ বর্ষের দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুক্ত-সংখ্যা, ৩'০০।

¶ অষ্টাদশ বর্ষের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়; ঊনবিংশ বর্ষের তৃতীয় এবং বিংশ বর্ষের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা পাওয়া যায়, প্রতি সংখ্যা ১'০০।

বিশ্বভারতী পত্রিকা

কলকাতার গ্রাহকবর্গ

স্থানীয় গ্রাহকদের সুবিধার জন্য কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়মিত ক্রেতারূপে নাম রেজিস্ট্রি করবার এবং বার্ষিক চার সংখ্যার মূল্য ৪'০০ টাকা অগ্রিম জমা নেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এইসকল কেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা উল্লিখিত হল—

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ কলেজ স্কোয়ার

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন

জিজ্ঞাসা
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
৩৩ কলেজ রো

ভবানীপুর বুক ব্যুরো
২বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড

যাঁরা এইরূপ গ্রাহক হবেন, পত্রিকার কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হলেই তাঁদের সংবাদ দেওয়া হবে এবং সেই অনুযায়ী গ্রাহকগণ তাঁদের সংখ্যা সংগ্রহ করে নিতে পারবেন। এই ব্যবস্থায় ডাকব্যয় বহন করবার প্রয়োজন হবে না এবং পত্রিকা হারাবার সম্ভাবনা থাকে না।

মফস্বলের গ্রাহকবর্গ

যাঁরা ডাকে কাগজ নিতে চান তাঁরা বার্ষিক মূল্য ৫'৫০ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কলিকাতা ৭ ঠিকানায় পাঠাবেন। যদিও কাগজ সার্টিফিকেট অব পোস্টিং রেখে পাঠানো হয়, তবুও কাগজ রেজিস্ট্রি ডাকে নেওয়াই অধিকতর নিরাপদ। রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠানোর জন্য অতিরিক্ত ২৲ লাগে।

শ্রাবণ থেকে বর্ষ আরম্ভ।

Sir Isaac Newton held that gravity is a force, whereas Einstein regarded it as a property of space, which he believed was curved. But they had one thing in common. Both the Law of Gravitation and the Theory of Relativity were put down on papers for the consumption of knowledge-hungry world.

The world's first paper was made by the wasp for nesting purposes. The Egyptians manufactured Paper by cutting strips from the stem of the Papyrus plant-moistening them and laying them flat.

In modern India, J. K. Paper Mills produce all quality high grade writing and printing paper.
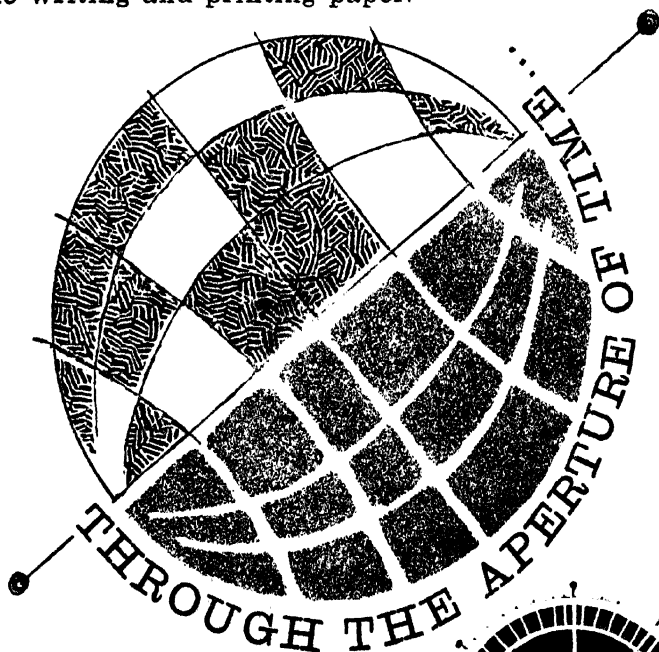
J. K. PAPER MILLS
A division of
STRAW PRODUCTS LIMITED
11, Rabindra Sarani,
Calcutta-1
Mills: P.O. JAYKAYPUR, Dist. Koraput,
Orissa.

KALPANA J.K.5.

সম্পাদক শ্রীসুধীরঞ্জন দাস বর্ষ ২১ সংখ্যা ৩ মাঘ-চৈত্র ১৩৭১
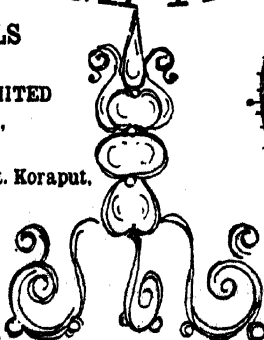
Common things
bloom into wonderful
works of art by the
creative genius of an
artist through his subtle
brush-work and use of colour.
Here is an example from Orissa.
But it is only half of the work. Now
is the turn of the craftsmen in Process
Engraving and Printing, who by their
technical knowledge and experience
reproduce the work of art with all the
details, not even missing the throbbing
life in it. One should, therefore, take
the help of such Process Engravers
and Printers who have the exp-
erience and knowledge to
do justice to the work
entrusted to them and
move with the most mod-
ern machines at their
disposal.

Phone : 34-1552

REPRODUCTION SYNDICATE

Process Engravers & Colour Printers

7-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA 6

IISCO

সমৃদ্ধির পথ
এই উপমহাদেশে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত লৌহপথ
ধরেই আজ প্রসারিত। সমগ্র দেশকে একসূত্রে
গ্রথিত ও ঐক্যবদ্ধ করেছে এই লৌহপথ, কিন্তু
আপনাদের সহযোগিতার উপরই এর
সামর্থ্য সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।
এই জটিল লৌহজালের পরিচালন ব্যবস্থা নিতান্তই
দুরূহ, এর প্রতিটি গ্রন্থির গুরুত্ব অপরিসীম ;
কোথায়ও সামান্যতম বিশৃঙ্খলায় সমগ্র পরিচালন
ব্যবস্থাই বিপর্যস্ত হ'তে পারে।
পূর্ব
রেলওয়ে
ARTADS

বিশ্বভারতী পত্রিকা

বর্ষ ২১ সংখ্যা ৩ · মাঘ-চৈত্র ১৩৭১ · ১৮৮৬-৭ শক

সম্পাদক শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

মূল্য এক টাকা

বৃষ্টিস্নাত কোনারক
শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু
শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২১ সংখ্যা ৩ · মাঘ-চৈত্র ১৩৭১ ১৮৮৬-৭ শক

বিবেকানন্দ

কিছুদিন আগে বিবেকানন্দ
বলেছিলেন, প্রত্যেক মানুষের
মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি; বলেছিলেন
দারিদ্রের মধ্য দিয়ে নারায়ণ
আমাদের সেবা পেতে চান।
একে বলি বাণী। এই বাণী স্বার্থবোধের সীমার
বাইরে মানুষের আত্মবোধকে
অসীম মুক্তির পথ দেখালে।
এতো কোনো বিশেষ আচারের
উপদেশ নয়, ব্যবহারিক সংকীর্ণ অনুশাসন
নয়। ছুঁৎমার্গের বিরুদ্ধে এর
মধ্যে আপনিই এসে
পড়েছে, — ওর দ্বারা রাষ্ট্রিক
স্বাতন্ত্র্যের সুযোগ হতে পারে
বলে নয়, ওর দ্বারা মানুষের

অপমানের দুঃখ হবে বলে, সেই
~~[illegible]~~ অপমানকে আমাদের
প্রত্যেকের আত্মাবমাননা। বিবেকা-
নন্দের এই বাণী সমস্ত মানুষের
উদ্বোধন বলেই কর্মের মধ্যে
দিয়ে ত্যাগের মধ্যে দিয়ে মুক্তির
বিচিত্র পথে আমাদের যুবকদের
প্রবৃত্ত করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বামী অশোকানন্দকে লিখিত পত্রের অংশ, ফাল্গুন ১৩৩৫

বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে-মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

'সমাজ', পূর্ব ও পশ্চিম, ১৩১৫

Vivekananda's idea was that we must accept the facts of life···We must rise higher in our spiritual experience in the domain where neither good nor evil exists. It was because Vivekananda tried to go beyond good and evil that he could tolerate many religious habits and customs which have nothing spiritual about them.

Rolland and Tagore, 1945

চরকাকাটা একটা বাহ্যক্রিয়া—এটাকে একটা লৌকিক আচার করে তোলা যেতে পারে। কিন্তু আচার প্রায়ই প্রবল হ'য়ে বিচারকে উপেক্ষা করে। কোনো একটা অভ্যস্ত দৈহিক কর্মকে যখনি উচ্চ সাধনার মূল্য দেওয়া হয় তখনি সে আন্তর সত্যের চেয়ে বাহ্য আচারকে বড়ো জায়গা দেয় আমাদের সমাজে তার অনেক প্রমাণ আছে। আরো একটা নতুন আচার যোগ ক'রে আমাদের মনোবৃত্তির জড়তা তাতে বাড়ানো হ'বে ব'লে আশঙ্কা করি।

একা একা ব'সে যাঁরা চরকা কাটেন তাঁরা মনে মনে ভাবতে পারেন যে চরকা কেটে সুতো উৎপাদন করে তাঁরা দেশের ধন বৃদ্ধি করচেন। কিন্তু একথা মনে রাখতে বেশি লোকে বেশি দিন পারবে না—ক্রমেই এটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হ'য়ে বুদ্ধিকে ম্লান ক'রেই দেবে।

বস্তুত চরকা কাটো একথার মধ্যে কোনো মহৎ অনুশাসন নেই এই জন্যে একথায় পূর্ণভাবে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটায় না। আধুনিক কালে ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, সেটি কোনো আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন তোমাদের সকলেরই মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি, দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটি যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েচে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্র ভাবে বিচিত্র ত্যাগে ফলেচে। তাঁর বাণী মানুষকে যখনি সম্মান দিয়েচে তখনি শক্তি দিয়েচে। সেই শক্তির পথ কেবল একঝোঁকা নয়, তা কোনো দৈহিক প্রক্রিয়ার

পুনরাবৃত্তির মধ্যে পর্য্যবসিত নয়, তা মানুষের প্রাণ মনকে বিচিত্র ভাবে প্রাণবান করেচে। বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যে সব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে আঙুলকে নয়। ভয় হয় পাছে আচারের সঙ্কীর্ণ অনুশাসন সেই নবোদ্বোধিত তেজকে চাপা দিয়ে ম্লান ক'রে দেয়, কঠিন তপস্যার পথ থেকে যান্ত্রিক আচারের পথে দেশের মনকে ভ্রষ্ট করে।

সরসীলাল সরকারকে লিখিত

'চরকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য' শিরোনামায় প্রকাশিত, প্রবাসী ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ

স্বামী বিবেকানন্দ

১৮৯৩ সালে গৃহীত

বিবেকানন্দের কবিতা ও জীবন

সুনীলচন্দ্র সরকার

বিবেকানন্দের রীতিমত কবিতার সংখ্যা কুড়ি-একুশটি হবে, এ ছাড়া তাঁর কবিতার কিছু কিছু লাইন ছড়িয়ে আছে তাঁর চিঠিপত্রে। শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তব (সংস্কৃত) ও বাংলায় সাবেকি চালে লেখা শিব ও কৃষ্ণের ভজনগান দু তিনটি এই হিসাব থেকে বাদ দিচ্ছি। বাকি কবিতাগুলি আবার ইংরাজি, বাংলা ও সংস্কৃত এই তিন বিভিন্ন ভাষায় লেখা। এদের প্রেরণা : জীবনদর্শন, দেশপ্রেম, মানবপ্রেম, অধ্যাত্ম-উপলব্ধি। প্রথম তিন রকমের বিষয় জড়িয়ে উল্লেখযোগ্য কবিতা হচ্ছে দশটি, তার দুটিমাত্র বাংলায়, বাকি আটটি ইংরাজিতে। যথা, সখার প্রতি, নাচুক হৃদয়ে শ্যামা, An Early Violet, Where Art Thou Gone, Angels Unawares, Requiescat in Pace, Hold on yet Awhile, To the Awakened India, Fourth July, The Song of the Sanyasin.

আর তাঁর আত্মিক বা মিস্টিক কবিতার তালিকায় স্থান দেওয়া যায় এই ন'টি কবিতাকে। সৃষ্টি, নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি, গাই গীত শুনাতে তোমায়, শিবস্তোত্রম্, অম্বাস্তোত্রম্, Kali the Mother, Who knows how the Mother, Peace ও Dream। এ ছাড়া তাঁর শেষজীবনের একটি চিঠিতে শান্তির আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতি এমন গভীর আবেগময় ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে যে সেই গদ্যরচনাকেও একটি গদ্যকবিতা হিসাবে স্থান দিলে এই পর্যায়ে সংখ্যা দাঁড়ায় দশ। দেখা যাচ্ছে এই দশটি কবিতার মধ্যে চারটি বাংলা, দুটি সংস্কৃত ও বাকি ইংরাজি।

প্রায়ই দেখা যায় কোনো কোনো মহান্ ব্যক্তির অপ্রধান কর্মও জনচিত্তে তাঁর অমর স্মৃতির রাজ্যে স্থান দাবী করে ; অনেক সময় তাঁর মাহাত্ম্য তাঁর গৌণ কীর্তিকেও একটা অযথা গৌরবের অধিকারী করে তোলে। রাজা রামমোহনের গান, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কবিতা, মধুসূদনের ইংরাজি উপন্যাস, বঙ্কিমচন্দ্রের আগমনীর কবিতা, তাই বা কেন— ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বহু ধর্মবোধসূচক সনেট ও কবিতা তাঁদের নামাঙ্কিত না হলে হারিয়েই যেত কতদিন আগে। স্বদেশে বিদেশে ন্যায্যলুপ্তি এড়িয়ে যাওয়ার উদাহরণ অনেক দেওয়া যেতে পারে। বিবেকানন্দের কবিতাকেও কি এই শ্রেণীর স্মৃতিসম্ভারের মধ্যে স্থান দেওয়া উচিত ? না তার নিজস্ব দাবী আছে অমরত্বের ? কিম্বা হয়তো কাব্যমূল্যে গরীয়ান্ না হলেও তাঁর জীবনের গূঢ় প্রেরণা ও পরিণতির দিকনির্ণয়ে এগুলি বিশেষভাবে সহায়ক— তাই আমরা এদের রক্ষা করতে বাধ্য ?

বিবেকানন্দের কবিত্বখ্যাতির প্রতিবন্ধক ছিল এবং আছে কয়েকটি। প্রথম এদের সংখ্যাল্পতা ; দ্বিতীয় এদের ভাষার বিভিন্নতা। আধুনিকযুগে সংস্কৃত কবিতায় কি মৌলিক কবিত্বপ্রকাশ সম্ভব ? ইংরাজিতে কাব্যসিদ্ধির সম্ভাবনাই বা কতটুকু। ইংরাজি বিবেকানন্দ ভালোই জানতেন। তাঁর ইংরাজি বক্তৃতার মধ্য দিয়ে ভাবপ্রবাহ সংক্রমিত হত বিদ্যুতের মতো। কিন্তু ইংরাজি মীটার ও ইডিয়ম আয়ত্ত করবার তিনি সময় ও সুযোগ পেলেন কোথায় ? বাংলায় তাঁর অসাধারণ অধিকারের নিদর্শন দেখি তাঁর গদ্যে, তাঁর পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য, ভাববার কথা ইত্যাদি রচনায়, তাঁর অসংখ্য বাংলা চিঠিপত্রে।

বাংলা কাব্যেও তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ছিল এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। কিন্তু বাংলা কাব্যের একটা স্বকীয় ডিক্‌শন ও স্টাইল গড়ে তুলতে যে সাধনা ও অভ্যাসের দরকার তার সময়ও তিনি পান নি। তাঁর সমস্ত কবিতাই রচিত হয়েছে একটা তাৎক্ষণিক আন্তর আবেগের তাগিদে, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য বা পরিস্থিতির দাবী মেটাতে। কাজেই শ্রোতা ও পরিবেশ বুঝে তিনি বেছে নিয়েছেন ভাষা। সেগুলি অন্যরকম হলে, কিম্বা তিনি আরো বেশি দিন বাঁচলে, কিম্বা কাব্যের একটা স্বতন্ত্র মূল্য সম্বন্ধে আস্থাবান্ হয়ে কিছুকাল তাইতেই মন দিতে পারলে তার ফলও অন্যরকম হত। ইংরাজি ও বাংলা কবিতা তিনি নিশ্চয় আরো অনেক লিখতেন। ক্রমশ এই দুই ভাষাতেই তাঁর নিজস্ব একটা স্টাইলের আবির্ভাব হত। এবং কবি হিসাবে তাঁর মৌলিকত্ব ও গুরুত্ব বিচার করার কাজ সহজ হত।

কিন্তু অপরপক্ষে বলা যায় যেভাবে এগুলি লিখিত হয়েছে তাতে বিবেকানন্দের জীবন ও সাধনার অর্থবোধের জন্য এরা অপরিহার্য। অতএব মূল্যবান ও রক্ষণীয়। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, শুধু এইটুকুতেই এদের মূল্য শেষ হয়ে যায় নি। এগুলির মধ্যে আছে সত্য কবিত্বের শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, অভ্রান্ত স্বাক্ষর। নরেনের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ যতগুলি শক্তির অস্তিত্ব টের পেয়েছিলেন তার মধ্যে এই কবিত্বও নিশ্চয় একটি। এই কবিপ্রাণ যুবক কবিতা লিখে শুধু শখই মেটান নি, অপ্রতিরোধ্য প্রেরণা তাঁর হৃদয়মনকে হিমশিলার মত গলিয়ে বইয়ে দিয়েছে কবিতায়। দীর্ঘ চর্চার অভাবকে ছাপিয়ে, ভাষা ও ছন্দের অনভ্যস্ততার বাধা এড়িয়ে ভিতরের সেই কাব্য বাইরে মুক্তি পেয়েছে। মৌলিকতা তাই ছন্দে বা ভাষাসজ্জায় ততটা স্পষ্ট না হয়ে উঠলেও তা আছে বিবেকানন্দের অনন্য মন ও প্রেরণার সবল স্পন্দনে— যা একটু মনোযোগ দিলেই এই কবিতাগুলির মধ্যে চিনে নেওয়া যায়। তিন ভাষাতেই বিবেকানন্দের কবিতা কাব্যরাজ্যে বিশেষ স্বীকৃতি পাবার যোগ্যতা লাভ করেছে।

রচনার তারিখ সাজিয়ে যেসব সিদ্ধান্ত পাওয়া যেতে পারত তার আশা আপাতত ত্যাগ করছি। কারণ প্রধান কয়েকটি রচনার রচনা-তারিখ অজ্ঞাত। সৃষ্টি, প্রলয় বা গভীর সমাধি (নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতি) ও সংস্কৃত স্তোত্রগুলি নিশ্চয় শ্রীরামকৃষ্ণ-তিরোধানের কাছাকাছি, অর্থাৎ আমেরিকা-যাত্রার অনেক আগে লেখা। 'গাই গীত শোনাতে তোমায়' ১৩০৮-৯এর উদ্বোধনে প্রকাশিত, অর্থাৎ ১৯০১ সালে বা পরে। অথচ এর প্রথম উল্লেখ ও উদ্ধৃতি আছে বিবেকানন্দের ১৮৯৪ সালের আমেরিকা থেকে লেখা এক চিঠিতে। 'নাচুক হৃদয়ে শ্যামা'ও প্রকাশিত ১৯০০ সালের পরে, লেখা কখন জানা নেই। সম্ভবত ১৮৯৪-৯৫ সালে। 'সখার প্রতি' সম্বন্ধেও ঐ একই বক্তব্য।

কিন্তু ইংরাজি কবিতাগুলির রচনাকাল তত অনিশ্চিত নয়। The Song of the Sanyasin লেখা হয় ১৮৯৫ সালে। তার আগে চিকাগো কন্‌ফারেন্সের ঠিক আগে ১৮৯৩ সালে লেখা O'er Hill and Dale। বাদবাকি কবিতার মধ্যে প্রধান পাঁচটি লেখা ১৮৯৮ সালে, এবং Peace ও Dream এই দুটি ১৮৯৯ ও ১৯০০ সালে।

এই হিসাব থেকে সিদ্ধান্ত করা অনুচিত হবে না যে বিবেকানন্দের সুপ্ত বা অবহেলিত কবিপ্রতিভার স্ফুরণ হয় পাশ্চাত্ত্য জীবন ও কর্মজগতের সংস্পর্শে। তাঁর মোট কাব্য-রচনাকাল ১৮৯৩ থেকে ১৯০০, এই আট বৎসর ধরলে এর মধ্যে তাঁর কবিমানসের ক্রমপরিণতির কোনো নিদর্শন আবিষ্কারের চেষ্টার তেমন কোনো অর্থ নেই। আমেরিকা-প্রবাসের আগেই ভারতপরিক্রমারত সন্ন্যাসীর আভ্যন্তর পরিণতি

যা হয়েছিল তাকেই বলা যায় একটা যুগান্তর। তবে বিদেশী সভ্যতার সংস্পর্শে একটা নতুন সামঞ্জস্য-বিধানের যে দৃষ্টান্ত তাঁর গদ্যরচনায় দেখা যায় তার ছাপ আছে তাঁর ইংরাজি কবিতাগুলির মধ্যে। তাছাড়া মোটামুটি বিচারে তাঁর সংস্কৃত ও বাংলা কবিতা কয়টি পূর্বতর ও ইংরাজি কবিতাগুলি পরবর্তী কালের। ভাষা ও ভাবসংহতি এবং কাব্যিক উৎকর্ষের বিচারেও তাই ইংরাজি কবিতাগুলিকে বেশি সার্থকতা ও maturity বা পরিপূর্তির গৌরব দেওয়া যায়।

আত্মজীবন রস

এর আগে আমরা কবিতাগুলিকে দু' ভাগে ভাগ করেছিলুম, কিন্তু দু শ্রেণীরই কয়েকটি কবিতায় বিবেকানন্দের আত্মজীবনের ইঙ্গিত ও বর্ণনা ছড়িয়ে রয়েছে। প্রথমেই এই তথ্য ও রসটুকুকে আলাদা করে নিয়ে বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে।

তাঁর একটি সংস্কৃত স্তোত্রেই অপ্রত্যাশিতভাবে আত্মজীবনের উল্লেখ পাই। অম্বাস্তোত্রম্ নিছক প্রথাসুলভ রচনা নয়। বিবেকানন্দ তাঁর মাকে বিশেষ করে স্পষ্ট করে দেখে বুঝেছেন তিনিই 'ধৃতকর্মপাশা', তাঁর জীবনের কর্ম পরম্পরাকে তিনিই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। অনেক দুঃখের মধ্যে দিয়েই তাঁর এই অগ্রগতি, কিন্তু তাতেই এই দেবীর কৌতুক, কারণ তিনি জানেন এর মহৎ পরিণামকে, এর সম্পূর্ণ লাভালাভের হিসাবটিকে। বিবেকানন্দ এই কথা মেনে সফলতা বিফলতার আর চিন্তা না করেই নিজের জীবনটিকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছেন এই মায়ের কাছে।

> যা মাং চিরায় বিনয়ত্যতিদুঃখমার্গৈঃ
> আসংসিদ্ধেঃ স্বকলিতৈর্ললিতৈর্বিলাসৈঃ
> যা মে মতিং সুবিদধে সততং ধরণ্যাং
> সাম্বা শিবা মম গতিঃ সফলেঽফলে বা।

যা তাঁর পক্ষে দুঃখমার্গযাত্রা তাই মায়ের কাছে তাঁর নিজের উদ্ভাবিত ললিত বিলাসের ব্যাপার—এই ধরণের ভাব আমাদের রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা উপলব্ধির এক দিক্ মনে করিয়ে দেয়। বিবেকানন্দের অম্বা তাঁর জীবনদেবী ধৃতকর্মপাশা তো বটেনই, তবে তিনি শুধু রহস্যময়ী নিরুদ্দেশের অভিসারিকা ততটা নন। বরং তিনি নিষ্ঠুরা কিন্তু মহতী সিদ্ধিদায়িনী। রবীন্দ্রনাথের 'রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা, ওরে রক্তলোভাতুরা কঠোর স্বামিনী'র সগোত্রা। তবু এঁর আহ্বানই, রবীন্দ্রনাথের মতই তিনি মেনে নেবেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। 'মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা ক'রে তোমার আহ্বান'। বিবেকানন্দ যে সত্যই তাই করেছিলেন তা তাঁর শেষজীবনের কাব্য উচ্চারণের মধ্যে স্পষ্ট। তাঁর Kali the Mother, Who Knows How the Mother Plays এই দুটি গভীর কবিতা এবং তাঁর কাব্যময় এক গদ্যরচনায়—যার উল্লেখ আগেই করেছি— হঠাৎ জীবনের মর্ম থেকে নিঃসারিত ধ্বনি 'যাই! মা যাই!' নিঃসন্দেহে প্রমাণ করছে তাঁর সেই প্রথম আত্মনিবেদনের পরিণাম।

দুটি কবিতায় তিনি প্রকাশ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা। চিকাগো বক্তৃতার তিন মাস আগে তাঁর সাহায্যকারী বন্ধু অধ্যাপক রাইট্‌কে তিনি একটি চিঠি লেখেন, তারই মধ্যে লিখে পাঠান O'er Hill and Dale কবিতাটি। 'কয়েক লাইন লিখে পাঠাচ্ছি— কবিতার মত ক'রে।

এই অত্যাচারটুকু আপনি ভালোবেসে ক্ষমা করবেন আশা করি।' সম্পূর্ণ হতাশার পর সেই বিদেশে আশার আলো দেখে বিবেকানন্দের প্রথমেই মনে পড়েছিল রামকৃষ্ণকে, এবং তাঁর হৃদয় তাঁকেই নিবেদন করতে চেয়েছিল আনুগত্য, কৃতজ্ঞতা, প্রেম। তাঁর সঙ্গে স্থান কালের সমস্ত বাধার মধ্যেও নিজের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিবেকানন্দ এইভাবে বর্ণনা করেছেন :

From that day forth wherever I roam
I feel him standing by,
O'er hill and dale, high mount and vale
Far, far away and high.

এই আত্মোদ্ঘাটন মর্মস্পর্শী। কিন্তু কাব্যকলা কিছুটা অপরিণত। কবিতাটিতে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ballad (গাথা) স্টাইল ও ছন্দের অনুকরণ সুস্পষ্ট।

'গাই গান শুনাতে তোমায়' কবিতায় এই আনুগত্য ও ভক্তিনিবেদন আরো মর্মস্পর্শীভাবে ব্যক্ত হয়েছে। অজ্ঞানতাবশে তিনি গুরুর প্রতি কত অনুচিত আচরণ করেছেন তার জন্য অনুশোচনা, প্রভুর তা সত্ত্বেও অবিচল করুণা ও ক্ষমা মনে করে কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস, এবং তাঁর মধ্যে বিশ্বের মহত্তম রহস্যের আবিষ্কার সম্বন্ধে নিঃসংশয় ঘোষণা এই কবিতাটিকে বিবেকানন্দের অন্তর্জীবনের একটি প্রামাণিক নির্দেশক হিসাবে মূল্যবান করেছে।—

ছেলেখেলা করি তব সনে,
কভু ক্রোধ করি তোমা পরে,
যেতে চাই দূরে পলাইয়ে ;
শিয়রে দাঁড়ায়ে তুমি রেতে,
নির্বাক আনন, ছলছল আঁখি,
চাহ মম মুখ পানে।
অমনি যে ফিরি, তব পায়ে ধরি,
কিন্তু ক্ষমা নাহি মাগি।
তুমি নাহি কর রোষ।
পুত্র তব, অন্য কে সহিবে প্রগল্‌ভতা ?
প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর।
কভু দেখি আমি তুমি, তুমি আমি।
বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর,
তরঙ্গে তোমার ভেসে যায় নরনারী।

আত্মজীবনীর দিক থেকে এর মূল্য অসামান্য। কাব্যিক প্রকাশ হিসাবেও এর একান্ত মর্মসত্যতা (sincerity) তীক্ষ্ণ সায়কের মতো সহানুভূতিশীল পাঠকচিত্ত বিদ্ধ করে। এর আপাত-বিশৃঙ্খল ভাব ও চিন্তা আরো নিঃসংশয়ে চিহ্নিত করে এমন একটি অনন্যসুলভ সদ্যোজাত অভিজ্ঞতার যা একান্ত নিজস্ব। এর আবেগস্পন্দের মধ্যে পাই কিছুটা সেই অর্জুনের আকুতির স্বর : 'সখেতি মত্বা প্রসভং

যদুক্তং, হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখেতি!· · যচ্চাবহাসার্থমসংকৃতোঽসি,· · তৎক্ষাময়ে' ইত্যাদি। সম্পর্ক নির্ণয়ের মধ্যেও পুত্রভাব, সখাভাব, সাযুজ্য বা সোঽহম্ ভাব পরস্পর মিশে গিয়েছে। কিন্তু কাব্যসিদ্ধির দিক থেকে তেমন প্রশংসা করা যায় কিনা সন্দেহ। বন্ধু গিরিশ ঘোষের ছন্দ নিয়ে এখানে বিবেকানন্দ পরীক্ষা করে দেখছেন। এই গৈরিশ ছন্দে অনুশীলনের ফলে তাঁর সাফল্য নিশ্চয় আরো বাড়ত। কিন্তু আপাতত বিবেকানন্দের মতো কবির কণ্ঠে এই রকমের ভাষা ও ছন্দের প্রবাহ মানায় নি। বাংলা কবিতার সমকালীন বিবর্তনধারার সঙ্গে তুলনা করলেও একে একটু পিছিয়ে থাকা, একটু অপরিণত বলে মনে হবে।

বরং 'সখার প্রতি' কবিতাটির ভাষা ও ছন্দ অনেক বেশি মানানসই হয়েছে। এর মধ্যে যেটুকু আত্মজীবনবর্ণনা আছে তা বিশেষভাবে হৃদয়গ্রাহী—

বিদ্যাহেতু করি প্রাণপণ, অর্ধেক করেছি আয়ুক্ষয়—
প্রেমহেতু উন্মাদের মতো। প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায় ;
ধর্মতরে করি কত মত, গঙ্গাতীর শ্মশান আলয়,
নদীতীর পর্বতগহ্বর, ভিক্ষাশনে কতকাল যায়।
অসহায়, ছিন্নবাস ধরে দ্বারে দ্বারে উদরপূরণ—
ভগ্নদেহ তপস্যার ভারে, কি ধন করিনু উপার্জন ?

মধুসূদনের সেই আত্মবিলাপ—'কি ফল লভিনু হায় তাই ভাবি মনে'— খানিকটা তারই মত তীব্র সুর বেজেছে এখানে বিবেকানন্দের কণ্ঠে। কিন্তু এই সুরে মিশেছে তাঁর নিজস্ব স্বভাব অনুযায়ী উদার বৈরাগ্যের সুর। তাই এ শুধু বিলাপই নয়, মহত্তর উপলব্ধিতে পৌঁছোবার আগেকার আবেগ সংকেত। ঐ বেদনার প্রস্থানের মধ্য দিয়েই তিনি পৌঁছোলেন এক মহৎ জীবনসত্যে। এক দুর্লভ অভিজ্ঞতার বজ্রবিদ্যুতে এই মাটিঘেঁসা ভারী চিন্তনের ছন্দোবাহনটি হঠাৎ যেন পরিণত হল এক দীপ্ত আকাশযানে—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

একই শব্দ দিয়ে মিল, ভাবটাও সহজ গদ্যে বললে অতি চেনা ও পুরাতন— অন্ততঃ ভারতীয় জনসমাজে। কিন্তু কাব্যচেতনা, ঋষিসুলভ সম্বিৎএর স্পর্শে যেন বেজে উঠল দুটি লাইন এক অনৈসর্গিক শঙ্খের মতো।

জীবনদর্শন, দেশ

জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত হয়েছে দুটি ইংরাজি কবিতায়। Requiescat in Pace—তাঁর অনুগত বন্ধু নিঃস্বার্থ সহায়ক Goodwinএর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে লেখা; ও Hold on yet Awhile—তাঁর গুণগ্রাহী ভক্ত ও সহায়ক খেত্রির মহারাজকে তাঁর কোনো দুঃখ বিপর্যয়ের দিনে সান্ত্বনা দেবার জন্য লেখা। মৃত্যুর পরও থাকে অবাধ স্বাধীনতা ও নিবিড় প্রেম-নীড়, এবং সেখান থেকেও এই জগতের দিকে প্রসারিত করা যায় প্রেম ও সেবা— এই হল প্রথম কবিতার ভাব। গভীর বিয়োগবেদনাকে ছাপিয়ে উঠেছে এই সান্ত্বনা, মৃত্যুজয়ের এই প্রত্যয়। বিবেকানন্দের ব্যক্তিচরিত্র তাই এতে প্রতিফলিত। কবিতাটিও বেশ সুলিখিত। যদিও এতে ম্যাথু আর্নল্ডের Requiescat কবিতাটির কিছু প্রভাব দেখা যায়। মনে রাখতে হবে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী কবিদের মধ্যেও এই

রকমের পারস্পরিক প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। রবীন্দ্রনাথের বর্ষশেষ কবিতায় Shelleyর West Wind এর মডেলের প্রভাব দেখা মানে তাঁর প্রতিভাকে গৌণ করা বোঝায় না। কাব্যের ভাবকাঠামো সম্বন্ধে কিছুটা পূর্বতন কবির মডেল অনুসরণ কাব্যচর্চার প্রাথমিক অবস্থায় অনিবার্য।

Hold on yet Awhile কবিতাটিতে বিবেকানন্দের জীবন সম্বন্ধে বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় আছে। তাঁর বেদান্ত, তাঁর অদ্বৈততত্ত্ব জীবনকে অস্বীকার করায় না, বরং কর্মকে মহৎ মর্যাদা দেয়, জীবনের প্রতিটি সত্য কীর্তিকে দেয় অমরত্বের আশ্বাস। এই কবিতাটিও সুলিখিত এবং এতে একটা উৎসাহপ্রেরণাব্যঞ্জক ছন্দের দোলা বেশ ফুটেছে। কিন্তু কৌতূহলের বিষয় এই যে এতে রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতার অনুরণন দেখা যায়। একটি কবিতার সামান্য একটু প্রতিধ্বনি যথা, 'Not a work will be lost, no struggle vain,···No good is e'er undone' এর মধ্যে 'যে ফুল না ফুটিতে· ·জানি হে জানি তাও হয় নি হারা'র। এবং সমস্ত কবিতাটির ভাব ও ছন্দ-বন্ধনে 'যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে'র। ইংরাজি কবিতাটির প্রথম চার লাইন থেকেই এই মিল ধরা পড়বে :

If the sun by the cloud is hidden a bit,
If the welkin shows but gloom,
Still hold on yet a while, brave heart,
The victory is sure to come.

এই কবিতাটির রচনাকাল ১৮৯৮। দুঃসময় কবিতার প্রকাশের তারিখ ১৫ বৈশাখ ১৩০৪।

এর পর আমরা আলোচনা করব বিবেকানন্দের তিনটি প্রধান কবিতা যার মধ্যে তাঁর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী ও কাব্যপ্রতিভা একই সঙ্গে শ্রেষ্ঠ প্রকাশ লাভ করেছে : Angels Unawares, নাচুক হৃদয়ে শ্যামা ও The Song of the Sanyasin— এই তিনটির মধ্যে Angels Unawares লেখা হয় সবচেয়ে পরে, ১৮৯৮এর নভেম্বরে। The Song of the Sanyasin লেখা হয় ১৮৯৫ সালে নিউইয়র্কের Thousand Island Parkএ। আলোচনার মধ্যে উঠে ঘরের ভিতরে গিয়ে অতি অল্পসময়ের মধ্যে এই কবিতাটি সমস্ত লিখে এনে বিবেকানন্দ তাঁর অনুরাগী সহচর ও অভ্যাগতদের দেখিয়েছিলেন— এই বর্ণনা পাওয়া যায় এক আমেরিকান ভক্তের স্মৃতিলিখনে। 'নাচুক হৃদয়ে শ্যামা' উদ্বোধনে প্রকাশিত ১৩০৬-৭এ। লেখা অনুমান করি পাঁচ-ছয় বৎসর আগে।

শঙ্করের বুদ্ধিবৈরাগ্য অদ্বৈতসিদ্ধি আর বুদ্ধদেবের ব্রহ্মবিহার প্রেম জগতের জন্য নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গ— এই দুই ধাতুর মিশ্রণে তৈরি বিবেকানন্দের ব্যক্তিচরিত্র। তাঁর নিজের রচনায় চিঠিপত্রে এই সিদ্ধান্তের যথেষ্ট সমর্থন পাওয়া যাবে। নির্বিকল্পের দিকেই তাঁর প্রধান আকর্ষণ। কিন্তু জগৎকেও তিনি মায়া বলে উড়িয়ে দেন নি, তাকে স্বীকার করেছেন, এ জগৎপ্রসবিনী ধৃতকর্মপাশা মাতৃরূপিণীকে আত্মসমর্পণ করেছেন। কিন্তু এ ছাড়া আরও এক দিকে তাঁর চারিত্রিক পরিধির বিস্তার ঘটেছে। রামমোহন-প্রবর্তিত পথেও তিনি পৃথিবীর দেশ সমাজ ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্রমিক পরিণতির ধারা বুঝে নেবার চেষ্টা করেছেন। এই দিকেও তাঁর অন্তর্দৃষ্টির গভীরতার সাক্ষ্য তাঁর পর্যটক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, ভাববার কথা, বর্তমান ভারত ইত্যাদি রচনায় প্রচুর পাওয়া যাবে। এমনকি পাশ্চাত্ত্য জীবনের অপ্রতিরোধ্য রাজসিকতার আদর্শ থেকেও কর্মবিমুখ ভারতের অনেক কিছু শেখবার আছে এমন কথাও তিনি বলেছেন। অর্থাৎ যেসব ভাবাদর্শের সংশ্লেষণে রবীন্দ্রজগৎ

তৈরি, সেইগুলি প্রায় সমস্তই পাওয়া যাচ্ছে বিবেকানন্দের চিত্তভূমিতে। তবু দু জনের মধ্যে অনেক মিল থাকা সত্ত্বেও দু জনের স্বাতন্ত্র্যও অনন্য রেখাবন্ধে উৎকীর্ণ। মতবাদের সূক্ষ্ম পার্থক্য, বা পার্থক্যও হয়তো ততটা নয়, মাত্রাভেদ (emphasis) আলোচনা করলে দু জনের এই তফাতটা কিছুটা বোঝা যাবে। আর কিছুটা হচ্ছে শুধু ব্যক্তিক নির্বাচন (personal preference)এর ব্যাপার, ব্যক্তিত্বরূপ বিকাশের আর্ট। এমনকি অদ্বৈতভূমিও একেবারে একঘেয়ে একাকার জায়গা নয়। একতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত বিচিত্র সত্তার অস্তিত্ব সেখানে আরো ভালোভাবেই থাকতে পারে ও আছে।

প্রথমে বুদ্ধিগ্রাহ্য মতবাদের দিক থেকে পরীক্ষা করে দেখা যাক এই কবিতাগুলি।

'নাচুক তাহাতে শ্যামা'য় ঠিক যেন দাঁড়িপাল্লার মাপের মতো ক'রে পৃথিবীর সুখকর সমস্ত অভিজ্ঞতা একদিকে ও দুঃখকর ভয়ঙ্কর যত অভিজ্ঞতাকে আর-এক দিকে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতির মধ্যেও এক দিকে শোভন সুষম সুন্দর, অপর দিকে ঝড় বজ্র ভূমিকম্প ইত্যাদির প্রলয়রূপ। মানুষের জীবনেও নানা সৌন্দর্যকলার সমাবেশ, ভোগের আয়োজন, প্রেমের অঙ্গন রচনা একদিকে ; অন্যদিকে দ্বন্দ্ব রেষারেষি যুদ্ধের চরম নৃশংসতা। মানুষ যা প্রিয় সুখকর তাই আসলে চায়, কিন্তু পায় কি ? 'সুখে দুঃখ, অমৃতে গরল, কণ্ঠে হলাহল, তবু নাহি ছাড়ে আশা'। জীবনের যে রুদ্ররূপ তাকে মানুষ হয় সন্তুষ্ট করতে চায় 'দয়াময়ী' এই চাটু প্রশংসার দ্বারা, নয় সম্পূর্ণ তাকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু সত্য আছে ঐ কালীর স্বরূপে। তাঁর নগ্ন ভয়ানকরণরঙ্গিনী মূর্তিতেই। ভয় ত্যাগ করে তাঁকেই গ্রহণ করতে হবে। হৃদয় থেকে সমস্ত সুখস্বপ্ন দূর করে তাকে শ্মশান করে ফেলতে হবে। মানতে হবে 'পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার', তখন সেই হৃদয়-শ্মশানে শুরু হবে শ্যামার নাচ।

এই কবিতায় যে বৈরাগ্যের অনমনীয় কঠোরতা, সংসারযাত্রা পরিহারের যে নির্মম নির্বন্ধ দেখা যাচ্ছে তার সঙ্গে শঙ্করের একরোখা জগৎবর্জন-ব্যগ্রতার তফাত কি ? এও তো সেই 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ' বলে সমস্ত মানবিক সম্পর্কের মূলোচ্ছেদের ব্যবস্থা। বরং 'সখার প্রতি' কবিতায় যা এর আগেই কিছুটা আলোচিত হয়েছে, প্রেম ও সেবার দ্বারা সংসারের সঙ্গে যোগরক্ষার একটা সঙ্কল্প আছে। এখানে কিন্তু একেবারে সেই পুরাণো বাঙলা গানের প্রতিধ্বনি :

শ্মশান ভালোবাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি।

কাব্যকলার দিক থেকে বিচার করলে এই কবিতাটিকে বিবেকানন্দের বাংলা কবিতাগুলির মধ্যে বোধ হয় শ্রেষ্ঠ আসন দিতে হবে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নপ্রয়াণের ছন্দ, স্টাইল, দার্শনিক চিন্তার প্রবাহ কাব্যের ভূখণ্ডে প্রবাহিত করবার চেষ্টার অনুসরণ পরবর্তী আর কোনো কবি করেছিলেন কি না জানি না। কিন্তু বিবেকানন্দের এই কবিতাটিতে তাই পাই। প্রকৃতির রূপরসধ্বনির প্রতি কবি দ্বিজেন্দ্রনাথের সচেতনতার ও ইন্দ্রিয়-প্রতিবেদন ক্ষমতার একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক—

হেতায় ঝরঝর, ঝরঝর, ঝরণা ঝরে।
পাদপ, মরমর, মরমর শব্দ করে॥
কি জানি, কোথা হতে, বায়ু পথে, আসিছে গীত,
বীণার ঝঙ্কার হয় আর আচম্বিত।

এর পাশে রাখা যাক 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' থেকে

চিত্রকর তরুণ ভাস্কর, স্বর্ণ তুলিকর, ছোঁয় মাত্র ধরাপটে।
বর্ণখেলা ধরাতল ছায়, রাগ পরিচয় ভাবরাশি জেগে ওঠে।

সূর্যকরস্পর্শে রূপের জগৎ এর প্রতিদিনকার নূতন সৃষ্টির বর্ণনা। আবার যুবকযুবতীর প্রণয়খেলার বর্ণনা হচ্ছে এই :

বিম্বফল যুবতী-অধর, ভাবের সাগর নীলোৎপল দুটি আঁখি।
দুটি কর— বাঞ্ছা অগ্রসর, প্রেমের পিঞ্জর, তাহে বাঁধা প্রাণপাখি।

প্রকৃতিসম্ভোগের ক্ষমতা দ্বিজেন্দ্রনাথের ছিল যথেষ্ট। তাঁর কাব্যে ঐ রসে সিক্ত বর্ণনা বা ভাব-মূর্তিগুলি বেশ জীবন্ত, চিন্তার রথের চাকার তলায় তারা পিষ্ট হয়ে যায় নি। বিবেকানন্দেরও মন প্রকৃতির সৌন্দর্যলোককে সাড়া দিত সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে। প্রেমের রসও যে তিনি অন্ততঃ বুঝতেন তা উপরের দুটি লাইন থেকে বোঝা যায়। শঙ্করের মত নিষ্করুণতার অপবাদ তাঁকে দেওয়া যাবে না। কিন্তু মানুষের কাপুরুষতা আদর্শভ্রষ্টতা দেখে তাদের চারিত্রিক ব্যাধি লক্ষ্য করে তাঁর এই সাময়িক নির্মমতা, এই কঠোর প্রতিষেধকের প্রস্তাব। তান্ত্রিক শ্মশানসমারোহের morbidity কিছুটা আপাতদৃষ্টিতে দেখা গেলেও আসলে বিবেকানন্দচিত্তের সাহস ও ওজস্‌ এই কবিতার মেজাজ ও রসোৎক্ষেপকে অনন্যসাধারণ পর্যায়ে উন্নীত করেছে। তাই তিনি যখন কবিতা শেষ করেন এই বলে

পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।—

তখন এই mood অনেকটা গিয়ে স্পর্শ করে রবীন্দ্রনাথের সেই ধরণের চিত্তভঙ্গীকে যা সর্বনাশকেও আহ্বান করে, হতাশায় নয়, নূতন সূচনা বা অগ্রগমনের আশায় ; যথা, 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো' ইত্যাদি।

একটা মন্তব্য না ক'রে পারছি না যে বাংলা কাব্যরচনায় কিছুদিন সময় দিলে ঐ 'না ডরাক তোমা'র 'তোমা' বিবেকানন্দকে লিখতে হত না। এই কবিতাতেই তাঁর বাংলা ভাষা ও ছন্দের উপর যে অধিকার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা তাঁর লোকোত্তর প্রতিভার প্রেরণায় সহজেই তাঁকে অনেক বেশি উৎকর্ষের অধিকারী করত।

তত্ত্বের দিক থেকে দেখা যাচ্ছে বিবেকানন্দের জীবনদর্শন মোটামুটি সেই সথার প্রতি কবিতাতেই প্রকাশ পেয়েছে। অন্যান্য কবিতাগুলিতে ভাববৈচিত্র্য ভঙ্গী ও রসের পার্থক্য যাই থাক, মোট কথাটা সেই এক। অসার যা পরিত্যাগ করো, যা সার বস্তু সেই সচ্চিদানন্দকে লাভ করো, মানুষের জগতের সঙ্গে যুক্ত হও প্রেম ও সেবার দ্বারা। নিম্নপ্রকৃতি থেকে সন্ন্যাসীর বৈদান্তিক ত্যাগ চর্যা সাধনে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে করো ব্রহ্মবিহার, আবার দুর্যোগ দুর্বিপাকের মধ্য দিয়ে কালীকে লাভ করো, লাভ করো সেই ভয়ঙ্করীকে যিনি 'ধৃতকর্মপাশা' জগতের নেত্রী। এই বাণীই আছে বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ দুইটি কবিতা The Song of the Sanyasin ও Kali the Mother এ। বক্তব্যের দিক থেকে Kali the Mother ঐ 'নাচুক তাহাতে শ্যামা'রই যেন ইংরাজিতে পুনরুচ্চারণ— অবশ্য অনেক বেশি গভীর উপলব্ধি ও বিদ্যুৎগর্ভ প্রেরণা সঞ্চারের সহযোগে। শুধু Angels Unawares কবিতাটি যা সব দিক দিয়েই বিস্ময়কর

ও কৌতূহলোদ্দীপক— বিবেকানন্দের মনে পাশ্চাত্যজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়ার একটা সাক্ষ্য উপস্থিত করেছে। বিবেকানন্দের মন যে ছিল সম্পূর্ণ স্বকীয় ও স্বাধীন, সেখানে কোনো বাঁধা মত বা dogma, কোনো পরম্পরা-প্রাপ্ত দার্শনিক ফরমূলা বা ধর্মীয় ভাববিগ্রহ যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সমর্থন ছাড়া প্রবেশের অধিকার পেতে পারে না এ কথা যাঁরা বিবেকানন্দ-চরিত্র কিছুমাত্র অনুধাবন করেছেন তাঁরাই একবাক্যে স্বীকার করবেন। তাঁর ভাবজগৎ নূতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রসারণশীল, নতুনভাবে আত্মসংস্থাপক (self-adjusting)। কাজেই তাঁর সন্ন্যাসও শুধুমাত্র প্রথানুযায়ী আনুষ্ঠানিক সাধন নয়। তাঁর বেদান্ততত্ত্বেও যুক্ত হয়েছে নূতন একটা হৃদয়াবেগ। তাঁর কালীদর্শনেও ভয়ঙ্করের সঙ্গে মিলেছে শিশুর মাতৃনির্ভরতা (মা, মা, যাচ্ছি), তাঁর জগৎএর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে রয়েছে বৈরাগ্যের সঙ্গে স্নেহ প্রেম সখ্য, আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে সেবার অরোধ্য আবেগ। এইসব জিনিসই আমরা পেয়েছি তাঁর কবিতায়। এগুলি না থাকলে বিবেকানন্দের অন্তঃপ্রকৃতির ঐশ্বর্যের সংবাদটি এমন ক'রে আমাদের কাছে পৌছোত না।

এখন যা বলছিলুম, ঐ Angels Unawaresএ দেখি বিবেকানন্দের মন সংসারের বর্তমান রূপকে শুধু করুণা বা সহনশীলতার দ্বারা মেনে নেওয়া নয়, আরো এগিয়ে এসে তাকে বুঝে নিতে— এমনকি আশীর্বাদ করতে প্রস্তুত। গাছপালা পশুপক্ষীর উত্থান পতন পাপ পুণ্য নেই, মানুষের আছে। আর সেইটেই মানুষের গৌরব। সে থেমে নেই, সে এগিয়ে চলেছে সৃষ্টির খোলা রাস্তায়। এই অগ্রযাত্রার অভিযানে ভুল দুঃখ তাপ এমনকি পাপেরও একটা মূল্য আছে। তাই তাঁর কবিতার তৃতীয় স্তবকের লোকটি এই কথা বুঝতে পেরে পাপের জন্যও ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছে :

—he blessed the fall,
And, with a joyful heart, declared it—
'Blessed Sin !'

প্রতিটি মানুষকে তিনি সন্ন্যাসী ফকির ক'রে তুলতে চাচ্ছেন না। ইতিহাস তাদের জীবনের যে সত্য ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছে যুগযুগান্তর ধরে, তাইতেই সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিতে চাইছেন। To The Awakened India— যা বোধ হয় ভারতকে জেগে উঠে পৃথিবীতে তার নূতন ভূমিকা গ্রহণ করবার প্রথম নিঃসংশয় উদাত্ত আহ্বান— তাইতে বিবেকানন্দ চেয়েছেন কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার দুঃস্বপ্ন নাশ, সম্পূর্ণ স্বপ্নমুক্ত হবার ক্ষমতা না থাকলে অন্ততঃ সত্যতর মঙ্গলতর স্বপ্নের আয়োজন— যা হল প্রেম ও সেবা। এরও পরে অবশ্য সত্যের নিষ্কল নির্বিকল্পরূপ— তা না পেলেও চলবে।

Let visions cease,
Or, if you cannot, dream but truer dreams,
Which are Eternal Love and Service Free.

মানুষের এই ভবিষ্যৎ স্বপ্ন সফল হবার জন্য চাই পৃথিবীব্যাপী স্বাধীনতা। তাই আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস ৪ঠা জুলাই উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে তিনি দেখলেন—

Oh sun, today thou sheddest liberty,

একটা উদার নৈর্ব্যক্তিক সহানুভূতি ও প্রেমের আকাশমণ্ডলের মধ্যে স্নেহ ভালোবাসার মানবিক

সম্পর্কের একটা ব্যক্তিগত রূপও ফুটে উঠতে পারে অতি হৃদয়স্পর্শীভাবে। বিবেকানন্দের সাঁওতাল মাঝির প্রতি ব্যবহার, নিবেদিতার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎএর দিন তাঁর আচমনের জন্য হাতে জল ঢেলে দেওয়া ইত্যাদি অনেক সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। ১৯০০ সালে শিষ্যা Christineকে লেখা চিঠিতে Dream নামে একটি কবিতায় তিনি চাইছেন এই কঠোর জগতে একটু স্নিগ্ধ স্বপ্নের কোমলতা। নির্মম বৈদান্তিক স্পষ্টতা, নিরাবরণ সত্যের রূঢ় আলোকস্পর্শের থেকে একটু আড়াল দুর্বল মানুষের জন্য। বিবেকানন্দের মুখে এই কোমলতার আবেদন, এই একটু স্নেহের প্রশ্রয় কত মিষ্ট।

Thou dream, O blessed dream!
Spread near and far thy veil of haze,
Tone down the lines so sharp,
Make smooth what roughness seems.
No magic but in thee!
Thy touch makes deserts bloom to life,
Harsh thunder blessed song,
Fell death the sweet release.

মিস্টিক ও আধ্যাত্মিক কবিতা

বাংলা সাহিত্যের প্রাক্-আধুনিক কয়েক শতাব্দী ধরে কবিদের লিরিক ব্যঞ্জনপ্রয়াস কেবলি পাক খেয়েছে কয়েকটি প্রথাসিদ্ধ প্রতীককে ঘিরে: কালী, শিব, রাধা, কৃষ্ণ— এবং এঁদের লীলা। মঙ্গলকাব্যের যুগের পূজাপ্রাপক সব দেবতারাও এই তালিকার অন্তর্গত। কবির ব্যক্তিগত উপলব্ধি, দর্শন, আবেগ, মানসপ্রতিক্রিয়ার কোনো স্বাতন্ত্র্য, কোনো সত্য আবেদন, কোনো কাব্য বা কল্পনামূল্য না থাকলেও রাশি রাশি নূতন কবিতা গান লিখিত ও পঠিত বা গীত হত। এমনকি ভারতচন্দ্রের মত বিদগ্ধ কবিও শুধু নিপুণ সূত্রধার ও মঞ্চাধ্যক্ষের মত দেবদেবীদের সভ্য সাজে সাজিয়ে বেদীতে তুলে দিয়েছেন, তাদের স্তবের ভাষায় ছন্দে দিয়েছেন সংস্কৃতির নূতন বর্ণ ও ঝঙ্কার। কিন্তু তারা যে শুধু স্থির নিষ্প্রাণ বিগ্রহ এ সম্বন্ধে তাঁর কবিচিত্তেও কোনো দ্বিধা নেই, পাঠকচিত্তেও থাকবার কথা নয়। কিম্বা যেমন আমাদের ক্লাসিকাল গানে হয়, পুরোনো রীত রেওয়াজ গায়কী সব রেখে নতুন ওস্তাদ শুধু একটু নতুন কায়দা আরোপ করেন, ভারতচন্দ্রের সেরা কবিতারও সেইটুকুই বৈশিষ্ট্য— যেমন, 'রে সতী রে সতী কান্দিল পশুপতি পাগল শিব প্রমথেশ'।

এই তো গেল যা সেরা। অক্ষমদের হাতে জপের মালাঘোরানোর মত একঘেয়ে পুনরাবৃত্তির জন্য এই প্রতীকগুলি এমন নীরস ও অরুচিকর হয়ে উঠল যে আধুনিকমনস্করা এই ধরণের সমস্ত কাব্যকেই কাব্যনামের অযোগ্য বলে নির্বাসন দিয়েছেন। তার ফলে দেখছি সত্যকার গভীর প্রেরণাজাত অনেক কবিতাকে শুধু কালী শিব কৃষ্ণ ব্রহ্ম বা বিশ্বপিতা জগন্মাতার নাম সংযোগ আছে বলেই আমরা কাব্য-জগতে প্রবেশাধিকার দিই নি। আমাদের কাব্যসংকলনে তাই রামপ্রসাদ, কমলাকান্তের অতি চমৎকার লিরিককেও প্রাপ্য আসন দেওয়া হয় নি। চমৎকার সব ব্রহ্মসঙ্গীতকেও নয়। বৈষ্ণব কবিতার প্রেমের

উপাদান তাকে আধুনিক লোকের চক্ষে কাব্যমর্যাদা দিয়েছে, রাধা ও কৃষ্ণের মিস্টিক বা আধ্যাত্মিক সত্য নয়। বাউলগানও সাধারণ জীবনদর্শনের ছাড়পত্র নিয়ে ঢুকেছে— অনেকটা রবীন্দ্রনাথের প্রসাদে। অধ্যাত্মিক, মিস্টিক, ভক্তিমূলক কবিতাকে যাঁরা স্বীকারও করেন তাঁরাও তাদের সরিয়ে রাখতে চান আলাদা ক'রে। তার উদাহরণ *The Oxford Book of English Mystical Verse*।

অধ্যাত্মসত্য যে শ্রেষ্ঠ কবির শ্রেষ্ঠ নির্মাণভূমি তা আজ স্বীকার করবার সময় এসেছে। জগতের গূঢ়তম সত্যের অনুসন্ধান, তারই রূপায়ণের ফলেই কবি সাধক যোগী ঋষি সকলেই পৌছোন অন্তর্লোকের সত্যে— তার একটা দিগন্ত জীবন্ত ব্যক্তিবিগ্রহে ভরা, সেখানে সত্যের ঘনীভূত সারসংকলন হিসাবে দেখ দিতে থাকে কৃষ্ণ কালী যীশু মেরি উর্বশী ভিনাস ইন্দ্র জুপিটার প্রভৃতি, অপর দিগন্তে সত্যের, শান্তির সমুদ্র, জ্যোতি, আনন্দ ইত্যাদির নৈর্ব্যক্তিক বিস্তার। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ যখন বলেন 'And I felt a presence that disturbs me with the joy of elevated thoughts' তখন তা প্রথম অভিজ্ঞালোকের কথা। শেলি যখন হঠাৎ দেখা পান তাঁর Intellectual Beautyর, তাঁর দেবী সরস্বতীর, আর সেই আবিষ্কারের বিস্ময় তাঁর মর্ম ছিন্ন করে বার করে নেয় স্বীকৃতির আনন্দবিদ্ধ চিৎকার তখনও তিনি আওতায় পৌছেছেন ঐ প্রথম লোকের—

Sudden, thy shadow fell on me,
I shrieked, and clapsed my hands in ecstasy.

আবার মিল্টন যখন আবাহন করেন Hail, holy light, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ধ্যান করেন সেই আলোর 'the light that never was on land or sea', বা শেলি বলেন 'the white radiance of Eternity'র কথা, তখন তাঁরা প্রবেশ করেছেন ঐ দ্বিতীয় রাজ্যে। প্রথমটা মিস্টিক কাব্যের, দর্শনের উদ্ভব স্থল। দ্বিতীয়টা spiritual বা আধ্যাত্মিক কাব্যের। মিস্টিক কাব্য অনেকটা ব্যক্তিগত রহস্যাচ্ছন্ন, প্রাইভেট। আধ্যাত্মিক কাব্য বেশি পরিমাণে নৈর্ব্যক্তিক, বিশ্বজাগতিক। অবশ্য দু'টি এলাকা প্রায়ই মিশিয়ে যেতে চায় পরস্পরের সঙ্গে।

এই ভূমিকাটুকু না করলে বিবেকানন্দের স্বল্পসংখ্যক কিন্তু অতি উৎকৃষ্ট এই শ্রেণীর কবিতাগুলির ন্যায্য মূল্য প্রতিষ্ঠিত করা যেত না।

এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের নিজেরই কথা কিছু তুলে দেওয়া যেতে পারে।

"প্রাচীন উপনিষদ্‌সমূহ অতি উচ্চস্তরের কবিত্বপূর্ণ। এইসব উপনিষদ্‌স্রষ্টা ঋষিরা ছিলেন মহাকবি। তোমাদের অবশ্যই প্লেটোর কথা মনে আছে, কবিত্বের মধ্য দিয়েও জগতে অলৌকিক সত্যের প্রকাশ হয়।"

"উপনিষদের ভাষা একরূপ নাস্তিভাবদ্যোতক, স্থানে স্থানে অস্ফুট, ওই ভাষা যেন তোমাকে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু মাঝপথে গিয়ে থেমে গেল। কেবল এক অতীন্দ্রিয় সত্তাকে উদ্দেশে দেখিয়ে দিল। তবু সেই সত্তা সম্বন্ধে তোমার অসংশয় উপলব্ধি হল।"

"জড়ের ভাষায় এই আত্মাকে ফুটিয়ে তোলার আর চেষ্টা রইল না!· · আত্মতত্ত্ব এমন ভাষায় বর্ণিত হল যে, সেই শব্দগুলি উচ্চারণমাত্রেই এক সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয়রাজ্যে অগ্রসর করে দেয়।"

স্বাধীন প্রেরণায় এইরকমের কবিতাই লেখার চেষ্টা করেছেন বিবেকানন্দ। তাঁর শিব পুতুলমাত্র নয়।

যাঁরা শিবের জীবন্ত সত্যের উপলব্ধি পান— তা সে স্বদেশে বিদেশে যে নামরূপ প্রত্যয়ের মাধ্যমেই হোক না কেন— তাঁদের দর্শনের মধ্যেও থাকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিশেষত্ব, দর্শন মনন রসস্ফারণের অনন্যস্বাতন্ত্র্য। ল্যাটিন কবি Bœthius এই তারকাখচিত ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টাকে পৃথিবীতে অবিচল শান্তি বর্ষণ করতে বলছেন—

Rapidos rector comprime fluctus
Et quo caelum regis immensum
Firma stabiles foedere terras.

'হে শাস্তা, এই সব দ্রুত ঢেউকে দমন করো, যে নিয়মে তুমি অপরিমাণ স্বর্গরাজ্যকে নিয়ন্ত্রিত করো, তারই প্রয়োগে এই পৃথিবীকেও করো অবিচল শান্ত।'

বোএথিউস্‌এর এই জীবন্ত ইমেজ্, এই রূপবিগ্রহ— এ শঙ্করের সেই সর্বউপলব্ধিমুক্ত শিব নয়— মানুষ নিজেকে প্রকৃতির সমস্ত বিকার থেকে মুক্ত করলে যাঁর চিদানন্দরূপের সমকক্ষতা লাভ করতে পারে—

ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভ মোহৌ
মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্যভাবঃ,
ন ধর্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষম্
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।

বিবেকানন্দ এই স্তবটিকে বিশেষ পছন্দ করতেন এবং ইংরাজি কবিতায় এর অনুবাদ করেছেন। এ ছাড়া শিবের মধ্যে একেবারে কৈবল্য বা শূন্যগর্ভ আনন্ত্য— the vacant infiniteএর স্পর্শও মিলতে পারে, যেমন দেখি শঙ্করএর 'শিবঃ কেবলোঽহম্' কবিতায়। শ্রীঅরবিন্দের শিবের বিভিন্ন রূপের উপর লেখা কয়েকটি কবিতা আছে, যথা— Shiva, Adwaita, The World Game প্রভৃতি।

এখন, বিবেকানন্দের শিব, তাঁর বহুবিদিত নির্বাণ নির্বিকল্প-অনুরাগ সত্ত্বেও, ঐ বোএথিউসএর সৃষ্টিনিয়ামক দেবতার মত। শ্রীঅরবিন্দের সনেটের ঐ অদ্বৈতের ভাবঘন রূপ নয়, বরং তাঁর Shiva কবিতায় একাকিত্বের মধ্য থেকে হঠাৎ উমার মুখের দিকে চেয়ে দেখা শিব। এই শিবেরই উপস্থিতি কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যে, রবীন্দ্রনাথের নটরাজে। অবশ্য কবির নিজস্ব দৃষ্টি হিসাবে প্রকাশের পার্থক্য আছে। এই সংস্কৃত স্তবে আমরা বিবেকানন্দকে কবি হিসাবেই পেয়েছি। শুধু সাধক হিসাবে নয়। এই শিবকে তিনি তাঁর শান্তরূপেও আবাহন করছেন, আবার তাঁরই মধ্যে যে অশান্তির আন্দোলন তাকেও স্বাগত জানিয়েছেন। এ যেন রবীন্দ্রনাথের 'তোমার কাছে শান্তি চাব না'।

'পূর্বসংস্কার সব ঝড়ের মত বইছে, ঘূর্ণি ঢেউ উঠে যেন (জীবনের) শক্তিগুলিকে আন্দোলিত বিপর্যস্ত করছে; তুমি আমি এই যুগ্ম অস্তিত্বের প্রত্যয়ও নড়ে যাচ্ছে; শিবের মধ্যে থেকেও চিত্তের এই যে অতিবিকল রূপ তার বন্দনা গাই'—

বহতি বিপুলবাতঃ পূর্বসংস্কাররূপঃ
বিদলতি বলবৃন্দং ঘূর্ণিতেবোর্মিমালা।
প্রচলিত খলু যুগ্মং যুষ্মদস্মৎ প্রতীতম্
অতিবিকলিতরূপং নৌমি চিত্তং শিবস্থম্।

'আবার তিমিরজাল যিনি ছেদন করে শুভ্র তেজ প্রকাশ করেন, শ্বেতকমলের মত যাঁর শোভা, যাঁর পুঞ্জীভূত জ্ঞান অট্টহাসির মত [কালিদাসের উপমা মনে করিয়ে দেয়], সংযমীদের হৃদয়ে ধ্যানের দ্বারা প্রাপ্তব্য সেই নিষ্কল মানস-রাজহংস এই প্রণত আমাকে রক্ষা করুন।'

গলিততিমির মাল শুভ্রতেজঃ প্রকাশঃ
ধবলকমলশোভঃ জ্ঞানপুঞ্জাট্টহাসঃ
যমিজন হৃদিগম্যঃ নিষ্কলো ধ্যায়মানঃ
প্রণতমবতু মাং সঃ মানসো রাজহংসঃ

এ শিব কৈবল্য পরিহার করে কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছেন রবীন্দ্রনাথের 'কালের অধীশ্বরের' যিনি

আপনি সন্ধান পেলে আপনার সৌন্দর্য উদার
আনন্দে ধরিলে হাতে জ্যোতির্ময় পাত্রটি সুধার
বিশ্বের ক্ষুধার।

এই 'তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়'কে বারম্বার বন্দনা জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

এইবার আমরা বিবেকানন্দের যে দু'টি কবিতার আলোচনা করব নিজগুণে তারা বিশ্বকাব্যে স্থান পাবার উপযুক্ত। যদি আমরা এমারসনএর Brahmaকে স্থান দিই, তবে বিবেকানন্দের Kali the Motherকে তার চেয়েও মর্যাদার স্থান দিতে হবে। যদি আমরা ওয়াল্‌ট্‌ হুইটম্যানের Passage to India কবিতার নীচে উদ্ধৃত ছত্রে উদ্দীপনা অনুভব করি তবে বিবেকানন্দের The Song of the Sanyasinকে স্থায়ী স্থান দিতে দ্বিধা করবার কথা নয়।

Greater than stars or suns,
Bounding O soul thou journeyest forth,
What love than thine or ours could wider amplify?
What aspiration, wishes, outvie thine and ours,
O soul?
What dreams of the ideal? What plans of purity
perfection, strength?
What cheerful willingness for others' sake to give up all?
For others' sake to suffer all?
...
Passage to more than India!

The Song of the Sanyasinই প্রথমে দেখা যাক। এর মধ্যে বৈরাগ্যভাব ও নিম্নপ্রকৃতি সাংসারিক সংস্কার সম্পর্ক ইত্যাদি বর্জনের কঠোরতা প্রায় শঙ্করাচার্যের সমগোত্রীয়। কিন্তু কবিতাটি নেতিবাচক নয়, সন্ন্যাসীর এবং তার মধ্য দিয়ে মানব-আত্মার উদারমুক্ত স্বরূপের জয়গান। শঙ্করের মত এতে নারীর মায়া ত্যাগের কথা আছে, জীবনের ভোগ তৃষ্ণা সম্পূর্ণ দূর করে দেবার প্রস্তাব আছে। আবার বুদ্ধদেবের প্রেরণা দেখা যায় সম্পূর্ণ অনাগরিক হয়ে একলা ঘুরে বেড়াবার স্বাচ্ছন্দ্য কল্পনায়।

Have thou no home? What home can hold thee, friend?
The sky thy roof ; the grass thy bed ; and food,
What chance may bring, well cooked or ill, judge not.
No food or drink can taint that noble self
Which knows itself. Like rolling river free
Thou ever be, Sanyasin bold! say— 'Om tat sat, om'!

স্বত্তনিপটে বুদ্ধের উপদেশ হচ্ছে : 'ঘুরে বেড়াও সঙ্গিহীন একলা, গণ্ডারের মত'।

সর্বথা স্বাধীন, বিরোধ নেই কারু সঙ্গে,
যা কিছুই জুটুক তাইতেই সন্তুষ্ট,
বিপদ সহ্য করে বিনাক্ষোভে
ঘুরে বেড়াও একলা— গণ্ডারের মত।

কিন্তু আইডিয়ার দিক থেকে যে মিলই থাকুক, কাব্যপ্রেরণার দিক থেকে এ কবিতায় বেজে উঠেছে 'নেতি' নয় 'ইতি' ধ্বনি— 'everlasting yea'! এর কৃচ্ছ্রসাধনও শংকরের 'সুরমন্দির— তরুমূল নিবাসঃ, শয্যা ভূতলমজিনংবাসঃ' র মত হলেও তার চেয়ে উদার আনন্দের বার্তাবাহক; বিবেকানন্দের 'The sky thy roof, the grass thy bed' এ Stevensonএর 'the sky over head', রবীন্দ্রনাথের 'শূন্য ব্যোম অপরিমাণ মন্ত সম করিতে পান'এর আমেজ।

আসলে এই সন্ন্যাসী এক অদ্ভুত রসায়নে সন্ন্যাসীর শুদ্ধ বুদ্ধ চৈতন্যের সঙ্গে যুক্ত করেছেন ওমর খৈয়মের আনন্দমদিরা। এক চিঠিতে বিবেকানন্দ লিখছেন—"আমি এতদিনে দু-একটা বিষয় শিখেছি। শিখেছি যে, 'ভাব, প্রেম, প্রেমাস্পদ'— এ সকল যুক্তি বিচার, বিদ্যাবুদ্ধি, বাক্যাড়ম্বরের বাইরে— ওসব হতে অনেক দূরে। ওহে 'সাকি' পেয়ালা পূর্ণ কর— আমরা প্রেমমদিরা পান ক'রে পাগল হয়ে যাই।"

তুলনা করে দেখা যাক Fitzeraldএর ওমর কবিতা থেকে :

Oh, come with old Khayam, and leave the Wise
To talk ; one thing is certain, that Life flies.
...
Ah, filll the cup.

আর বিবেকানন্দের

Few only know the truth, the rest will hate
And laugh at thee great one! but pay no heed,
Go thou, the free from place to place, and help
Them out of darkness, Maya's veil. Without
The fear of pain or search for pleasure, go
Beyond them both, Sanyasin bold! Say—
'Om tat sat, om!'

Kali the Motherএর কাব্যরস গ্রহণ করতে হলে বোঝা দরকার যে এই কালী শুধু একটা ধর্মীয় প্রতীক নয়, একটা esoteric রহস্যকেন্দ্র মাত্র নয়। এ এক বিশ্বগত সত্য যা সকল মানুষের অভিজ্ঞতার সীমার মধ্যে আসা সম্ভব, বিশেষতঃ সেই মহৎ কবিদের যাঁরা জগতের নিগূঢ়তম ব্যাপকতম সত্যগুলিকে প্রত্যক্ষ করতে চান।

কবি Donne এই অদ্ভুত প্রার্থনা জানাচ্ছেন কাকে ?

Batter my heart, three person'd God...
That I may rise, and stand, o'erthrow me
and bend
Your force, to breake, burn and make me new?

এখন এই three-personed God বলতে Donne যাকেই বুঝুন, আসলে তিনি আবাহন করছেন ভগবানের শক্তিরূপকে, কালীকে। Shelley যে West Windকে বলছেন

Wild spirit, which art moving everywhere ;
Destroyer and Preserver ; hear, oh, hear!

যার সামনে শুকনো পাতা উড়ে চলে, যার ভয়ে সমুদ্রতলের গাছপালা ফুলও 'grow grey with fear and tremble and despoil themselves,' সেই 'ভয়ং ভয়ানাং ভীষণং ভীষণানাম্' এই কালী ছাড়া আর কিছু নয়। শ্রীঅরবিন্দ একটি সনেটে— The Cosmic Dance : (Dance of Krishna, Dance of Kali)— এই সার্বিক তত্ত্বটি প্রকাশ করেছেন। তার অনুবাদ দিচ্ছি :

দুটি নৃত্যছন্দ আছে এই বিশ্বের বিধানে।
সর্বদা আমরা শুনছি সেই কালীপদপাত,
যা দুঃখদৈন্য দুর্দশায় গাঁথে তালে মানে
জীবনের বাজিখেলা, মধুর, নির্ঘাত।
তাতে দারুণ পরীক্ষা আছে গুপ্ত সাধকের,
আছে মৃত্যু-আলিঙ্গন ক্রীড়ামত্ত আত্ম-বীর,
আছে নিয়তির মল্লমঞ্চে সন্ত্রাস দ্বন্দ্বের,
আর ত্যাগ— সেই একপথ কৃপাপদবীর।
রহস্যের চাবি হয় মানুষী ত্রিতাপ,
একটি সূক্ষ্ম সত্যপথে কালমরু পার,
জড়ের কবর থেকে উঠতে আত্মার সাতধাপ :
এই সবই সেই নাটকের আটপৌরে ব্যাপার।
বলো এ বিশ্বে কৃষ্ণের নাচ হবে কোন বেলা ?
সেই ছদ্মবেশ, ভূমানন্দ, হাসি, প্রেমখেলা ?

বিবেকানন্দের কবিতার প্রথম দিককার দুর্যোগ রাত্রি ও ঝড়ের সুর যেন সেই রঘুপতির 'এতদিনে আজ বুঝি জাগিয়াছ দেবী! ওই রোষ-হুহুংকার। অভিশাপ হাঁকি নগরের 'পর দিয়া ধেয়ে চলিয়াছ

তিমিররূপিণী'র একই স্বরসপ্তকে, তবে তার সঙ্গে মিলেছে শেলির West Windএর তীব্রোদাত্ত আস্পৃহা। তাতে ছাড়া পেয়েছে বিশ্বের সমস্ত ভয়মূর্তি— প্রকৃতির, প্রাণের। কিন্তু তবু সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে ডাকো Come, Mother, Come।

For Terror is Thy name,
Death is in thy breath,
And every shaking step
Destroys a world for e'er,
Thou 'Time', the All-Destroyer!
Come, O Mother, come!
Who dares misery love,
And hug the form of Death,
Dance in Destruction's dance,
To him the Mother comes.

যে পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কালী কৃষ্ণ শিব —তত্ত্বের আলোচনা করছি তা মনে রেখে বলা যায় রবীন্দ্রনাথে কৃষ্ণের মাধুর্য নটরাজ শিবের লীলার প্রকাশ ব্যাপক ও কাব্যসম্পদময়। কালীভাবকল্প ধ্যানের দীর্ঘ বিচিত্র লিরিক আকৃতি ফুটেছে সমস্ত বিসর্জন নাটকে, জয়সিংহ গোবিন্দমাণিক্যের কণ্ঠের মধ্য দিয়ে। মাতৃস্বরূপিণীর, শারদলক্ষ্মীর অতুলনীয় স্তবসঙ্গীত সমৃদ্ধ করেছে তাঁর গানের ভাণ্ডার। রুদ্রের আবাহনও তাঁর আছে বিখ্যাত কবিতায়, গানে। কিন্তু ছলনাময়ী রুদ্রাণীর স্বীকৃতি তেমন নেই। কিন্তু তাঁর শেষের কবিতাগুলিতে দেখা যাবে এই কালী তাঁর সমস্ত পাওনা আদায় করে নিয়েছেন। 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি'— পুরোপুরি এই কালীর ধ্যান। এবং তাঁর শেষ বক্তব্য— 'অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে সে পায় তোমার হাতে শান্তির অক্ষয় অধিকার' বিবেকানন্দের ঐ Who dares misery Love এর সঙ্গে একসুরে বাঁধা।

জীবনের চরম অভিজ্ঞতার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিবেকানন্দের— এবং এঁদের দুজনের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের একটি চমৎকার মিল আছে। সে হচ্ছে অনন্ত শান্তিসমুদ্রে শেষহীন যাত্রার অভিজ্ঞতা। রবীন্দ্রনাথ তা প্রকাশ করেছিলেন 'সমুখে শান্তিপারাবার' গানে। এটি রচিত হয় ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বরে। তার তিন মাস আগে শ্রীঅরবিন্দ লেখেন তাঁর The Infinite Adventure সনেট। অবশ্য এটির প্রথম প্রকাশ ১৯৫২ সালে। এই সনেটে শান্তিপারাবারে অকূলযাত্রাও আছে— 'On the waters of a namelerss Infinite my skiff is launched' আবার কর্ণধারও আছে— An unseen hand controls my rudder. এমনকি শেষ 'পায় যেন অন্তরে নির্ভয় পরিচয় মহা-অজানার' এর সঙ্গেও একসুরে শ্রীঅরবিন্দ বলছেন—'I shall be merged in the Lonely and Unique,/And wake into a sudden blaze of God'.

এই ধরণের অভিজ্ঞতার কথাই Shelley লিখেছেন তাঁর Adonaisএ প্রায় একই ভাবচিত্রের সাহায্যে :

The breath whose might I have invoked in song
Descends on me ; my spirit's bark is driven,
Far from the shore, far from the trembling throng
Whose sails were never to the tempest given ;
The massy earth and sphered skies are riven,
I am borne darkly, fearfully, afar,
Whilst, burning through the inmost veil of Heaven,
The soul of Adonais, like a star,
Beacons from the abode where the Eternal are.

Adonaisএর এই শেষ স্তবকে শেলি যে যাত্রার কথা বলছেন তা কিন্তু 'শান্ত' নয়, এও এক চরম adventure, এক দুরন্ত অভিসার, ঝড়ের কাছে নৌকোর পাল সমর্পণ। মেজাজে এর স্থর Ode to West Wind এর সমগোত্র। এ যেন নদীর মোহানার তীব্রস্রোতে নৌকা ভাসিয়ে সমুদ্রসঙ্গমের আশায় স্পন্দিত হৃদয়ে অপেক্ষা করা। তবে এ যাত্রা নিরুদ্দেশ নয়, এর সামনে আছে তারার পথনির্দেশ, আর গন্তব্য হচ্ছে সেই চিরন্তন ধাম 'where the eternal are'। শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেরই কবিতা কিন্তু সম্পূর্ণ সেই চিরন্তন শান্তিসমুদ্রের অন্তরঙ্গ অনুভূতির উপরেই রচিত।

১৮৯৯ সালে নিউইয়র্কে বিবেকানন্দ শেলির Skylarkএর ছন্দে লেখেন Peace বলে একটি কবিতা।

It is death between two lines,
And hill between two storms,
The void whence rose creation,
And that where it returns.

কিন্তু এই শূন্যগর্ভ শান্তিতে তাঁর আশা মিটছেনা। ১৯০০ সালে জানুয়ারি মাসে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে তিনি লিখছেন, "যে শান্তি ও বিশ্রাম খুঁজছি, তা আসবে বলে তো মনে হচ্ছে না। তবে মহামায়া আমাকে দিয়ে অপরের— অন্ততঃ আমার স্বদেশের— কথঞ্চিৎ কল্যাণ করাচ্ছেন।"

ঐ বৎসরই পরে আবার লিখছেন :

"হাঁ, এইবার আমি ঠিক যাচ্ছি। আমার সামনে অপার নির্বাণ সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি। সময়ে সময়ে তা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করি, সেই অসীম অনন্ত শান্তিসমুদ্র— মায়ার এতটুকু বাতাস বা ঢেউ পর্যন্ত যার শান্তিভঙ্গ করছে না।"

"যাই! মা যাই!— তোমার স্নেহময় বক্ষে ধারণ করে যেখানে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, নেই অশব্দ, অস্পর্শ, অজ্ঞাত, অদ্ভুত রাজ্যে— অভিনেতার ভাব সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র দ্রষ্টা বা সাক্ষীর মতো ডুবে যেতে আমার দ্বিধা নাই।"

যে আত্মিক কাব্যিক অভিজ্ঞতা ধরা দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দের কাছে ১৯৩৯ সালে, সেই একই অভিজ্ঞতা বিবেকানন্দের সাধনোত্তীর্ণ আত্মা ও কবিহৃদয়কে পুরস্কৃত করেছিল এই শতাব্দীর প্রথমেই, ১৯০০

সালের এপ্রিল মাসে, সুদূর ক্যালিফোর্নিয়ায়। রীতিমত ছন্দোবদ্ধ কবিতায় অবশ্য তিনি তা লিখে যেতে পারেন নি ; কিন্তু তার সাক্ষ্য রেখে গিয়েছেন চিঠির ঐ গদ্যছন্দে।

প্রায় শতাব্দীকাল ধরে পাশ্চাত্ত্য দেশে দ্বন্দ্ব চলেছে ধর্মের সঙ্গে ইহজাগতিকতার। এই religious আর secular মনোভঙ্গীর মধ্যে পশ্চিম রায় দিয়েছে secularএর সপক্ষে, কাজেই রাজনীতিতে শিক্ষায় সাহিত্যে সেই হল তাদের প্রেক্ষিত সীমা। আমাদের জীবনেও এরই প্রভাব সুস্পষ্ট। তার কিছুটা সুফল যে ফলে নি এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশে তা বলছি না। কিন্তু কিছুটা নিজস্ব সম্পদ আমরা হারিয়েছি। এবং 'পরা' ও 'অপরা'র মধ্যে এই 'অর্দ্ধং ত্যজন্তি পণ্ডিতাঃ' নীতি— যা শুধু আপৎকালীন হওয়াই বাঞ্ছনীয়— চালিয়ে গেলে মানবসভ্যতা সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও হয়ে থাকবে ক্ষীণ। বিবেকানন্দ আধুনিক যুগের প্রথম কবিকণ্ঠ যা জগৎএর পূর্ব পশ্চিমকে ধ্বনিত ক'রে আবার এনে দিয়েছে জীবন্ত এবং গভীরতম অধ্যাত্মরস— যা সমস্ত ভেদাভেদের নিম্নগুল্মের উপর প্রসারিত হয়েছে সর্বজনগ্রাহ্য ভোরের আলোর মত। বিবেকানন্দের এই ভাবপ্রবাহ কেমনভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল পাশ্চাত্ত্য জগতের অনেক ভাবগ্রাহী চিত্তে তার একটি চমৎকার প্রমাণ নিবেদিতার *Kali the Mother* গ্রন্থ। তার এক জায়গায় নিবেদিতা লিখছেন, "কালী-বিগ্রহ শুধু এক দেবীর মূর্তন চেষ্টা ততটা নয়, বরং একে বলতে পারি আমাদের জীবনের গোপন রহস্যের উচ্চারণ।"

আর-এক জায়গায় : "কালী নীলবর্ণা। প্রায় কালো ; যেন একটা বিরাট ছায়া ; জীবন ও মৃত্যুর নিষ্করুণ সত্যের মত নগ্ন। কিন্তু তার (আত্মার) কাছে এ শুধু একটা ছায়ামূর্তি নয়। এই ভয়ঙ্করীর গভীরতম অন্তস্তলে পৌছোয় তার অবিচল দৃষ্টি আর চেনার আনন্দোচ্ছ্বাসে সে তাকে ডাক দিয়ে বলে ওঠে : 'মা' !"

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৮৬৫-১৯৪৩

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বর্তমান দশকে এ পর্যন্ত বহু বঙ্গ মনীষীর শততম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সর্বত্যাগী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, কবিনাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং স্বামী বিবেকানন্দের নাম স্বতঃই আমাদের মনে উদিত হয়। এই বৎসর সাংবাদিক-প্রবর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়েরও শততম জন্মবার্ষিকী প্রতিপালিত হইবে ও তাঁহার কথা আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিব। সাংবাদিক-রূপেই সাধারণ্যে রামানন্দের প্রসিদ্ধি এবং তিনি ভারতবর্ষে এই বিভাগে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। কিন্তু সাংবাদিক বলিলেই তাঁহার সম্যক পরিচয় হয় না ; রামানন্দ ছিলেন একাধারে চিন্তানায়ক ও কর্মবীর।

রামানন্দ বাঁকুড়া জেলা শহরে এক বিখ্যাত পণ্ডিত বংশে ১৮৬৫ সনের ২৮শে মে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে বাংলা স্কুলে অধ্যয়ন করেন এবং ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় চারি টাকা বৃত্তি পান। পরে বাঁকুড়াস্থ ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হন। এখান হইতে তিনি ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া কুড়ি টাকা মাসিক বৃত্তি লাভ করেন। এই দুই স্কুলে অধ্যায়নকালেই রামানন্দের মনে স্বদেশ-প্রেমের বীজ উপ্ত হয়। তিনি যখন ইংরেজি স্কুলে উপরের ক্লাসের ছাত্র তখন ব্রাহ্মশিক্ষক কেদারনাথ কুলভী মহাশয়ের উপদেশে নানাবিধ হিতকর্মে রত হইয়াছিলেন। এই সময় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিও তিনি আকৃষ্ট হন। কুলভী মহাশয়ের মুখে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চমৎকার উক্তিগুলি শুনিতেন, এ কারণ তাঁহার মনে পরমহংসদেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জন্মে। প্রসিদ্ধ সিবিলিয়ান ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের সংস্পর্শে আসিবারও তাঁহার সুযোগ ঘটিল। তাঁহার উপন্যাস পাঠে রামানন্দের মনে স্বদেশপ্রীতি দৃঢ়মূল হইয়া উঠে।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রামানন্দ কলিকাতায় আসেন ও প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হন। ঘটনাচক্রে তাঁহাকে প্রেসিডেন্সি কলেজ, সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও সিটি কলেজে অধ্যয়ন করিতে হয়। তিনি সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ হইতে এফ. এ. পরীক্ষা দেন। প্রথম বিভাগে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া তিনি মাসিক পঁচিশ টাকা বৃত্তি পাইলেন। ইহার পর প্রেসিডেন্সি কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর অধ্যাপনায় ও সঙ্গলাভে বিশেষ উদ্দীপিত হন। এবারেও কিন্তু শেষ রক্ষা হয় নাই। বি. এ. পরীক্ষা কালে, শেষ পর্যন্ত কোনো কোনো বিষয়ে পরীক্ষা আর দিলেন না, কেননা তাঁহার ধারণা হয় উহা আশানুরূপ হয় নাই। সিটি কলেজ হইতে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজিতে বি. এ. অনার্স পরীক্ষা দেন ও ইহাতে প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া কলেজ হইতে চল্লিশ টাকা রিপন বৃত্তি পান। কলেজের ইংরেজি-সাহিত্যের অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্র রামানন্দের কৃতিত্বে স্বতঃই উৎফুল্ল হন। তাঁহার পরামর্শে কলেজ কর্তৃপক্ষ রামানন্দকে অবেতনে অধ্যাপনা-কার্যে নিযুক্ত করেন।

কলিকাতায় আসিয়া রামানন্দ আনন্দমোহন-সুরেন্দ্রনাথের স্টুডেণ্টস্ অ্যাসোশিয়েশনে উদ্দীপনাপূর্ণ

রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনিয়া এবং আনন্দমোহন-শিবনাথ প্রতিষ্ঠিত ছাত্রসমাজে যোগ দিয়া স্বদেশের এবং সমাজের উন্নতিপ্রয়াসে উদ্বুদ্ধ হইলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার নিকট একজন আদর্শ মানুষ বলিয়া প্রতিভাত হন। তাঁহার ব্রাহ্মধর্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং সেবাকার্যে কঠোর পরিশ্রম ও তৎপরতা রামানন্দকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। অধ্যাপনা-কালে তিনি ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক পদে কার্য করিতে থাকেন। ইহার সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র। ইণ্ডিয়ান মিররেও সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিতে লাগিলেন। রামানন্দ ছিলেন সব্যসাচী। ইংরেজির মতো বাংলা 'সঞ্জীবনী' এবং 'ধর্মবন্ধু'তেও তিনি প্রবন্ধ, রসরচনা ও মন্তব্যাদি সমানে লিখিতেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'ধর্মবন্ধু'র সম্পাদক হন।

এই সনেই (১৮৯০) রামানন্দ সিটি কলেজ হইতে এম. এ. পরীক্ষা দিলেন। উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে তাঁহার স্থান হইল প্রথমশ্রেণীতে চতুর্থ। কলেজ-কর্তৃপক্ষ ১৮৯০ মার্চ হইতে রামানন্দকে মাসিক এক শত টাকা বেতনে কলেজের অন্যতম অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন। শর্ত ছিল যে দুই বৎসর কাল এই বেতনেই তাঁহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। এই সময়ান্তে তাঁহার রীতিমত বেতনবৃদ্ধি হইতে শুরু হয়। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আগস্ট মাসে তিনি এই পদ ত্যাগ করেন এবং ইহার পরে এলাহাবাদের কায়স্থ পাঠশালার (কলেজ) অধ্যক্ষ হইয়া যান। সিটি কলেজে তিনি যখন বেতনভোগী অধ্যাপক হইলেন সেই সময় হইতে সেবামূলক নানা কার্যে তিনি ব্রতী হন। ইহার মধ্যে দাসাশ্রম ও 'দাসী'র কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দাসাশ্রম মফস্বলে প্রতিষ্ঠিত (২৯ জুন ১৮৯১) হইবার পর যখন হইতে ইহার কর্মকেন্দ্র কলিকাতায় তুলিয়া আনা হয় প্রায় সেই সময় হইতেই রামানন্দ ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়া পড়েন। প্রথমে দাসাশ্রমের কার্যক্রম দুই ভাগে বিভক্ত হয়।— ১. পতিতা নারীগণের কন্যাদের উদ্ধার ও সেবাকার্যে শিক্ষা; ২. দুঃস্থ নিরাশ্রয় রোগীদের এবং রাস্তা হইতে দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত অনাথ নারীপুরুষকে একটি স্থানে আশ্রয় দান এবং তাঁহাদের চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা। প্রথমটির জন্য যে কমিটি হয়, তাহার সম্পাদক ছিলেন রামানন্দ। এই কার্যে আইনগত বাধা থাকায় ইহা অল্পকাল পরেই উঠিয়া যায়। দাসাশ্রমের অন্য কার্যের জন্য ১৮৯২, ২৫শে জানুয়ারি একটি সেবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সেবালয়ের কার্যনির্বাহকল্পে যে কমিটি গঠিত হইল তাহার সভাপতি ছিলেন রামানন্দ স্বয়ং। দাসাশ্রমের মুখপত্র 'দাসী' নামক একখানি মাসিক পত্রিকা ১২৯৮ আষাঢ় মাস হইতে প্রকাশিত হয়। প্রথমাবধি রামানন্দ এই পত্রিকাখানি পরিচালনা ও সম্পাদনার ভার লন। সেবাব্রতমূলক নানা ঘটনা কাহিনী ও সেবাব্রতীদের জীবনী ইহাতে প্রথমে প্রকাশিত হইতে থাকিলেও ক্রমে ইহাকে সাধারণ পাঠোপযোগী করিয়া তোলা আবশ্যক বিবেচিত হয়; আর ইহাতে সে সময়ে খ্যাতিমান প্রবীণ ও নবীন লেখকেরা রচনা পরিবেশন করিতে আরম্ভ করেন। কবিতা গল্প উপন্যাসও ইহাতে স্থান পাইত। সম্পাদকরূপে রামানন্দ বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধনিবন্ধ লিখিয়াছিলেন— তন্মধ্যে অন্ধদের শিক্ষা বিষয়ক ব্রেল পদ্ধতি আলোচনা, প্রাদেশিক কথিত বাংলা, ঐতিহাসিক তীর্থযাত্রা প্রভৃতি রচনা ঐ সময়ে বিশেষ চিন্তার খোরাক যোগায়। এলাহাবাদে যাইবার পরেও রামানন্দ কিছুকাল ইহার সম্পাদনা করেন। তাঁহার 'বিবিধ প্রসঙ্গ' শীর্ষক অধ্যায় দাসীতেই প্রথম সন্নিবেশিত হইতে থাকে। এই নামটির সঙ্গে বাঙালি পাঠক-সাধারণ প্রবাসীর মারফত আজ সুপরিচিত।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বিধুশেখর শাস্ত্রী-সহ রামানন্দ। শান্তিনিকেতনে উৎসবসভায়

শিশুশিক্ষার প্রতি রামানন্দের বিশেষ ঝোঁক ছিল। তিনি ইতিপূর্বে নূতন ধরণের সচিত্র বর্ণপরিচয় (দুই খণ্ডে) প্রকাশ করেন। ১৩০৮ সালের একটি বিজ্ঞাপনে দেখি তখন পর্যন্ত ইহা এক লক্ষ দুই হাজার বিক্রয় হইয়াছে। শিশু ও কিশোর পাঠোপযোগী সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশে তিনি ও যোগীন্দ্রনাথ সরকার উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এই উদ্যোগের ফল 'মুকুল' নামক সচিত্র কিশোর পত্রিকা। ইহার প্রথম সংখ্যা বাহির হয় আষাঢ় ১৩০২ বঙ্গাব্দে এবং সম্পাদক হন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

রামানন্দ ১৮৯৫ অক্টোবর মাসের প্রথমে সপরিবারে এলাহাবাদ যান এবং কায়স্থ পাঠশালার অধ্যক্ষতা-কর্মে লিপ্ত হন। ছাত্রদের পাঠোৎকর্ষ ও চিত্তোৎকর্ষ দুইই ছিল রামানন্দের কাম্য। এই উদ্দেশ্যে তিনি কায়স্থ পাঠশালাকে একটি আদর্শ কলেজে রূপায়িত করিতে ব্রতী হইলেন। কিন্তু কলেজী শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার করিতে হইলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষারও উন্নতি হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ঐ সময়ে নিম্নস্তরের শিক্ষা খুবই বাধাগ্রস্ত ছিল। তৃতীয় পঞ্চম ও সপ্তম শ্রেণীতে পর পর সরকারী বিভাগীয় পরীক্ষা লওয়া হইত। এইসকল বেড়া ডিঙাইয়া তবে ছেলেরা প্রবেশিকার মান পর্যন্ত পৌছিতে পারিত। শিক্ষাবিদ্ রামানন্দ এই সমুদয় কৃত্রিম বাধার বিরুদ্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় আন্দোলন উপস্থিত করেন। ইহাতে ফল হইল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সরকার ক্রমে এই বাধাগুলি একে একে তুলিয়া লন এবং ছেলেরা বিনা ক্লেশে প্রবেশিকা পরীক্ষার মান পর্যন্ত উঠিতে পারে। কলেজী-শিক্ষাও এইরূপে ব্যাপকতর হইবার পথ পাইল। এলাহাবাদ অ্যাংলো-বেঙ্গলী স্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক নেপালচন্দ্র রায় বলেন, 'আজ এই প্রদেশে যে শিক্ষার বহুল বিস্তার ঘটিয়াছে, তাহার মূলে ছিল রামানন্দ বাবুর পরিশ্রম ও চেষ্টা।' বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বলিয়া এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় রামানন্দকে ইহার অন্যতম ফেলো নিযুক্ত করিলেন। কংগ্রেসের শিক্ষাবিষয়ক কমিটি ও শিক্ষাবিষয়ক আলোচনাদিতে তাঁহার যোগদানের আহ্বান আসিত।

এলাহাবাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক সাহিত্যবিষয়ক ও জনহিতকর বিবিধ অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ক্রমে তাঁহার নিবিড় যোগ সাধিত হয়। ঐ প্রদেশে মাদকদ্রব্য-নিবারক সভার সভাপতি, এলাহাবাদস্থ অনাথ আশ্রমের সম্পাদক, প্রদেশের কংগ্রেস কমিটির সদস্য, প্রয়াগ সাহিত্যমন্দিরের সহ-সভাপতি, প্লেগ-আক্রান্ত রোগীদের সেবাকার্যের উদ্যোক্তা, প্রয়াগ বাঙালি সম্মিলনের প্রধান নেতা প্রভৃতি ব্যপদেশে বাঙালি ও অবাঙালি নেতৃস্থানীয় ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে তিনি একান্ত ভাবে মিলিত হইলেন। কংগ্রেসের কার্যে তিনি বন্ধুরূপে পান পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়কে। এলাহাবাদ হইতে প্রতিবার কংগ্রেসে ডেলিগেট বা প্রতিনিধি মনোনীত হইতে লাগিলেন এবং ইহার প্রায় সব অধিবেশনেই তিনি যাইতেন। এলাহাবাদ অবস্থানকালে রামানন্দের মননশীলতা ও কর্মশক্তি বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্য দিয়া স্পষ্টরূপে প্রকটিত হয়। তিনি জ্ঞানতপস্বী কিন্তু অর্জিত জ্ঞান সাধারণের মধ্যে বিতরণ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। শিশুদের জন্য এই সময়ে তিনি দুইখানি ইংরাজি পাঠ্যপুস্তক লেখেন। কলেজের কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রকাশিত ইংরেজি মাসিকপত্র কায়স্থ সমাচারের তিনি প্রথম সম্পাদক হন। এক বৎসরকাল (জুলাই ১৮৯৯-জুন ১৯০০) রামানন্দ এই গুরু দায়িত্বভার বহন করিয়াছিলেন।

কিন্তু এ সময়কার তাঁহার একটি প্রধান কার্য হইল 'প্রদীপ' নামক সচিত্র মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা। কলিকাতা হইতে ১৩০৪ সালের পৌষ মাসে এই পত্রিকাখানি বাহির হয় এবং রামানন্দ ইহা এলাহাবাদে বসিয়াই সম্পাদনা করিতে আরম্ভ করেন। তৎকালের গুণী জ্ঞানী খ্যাতনামা লেখকবর্গ এবং উদীয়মান

সাহিত্যিকগণের রচনাসম্ভারে 'প্রদীপ' পরিপুষ্ট হইত। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা ও কিছু গদ্য রচনা রামানন্দ এই প্রথম প্রদীপে প্রকাশিত করিলেন। পত্রিকাখানির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল প্রায় প্রতি সংখ্যায় বাঙালি অবাঙালি এবং ভারতপ্রেমিক বিদেশী মহামনা মনীষীদের সচিত্র সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ। বাঙালি যে ভীরু কাপুরুষ শ্রমবিমুখ নহে, তাহারা যে উপযুক্ত ক্ষেত্রে শৌর্যবীর্যের যথেষ্ট প্রমাণ পূর্বে দিয়াছিল এখনও দিতে পারে তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ রামানন্দ বীর যোদ্ধা প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সচিত্র জীবনী প্রথম সংখ্যায়ই লিখিয়াছিলেন। তাঁহার নির্বন্ধাতিশয়ে দূর ও নিকট অতীতের বাঙালির বীরত্বের কাহিনী ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ধারাবাহিকরূপে লেখেন। ইহা ব্যতীত ভাষাতত্ত্ব প্রাণীবিদ্যা রসায়ন জ্যোতির্বিদ্যা স্ত্রী-শিক্ষা সাধারণ শিক্ষা বাংলায় স্টেনোগ্রাফি হাফটোন ব্লক সমসাময়িক রাজনীতি ও অর্থনীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের আলোচনার ক্ষেত্র হইল 'প্রদীপ'। বস্তুতঃ অনতিকালের মধ্যেই যে সর্ববিধ বিদ্যার আলোচনা ও জাতীয় সর্বাঙ্গীণ উন্নতি চিন্তার একখানি প্রথমশ্রেণীর মাসিক পত্রের অভ্যুদয় হইবে 'প্রদীপ' তাহার আগমনী বাঙালিকে শুনাইল।

রামানন্দ প্রায়ই পাণিনি কার্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সুপণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বসু এবং অন্যান্য এলাহাবাদবাসী বাঙালি মনীষীদের সঙ্গে বাঙালির, বিশেষ করিয়া প্রবাসী বাঙালির, ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনায় লিপ্ত হইতেন। এইসকল আলোচনার ফলে একখানি উৎকৃষ্ট ধরণের মাসিক পত্র প্রকাশের কথা তাঁহার মনে উদয় হইয়া থাকিবে। পরবর্তী প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের বীজও আমরা ইহার মধ্যে পাই। ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে রামানন্দ এলাহাবাদ হইতে 'প্রবাসী' প্রকাশ করেন। প্রবাস হইতে প্রকাশিত, এই জন্যই ইহার এইরূপ নামকরণ। রামানন্দ পত্রিকাখানিকে প্রবাসী বাঙালির একেবারে মুখপত্র করিয়া তুলিলেন না বটে, কিন্তু ইহাতে ক্রমে ক্রমে প্রবাসী বাঙালিদের নানা সমস্যা ও সাধনার কথা প্রকাশিত হয় এবং এজন্য তাঁহারা এখানিকে তাঁহাদের নিজস্ব পত্রিকা বলিয়াই জ্ঞান করিতে থাকেন। এ বিষয়ে তৎকালীন জয়পুরপ্রবাসিনী শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবীর কয়েকটি কথা উল্লেখ করি। "...প্রবাসী মানুষের কাছে 'প্রবাসী'র সমাদরের অবধি রইল না। প্রবাসের শিক্ষিত প্রবাসী বাঙালিদের কাছে প্রবাসী যেন গৃহপঞ্জিকার মতো অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল— অবশ্য-পাঠ্য তো বটেই। তাঁদের মনে ও জীবনে সাহিত্যের একটি শুদ্ধ পরিচ্ছন্ন আনন্দময় পরিবেশ প্রবাসী সৃষ্টি করেছিল।"[১]

'প্রবাসী' কিন্তু কোনো শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের মুখপত্র না হইয়া এবং কোনো একক বিদ্যার আলোচনা-ক্ষেত্র না হইয়া সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের এবং সকল বিদ্যার প্রতিভূ হইল। এই কারণে ইহা ত্বরায় বাঙালি ও প্রবাসীবাঙালি নির্বিশেষে সকল বাংলাভাষীরই নিকট আদরণীয় হইয়া উঠিল। বিবিধ জাতীয় সমস্যা, বিবিধ বিদ্যা যেমন শিল্পকলা কারুশিল্প কবিতা রসরচনা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ইতিহাস ভাষা সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ক রচনার দ্বারা এবং চিত্রসম্ভারে এখানি সমৃদ্ধ হয়। সাধারণের নিকট ইহা এতই সমাদৃত হয় যে প্রচারসংখ্যা শীঘ্রই বিস্তর বাড়িয়া গেল। প্রদীপের ন্যায় প্রবাসীতেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগেশচন্দ্র রায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমুখ মনস্বী লেখকবর্গ লেখা পরিবেশন করিতে থাকেন। তবে প্রথম দিকে প্রবাসী-বাঙালি সাহিত্যিকদের লেখার দ্বারাই ইহার কলেবর বেশির ভাগ পূর্ণ হইত।

---

১ প্রবাসী ষষ্টি বার্ষিক, পৃ. ১৬

দ্বিতীয় বর্ষ হইতে 'প্রবাসী' একটি বিষয়ে সাময়িক সাহিত্যে পথ প্রদর্শক হইল। প্রচুর অর্থব্যয়ে ও নানাবিধ আয়াস স্বীকার করিয়া রামানন্দ দ্বিতীয় বর্ষ হইতে দেশী বিদেশী রঙীন চিত্র সর্বপ্রথম প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের রঙীন চিত্রসমূহও ক্রমান্বয়ে ইহাতে প্রকাশিত হইতে থাকে। নব্য চিত্রকলা (যাহা ভারতীয় চিত্রকলা নামে অধুনা পরিচিত) প্রচারে ও প্রসারে প্রবাসীর কৃতিত্ব অনন্যতুল্য। নন্দলাল বসু অসিতকুমার হালদার সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত সারদাচরণ উকিল মুকুল দে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অবনীন্দ্র-শিষ্যপ্রশিষ্যগণের চিত্র ধারাবাহিক ভাবে বাহির করিয়া 'প্রবাসী' জনসাধারণকে শিল্পসচেতন করিয়া তোলে। ভারতীয় শিল্পকলার ইহা একটি যুগান্তকারী প্রয়াস।

রামানন্দ কংগ্রেসের আদর্শে উদ্বুদ্ধ। কংগ্রেস কর্তৃক ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্যবোধ জাগ্রত করিবার সার্থক প্রচেষ্টার কথা তিনি বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন। যেখানেই এবং যখনই ঐক্যবুদ্ধি ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়াছেন তখনই তিনি ইহার প্রতিবাদকল্পে লেখনী পরিচালনা করিয়াছেন। তিনি চিন্তাশীল নীরব কর্মী। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে তিনি আর অন্তরালে থাকিতে পারেন নাই। ১৩১২, ৩০শে আশ্বিন বঙ্গভঙ্গের দিন এলাহাবাদে বসিয়া প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে বিবিধ উপায়ে স্বদেশী-ব্রত উদ্‌যাপনের সংকল্প গ্রহণ করেন। অরন্ধন রাখিবন্ধন যথারীতি প্রতিপালিত হইল। তিনি প্রকাশ্য সভাসমিতিতেও সভাপতি বা প্রধান বক্তারূপে যোগ দিয়া বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। বহু বৎসর পূর্ব হইতেই তাঁহার পরিবারে স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার শুরু হয়। তিনি জনসাধারণের সম্মুখে স্বদেশীর মূর্ত প্রতীকরূপে প্রতিভাত হইলেন। 'প্রবাসী'কেও রামানন্দ স্বদেশী-আন্দোলন-সঞ্জাত বিবিধ প্রচেষ্টার আলোচনার ক্ষেত্র করিয়া তুলিলেন। রাজনীতি অর্থনীতি শিক্ষানীতি প্রভৃতি ইহাতে বিশেষ-ভাবে স্থান পাইতে লাগিল। তবে রামানন্দের স্বদেশীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ব্যাপকতর, স্বদেশীয় আচার্য বসুর অভিনব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পীপ্রধানদের শিল্পকলার প্রকাশ প্রভৃতিও ইহার অঙ্গীভূত করিলেন। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, ভারতীয় চিত্রকলার বিচার-বিশ্লেষণে ভগিনী নিবেদিতা বিশেষ তৎপর ছিলেন। ভারতীয় মহাজাতি গঠনে শিল্পের শক্তিমত্তা ও প্রাণপ্রাচুর্য যে কত কার্যকরী তাহা তিনি ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিতেন।

স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যেই রামানন্দের মনে একখানি ইংরেজি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের কথা উদয় হয়। বাঙালির সমস্যা ভারতবাসীর সমস্যা—এককথায় বাঙলা তথা ভারতের মর্মবাণী স্বদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে প্রচার হেতু এবং ব্রিটিশ সরকার ও বিশ্ববাসীর নিকট ইহা পৌছাইয়া দিবার নিমিত্ত এইরূপ একখানি ইংরেজি পত্রিকার বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হইতেছিল। রামানন্দ স্বেচ্ছায় এই ভার লইতে আগাইয়া আসিলেন। কিন্তু এই সময়, ১৯০৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কলেজ-কর্তৃপক্ষের উপর সরকারি চাপ পড়ার দরুণ কলেজের স্বার্থরক্ষা করার জন্য তাঁহাকে অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করিতে হইল। প্রবাসী তখনও ঋণমুক্ত হয় নাই। তাহার উপরে আয় সম্পূর্ণ বন্ধ। এ অবস্থায়ও কিন্তু রামানন্দ সংকল্পচ্যুত হন নাই। তিনি পূর্ব ব্যবস্থা মতো ১৯০৭ সনের জানুয়ারি মাসে অভাব ক্ষতি ও বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া এই পত্রিকাখানি প্রকাশ করিলেন। নাম দিলেন *The Modern Review and **Miscellany***। তাঁহার এই শুভ প্রচেষ্টাকে ভারতের মনীষীবৃন্দ সার্থক করিয়া তুলিতে অগ্রসর

হইলেন। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক, রাজনীতি ও সমাজনীতিবিদ, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যরসিক, শিল্পী ও শিল্পসমালোচক চিন্তাপূর্ণ সারগর্ভ রচনার দ্বারা মডার্ন রিভিউকে একখানি উন্নত উচ্চশ্রেণীর মাসিকপত্রে পরিণত করিতে সবিশেষ সহায়তা করেন। ইহাদের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতা ও ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়।

মডার্ন রিভিউ ভারতবর্ষের মুক্তিযজ্ঞে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের জাতীয়তা-বিরোধী অপকৌশল রামানন্দ *Notes* বা সম্পাদকীয় মন্তব্যে ধরাইয়া দিতেন এবং ইহার তীব্র সমালোচনা করিতেন। ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে যখন চরমপন্থী ও নরমপন্থী দলের উদ্ভব হয় ও দুই দলের মতানৈক্য হেতু সুরাটে কংগ্রেস ভাঙিয়া যায় তখন রামানন্দ স্বদেশবাসীদের এই বলিয়া সাবধান করিয়া দেন যে, জাতীয় নেতা ও কর্মীদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দিলে ব্রিটিশ সরকারেরই বলবৃদ্ধি পাইবে। আর, ইহার ফলে আমাদের জাতীয় প্রগতি পদে পদে ব্যাহত হইবে। তাঁহার এই উক্তি অবিলম্বে যথার্থ প্রতিপন্ন হইল। ব্রিটিশ সরকার প্রবল প্রতাপে নির্বিচারে জাতীয় নেতা ও কর্মীদের কারারুদ্ধ করিলেন ও নানারূপ জরুরী আইন বিধিবদ্ধ করিয়া জাতীয় আন্দোলনের উৎসমূলে আঘাত হানিলেন। রামানন্দ মাসের পর মাস তাহাদের এই কার্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। বাংলা দেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন অপরাপর প্রদেশেও অনুসৃত হইল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সরকার ইহাতে বাধা দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তাহারা কয়েকজন স্বদেশী কর্মীকেই বহিষ্কার করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। রামানন্দের উপরে এই হুমকি দিলেন যে, ঐ অঞ্চল হইতে অবিলম্বে চলিয়া যাইতে হইবে। যে প্রেসে মডার্ন রিভিউ ছাপা হইত সেই প্রেসের উপরও সরকারি নির্দেশ আসিল, তার ফলে সেখানে কাগজ ছাপা বন্ধ হইল। রামানন্দ দ্বিতীয় বিকল্প গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন। মডার্ণ রিভিউ ১৯০৮ মে সংখ্যা এবং প্রবাসী ১৩১৫ বৈশাখ সংখ্যা কলিকাতা হইতে প্রথম প্রকাশিত হইল। রামানন্দ সপরিবারে এলাহাবাদ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। কলিকাতাই অতঃপর তাঁহার কর্মক্ষেত্র হয়।

রামানন্দ সরকারের চিহ্নিত ব্যক্তি। কাজেই কলিকাতায় ফিরিবার পরেও বহু বৎসর যাবত গোয়েন্দা পুলিশ তাঁহার উপর কড়া নজর রাখিতে থাকে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গলির একটি বাড়ি ভাড়া করিয়া সেখানে তাঁহার বাসস্থান ও আপিসঘর নির্দিষ্ট হইল। রবীন্দ্রনাথের গোরা এলাহাবাদে থাকিতেই প্রবাসীতে (ভাদ্র ১৩১৩) প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। কলিকাতায় ফিরিবার পর ১৩১৫ সালে ইহা সমাপ্ত হইল। তাঁহার জীবনস্মৃতিও পরে প্রবাসীতে ধারাবাহিকভাবে বাহির হয়। রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গে রামানন্দের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন বাংলা মাসিক পত্র হইতে লেখার দরুণ সর্বপ্রথম তিনি প্রবাসীর নিকট হইতেই দক্ষিণা স্বরূপ অর্থ পাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পরে বিদেশী কাগজপত্র হইতে জ্ঞানগর্ভ অংশগুলি নিজে অনুবাদ করিয়া এবং শান্তিনিকেতন আশ্রমের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ দ্বারা অনুবাদ করাইয়া 'প্রবাসী'র জন্য পাঠাইতেন। রামানন্দও সাগ্রহে এগুলি নিয়মিত 'সংকলন'রূপে পত্রস্থ করিতেন। ইহা হইতেই প্রবাসীর 'কষ্টিপাথরে'র উৎপত্তি। সারগর্ভ সুচিন্তিত রচনাদি বাদে প্রবাসীর বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়ায়— কষ্টিপাথর, পঞ্চশস্য, দেশের কথা (পরে দেশবিদেশের কথা), পারাপারের ঢেউ, মহিলা মজলিস, বেতালের বৈঠক, ছেলেদের পাততাড়ি প্রভৃতি বিভাগগুলি।

ইহার কোনো কোনোটি পরে অন্যান্য পত্রপত্রিকায়ও অনুসৃত হইয়াছে এবং হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি যুগান্তকারী রাজনৈতিক প্রবন্ধ, যেমন ছোটো ও বড়, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, সত্যের আহ্বান ইত্যাদি প্রবাসীতে পত্রস্থ হয়।

প্রথম মহাসমরকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের নেতৃবৃন্দের ধরপাকড়ের হিড়িক চলে। ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষাও কেমন যেন তমসাচ্ছন্ন হইয়া যায়। এই সময়ে প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ বিভ্রান্ত দেশবাসীর পরম সহায় হইয়া উঠিল। নির্ভীক রামানন্দ সরকারী রোষ অগ্রাহ্য করিয়া জাতির মর্মবেদনা সম্পাদকীয় মন্তব্যে এবং নিজের ও পরের বিবিধ রচনার মধ্য দিয়া দেশবিদেশে জানাইতে ব্রতী হইলেন। তিলক-বেসান্ত পরিচালিত 'হোমরুল'-আন্দোলনকেও রামানন্দ আন্তরিক স্বাগত জানান। তিনি ইহার সমর্থনে মডার্ন রিভিউতে যে সব তথ্যমূলক ও যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা অপর কোনো কোনো লেখকের এই বিষয়ক রচনার সঙ্গে একত্র করিয়া *Towards Home-Rule* পুস্তকে গ্রথিত করেন।

রামানন্দ একনিষ্ঠ জাতীয়তাবাদী, তাই কংগ্রেসের ১৯১০ সনের অধিবেশনে যখন রামসে ম্যাকডোনাল্ডকে সভাপতি করা সাব্যস্ত হয় তখন মডার্ন রিভিউতে ইহার প্রতিবাদ করেন। ১৯১৭ সনে অ্যানি বেসাণ্ট কংগ্রেসের সভাপতি হইবেন, রবীন্দ্রনাথের মুখে যখন এই কথা শুনিলেন তখনও ইহাতে কবিগুরুর সম্মতি সত্ত্বেও তিনি ইহা সমর্থন করিতে পারেন নাই। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নাইটহুড বর্জনের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ মাত্র দুইজনের নিকট পরামর্শ যাচ্ঞা করেন। সি. এফ. এণ্ড্রুজ উহা বর্জন না করিতে বলেন। কিন্তু রামানন্দ রবীন্দ্রনাথের এই প্রস্তাবকে পুরাপুরি সমর্থন করিয়াছিলেন। প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউর পৃষ্ঠায় এই সময়কার অনাচারের কথা বিশেষভাবে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় দেশবিদেশেও লোকমত অনেকটা ভারতবাসীর অনুকূলে ফিরিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে তাঁহার অত্যল্পসংখ্যক বন্ধুর মধ্যে অন্যতম বলিয়া জানিতেন। তাঁহার মূল রচনা প্রবাসীতে এবং অনেকগুলি কবিতা গল্প প্রবন্ধ ও রসরচনার অনুবাদ (কোনো কোনোটি স্বকৃত) মডার্ন রিভিউতে প্রকাশিত করিয়া রামানন্দ অবাঙালি ভারতীয় ও ইংরেজি ভাষাভাষী সুধীমণ্ডলীর গোচরে আনিবার প্রভূত আয়োজন করেন। ইহা নোবল পুরস্কার (১৯১৩)-প্রাপ্তির কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ও পরে বিশ্বভারতীর সঙ্গেও রামানন্দের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটিল, বিশ্বভারতী কলেজের তিনিই হইলেন প্রথম অবৈতনিক অধ্যক্ষ। রামানন্দ প্রস্তাব করেন যে বিলাতের হোম ইউনিভার্সিটি সিরিজ বা গ্রন্থমালার মতো বিশ্বভারতী কর্তৃকও একপ্রস্থ লোকশিক্ষার উপযোগী বিবিধ বিদ্যা বিষয়ক ছোটো আকারের সুলভ গ্রন্থ-সমূহ প্রকাশ করিলে তাহা সাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধির খুবই সহায়ক হইবে। রবীন্দ্রনাথ এই প্রস্তাবে বিশেষ আনন্দিত হন। অতঃপর বিশ্বভারতী 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা' প্রকাশ আরম্ভ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ-রামানন্দ প্রসঙ্গে এখানে আরও কিছু বলি।— রবীন্দ্রজীবনের শেষ কুড়ি বৎসরে রামানন্দ তাঁহার অসংখ্য রচনা— কবিতা গল্প নাটক উপন্যাস পত্রাবলী ও প্রবন্ধনিবন্ধ প্রবাসীতে মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে মুক্তধারা, রক্তকরবী, শেষের কবিতা, সভ্যতার সংকট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে *Golden Book of Tagore* সম্পাদনা করিয়া রামানন্দ তাঁহার প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন।

রামানন্দ ভারতবর্ষের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা চাহিতেন, কিন্তু তাহার নিম্নে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন বা স্বরাজ লাভ হইলেও তাহা অগ্রাহ্য করিবার কোনো কারণ নাই। এই স্বরাজকেই পরে মহাত্মা গান্ধী Substance of Independence বা স্বাধীনতার সার বলিয়াছেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে যখন অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গান্ধীজি কর্তৃক উত্থাপিত ও কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হয় তখনও রামানন্দ ইহার মূল লক্ষ্যে সম্পূর্ণ সম্মতি জানান। কিন্তু এই প্রস্তাবের সকল স্তর বা ধাপ তাঁহার সমর্থন পায় নাই। জাতি-গঠনমূলক বা রচনাত্মক সকল কার্যেই রামানন্দ ছিলেন পূর্বাপর অগ্রণী। চরকা ও খদ্দর প্রচলন, অস্পৃশ্যতা-বর্জন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যস্থাপন প্রভৃতি বিষয়ের অনুকূলে পত্রিকা দুই খানিতে তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করেন। কবিতায় প্রবন্ধে ও সম্পাদকীয় প্রসঙ্গসমূহ দ্বারা তিনি জাতিকে স্বাবলম্বন-মন্ত্রে ও সংগঠন কার্যে উদ্বোধিত করিতে তৎপর হইলেন। কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে, সাহিত্য ক্ষেত্রে বা অন্য যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক না কেন যখনই কলুষ দুর্নীতি ধাপ্পাবাজি দায়-সারা-গোছ কাজ দেখিয়াছেন তখনই ইহার বিরুদ্ধে লেখনী পরিচালনা করেন। স্বরাজ্য দলের হিন্দু মুসলিম প্যাক্ট বা চুক্তিকে তিনি আদৌ বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। ইহা যে পরে দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য অসদ্ভাব ও ভেদবুদ্ধির উদ্রেক করিবে এই সাবধানবাণীও রামানন্দ উচ্চারণ করিলেন। পরবর্তীকালের মর্মান্তিক ঘটনাবলীর মধ্যে ইহার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইয়াছে।

রাষ্ট্রসংঘে এ যাবৎ বৃটিশ সরকারের মনোনীত ভারতীয় সদস্যরাই যোগ দিয়াছেন। ভারতবাসীর স্বার্থ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা সংঘ-কর্তৃপক্ষের গোচরে একরূপ আনাই হইত না। রাষ্ট্রসংঘ ১৯২৬ সনে সর্বপ্রথম একজন বে-সরকারী ভারতীয়কে ইহার কার্যকলাপ সাক্ষাৎভাবে পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ করেন। ইনি হইলেন প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ'র সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তিনি ঐ সনের সেপ্টেম্বর মাসে জেনিভায় যান এবং স্বচক্ষে ইহার কার্যকলাপ দেখিতে চেষ্টা করেন। পাছে নিজ স্বাধীন সত্তা বিঘ্নিত হয় এই আশঙ্কায় রামানন্দ রাষ্ট্রসংঘের নিকট হইতে যাতায়াত খরচ এবং রাহা খরচ বাবদে কিছুই লন নাই, নিজে হইতে সমস্ত ব্যয় বহন করেন। রাষ্ট্রসংঘের কর্তৃপক্ষ বোধ হয় এই কারণেই প্রথমাবধি তাঁহাকে ভালো চক্ষে দেখেন নাই। রামানন্দ উক্ত প্রতিষ্ঠানের পদস্থ কর্মীবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া এবং পরিষদের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া যাহা দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন তাহাতে মোটেই তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে রাষ্ট্রসংঘের জন্য অর্থব্যয় হয় প্রচুর, কিন্তু ভারতীয় কর্মী খুবই সামান্য। বিভিন্ন দেশের মধ্যে সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপনের জন্য যে বিধি-ব্যবস্থা আছে তাহা হইতে ভারতবর্ষ প্রায় বাদ পড়িয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষা, নারীদের ও শ্রমিকদের অবস্থা প্রভৃতি খাতে ভারতের জন্য অনুসন্ধান ও ব্যবস্থাদি করার নিমিত্ত কর্তৃপক্ষের কোনো যত্ন তিনি লক্ষ্য করেন নাই। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিও তাহাদের ঔদাসীন্য ও অবহেলা প্রকট। রামানন্দ ভারতবর্ষে ফিরিয়া রাষ্ট্রসংঘের বিবিধ বিষয়ে আলোচনা ও সমালোচনা করিতে এতটুকুও দ্বিধা বোধ করেন নাই। হয়তো ইহার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিলে এমনটি করা সম্ভব হইত না। এই সময়ের মধ্যে তিনি ইটালি জার্মানী ফ্রান্স ও ব্রিটেন পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা প্রবাসীতে প্রকাশিত 'সম্পাদকের চিঠি' নামক ধারাবাহিক লেখায় বিধৃত রহিয়াছে। রামানন্দ ইহার পর আর নিরালায় বসিয়া রহিলেন না। তিনি 'সাধারণের মানুষ' (public man) হইয়া

ভারতবাসীর কল্যাণকর নানা উদ্যোগে যোগদানের জন্য যেখান হইতে আমন্ত্রণ আসিয়াছে সেখানেই যাইতে তৎপর হন।

পূর্বে প্রবাসীতে প্রবাসী বাঙালির কথা বিস্তর বাহির হইত। মডার্ণ রিভিউতে মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের বিষয় এবং এই জন্য তাঁহার ও তদীয় সহকর্মী নারী পুরুষের অপূর্ব আত্মত্যাগ দুঃসাহসিক কার্যকলাপ ও অশেষ দুঃখবরণ সম্বন্ধে মডার্ন রিভিউতে সচিত্র প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ১৯২৭ সন নাগাদ বহির্ভারতে প্রবাসী ভারতীয়দের বিষয় রীতিমত আলোচনার নিমিত্তও তিনি ব্যবস্থা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। বিশাল ভারত নামক হিন্দি মাসিক পত্র তাঁহারই পরিচালনায় প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক পণ্ডিত বেনারসী দাস চতুর্বেদী *Indians Abroad* নামক মডার্ন রিভিউর একটি অধ্যায়ে বহির্ভারতে প্রবাসী ভারতীয়দের সম্বন্ধে প্রতিমাসে তথ্যভিত্তিক আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। প্রবাসী ভারতীয়দের দুঃখদুর্দশা সম্বন্ধেও ইহাতে বহু লেখা বাহির হইয়াছিল এবং তাহাতে ফলোদয়ও হইয়াছিল।

রামানন্দ শুধু পত্রিকা সম্পাদনা বা পরিচালনা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ও শিল্পসাহিত্য-শিক্ষা-বিষয়ক গ্রন্থাদি প্রকাশ করিয়া একটি উন্নত ধরণের জাতীয় সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে প্রয়াসী হন। এই কার্যে তাঁহাকে কোনো কোনো সময়ে বিপদের সম্মুখীন হইতেও হইয়াছিল। তিনি ১৯২৮ সনে ডক্টর জ্যাবেস. টি. সাণ্ডারল্যাণ্ড লিখিত *India in Bondage* নামক বিখ্যাত গ্রন্থ নিজ দায়িত্বে প্রকাশিত করিলেন। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইতেই তাঁহার উপর সরকারী কোপ পড়িল। পুস্তকখানি বাজেয়াপ্ত হইয়া প্রচার নিষিদ্ধ তো হইলই, উপরন্তু মুদ্রাকর ও প্রকাশকরূপে সজনীকান্ত দাস এবং প্রতিষ্ঠানের সত্ত্বাধিকারীরূপে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অভিযুক্ত হইলেন। কয়েক সহস্র টাকা জরিমানা করিয়া তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

একটু আগেই বলিয়াছি রামানন্দ তখন হইতে সাধারণের মানুষ হইয়াছেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে নিখিল ভারত হিন্দুমহাসভার সুরাট অধিবেশনে সভাপতি-পদে বৃত করা হইল। সভাপতির অভিভাষণে রামানন্দ দেখাইলেন যে, হিন্দুমহাসভার আদর্শ ও লক্ষ্য জাতীয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষে উদ্ভূত বিভিন্ন ধর্মের অনুবর্তীদের লইয়াই এই সভা, কাজেই (ব্যাপক অর্থে) হিন্দুস্থানের অধিবাসীদের ভিতরকার গলদ, কুসংস্কার ও অজ্ঞতা দূর করিয়া ইহাকে সুস্থ সংহত ঐক্যবদ্ধ করাই সভার লক্ষ্য। সভা অপরাপর ধর্মাশ্রয়ীদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে মিলিত হইতে পারিবে। এই দিক হইতে ইহা একটি অ সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানও বটে। রামানন্দ ইহার পরবর্তী কোনো কোনো নিখিল ভারত প্রতিষ্ঠানেরও সভাপতিত্ব করিয়াছেন,—যেমন অখিল ভারত মিত্র ও করদ রাজ্যের প্রজা সম্মেলন, জাত-পাত-তোড়ক সম্মেলন, সমাজসংস্কার সম্মেলন, একেশ্বরবাদী সম্মেলন প্রভৃতি।

১৯২৯ সন হইতে ভারতবর্ষে ভারতবাসীদের মধ্যে অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয়। রামানন্দ ১৯২৯ সনের লাহোর কংগ্রেসে ও ১৯৩১ সনের করাচী কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন (১৯৩০), দ্বিতীয় সত্যাগ্রহ আন্দোলন (১৯৩২-৩৪), নবোদ্ভূত বিপ্লববাদ (সরকারী পরিভাষায় সন্ত্রাসনবাদ), গোলটেবিল বৈঠক, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা, ভারত শাসন আইন (১৯৩৫), দ্বিতীয় মহাসমর (১৯৩৯), সীমিত সত্যাগ্রহ (১৯৪০-৪১), ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাব (১৯৪২), আগস্ট বিপ্লব (১৯৪২) প্রভৃতি জাতীয়

স্বাধীনতার অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয় সম্বন্ধে দায় ঝুঁকি মাথায় লইয়া লেখনী পরিচালনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ শতাব্দীর প্রথমাবধি ভারতের জাতীয়তা তথা স্বাধীনতা প্রচেষ্টার ধারাবাহিক ইতিহাসের আকর প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউর পৃষ্ঠায় সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে।

বিবিধ সভাসমিতি-সম্মেলনের কথা সামান্যমাত্র বলিয়াছি। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের রামানন্দ ছিলেন অন্যতম উদ্‌গাতা এবং প্রতিষ্ঠাবধি ইহার প্রধান প্রতিপোষক। রামানন্দ এই সম্মেলনের প্রায় সকল অধিবেশনেই যোগদান করিতেন— কখনও প্রধান সদস্য ও বক্তা, কখনও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, কখনও বা শাখা ও মূল সমিতির সভাপতি রূপে। তাঁহার ভাষণ ও উপদেশ প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রসারে বিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল। নারী জাতি, অনুন্নত সম্প্রদায়, কৃষক ও শ্রমিক সকলের অবস্থার উন্নতির জন্যই তাঁহার প্রাণস্পর্শী রচনা শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুকরণের যোগ্য। অধ্যাপক কার্ভের পুণা মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমাবর্তন-ভাষণে তিনি ভারতীয় নারী সমাজের বিবিধ সমস্যার বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন। শুধু সাহিত্য-সংস্কৃতি দ্বারাই একটা জাতি বড় হয় না। তাহার ধনসম্পদ বৃদ্ধি হওয়াও একান্ত আবশ্যক। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু এখানে ব্যাঙ্ক কলকারখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইলে জাতির ধনসম্পদ বৃদ্ধির উপায় হইবে এই জন্য এইসব প্রতিষ্ঠান হইতে যখনই ডাক আসিত রামানন্দ তখনই সানন্দে সাড়া দিতেন। তাঁহার পত্রিকা দুইখানিকে এই ধরণের আলোচনারও বাহন করিয়া লন।

আর-একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বর্তমান আলোচনা শেষ করিব। রামানন্দ নিষ্ঠাবান জাতীয়তাবাদী। যখনই এই জাতীয়তাবাদ তথা অখণ্ড ভারতের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হইবার কিছুমাত্রও আশঙ্কা দেখা দিয়াছে তখনই তিনি ইহার বিরুদ্ধে পত্রিকা দুইখানির মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। কংগ্রেস ভারতের প্রধানতম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং ইহার লক্ষ্য অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা। এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথে কংগ্রেস-পরিচালকগণের কার্যক্রমে বৈপরীত্য তাঁহাকে বড়ই পীড়া দিত। পূর্বেকার হিন্দু-মুসলিম চুক্তি, মি. জিন্নার মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা কল্পে প্রস্তাবিত ১৪ দফা দাবী, গোলটেবিল বৈঠকে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমানদের যোগসাজসে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত আত্যন্তিক জিদ, প্রধানমন্ত্রী মি. ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা প্রভৃতির কঠোর সমালোচনা ও তীব্র নিন্দা রামানন্দ পত্রিকার পৃষ্ঠায় করিয়াছেন। কিন্তু যখন দেখিলেন সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার ভিত্তিতে রচিত ভারত শাসন আইন (১৯৩৫) সম্পর্কে মুসলমানদের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত 'না-গ্রহণ না-বর্জন'-নীতি কংগ্রেস অবলম্বন করিয়াছেন তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, নরসিংহ চিন্তামন কেলকার, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ বিভিন্ন বিভাগের মনীষী-নেতৃবৃন্দের সঙ্গে রামানন্দ মিলিত হইলেন এবং কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী সম্মেলনের উদ্যোগ করিয়া কংগ্রেসের এই কার্যের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতের জাতীয়তাবাদীদের মর্মবেদনা স্বদেশবাসী এবং বিশ্ববাসীকে জানাইলেন। এই উপলক্ষে বিভিন্ন প্রদেশ ও স্থলে অনুষ্ঠিত সভাসমিতিতেও রামানন্দ যোগ দিয়া কংগ্রেস-নীতির অদূরদর্শিতা এবং ভাবী কুফলসমূহের বিষয় সম্পর্কে সাধারণকে সাবধান করিয়া দেন। তিনি অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। বিভেদের ভিত্তিতে রচিত ভারত শাসন আইন যে একদিন মুসলমান এবং হিন্দুজাতির মধ্যে পুরাপুরি বিচ্ছেদও ঘটাইতে পারে—এরূপ ভাবনায় তাহাকে বিচলিত

করিয়াছিল। সম্প্রদায় বিশেষের আপত্তি হেতু যখন আমাদের 'বন্দেমাতরম্' জাতীয় সংগীতটি ছাঁটাই করিবার প্রস্তাব হয় তখনও রামানন্দ এক প্রতিনিধি-দলের নেতারূপে মহাত্মা গান্ধীর নিকট ইহার অযৌক্তিকতা ব্যক্ত করেন এবং বন্দেমাতরম্ সংগীতটি জাতীয় সংগীতরূপে যে পুরাপুরি গ্রহণ করা উচিত এবিষয়ে তাঁহাদের দৃঢ়মত জানাইলেন।

রামানন্দ ১৯৪২ সনের শেষ নাগাদ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। ক্রমেই বুঝা গেল এই ব্যাধি হইতে তাঁহার আর নিস্তার নাই। বাংলা দেশের বিভিন্ন সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান তাঁহার বাসস্থানে গিয়া বিভিন্ন সময়ে তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, বিশ্বভারতী, ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সংঘ, কলিকাতার নাগরিকবৃন্দ প্রভৃতির পক্ষে মানপত্র দেওয়া হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি অল্পসল্প কথায় মানপত্রের উত্তর দেন। ভারতবাসীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকামী, অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা পূজারী, চিন্তানায়ক ও কর্মবীর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৩ ইহধাম ত্যাগ করেন। এরূপ একটি কীর্তিমান জীবনের কথা সামান্যতঃ আলোচনা করিয়াও আমরা আজ ধন্য।

চর্যাচর্যবিনিশ্চয় পুথির কয়েকটি অক্ষর

তারাপদ মুখোপাধ্যায়

১

'বৌদ্ধগান ও দোহা'র ভূমিকায় চর্যাচর্যবিনিশ্চয় পুথির লিপিকাল ও লিপিবৈশিষ্ট্য[১] সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কোনো অভিমত প্রকাশ করেন নি ; তবে ঐ বই-এর পঁচিশ পৃষ্ঠায়[২] একটি মন্তব্য আছে—

> পোই এই দুটি অক্ষরের পর একটি আ বার শতাব্দীর বাঙ্গালা অক্ষরে উপরে তুলিয়া দেওয়া আছে।

এই মন্তব্য থেকে অনুমান করা যায় যে শাস্ত্রীর ধারণা ছিল পুথির লিপিকাল দ্বাদশ শতক। আর এক জায়গায় চর্যার পুথি সম্বন্ধে শাস্ত্রী বলেছেন,[৩]

> ···যে পুথিগুলি [চর্যা ও দোহার পুথি] পাইয়াছি সেগুলি মুসলমান আমলেরও পূর্বে লেখা। পুথিগুলি পাকান তালপাতায় লেখা ; সে তালপাতা প্রায় কাগজের মত। আর অক্ষর সেই সেকালের বাঙ্গালা। পুথিগুলিতে তারিখ নাই। কিন্তু ঐ কালের যে সমস্ত তারিখওয়ালা পুথি আছে তাহার সহিত ইহাদের বেশ মিল আছে।

আরও এক জায়গায় শাস্ত্রী বলেছেন,[৪]

> এ ['চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'] পুথির অক্ষরগুলি ১২ শতকের গোড়ার।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় চর্যাগীতির পুথি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির চেয়ে পুরাণো নয় বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন।[৫]

> উহা [শ্রীকৃষ্ণকীর্তন] বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত অদ্যাবধি আবিষ্কৃত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুরাতন। বাঙ্গালাভাষায় লিখিত "চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়" প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ

---

১. 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'-র ভূমিকায় লিপিবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোনো আলোচনা না থাকলেও 'প্রাচীন বাংলা অক্ষর' নামক প্রবন্ধে (দ্রষ্টব্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী' প্রথম সম্ভার, ১৯৫৬, পৃ. ৩০১) চর্যার পুথির লিপি সম্পর্কে নিম্নউদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে।

"ইহার 'প' অনেকটা এখনকার 'প'-য়ের মত হইয়া আসিয়াছে অর্থাৎ 'প'-এর টাঙ্গির মত যে মুখ আছে তাহার নীচের রেখাটি 'প'-য়ের দাঁড়িটার তলা পর্যন্ত যায় না, মাঝামাঝি পর্যন্ত যায়।···'ষ'-য়ের আর সেরূপ পেট মোটা নাই, পেটটা পড়িয়া গিয়াছে। সব তেকোনা অক্ষরেরই কোনগুলা বেশ স্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। 'র' 'ব' ঠিক তেকোনা হইয়া উঠিয়াছে। 'ধ'-য়ের মাথায় একটু বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়।"

বিবরণ সংক্ষিপ্ত বটে, তবে চর্যার পুথির লিপি সম্পর্কে এই একমাত্র বিবরণ— পুথির প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ— তাই মূল্যবান্।

২. 'বৌদ্ধ গান ও দোহা', প্রথম সংস্করণ, ১৩২৩

৩. 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী', প্রথম সম্ভার, পৃ. ২৪১

৪. 'হরপ্রসাদ রচনাবলী', প্রথম সম্ভার, পৃ. ৩০১

৫. বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' (১৩২৩) গ্রন্থে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপিকাল', পৃ. /০

শাস্ত্রী সি. আই. ই কর্তৃক নেপালে আবিষ্কৃত গ্রন্থসমূহ, রচনাকাল হিসাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অপেক্ষা প্রাচীন। কিন্তু পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত গ্রন্থসমূহের যে পুথিগুলি আনাইয়াছেন, তাহা কৃষ্ণকীর্তন অপেক্ষা প্রাচীন কিনা সন্দেহ।

বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপিকাল "১৩৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে, সম্ভবত খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে"।[৬] কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল সম্পর্কে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃসংশয় নন্। তিনি একবার বলেছেন লিপিকাল চতুর্দশ শতক[৭], আর একবার বলেছেন পঞ্চদশ শতক[৮]। কোন্‌টি তাঁর আসল মত বলা শক্ত। আসল মত যদি পঞ্চদশ শতক হয় তাহলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যখন, তাঁর অনুমানে, চর্যার চেয়ে পুরাণো তখন চর্যার পুথির লিপিকাল রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ষোড়শ শতকের আগে নয় বলেই বুঝতে হবে।

সুকুমার সেন-এর অনুমান চর্যার পুথি "চতুর্দশ হইতে ষোড়শ শতাব্দের মধ্যে অনুলিখিত।"[৯]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুকুমার সেন—এঁদের অনুমান থেকে জানা যাচ্ছে যে চর্যাচর্যবিনিশ্চয় পুথিখানির লিপিকালের ঊর্ধ্বসীমা দ্বাদশ শতক, নিম্নসীমা ষোড়শ শতক।

২

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন চর্যার পুথির লিপি বাংলা। তথাপি অনেকের ধারণা পুথিখানির লিপি বাংলা নয়, নেওয়ারী। পুথিতে নেওয়ারী অক্ষরে সংশোধনের চিহ্ন আছে, সে-কথাও শাস্ত্রী বলেছেন; কিন্তু মূল পুথিখানি যে বাংলা অক্ষরে লেখা সে-সম্পর্কে শাস্ত্রীর মনে কোন সংশয় ছিল না। যাঁরা শাস্ত্রীর মন্তব্য না দেখে বা অগ্রাহ্য করে নেওয়ারী অক্ষরের কথা বলেছেন তাঁদের কেউ-ই অবশ্য মূল পুথি চোখে দেখেন নি। সম্ভবত পুথি নেপালে পাওয়া গিয়েছে বলেই নেওয়ারী লিপি এবং নেওয়ার লিপিকারের কথা উঠেছে।

নেওয়ারী অক্ষর বলতে আমরা যা বুঝি তার উদ্ভবের এবং বিবর্তনের আলাদা কোনো ইতিহাস নেই, তা নাগরী বা বাংলা অক্ষরেরই স্থানীয় প্রকারভেদ। এ-সম্পর্কে Bendall-এর উক্তি[১০] প্রণিধানযোগ্য—

> The Nepalese must not, then, be regarded as a district and original development of the Indian alphabet in the same sense that Bengali, for instance, is so.

প্রাচীন নেওয়ারী অক্ষর মূলত নাগরী বা বাংলা—এ কথা স্মরণ রেখেও নিঃসংশয়ে বলা চলে যে চর্যার

---

৬. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপিকাল', পৃ. ।৶০

৭. "...the script makes it impossible to assign the ms. [শ্রীকৃষ্ণকীর্তন] to any date later than the 14th Century A.D." *The Origin of the Bengali Script,* ১৯১৯ পৃ. ৪

৮. "...*Krsn-Kīrtana* of Candīdāsa which is certainly not later than the 15th Century A.D." *The Origin of the Bengali Script.* পৃ. ৮৯

৯. 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃ. ৫০

১০. C. Bendall, *Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts,* পৃ. xxvii

পুথির অক্ষর নেওয়ারী নয়, বাংলা[১১]। নেপালে পাওয়া গেছে বলেই চর্যার পুথির লিপিকর নেওয়ার এবং লিপি নেওয়ারী হবেই এমন অনুমান করবারও কোনো কারণ নেই। বাংলা অক্ষরে লেখা বহু পুথি নেপাল থেকে পাওয়া গেছে। যেমন, বোধিচর্যাবতার, অষ্টশাহ্বিকা, কালচক্রতন্ত্র ইত্যাদি।

এক সময় নেপালে বহু বাঙালির বাস ছিল, তাঁরা বাংলা অক্ষরে পুথিও লিখতেন।[১২] সুতরাং নেপালে বাংলা অক্ষরে বাঙালি লিপিকরের লেখা পুথির অস্তিত্ব অভাবিত ব্যাপার নয়।

আবার, চর্যার পুথি যে নেপালেই লেখা হয়েছে এমন নিশ্চিত প্রমাণ কি পাওয়া গেছে? পুথি যে বাংলা দেশ থেকে নেপালে যায় নি, তার প্রমাণ কি? মুসলমান আক্রমণের সময় বাংলাদেশের বহু পুথি নিরাপদ-স্থান নেপালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল—এ কাহিনীকে কিম্বদন্তী মনে করবার কারণ নেই। Bendall বলেছেন,[১৩]

> ...both Dr. Wright and Mr. Hodgeson found in Nepal Mss. actually written in Bengal.

সুতরাং নিশ্চিত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত চর্যার পুথি নেপালে লেখা হয়েছিল এবং নেওয়ারী লিপিকর লিখেছিলেন—এ ধারণা পরিত্যাজ্য।

৩

চর্যার পুথির লিপিকাল জানা যায় নি বটে তবে তারিখওয়ালা অনেক পুথির অক্ষরের সঙ্গে চর্যার পুথির অক্ষরের মিল আছে। সবচেয়ে বেশি মিল আছে ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত পঞ্চাকার[১৪] পুথির সঙ্গে।

---

১১. চর্যার পুথির প্রায় সব অক্ষরকেই বাংলা অক্ষরের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া যায়; কোনো কোনো অক্ষরের সঙ্গে নগরী অক্ষরেরও মিল আছে। এই মিল প্রাচীন যুগের বাংলা লিপিতে প্রত্যাশিত। তথাপি প্রাচীন বাংলা লিপি এবং প্রাচীন নাগরীর পার্থক্যটি সুস্পষ্ট। এই পার্থক্যের কথা Burnell এইভাবে বলেছেন,

> "The last [*Gauḍī* or *Bengali*] is chiefly distinguished from the other types by the way of marking secondary *e* and *o*, which is done by a perpendicular stroke before the consonant in the case of *e*, and by a similar stroke before and another after the consonant in the case of *o*, and this is, very nearly, the actual Bengali system. The other types marks these vowels in the same way as is done by the ordinary Nāgarī Alphabet." A. C. Burnell, *Elements of South Indian Palaeography*, ১৮৭৮ পৃ. ৫৩

১২. 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী', প্রথম সম্ভার, পৃ. ২৪২

১৩. Bendall, *Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts*, পৃ. xx

১৪. এই পুথির বিবরণ আছে Bendall-এর *Catalogue*-এর ১৮৯-১৯০ পৃষ্ঠায়। পুথির সংখ্যা Add, 1699; পুথিখানি সম্পর্কে Bendall-এর মন্তব্য এই—

> "This number [Add. 1699] Consists of three works and a fragment, written by one scribe, Kāśrīgayākāra, in three successive years (1198-1200 A.D.) in the Bengali character, forming the earliest example of that writing at present found."

এই পুথিখানির Bendall-কৃত লিপি-সংক্রান্ত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য *Journal of the Palaeographical Society* (*Oriental Series*), ১৮৭৩-১৮৮৩ পৃঃ

এই পুথিখানির অক্ষর আর চর্যাচর্যবিনিশ্চয় পুথির অধিকাংশ অক্ষর হুবহু এক তো বটেই, লেখার ধাঁচও এক। নেপালে পাওয়া অধিকাংশ পুথির অক্ষর খাড়া খাড়া, এই পুথিদুখানির অক্ষরগুলি একটু ডান দিকে হেলানো। লিপিকরের হস্তাক্ষর সুন্দর নয়, বিশেষত চর্যাচর্যবিনিশ্চয় পুথির লিপিকরের। অক্ষরের আকারে সমতা নেই। অক্ষরগুলির মধ্যে বেশ অনেকখানি করে ফাঁক আছে। দুখানি পুথি-ই মোটা কলমে লেখা।

এই আলোচনায় পঞ্চাকার এবং চর্যাচর্যবিনিশ্চয়[১৫] পুথির কয়েকটি অক্ষর পাশাপাশি রেখে এদের সাদৃশ্য দেখাতে চেষ্টা করব এবং আরও কয়েকখানি বাংলা পুথির (বিশেষত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) অক্ষরের সঙ্গে চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথির অক্ষরের সাদৃশ্যের কথাও প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়বে। বিশেষ করে পঞ্চাকার পুথিখানি নির্বাচন করবার কারণ এই—পুথিখানি তারিখওয়ালা এবং চর্যার পুথির অক্ষরের সঙ্গে এই পুথির অক্ষরগুলির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য।

৪

অক্ষরগুলির আকার পরীক্ষা করবার আগে বাংলা অক্ষরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির নাম ঠিক করে নেওয়া দরকার, নতুবা কোন শব্দ দিয়ে অক্ষরের কোন অংশটি আমি নির্দেশ করেছি তা বোঝা শক্ত হতে পারে।

অনেকগুলি অক্ষরকে বাঁ এবং ডান— এই দুটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। বাঁ অংশটির গুরুত্বই সর্বাধিক, কারণ বাঁ অংশের গঠনের পরিবর্তনেই অক্ষরের পরিবর্তন। ডান অংশ প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দাঁড়ি। যেমন, 'ব' অক্ষরটির মাত্রা বাদ দিলে এই কোণাকার অংশটি বাঁ, দাঁড়িটি ডান অংশ। অনেকগুলি অক্ষরে ডান এবং বাঁ-অংশের মধ্যে একটি যোজক-রেখা আছে। 'অ' অক্ষরটির ডান-বাঁ-অংশ এবং "যোজক" আলাদা করে দেখাচ্ছি—

এখানে আধুনিক বাংলার '৩'-এর মত অংশটি বাঁ, দাঁড়িটি ডান অংশ এবং এই দুই অংশের মধ্যবর্তী নিম্নমুখী রেখাটি "যোজক"।

যোজক মাত্রার সঙ্গে সমান্তরাল হতে পারে— , অধবৃত্তাকার হতে পারে— আবার নিম্নগামীও হতে পারে—

অক্ষরের বাঁ অংশ ডান অংশের যে-জায়গায় মিলিত হয় তার নাম "সংযোগ"। সংযোগ উঁচুতে হতে পারে— , মাঝে হতে পারে , নীচেয় হতে পারে—

এই আলোচনাতেই পরে দেখতে পাওয়া যাবে যে সংযোগের উচ্চ/মধ্য/নীচ অবস্থানের সঙ্গে বাংলা লিপির বিবর্তনের যোগ আছে।

১৫. 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' পুথির ছবি শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন-এর সৌজন্যে ব্যবহার করতে পেরেছি।

আধুনিক বাংলার অনেকগুলি অক্ষরের ভিত্তি বাঁ-অংশে সূক্ষ্ম 'কোণ' < এবং ডান অংশে দাঁড়ি । বাঁ অংশের ঈষৎ পরিবর্তন করে অনেকগুলি অক্ষর গঠিত। যেমন,

থ থ ঘ ম ঋ ধ ব র য ষ

সুতরাং বাংলা অক্ষরের বাঁ অংশের বিশেষ গুরুত্ব। 'কোণ' সূক্ষ্ম হতে পারে (যেমন উপরের অক্ষরগুলিতে) আবার অর্ধবৃত্তাকার হতে পারে— **থ ব**

অনেকগুলি বাংলা অক্ষরে বামাংশ এবং নিম্নাংশ যেমন কোণাকার, তেমনি আরও কতকগুলি অক্ষরের নিম্নাংশ অর্ধবৃত্তাকার—**ত ভ ড জ অ**

সুতরাং এই অক্ষরগুলির নিম্নাংশ বোঝাতে অর্ধবৃত্তাকার আঁকুড়ি কথাটি ব্যবহার করেছি। এ-ছাড়া শাস্ত্রীয় ব্যবহৃত 'চৈতন' এবং 'বাড়ী'ও ব্যবহার করেছি।

আধুনিক বাংলার 'ল'-এর বামাংশকে m বাঁক বলেছি। 'ল'-এ দুটি বাঁক আছে, 'ন'-তে একটি বাঁক। 'ড'-এর সঙ্গে 'জ'-এর পার্থক এই রেখাটিতে ㄱ -একেও 'কোণ' বলা যেতে পারে। তবে আমি একে 'বাহু' বলেছি।

৫

স্বরবর্ণ : আদ্যাক্ষরে : অ

নবম শতকের মাঝামাঝি সময় লেখা (৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দ) পারমেশ্বরতন্ত্র[১৬] নামে একখানি পুথিতে দেখা যায় 'অ'-এর বামাংশটির একাধিক ভাগ ছিল। উপরের ভাগে ছোটো একটি ত্রিভুজ, নীচে অর্ধবৃত্তাকার আঁকুড়ি ʕ এই দুটি ভাগকে যুক্ত করেছে মাত্রার সঙ্গে সমান্তরাল 'যোজক' **অ**

পঞ্চাকার-এর সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, নবম শতকের 'অ' ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে (তুলনীয় পঞ্চাকার (১১৯৯) পুথির 'অ') অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছে। বামাংশের উপরিভাগের ত্রিভুজটি লুপ্ত প্রায়, লুপ্তচিহ্নস্বরূপ মাত্রা থেকে একটি ছোটো রেখা নীচে নেমে এসে আঁকুড়ির মাথার উপর বসেছে। আঁকুড়িটি নবম শতকে ক্ষীণকায় ছিল, ত্রয়োদশ শতকে আকার বিস্ফারিত হয়েছে। 'সংযোজক' নবম শতকে ছিল মাত্রার সমান্তরাল এবং 'সংযোগ' ছিল মাঝারি। ত্রয়োদশ শতকে 'সংযোজক' নিম্নমুখী এবং 'সংযোগ' নীচু। চর্যার পুথির 'অ' আর পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির 'অ' আকারে প্রায় এক। পার্থক্যের মধ্যে চর্যার পুথিতে 'সংযোজক' নিম্নমুখী নয়, আবার পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির মত স্পষ্ট সমান্তরালও নয়— এই দু'য়ের মাঝামাঝি। 'সংযোগ' অবশ্যই

---

১৬. Bendall, *Catalogue*, পৃ: ২৭ ; *Palaeographical Society* (Oriental Series), plate xciii

পঞ্চাকার পুথির মতো নীচু নয়, একটু উঁচুতে। চর্যার পুথিতে দক্ষিণাংশের আঁকুড়িটি তেমন সুডোল এবং সুপুষ্ট নয়, আঁকুড়ির লেজটি মাঝ পথে ঠিক কাটা না পড়লেও পঞ্চাকার পুথির 'অ'র মতো লেজটি মাথায় ওঠে নি। সেইকারণে চর্যার পুথিতে 'অ' এবং 'ম' অক্ষরের মধ্যে গোলমাল হয়। চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথির কোনো কোনো 'অ'-এর দক্ষিণাংশের নীচে ত্রিভুজ আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিতে 'সংযোজক' অর্ধ-বৃত্তাকার এবং সংযোজকের উৎপত্তি আঁকুড়ির নিম্নদেশ থেকে। 'সংযোগ' নীচু-ই বলতে হবে। সংযোজকের অর্ধবৃত্তাকার দেখে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির 'অ' অক্ষরটিকে প্রাচীন বলে অনুমান করেছিলেন। এখানে বলা দরকার অর্ধবৃত্তাকার 'সংযোজক' কেবলমাত্র পুথির প্রথমাংশেই পাওয়া গেছে। 'অ' অক্ষরে অর্ধবৃত্তাকার 'সংযোজক' দ্বিতীয় কোনো বাংলা পুথিতে পাওয়া যায় নি, সুতরাং এটা প্রাচীন কি আধুনিক বুঝবার উপায় নেই। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্য অক্ষরগুলি দেখলেই বোঝা যায় 'কোণ'-কে অর্ধবৃত্তাকার করা লিপিকরের বৈশিষ্ট্য। 'ক', 'খ', 'ধ', 'ব' প্রভৃতি অক্ষরের 'কোণ'গুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকর কলমটিকে ঘুরিয়ে অর্ধবৃত্তাকৃতি করেছেন— এটি যে বাংলা অক্ষরের প্রকারভেদ নয়, লিপিকরের বৈশিষ্ট্য, তা বোঝা যায় এই থেকে যে কোণাকার 'ব' এবং অর্ধবৃত্তাকার 'ব' পুথির একই জায়গায় পাশাপাশি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সম্ভবত লিপিকর সাজিয়ে লিখতে গিয়ে 'কোণ'গুলি অর্ধবৃত্তাকার করেছেন। আধুনিক কালেও সাজিয়ে লিখতে গিয়ে কেউ কেউ এমন করে থাকেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যাবতীয় অর্ধবৃত্ত-কে লিপিকরের বৈশিষ্ট্য বলতে হবে।

নীচে বিভিন্ন পুথির 'অ' অক্ষরটি দেখানো হল।

পারমেশ্বরতন্ত্র চর্যা পঞ্চাকার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

আ

পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে 'আ'র দীর্ঘত্ব দেখানো হয়েছে অক্ষরের নীচে পঞ্চাকার এবং চর্যার পুথিতে আধুনিক বাংলার মতো 'অ'-এর ডান পাশে দাঁড়ির মতো রেখা দিয়ে দীর্ঘত্ব দেখানো হয়েছে। এই দুখানি পুথিতেই 'অ' 'আ' আকারে এক, পার্থক্যের মধ্যে 'আ'-য় দাঁড়ি আছে।

ই

পারমেশ্বরতন্ত্রে 'ই' অক্ষরটির আকার দুটি বিন্দুর নীচে আঁকুড়ি চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথির 'ই' এক।

চর্যার 'ই'— , পঞ্চাকারের 'ই'— । পার্থক্যের মধ্যে চর্যার কোনো কোনো 'ই'-র ডান অংশ বাঁ-অংশের সঙ্গে যুক্ত নয়। চর্যা ও পঞ্চাকার পুথির 'ই'-র আকার বিচিত্র। Bhuler এই 'ই'-তে দক্ষিণ ভারতীয় লিপির প্রভাবের কথা বলেছেন। এই 'ই'-র সঙ্গে পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির 'ই' এবং আধুনিক বাংলা 'ই'-র সাদৃশ্য নেই বলা চলে।

পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময় (১৪৪৬) নকল করা কালচক্রতন্ত্র[১৭] এবং বোধিচর্যাবতার (১৪৩৫) পুথিতেই 'ই' পাওয়া যাচ্ছে আধুনিক বাংলার 'উ' র মতো, এমন কি মাথায় চৈতনও আছে—

আধুনিক বাংলার মত 'ই' দেখতে পাওয়া গেল পঞ্চদশ শতকের শেষে (১৪৮৯) নকল করা ধর্মরত্ন[১৮] পুথিতে—

এই পুথির 'ই' দেখে অনুমান করা চলে এর পূর্বরূপটি দেখতে পাওয়া গেছে কালচক্রতন্ত্র পুথিতে। ধর্মরত্ন পুথির 'ই'-কে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—১. চৈতন, ২. আধুনিক বাংলার 'ড'-এর মতো মধ্যাংশ, ৩. নিম্নমুখী রেখাটি।

কালচক্রতন্ত্র পুথিতে তৃতীয়াংশ অর্থাৎ নিম্নমুখী রেখাটি ছিল না। এবং মধ্যাংশের 'ড'-টির আকার বৃহৎ ছিল। ধর্মরত্ন পুথিতে মধ্যাংশের 'ড'-এর আকার কৃশ হয়েছে এবং 'ড'-এর লেজের কিছুটা কাটা পড়েছে; তবে তৃতীয়াংশের ঊর্ধভাগ 'ড'-এর সঙ্গে যুক্ত না হয়েও লেজের কাজ করছে। ধর্মরত্ন পুথির 'ই' থেকে তৃতীয়াংশ অর্থাৎ নিম্নমুখী রেখাটি বাদ দিলে যা থাকে তা কালচক্রতন্ত্র পুথির 'ই'।

কালচক্রতন্ত্র, ধর্মরত্ন, এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—এই তিনখানি পুথির 'ই' পাশাপাশি রেখে তুলনা করলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'ই' অন্য দুখানি পুথির 'ই'-র তুলনায় আধুনিক মনে হবে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'ই'-র মধ্যাংশ প্রায় আধুনিক হয়ে এসেছে 'ড'-এর আকার আর নেই, যদিও তৃতীয়াংশ মধ্যাংশের সঙ্গে যুক্ত হয় নি। তুলনার জন্য এই তিনখানি পুথির 'ই' পাশাপাশি রাখা হল।

কালচক্রতন্ত্র ধর্মরত্ন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

ধর্মরত্ন এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির 'ই' অল্পবিস্তর পরিবর্তিত অবস্থায় ষোড়শ শতকের একাধিক পুথিতে পাওয়া গেলেও চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথির 'ই' এই সময়কার অন্য কোনো পুথিতে পাওয়া যাচ্ছে না। এই 'ই' বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত কিনা বলা শক্ত। তবে এ-কথা ঠিক আধুনিক বাংলা 'ই'-র সঙ্গে এর সাদৃশ্য নেই। পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির 'ই'-র আঁকুড়িটি সম্ভবত ধর্মরত্ন এবং কালচক্রতন্ত্র 'ই'-র মধ্যাংশ। এই আঁকুড়িটি সম্ভবত পরে 'ড'-এর আকার নিয়েছিল। এবং 'ড'-এর লেজ কাটা গিয়ে এবং নিম্নমুখী রেখাটি যুক্ত হয়ে আধুনিক বাংলার 'ই'-র রূপ নিয়েছিল। এ-সমস্ত অনুমানের কথা। কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে আধুনিক বাংলায় 'ই' প্রকারান্তে 'হ', কেবল 'হ'-এর মাথায় চৈতন নেই। তবে 'হ' এবং 'ই' আধুনিক কালে প্রায় অভিন্ন হলেও অক্ষর দুটির বিবর্তনের ইতিহাস আলাদা। এ-কথা বলা চলে না যে কোনো একসময় 'হ'-এর মাথায় চৈতন জুড়ে দিয়ে 'ই' করা হয়েছে।

---

১৭. *Palaeographical Society* (Oriental Series) plate xxiii.

১৮. Rajendra Lal Mitra, *Notices of Sanskrit Manuscripts,* volume V, Plate II.

উ

পঞ্চাকার এবং চর্যা-র পুথির ‘উ’ এক। অক্ষরটি দেখতে আধুনিক বাংলার ‘ড’-এর মতো— মাথায় চৈতন নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির ‘উ’-র মাথায়ও চৈতন নেই, সেখানেও অক্ষরটির আকার আধুনিক বাংলা ‘ড’-এর মতো। এই রকম চৈতনহীন ‘উ’ অষ্টাদশ শতকে লেখা পুথিতেও পাওয়া যায় (যদিও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চৈতনহীন ‘উ’-কে পুথির প্রাচীনত্বের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন); সুতরাং বলতে হবে দীর্ঘকাল যাবৎ এই অক্ষরটির আকারের কোনো পরিবর্তন হয় নি।

এ

পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে ‘এ’ ত্রিভুজাকার।

পঞ্চাকার পুথিতে অক্ষরটির ত্রিভুজাকার সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি, কেবল বাঁদিকের উপরের কোণটি খুলে গেছে। ডানদিকে উপরে ও নীচে তখনও কোণ আছে। ত্রিভুজের বাঁ বাহুটি ভূমিতে নেমে আসে নি। সে-তুলনায় চর্যার পুথির ‘এ’ অনেকটা আধুনিক। অক্ষরের উপরের দিকটা ছাতার বাঁটের মতো বাঁকানো, নীচের দিকটা প্রায় ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল, তবে ঢেউ খেলানো নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ‘এ’ আর চর্যার পুথির ‘এ’ এক রকম।
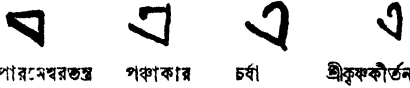
চর্যা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মিতাক্ষরা[১৯] (১৫০৬) ইত্যাদি পুথির ‘এ’ অক্ষরে কোনো পার্থক্য নেই। একমাত্র কালচক্রতন্ত্র পুথিতে ‘এ’-র নিম্নবাহু দাঁড়ির মাঝামাঝি জায়গা থেকে বেরিয়েছে, অন্যান্য পুথির মতো নীচু থেকে বেরয় নি। কালচক্রতন্ত্র পুথির ‘এ’ এই রকম—

ঐ

আধুনিক বাংলাতেও ‘এ’ এবং ‘ঐ’ আকারে প্রায় অভিন্ন, পার্থক্যের মধ্যে ‘ঐ’-র মাথায় চৈতন আছে। পারমেশ্বরতন্ত্রেও ‘এ’ ‘ঐ’-র পার্থক্য কেবল চৈতনে। পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে ‘ঐ’-র চৈতন উঠেছে ত্রিভুজের ডানদিকে উপরের কোণ থেকে। পঞ্চাকার পুথিতেও চৈতন ডানদিকের কোণ থেকে উঠেছে, যদিও কোণ প্রায় বাঁকের আকার নিয়েছে। চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথির ‘ঐ’ এক আকারের।

পারমেশ্বরতন্ত্র ‘পঞ্চাকার

১৯. Rajendra Lal Mitra, *Notices of Sanskrit Manuscripts*, Vol. V, plate III.

ও।ঔ

চর্যা-র পুথিতে আদ্যাক্ষরে 'ও' এবং 'ঔ' আমি দেখি নি, কারণ গোটা পুথির ছবি আমি পাই নি। তবে অনুমান করতে পারি চর্যা-র পুথির 'ও' এবং 'ঔ' পঞ্চাকার পুথি থেকে পৃথক নয়। আধুনিক বাংলার মতো 'ও' পারমেশ্বরতন্ত্র এবং পঞ্চাকার পুথিতে পাওয়া যাচ্ছে।

পারমেশ্বরতন্ত্র পঞ্চাকার

'ঔ'-র আকার প্রায় 'ও'-র মতো, পার্থক্য শুধু চৈতনে। পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে 'ঔ'-র চৈতন নেই, তবে ডানদিকে একটি কোণাকার রেখা আছে। পঞ্চাকার পুথিতে সেই কোণাকার রেখাটিকেই চৈতনে পরিণত করা হয়েছে।

পারমেশ্বরতন্ত্র পঞ্চাকার

পদমধ্যস্থিত স্বরবর্ণ

আ

পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে আদ্যাক্ষরে 'অ'-এর নীচে আঁকুড়ি দিয়ে দীর্ঘত্ব দেখানো হলেও, পদমধ্যস্থিত 'আ' আধুনিক বাংলার মতো দাঁড়ি দিয়ে দেখানো হয়েছে। চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথিতেও পদমধ্যস্থিত 'আ' ব্যঞ্জনের ডানদিকে দাঁড়ি।

ই

চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথির অক্ষরের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পদমধ্যস্থিত 'ই'। চর্যার পুথিতে পদমধ্যস্থিত 'ই' আধুনিক বাংলার মতো। ব্যঞ্জনের বাঁদিকে দাঁড়ি এবং দাঁড়ির মাথায় ছত্রাকার একটি রেখা। চর্যার পুথিতে কখনও কখনও মনে হয় দাঁড়ি এবং ছত্রাকার রেখাটি কলমের একটি টানে লেখা হয়েছে। পঞ্চাকার পুথিতে ছত্রাকার রেখাটি আছে কিন্তু দাঁড়িটি নেই। যেমন নীচের 'অমিতাভ' শব্দটিতে।

Bendall-এর মতে[২০] পদমধ্যস্থিত 'ই'-র এই আকার প্রাচীন। তবে চর্যার পুথির পদমধ্যস্থিত 'ই' পঞ্চাকার পুথিরও কয়েক জায়গায় দেখা যায়।

---

২০. "The writing is Bengali, with several antique features, e.g. medial *i* written simple curve above its consonants, not before it." Bendall, *Catalogue*, পৃ. ১০৬

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিতে পদমধ্যস্থিত 'ই'-র দাঁড়িটি আছে, ছত্রাকার ঊর্ধাংশটি অনেক জায়গায়, নেই যেখানে আছে সেখানেও ঠিক ছত্রাকারে নেই, প্রায় মাত্রার সঙ্গে মিলে আছে। মিতাক্ষরা পুথিতেও কয়েক জায়গায় ছত্রাকার ঊর্ধাংশটি মাত্রার সঙ্গে মিলে আছে। আবার কালচক্রতন্ত্র (১৪৪৬), শূদ্রপদ্ধতি (১৫১৪), শকুন্তলা (১৫৭১), ধর্মরত্ন (১৪৮৯), শিশুপালবধ (১৫১১) প্রভৃতি পুথিতে ছত্রাকার ঊর্ধরেখাটি বেশ স্পষ্ট। পারমেশ্বরতন্ত্র (৮৫৮ খ্রী:) পুথিতে পদমধ্যস্থিতই চর্যার মতো (পঞ্চাকার পুথির মতো নয়) এবং ছত্রাকার ঊর্ধাংশটি বেশ স্পষ্ট এবং ব্যঞ্জনের উপর অনেকখানি উঁচুতে উঠেছে। ১০৮৪ খ্রীষ্টাব্দে নকল করা 'শিষ্যালেখ'[২০] পুথিতেও (এ পুথিখানির অধিকাংশ অক্ষরগুলি নেওয়ারী) পদমধ্যস্থিত 'ই' পারমেশ্বরতন্ত্র এবং চর্যা-র মতো। সুতরাং আধুনিক বাংলায় প্রচলিত পদমধ্যস্থিত 'ই'—যা চর্যার পুথিতে পাওয়া যাচ্ছে—নবম শতকের পুথিতেও (পারমেশ্বরতন্ত্র) অবিকল সেই আকারে পাওয়া যাচ্ছে। তাই Bendall ঠিক কেন পঞ্চাকার পুথির পদমধ্যস্থিত 'ই'-কে প্রাচীন বলেছেন, বোঝা গেল না।

উ

আধুনিক বাংলায় পদমধ্যস্থিত 'উ' ব্যঞ্জনবর্ণ অনুসারে বিবিধ প্রকারের হয়ে থাকে, 'শু', 'কু', 'রু' ইত্যাদি তার দৃষ্টান্ত। চর্যার পুথিতেও এই রীতি।

চর্যার পুথিতে 'রু' আধুনিক বাংলার মতো। 'উ' যুক্ত হয়েছে 'র'-র ডান অংশের মাঝখানে, অন্যান্য অক্ষরের মতো ব্যঞ্জনের নীচে নয়। তবে 'উ'-র আকার আধুনিক বাংলার মতো উল্টো 'কমা' কিনা বলা শক্ত, সম্ভবত নয়। যতদূর মনে হয় মাত্রার সঙ্গে সমান্তরাল একটি রেখা বেরিয়ে এসেছে, 'কমা'-র আকার পায় নি।

'তু' চর্যার পুথিতে আধুনিক বাংলার 'ত্ত'। 'তু' এবং 'ত্ত' লিখতে চর্যার পুথির লিপিকর এই একটি অক্ষরই ব্যবহার করেছেন। 'গু' এবং 'শু' অবিকল আধুনিক বাংলার আকার না পেলেও প্রবণতা সেই দিকে। 'গ' এবং 'শ'-এর দাঁড়ির নীচের দিকটা বাঁ দিকে বেঁকে গিয়েছে 'ত'-এর নিম্নাংশের মতো।

'পু', 'ডু', 'সু', 'মু' লিখতে চর্যার লিপিকর যে 'উ' ব্যবহার করেছেন তার আকার আধুনিক বাংলার 'ব' ফলার মতো। 'থু' 'ষু' প্রভৃতি অক্ষরে আধুনিক বাংলার 'উ' ব্যবহৃত হয়েছে। এই সব ক্ষেত্রে 'উ' ব্যঞ্জনের নীচে একটি আঁকুড়ি চিহ্ন হয়ে এমনভাবে ঝুলে থাকে যে ব্যঞ্জনটিকে আঁকুড়ি চিহ্ন থেকে সহজে পৃথক করা যায়।

চর্যার পুথিতে আরও একরকমের 'উ' ব্যবহৃত হয়েছে 'কু' লিখতে গিয়ে। সেখানে 'উ' আর স্বতন্ত্র নেই, ব্যঞ্জনের অক্ষর গঠনের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে।

সুতরাং চর্যার পুথিতে পাঁচ রকমের পদমধ্যস্থিত 'উ' দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

১. আধুনিক বাংলার 'ত' এর নিম্নাংশের মতো। এই 'উ' ব্যবহৃত হয়েছে 'গু' এবং 'শু' লিখতে।
২. ব্যঞ্জনের মধ্যাংশের সঙ্গে যুক্ত উ, যেমন 'রু'
৩. ব্যঞ্জনের নিম্নাংশের সঙ্গে যুক্ত আঁকুড়ি চিহ্ন, যেমন 'থু', 'ষু' ইত্যাদি

৪. ব্যঞ্জনের সঙ্গে সংযুক্ত যেমন, 'কু'। এখানে 'উ' ব্যঞ্জন থেকে আলাদা করা যায় না।

৫. ব্যঞ্জনের নীচে 'ব' ফলার মতো, যেমন 'পু' 'ত্নু' ইত্যাদি।

এই পাঁচ প্রকারের পদমধ্যস্থিত 'উ' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এবং অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সমস্ত বাংলা পুথিতে দেখতে পাওয়া যায়।

চর্যার কয়েকটি পদমধ্যস্থিত 'উ'-র দৃষ্টান্ত নীচে দেওয়া হল।

কু মু ড়ু তু স্থু গু ষু কু

এর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদমধ্যস্থিত 'উ'-র তুলনা করা যেতে পারে।

গু ড়ু কু কু স্থু ষু স্থ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'স্থু' 'ষু' '(মু)' চর্যার 'কু' শ্রেণীর, অর্থাৎ 'উ' ব্যঞ্জনের সঙ্গে সংযুক্ত, স্বতন্ত্র নয়। চর্যার 'কু' এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'কু' আকারে প্রায় এক। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপির বিস্তৃত পরিচয় দেওয়ার স্থান এটি নয়, তথাপি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা কর্তব্য যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'যু' এবং 'মু' অভিন্ন, 'নু' এবং 'ন্ন' আকারে অভিন্ন (তুলনীয়, 'আনুমান' এবং 'জগন্নাথ'), আদ্যাক্ষর 'ঈ' 'দ্দ' এবং 'কু' অভিন্ন (তুলনীয়, 'ঈসত' 'উদ্দেশ' এবং 'গোকুল'), 'যু' ('মু')-র পাশে একটি ছোটো রেখা যোগ করলে 'ক্ষ' হয়। অর্থাৎ পদমধ্যস্থিত 'উ' যেমন অনেকগুলি ব্যঞ্জনের আকারে পরিবর্তন এনেছে তেমনি সেই অক্ষরগুলি একাধিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

এবার ষোড়শ শতকের এবং সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের কয়েকখানি পুথির পদমধ্যাস্থ 'উ'-র দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

মিতাক্ষরা				ধর্মরত্ন		শূদ্রপদ্ধতি			কালচক্রতন্ত্র
স্থু	রু	কু	পু	তু	শু	পু	ষু	গু	বু

কবিকঙ্কণ (সপ্তদশ শতকের শেষ)

'কু' 'পু' 'গু'

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে চর্যার পুথির পাঁচ শ্রেণীর পদমধ্যস্থিত 'উ'-র প্রত্যেকটি প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত পৌঁচেছে।

উ

চর্যার পুথির পদমধ্যস্থিত 'উ' আধুনিক বাংলার মতো, তবে চিহ্নটিতে সম্পূর্ণতা আসে নি। নীচের 'শূ' দেখলেই বোঝা যাবে যে চিহ্নটির গতি আধুনিক বাংলার 'উ'-র দিকে।

শূ

'শূ' ব্যতীত অন্য অক্ষরগুলিতে পদমধ্যস্থিত 'উ' আধুনিক বাংলার 'উ'-র সঙ্গে অভিন্ন।

ঋ।এ।ঐ।ও।ঔ

চর্যার পুথির পদমধ্যস্থিত 'ঋ', 'এ', 'ঐ', 'ও', 'ঔ' আধুনিক বাংলার ঐ স্বর-চিহ্নগুলি থেকে একটুও পৃথক নয়। নীচের উদাহরণগুলি লক্ষ্য করলে এ-মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হবে।

গৃ বে দৈ বো যৌ

গৃ বে দৈ বো যৌ

(উপরের উদাহরণগুলির মধ্যে 'য' অক্ষরটির আকার এখানে একটু বিচিত্র, অন্যত্র অবশ্য স্বাভাবিক 'য' আছে।) পদমধ্যস্থিত 'ঋ', 'এ', 'ও' চিহ্ন আধুনিক বাংলা থেকে একটুও পৃথক নয়। কেবল 'ঐ' এবং 'ঔ'-র চৈতনের উৎপত্তিস্থল আধুনিক বাংলা থেকে পৃথক। আধুনিক বাংলায় 'ঐ'-র চৈতনের উৎপত্তি 'ৈ'-এই আঁকুড়ি-চিহ্নটির উপর থেকে, 'ঔ'-র চৈতনের উৎপত্তি 'ৌ' দাঁড়ির মাথা থেকে।

ব্যঞ্জনবর্ণ

ক

পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির 'ক' প্রায় আধুনিক বাংলার মতো। সুতরাং অক্ষরটির গঠন নবম শতকেই সম্পূর্ণ হয়েছে। পরবর্তীকালে পরিবর্তন যা হয়েছে তা যৎসামান্য। পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে 'ক' ত্রিভুজাকার এবং ডানদিকে আঁকুড়ি। ডানদিকের আঁকুড়িটি একটু বেশি লম্বিত, প্রায় ভূমি স্পর্শ করেছে। আঁকুড়িটি মাত্রারেখা এবং ত্রিভুজের সংযোগস্থল থেকে বেরিয়ে দাঁড়ির মতো রেখাটির সমান্তরাল হয়ে লম্বিত।

চর্যার পুথির 'ক' পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির 'ক' থেকে বেশি পৃথক নয়। দুখানি পুঁথির 'ক'-তেই সূক্ষ্ম কোণ আছে। পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির 'ক'-এর আঁকুড়িটি বেশি লম্বিত, চর্যার 'ক'-এর আঁকুড়ি অত লম্বিত নয়।

আঁকুড়ির দৈর্ঘ্য অনুসারে চর্যার পুথির 'ক' দুই শ্রেণীতে পড়ে। এক শ্রেণীর আঁকুড়ি দীর্ঘ এবং বেশি বাঁকান নয়, সম্ভবত এইটি প্রাচীন রীতি, আর এক শ্রেণীর আঁকুড়ি ছোট এবং বাঁকান। যেমন,

ক ক

দীর্ঘ এবং স্বল্পবক্র আঁকুড়িকে প্রাচীন মনে করেছি, এই কারণে যে এইরকম আঁকুড়ি পারমেশ্বরতন্ত্র এবং শিল্যালেখ পুথিতে পাওয়া যাচ্ছে। এই দুখানি পুথিতে ছোট এবং বাঁকান আঁকুড়ি পাওয়া যাচ্ছে না। চর্যায় দু-রকমই আছে। আবার, পঞ্চাকার (১১৯৯), কালচক্রতন্ত্র (১৪৪৬), শিশুপালবধ (১৫১১), ধর্মরত্ন (১৪১৭), শূদ্রপদ্ধতি (১৫১৪), শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বোধিচর্যাবতার (১৪৩৫) সর্বত্রই 'ক' অক্ষরটিতে ছোট

এবং বাঁকান আঁকুড়ি। সুতরাং স্বভাবতই অনুমান করা যায় দীর্ঘ এবং স্বল্প বক্র আঁকুড়ি প্রাচীন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এক রকমের 'ক' দেখতে পাওয়া যায় তাতে আঁকুড়ি নেই। দ্রুত এবং টানা লিখতে গিয়ে আঁকুড়ি ত্রিভুজের সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত হয়ে গেছে যে তাকে আর দেখতে পাওয়া যায় না।

পারমেশ্বরতন্ত্র শিয়ালেখ পঞ্চাকার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

খ

পারমেশ্বরতন্ত্র (৮৫৭-৫৮) এবং শিয়ালেখ (১০৮৪) পুথির 'খ'-র সঙ্গে আধুনিক বাংলা 'খ'-র সাদৃশ্য নেই। আধুনিক বাংলা 'খ' দেখতে পাওয়া গেল চর্যা এবং পঞ্চাকার (১১৯৯) পুথিতে। এই 'খ' পারমেশ্বরতন্ত্র এবং শিয়ালেখ পুথির 'খ' থেকে উদ্ভূত কিনা বা চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথির 'খ'-এর বিবর্তনের স্বতন্ত্র কোন ইতিহাস আছে বলা শক্ত।

কালচক্রতন্ত্র পুথির 'খ' বিচিত্র আকারের। এই পুথির 'খ'-র সঙ্গে চর্যার পুথির 'খ'-র কিছুমাত্র সাদৃশ নেই বলা যায় না। তবে চর্যার পুথির 'খ' সরল এবং আধুনিক বাংলা 'খ'-র বেশি কাছাকাছি। কালচক্রতন্ত্র পুথির 'খ'-র বাঁ অংশটি জটিল। অক্ষরটির গঠন দেখে বলতেই হয় কালচক্রতন্ত্র পুথির 'খ চর্যার পুথির 'খ' থেকে পুরাণো। কিন্তু কালচক্রতন্ত্রের অন্য অক্ষরগুলি যে চর্যার পুথির তুলনায় আধুনিক, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। সম্ভবত 'খ' অক্ষরটি প্রাচীন রূপ কোনো অজ্ঞাত কারণে এই পুথিতে রক্ষা পেয়েছে। এই অনুমান যদি ঠিক হয় তাহলে চর্যার পুথির 'খ'-র পূর্বরূপ দেখতে পাওয়া গেল কালচক্রতন্ত্র পুথিতে। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, কালচক্রতন্ত্রের 'খ' কি পারমেশ্বরতন্ত্র এবং চর্যার 'খ'-এর মধ্যবর্তী রূপ? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শক্ত। বিভিন্ন পুথির 'খ'গুলি পরীক্ষা করে দেখা যাক।

পারমেশ্বরতন্ত্র চর্যা কালচক্রতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

পারমেশ্বরতন্ত্র এবং কালচক্রতন্ত্র[২১] পুথির 'খ' স্পষ্টই নেওয়ারী। এই রকম 'খ' সমস্ত নেওয়ারী পুথিতে পাওয়া যায়। চর্যা এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির 'খ' বাংলা। এ-অনুমান হয়তো অসঙ্গত নয় যে কালচক্রতন্ত্র পুথির 'খ' থেকে চর্যার পুথির 'খ'-র উৎপত্তি।

---

২১. এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে বাংলা বর্ণমালার সব অক্ষরের বঙ্গীয়ত্ব একই সময় প্রকাশ পায় নি। কোনো কোনো অক্ষরের বাংলা রূপ (যেমন 'ক') অনেক আগে প্রকাশিত হয়েছে: কোনো কোনো অক্ষরের পরে। সুতরাং একাদশ-দ্বাদশ শতকের বাংলা অক্ষরে লেখা পুথি মানে এই নয় যে তার প্রত্যেকটি অক্ষরকে নিঃসন্দিগ্ধভাবে বাংলা বলে প্রমাণ করা যায়। এখানে কালচক্রতন্ত্র পুথিখানি যে বাংলা অক্ষরে লেখা তা যে-কোনো বাঙালি পুথিখানিকে একবার চোখে দেখলেই স্বীকার করবেন; তথাপি এই পুথিতে একটি নেওয়ারী অক্ষর পাওয়া গেল।

গ

‘পারমেশ্বরতন্ত্র’ পুথির ‘গ’ অক্ষরটির বাঁ অংশে কিছু কারুকার্য আছে। কারুকার্যটুকু বাদ দিলে অক্ষরটি আধুনিক বাংলার রূপ পায়। চর্যার পুথিতে তাই হয়েছে ; তাই চর্যার ‘গ’ আধুনিক বাংলার মত।

পারমেশ্বরতন্ত্র চর্যা পঞ্চাকার কালচক্রতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

চ

পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির ‘চ’ অক্ষরটির ডান অংশটি দাঁড়ি, বাঁ অংশটি অর্ধবৃত্তাকার। চর্যার পুথির ‘চ’-তে দাঁড়ি নেই। অর্ধবৃত্তাকার অংশটি মাত্রার সঙ্গে ঝুলে আছে। অর্ধবৃত্তাকার বাঁ অংশটি ছুঁচলো, পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতেও তাই ছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ছুঁচলো অংশটা সরল হয়ে প্রায় ডিম্বাকার হয়েছে। কালচক্রতন্ত্র এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির ‘চ’ এক।

পারমেশ্বরতন্ত্র চর্যা চর্যা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

জ

আধুনিক বাংলায় ‘ড’-র ডানদিকে বাহু যোগ করলে ‘জ’ হয়। পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে যে ‘জ’ পাওয়া যাচ্ছে তাও এইরকম, তবে ‘জ’-এর ‘ড’ আধুনিক আকার পায় নি। বাহুও বাঁকানো নয়, নিম্নগামী একটি সরলরেখা। পঞ্চাকার পুথিতে ‘ড’ আধুনিক আকার ধারণ করেছে বটে তবে বাহু এখনও পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির মতো।

চর্যার পুথিতে দু-রকম ‘জ’ দেখা যাচ্ছে। একরকমে বাহুর অর্ধেকটুকু আছে, বাহু-রেখাটি মাত্রার সঙ্গে সমান্তরাল, আর একরকমে বাহু বেঁকে ভূমি পর্যন্ত গিয়েছে। ষোড়শ শতকের বহু পুথিতে বাহুর অর্ধ এবং সম্পূর্ণরূপ একই সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে।

পারমেশ্বরতন্ত্র পঞ্চাকার চর্যা চর্যা কালচক্রতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন শিশুপালবধ শূদ্রপদ্ধতি শকুন্তলা মিতাক্ষরা
৮৫৭-৫৮ খ্রীঃ ১১৯৯ খ্রীঃ ১৪৪৬ খ্রীঃ ১৫১১ খ্রীঃ ১৫১৪ খ্রীঃ ১৫৭১ খ্রীঃ ১৫০৬ খ্রীঃ

‘জ’-র বাহুর পূর্ণ বা সংক্ষিপ্ত আকারের উপর অক্ষরটির প্রাচীনত্ব বা আধুনিকত্ব নির্ভর করছে না। দশম শতকের অনেক নেওয়ারী পুথিতে ‘জ’-এর পূর্ণ বাহু ছিল। উপরের উদাহরণগুলিতে একটি বিষয় লক্ষণীয়। শূদ্রপদ্ধতি শকুন্তলা পুথিতে ‘জ’-এর নিম্নভাগের লেজটি মাথায় উঠেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং চর্যা পুথিতে লেজ মাথায় না উঠলেও অনেকখানি এগিয়েছে। পারমেশ্বরতন্ত্রে লেজটি কাটা গিয়েছে। লেজের ক্রমবর্ধমান আকারের সঙ্গে অক্ষরের প্রাচীনত্ব-আধুনিকত্বের যোগ আছে। বাংলায় লেজওয়ালা

অক্ষর অনেকগুলি 'ভ', 'ত', 'জ', 'ড' ইত্যাদি। পুথি কালের দিক থেকে যত আধুনিক লেজ তত বেশি মাথায় উঠেছে। লেজকে মাথায় তোলা বাংলা লিখনভঙ্গীর একটি বৈশিষ্ট্য।

ঝ

চর্যার পুথিতে 'ঝ' আধুনিক বাংলার মতো।

ঝ

ট

চর্যার পুথির 'ট' পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির 'ট' থেকে বিশেষ পৃথক নয়। এখনও চৈতন দেখা যাচ্ছে না, গলার কাছে খাঁচটা পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে বেশি, চর্যার পুথিতে কম। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিতে খাঁচটি প্রায় মিলিয়ে এসেছে এবং মাথায় চৈতনও দেখা দিয়েছে।

পারমেশ্বরতন্ত্র চর্যা পঞ্চাকার কালচক্রতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ধর্মরত্ন

উপরের এই ছয়টি 'ট'-র গঠন পরীক্ষা করলে এদের ক্রমবিবর্তনের ধারাটি স্পষ্ট হয়। অক্ষরগুলির গঠনে দুটি বিষয় লক্ষণীয় গলার কাছের খাঁচের ক্রমবিলীয়মানতা এবং চৈতনের আবির্ভাব। পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে খাঁচটি সূক্ষ্ম, চৈতন নেই তবে চৈতনের বদলে একটি ছোটো নিম্নগামী রেখা আছে। চর্যার এবং পঞ্চাকার পুথিতে গলার খাঁচের সূক্ষ্মতা কমে গেছে এবং পঞ্চাকারে যেন চৈতনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কালচক্রতন্ত্র পুথিতে গলার খাঁচটি উপরে উঠেছে, খাঁচের সূক্ষ্মতা আরও কমে গেছে, নিম্নভাগ অনেকটা আধুনিক বাংলা 'ট'-এর আকার নিয়েছে। চৈতন ও আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে গলার খাঁচটি মিলিয়ে গিয়ে সে-জায়গায় একটু বাঁক দেখা দিয়েছে। চৈতনের আকার আধুনিক হয়েছে। ধর্মরত্ন পুথিতে গলার কাছের বাঁকটি অনেকটা সরল হয়ে আধুনিক বাংলা 'ট'-তে পরিণত হয়েছে।

ঠ

চর্যার পুথির 'ঠ' গোলাকার, এমন গোলাকার যে তার সঙ্গে আ-কার যুক্ত হলে তাকে মাত্রাহীন 'ন' বলে ভুল হয়। এই কারণে শাস্ত্রী এক জায়গায় 'বইঠা'-কে 'বইণ' পড়েছেন। এই আকারের 'ঠ' পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতেও পাওয়া যাচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'ঠ' ডিম্বাকার, উপরের দিকটা সরু, নীচের দিকটা স্ফীত। অক্ষরটি মাত্রা ধরে দোদুল্যমান।

পারমেশ্বরতন্ত্র চর্যা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

ড

আগেই বলা হয়েছে চর্যার পুথিতে 'ড', 'ড়' এবং 'উ'—এই অক্ষর তিনটির মধ্যে আকারগত কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং 'গাইউ'-কে 'গাইড়' বা 'গাইড' পড়তে কোনো বাধা নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিতেও এই রীতি,

'উ'-র মাথায় চৈতন নেই, 'ড়'-র নীচে বিন্দু নেই। 'ড'-র মাথায় চৈতন দিয়ে 'উ', এবং নীচে বিন্দু দিয়ে 'ড়' অষ্টাদশ শতকের শেষে পাওয়া যায়। বিন্দু এবং চৈতনের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে হয়েছে ; তাই 'চর্যা' এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে পুরাণো বলতে হয় এবং চর্যাকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চেয়েও পুরাণো বলতে হয়, কারণ চর্যার 'ট' অচৈতন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'ট' চৈতনযুক্ত।

ণ

আধুনিক বাংলায় 'ণ' এবং 'ন'-র পার্থক্য গুরুতর নয়। 'ণ' মাত্রাহীন, 'ন'-য় মাত্রা আছে। 'ণ'-র বাঁ অংশের ডান অংশের সঙ্গে সংযোগ উঁচুতে, 'ন'-র মাঝে। চর্যা এবং কোনো কোনো পুরাণো বাংলা পুথিতে 'ণ' এবং 'ন'-র পার্থক্য এর চেয়ে বেশি ছিল।

চর্যার পুথির 'ণ'-র বাঁ অংশটির আকার আধুনিক বাংলার 'ল'-র বাঁ-অংশের অনুরূপ। এবং বাঁ-অংশ ও ডান অংশের সংযোগ উঁচুতে, প্রায় মাত্রার কাছাকাছি। পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির 'ণ'-র সঙ্গে তুলনায় চর্যার 'ণ'-র বাঁ-অংশ অনেক সরল। চর্যার পুথির 'ণ'-কে বলতে পারি দ্বি-বাঁকযুক্ত 'ণ', কারণ এর বাঁ অংশে দুটি বাঁক আছে।

দ্বি-বাঁকযুক্ত 'ণ' পাওয়া যাচ্ছে চর্যার পুথিতে, পঞ্চাকার (১১৯৯), কালচক্রতন্ত্র (১৪৪৬), শূদ্রপদ্ধতি (১৫১৪), ধর্মরত্ন (১৪৮৯), চোধিচর্যাবতার (১৪৩৫) পুথিতে।

এক বাঁকযুক্ত 'ণ' পাওয়া যাচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মিতাক্ষরা (১৫০৬), শিশুপালবধ (১৫১১), শকুন্তলা (১৫৭১) পুথিতে।

দ্বিবিধপ্রকার 'ণ'-র মধ্যে দ্বিবাঁকযুক্ত 'ণ' যে প্রাচীন সে-সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কারণ নেই, কারণ পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির 'ণ'-এর সঙ্গে তুলনায় এই 'ণ'-এর ইতিহাসটি পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া তারিখযুক্ত প্রাচীন পঞ্চাকার পুথিতে শুধু দ্বিবাঁকযুক্ত 'ণ' পাওয়া যাচ্ছে।

ধর্মরত্ন (১৪৮৯) পুথিতে দ্বিবিধপ্রকারের 'ণ' পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং একবাঁকযুক্ত 'ণ'-র এক দিকের সীমা ১৪৮৯-কে ধরা যেতে পারে। আবার দ্বিবাঁকযুক্ত 'ণ' পাওয়া যাচ্ছে শূদ্রপদ্ধতি (১৫১৪) পুথিতে। তাহলে বুঝতে হবে ১৪৮৯-১৫১৪ এই সময়ের মধ্যে দ্বিবিধপ্রকারের 'ণ'-র ব্যবহারই চালু ছিল। কিন্তু ১৫১৪-র পরে দ্বিবাঁকযুক্ত 'ণ' আর পাওয়া যায় নি।

বিরুদ্ধপ্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাহলে এই সিদ্ধান্তে পৌছান বোধহয় অযৌক্তিক হবে না যে ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় দশকের পরে প্রাচীন 'ণ'-র প্রচলন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং যে-পুথিতে আধুনিক (অর্থাৎ একবাঁকযুক্ত) 'ণ' ব্যবহৃত হয়েছিল সে-পুথির লিপিকাল ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় দশকের আগে নয়। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে চর্যার পুথি ষোড়শ শতকের আগে লেখা। কত আগে সে-বিচার স্বতন্ত্র, এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপিকালের উর্ধ্ব সীমা ১৫১৪।

পারমেশ্বরতন্ত্র চর্যা পঞ্চাকার কালচক্রতন্ত্র শূদ্রপদ্ধতি ধর্মরত্ন

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন শকুন্তলা শিশুপালবধ মিতাক্ষরা

ত

চর্যার পুথিতে 'ত' এবং 'দ'-র মধ্যে গোলমাল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। দুটি অক্ষরেই মাত্রা থেকে একটি রেখা নীচের দিকে বেরিয়ে এসে ডান দিকে বাঁক নিয়েছে। আধুনিক বাংলায় 'ত' অক্ষরের মাত্রার নীচে বিন্দু আছে এবং লেজটি সেই বিন্দু থেকে বেরিয়েছে। চর্যার পুথিতে বিন্দুর বদলে একটি রেখা আছে

এই রেখাটি থেকে লেজ নির্গত হয়েছে, পরে লেজটি পাক খেয়ে নীচের দিকে নামলে কাটা পড়েছে

তাই 'ত' দেখতে 'দ'-র মতো হয়েছে। পঞ্চাকার পুথিতে আধুনিক বাংলার 'ত' দেখা গেল। এই পুথির 'ত'-তে দেখা যাচ্ছে মাত্রা থেকে একটি রেখা নীচের দিকে নেমে এসেছে, রেখাটি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটি বিন্দু, এই বিন্দু থেকে লেজ বেরিয়েছে। লেজ মাঝপথে কাটা পড়ে নি, মাথা পর্যন্ত উঠেছে। কালচক্রতন্ত্র এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির 'ত' পঞ্চাকারের 'ত'-র মতো। পঞ্চাকার পুথির সাক্ষ্যে বলা যায় 'ত'-র লেজ মাথায় উঠেছে ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে। পরবর্তী কোনো পুথিতে লেজ কাটা 'ত' দেখা যাচ্ছে না। তবে এ-ব্যাপারে 'ত'-র লেজই একমাত্র সাক্ষ্য নয়। বাংলায় যতগুলি লেজযুক্ত অক্ষর আছে, যেমন ড, 'ভ', 'ত', 'জ', 'ড'—এই সবগুলি অক্ষরের সাক্ষ্য গ্রহণ করলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে ত্রয়োদশ শতকের আগে এই অক্ষরগুলির কোনোটিরই লেজ মাথায় ওঠে নি, প্রত্যেকটিরই লেজ মাঝপথে কাটা পড়েছে। নীচে বিভিন্ন পুথির 'ত' অক্ষরটি দেখান হল।

পারমেশ্বরতন্ত্র চর্যা পঞ্চাকার কালচক্রতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

থ

চর্যার পুথির 'থ' আধুনিক বাংলার মতো। তবে বাঁ অংশ এবং ডান অংশের 'সংযোগ' সূক্ষ্ম কোণাকৃতি নয়, নীচেয়ও নয়। আগেই বলা হয়েছে যে বাংলার অক্ষরের ডান অংশ এবং বাঁ-অংশের 'সংযোগ' সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করবার বিষয়। প্রাচীন অক্ষরে 'সংযোগ' অপেক্ষাকৃত উপরের দিকে, আধুনিক অক্ষরে অপেক্ষাকৃত নীচের দিকে। 'ত' 'ভ' 'ড'-র লেজ উপরে ওঠা যেমন আধুনিকতার লক্ষণ, তেমনি 'থ' 'য' 'ব' 'ম' প্রভৃতি অক্ষরের 'সংযোগ' নীচের দিকে নেমে আসা এবং সূক্ষ্ম কোণাকার হওয়া আধুনিকতার লক্ষণ। 'থ' অক্ষরটিতে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে সংযোগ সূক্ষ্ম কোণাকারও নয়, ঠিক নীচেয়ও নয়।

'চর্যার 'থ'-র সঙ্গে তুলনীয় পঞ্চাকার পুথির 'থ' অক্ষরটি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'থ' পঞ্চাকার পুথির মতো-ই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির অন্যান্য অক্ষরে যেমন এই অক্ষরেও তেমনি কিছু অলঙ্কার আছে।

থ

দ

পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে 'দ'-র আকার কিছু জটিল। পঞ্চাকার ও কালচক্রতন্ত্র পুথিতেও এই জটিল 'দ'। কিন্তু চর্যার পুথির 'দ' সরল, আধুনিক বাংলা 'দ'-র সঙ্গে তার পার্থক্য নেই। আগেই বলা হয়েছে চর্যার পুথির 'দ' অনেকটা 'ত'-র মতো। 'ত' র মতো 'দ' অক্ষরেও মাত্রা থেকে একটি রেখা নেমে এসে ডান দিকে বাঁক নিয়েছে। চর্যার পুথিতে এই রেখাটি সরল, পঞ্চাকার, কালচক্রতন্ত্র পুথিতে এই রেখাটি সরল নয়।

দ দ দ দ

পারমেশ্বরতন্ত্র পঞ্চাকার কালচক্রতন্ত্র চর্যা

এই চারটি 'দ'-র মধ্যে 'চর্যা'-র 'দ'-কে আধুনিক বলতে হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং ষোড়শ শতকের অন্যান্য পুথির 'দ' চর্যার 'দ' থেকে পৃথক নয়।

ধ

চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথির 'ধ' এক। মাথায় সামান্য একটু 'বাড়ী' বোধহয় আছে। তবে 'বাড়ী' অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পদমধ্যস্থিত 'ই' বা 'এ'-র সঙ্গে মিশে রয়েছে বলে এর দৈর্ঘ্য বা অস্তিত্ব অনুমান করা শক্ত। কালচক্রতন্ত্র পুথিতে 'ধ'-র মাথায় 'বাড়ী' আছে; তবে 'বাড়ী' মাত্রারেখা ছাপিয়ে উপরে ওঠে নি; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'ধ' আর কালচক্রতন্ত্র পুথির 'ধ' এক।

ধ ধ ধ ধ

চর্যা পঞ্চাকার কালচক্রতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

সম্ভবত চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথির 'ধ'-র বাড়ী নেই। যদি থাকে, তাহলে তা 'ই'-র ছত্রের সঙ্গে মিশে গেছে এবং কালচক্রতন্ত্র এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'ধ'-র মত 'বাড়ী' নীচের দিকেও নামে নি, উপরের দিকেও ওঠে নি। 'বাড়ী' না থাকলে চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথির 'ধ'-র আকার 'ব'-র মতো হয়। তবে 'ব' এবং 'ধ'-র গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা নেই, কারণ 'ব'-য় মাত্রা আছে, 'ধ'-য় মাত্রা নেই।

ন

চর্যার 'ন' আধুনিক বাংলার মতো বটে তবে পঞ্চাকার পুথির 'ন'-র সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে চর্যার পুথিতে বাঁ অংশ এবং ডান অংশের সংযোগটি একটু উপরে, পঞ্চাকার পুথিতে নীচে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিতেও 'সংযোগ' পঞ্চাকার পুথির মতো।

ন ন ন ন

চর্যা পঞ্চাকার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কালচক্রতন্ত্র

প

পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে 'প'-র বাঁ অংশ ঠিক টাঙ্গীর মতো নয়, আধুনিক বাংলা 'য'-র মতো। পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির 'প' সামান্য পরিবর্তিত আকারে পাওয়া যাচ্ছে পঞ্চাকার পুথিতে। পরিবর্তনের মধ্যে উপরের দিকটা জুড়ে গেছে, পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে উপরের দিকটা খোলা ছিল। এই দুটি 'প'-র আকার তুলনা করলেই পার্থক্য স্পষ্ট হবে।

পারমেশ্বরতন্ত্র পঞ্চাকার

পঞ্চাকার পুথির 'প'-র তুলনায় চর্যার 'প' আধুনিক বাংলা 'প'-র বেশি কাছাকাছি। চর্যার পুথিতে 'প'-র বাঁ-অংশ টাঙ্গীর আকার ধারণ করেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'প' অক্ষরটির বাঁ-অংশ, ডান অংশ থেকে যেন সম্পূর্ণ আলাদা। দুটি অংশ এক হয়েছে মাত্রার সূত্রে। মাত্রা না থাকলে দুটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। বাঁ অংশের আকারও ঠিক টাঙ্গীর মতো নয়।

চর্যা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

ষোড়শ শতকের সমস্ত পুথিতেই চর্যার পুথির 'প' দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'প' বড়ই অদ্ভুত। এইরকম মাত্রা থেকে ঝুলে থাকা 'প' দ্বিতীয় কোনো পুথিতে দেখা যায় নি। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'গ' অক্ষরটির সঙ্গে তুলনা করলে 'প'-র অদ্ভুত আকারকে লিপিকরের বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা যায়। 'গ'-র বাঁ দিকের আঁকুড়িটিও মাত্রা থেকে ঝোলা।

ব

চর্যার 'ব' আধুনিক বাংলার মতো। অক্ষরটির ত্রিকোণাকার প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে বটে তবে বাঁ অংশ এবং ডান অংশের সংযোগ এখনকার 'ব'-র মতো নীচেয় নয়। সে তুলনায় পঞ্চাকার পুথির 'ব আধুনিক বাংলা 'ব'-র বেশি কাছাকাছি।

চর্যা পঞ্চাকার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কালচক্রতন্ত্র

এর মধ্যে এক পঞ্চাকার ছাড়া আর কোনো পুথির 'ব' অক্ষরে সূক্ষ্ম কোণ নেই। তবে প্রবণতা সেইদিকে।

ভ

চর্যার 'ভ'-র লেজটি মাঝপথে কাটা পড়েছে, যেমন কাটা পড়েছে 'ত'-র লেজ। মাথার দিকটাও জটিল।

সে তুলনায় পঞ্চাকার পুথির 'ভ' আধুনিক বাংলা 'ভ'-র বেশি কাছাকাছি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং পঞ্চাকার পুথির 'ভ' এক রকম।

পারমেশ্বরতন্ত্র চর্যা পঞ্চাকার শ্রীকৃষ্ণকীর্ত কালচক্রতন্ত্র

পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির 'ভ' চর্যার পুথির 'ভ' থেকে বেশি পৃথক নয়, কেবলমাত্র চর্যার পুথিতে লেজ একটু বেঁকেছে। পঞ্চাকার পুথিতে পরিবর্তন অনেক বেশি। লেজ অনেকখানি বেঁকেছে, মাথার দিকটাও সরল হয়েছে। একেবারে আধুনিক বাংলার 'ভ' দেখা যাচ্ছে শকুন্তলা (১৫৭১) পুথিতে।

ম

চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথির 'ম' আধুনিক বাংলার মতো।

চর্যা পঞ্চাকার

য

চর্যার পুথিতে 'য' এবং 'য়' কোনো পার্থক্য নেই, বলা বাহুল্য, প্রাচীন বাংলার অধিকাংশ পুথিতেই নেই। চর্যার 'য' অক্ষরটি অন্যান্য অক্ষরের তুলনায় কিছু বিচিত্র আকারের। প্রথমত, বাঁদিকের নীচের রেখাটি মাত্রার সঙ্গে সমান্তরাল, এটি হওয়া উচিত ছিল নিম্নগামী এবং ঈষত বক্র, যেমন 'ব' 'র' ইত্যাদি অক্ষরে দেখা যায়। দ্বিতীয়ত, বাঁ অংশ এবং ডান অংশের 'সংযোগ' অনেক উচুতে। চর্যার অনেক অক্ষরেই 'সংযোগ' উঁচুতে, তবে 'য' অক্ষরটিতে যেন কিছু বেশি উঁচুতে।

চর্যার 'য'-র তুলনায় পঞ্চাকার পুথির 'য' আধুনিক বাংলা 'য'-র বেশি কাছাকাছি। এই পুথির 'য'-র 'সংযোগ' অনেক নীচুতে, যেমন বাংলা অক্ষরের পক্ষে স্বাভাবিক।

কালচক্রতন্ত্র পুথির 'য'-তে কোণগুলি খুব সূক্ষ্ম এবং 'সংযোগ' খুব নীচুতে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিতে 'য'-র কোণ সূক্ষ্ম নয় (না হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ অধিকাংশ অক্ষরেরই কোণ সূক্ষ্ম নয়) তবে 'সংযোগ' নীচুতে।

পারমেশ্বরতন্ত্র চর্যা পঞ্চাকার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কালচক্রতন্ত্র

র

আধুনিক বাংলা 'র' এবং 'ব'-র পার্থক্য বিন্দুতে। ষোড়শ শতকের অনেক পুথিতে (যেমন ধর্মরত্ন, মিতাক্ষরা) এবং তার পরবর্তীকালের বহু পুথিতে 'র' 'ব'-র কোনো আকারগত পার্থক্য নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এবং ষোড়শ শতকের কোনো কোনো পুথিতে 'র'-র পেট চিরে 'ব' থেকে পৃথক করা হয়েছে।[২২]

২২. পঞ্চদশ শতকের একেবারে শেষে [১৪৯৬ খ্রীঃ] নকল করা একখানি পুথিতে [বর্ধমান রচিত 'গঙ্গাকৃত্যবিবেক', বৃটিশ মিউজিয়ামের পুথি, সংখ্যা Or 8567 a.] দ্বিবাঁকযুক্ত 'ণ' এবং পেট-কাটা 'র' একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই পুথির লিপিকাল যদি ঠিক হয় (লিপিকালের জন্য দ্রষ্টব্য Killhorn, JAASB, 1898, পৃ. ২৩২) তাহলে পেট কাটা 'র'-র একটা নিম্নসীমা পাওয়া যাচ্ছে ১৪৯৬। এর আগেও পেট কাটা 'র'-র প্রচলন ছিল কিনা তা আমার জানা নেই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পেট-কাটা 'র' আছে বটে, কিন্তু এক বাঁকযুক্ত 'ণ'।

চর্যা, পঞ্চাকার এবং কালচক্রতন্ত্র পুথিতে 'র'-র পেটটিকে মসীলিপ্ত করে 'ব' থেকে পৃথক করা হয়েছে। এই রকম মসীলিপ্ত 'র' এই তিনখানি পুথিতে ছাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। এই তিনখানি পুথি-ই নেপালে পাওয়া। সুতরাং এই রীতিটি নেপাল অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল কিনা সে-সম্বন্ধেও নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। চর্যার 'র' নিম্নরূপ।

র

ল

চর্যার পুথিতে দুই রকম 'ল' পাওয়া যায়। একটি খাঁটি আধুনিক বাংলার 'ল', আর একটি আধুনিক বাংলার মাত্রাযুক্ত 'ণ'-র মতো। প্রথম শ্রেণীর 'ল' সংখ্যায় কম। পঞ্চাকার পুথিতে আধুনিক বাংলার 'ল' দেখা যাচ্ছে। কালচক্রতন্ত্র পুথিতেও তাই। তবে 'ন'-র মতো 'ল'-ও আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও আধুনিক বাংলার 'ল' এবং 'ণ'-র মতো 'ল' দুই-ই পাওয়া যাচ্ছে।

ল ন ল ল ন ল

চর্যা পঞ্চাকার কালচক্রতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

মাত্রাযুক্ত 'ণ'-কে 'ল'-র জায়গায় ব্যবহার করবার রীতি অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত চালু ছিল। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় 'ল'-কেও 'ণ'-র জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে চর্যার পুথিতে। তবে 'ল' এবং 'ণ'-র পার্থক্য স্পষ্ট; 'ল'-য় মাত্রা আছে 'ণ'-য় মাত্রা নেই।

শ

চর্যার পুথির 'শ' আধুনিক বাংলার মতো, দোপুঁটুলি আকারটি সুস্পষ্ট। এইরকম 'শ' পঞ্চাকার পুথির কয়েক জায়গায় আছে, তবে পঞ্চাকার পুথির অধিকাংশ 'শ' আকারে 'ল'-র মতো। এইরকম 'শ' কালচক্রতন্ত্র পুথিতেও আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'শ' চর্যার পুথির মতো।

শ শ শ শ শ

চর্যা পঞ্চাকার কালচক্রতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মিতাক্ষরা

ষ

চর্যার পুথির 'ষ' আধুনিক বাংলার মতো পেট কাটা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও তাই।

ষ ষ

চর্যা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

লক্ষণীয় যে চর্যার পুথিতে মাঝের খাঁচটা ক্ষীণ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে স্পষ্ট, নীচের বাঁকটি চর্যার পুথিতে কোণাকার, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অর্ধবৃত্তাকার।[২৩] চর্যার পুথির 'র' 'ব' 'থ' 'থ'-র তুলনায় 'ষ'-য় কোণগুলি স্পষ্ট নয়। পঞ্চাকার এবং কালচক্রতন্ত্র পুথিতে কোণ স্পষ্ট।

ষ ষ

পঞ্চাকার কালচক্রতন্ত্র

স

'স'-র আকার প্রায় সব পুথিতেই একরকম।

স স স স

চর্যা পঞ্চাকার কালচক্রতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

হ

চর্যা, পঞ্চাকার, কালচক্রতন্ত্র—এই তিনখানি পুথির কোনোখানিতেই 'হ' আধুনিক আকার পায় নি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আধুনিক বাংলার মতো 'হ' দেখতে পাওয়া গেল, তবে তখনও নিম্নগামী রেখাটি মধ্যাংশের সঙ্গে যুক্ত হয় নি।

হ হ হ হ

চর্যা পঞ্চাকার কালচক্রতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

চর্যার পুথির কয়েকটি সংযুক্ত ব্যঞ্জন

কুং ঙ্ক স্ত্র ন্তু প্র স্থৈ

৬

চর্যার পুথির অক্ষরগুলি পরীক্ষা করে দেখা গেল আধুনিক বাংলা অক্ষর থেকে এই অক্ষরগুলির আকারগত পার্থক্য বেশি নয়। একমাত্র আত্যাক্ষরে 'ই' ছাড়া এমন আর একটি অক্ষরও এই পুথিতে নেই যার বঙ্গীয়ত্বে সন্দেহ করা যায়।

আর একটি প্রসঙ্গ এখানে স্মরণীয় যে আধুনিক বাংলা অক্ষরের প্রত্যেকটির গঠনের সম্পূর্ণতা একই সময়ে হয় নি। কোনো কোনো অক্ষরের বিবর্তনে কয়েক শত বছরের ব্যবধান আছে ; অর্থাৎ 'ক' যদি আধুনিক

২৩. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অধিকাংশ অক্ষরের যে অর্ধবৃত্তাকার বাঁক আছে তা যে লিপিকরের বৈশিষ্ট্য তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই থেকে যে চর্যা, কালচক্রতন্ত্র পুথিতেও অনুরূপ অর্ধবৃত্তাকার বাঁক আছে— ষ ষ

রূপ পেয়ে থাকে নবম শতাব্দীতে, 'ই' আধুনিক রূপ পেয়েছে অনেক পরে। এই কথাটি মনে রাখলে চর্যার পুথির দু-একটি অক্ষরের বিচিত্র আকার বিভ্রান্তিকর মনে হবে না।

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন হবে এই অক্ষরগুলি কত পুরাণো, অর্থাৎ চর্যার পুথি লেখা হয়েছিল কবে।

অক্ষরের গঠন পরীক্ষা করে কোনো কোনো প্রাচীন পুথি বা অনুশাসনের লিপিকাল সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু অক্ষর গঠন দেখে চর্যার পুথির লিপিকাল অনুমান করবার আগে বাংলা লিপির আঞ্চলিক প্রকারভেদ সম্বন্ধে কিছু ধারণা পাওয়া দরকার এবং ত্রয়োদশ-চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতকের বাংলা লিপির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু তথ্য বিস্তৃতাকারে জানা দরকার।

চর্যার পুথির উল্লেখযোগ্য লিপিগত বৈশিষ্ট্য এইগুলি—

১. দ্বিবাঁকযুক্ত 'ণ'

২. লেজকাটা 'ত' এবং 'ভ'

৩. 'অ'-র সংযোগ মাঝে,

৪. চৈতনহীন 'ট',

৫. 'য'-র সংযোগ উঁচুতে,

৬. 'ক'-র আঁকুড়ি লম্বা।

১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত পঞ্চাকার পুথির সঙ্গে চর্যার লিপিগত সাদৃশ্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কিছু অমিলও আলোচনা প্রসঙ্গে ধরা পড়েছে, যেমন 'ত', 'য', 'ভ', 'স' ইত্যাদি। পঞ্চাকার পুথির এই অক্ষরগুলি আধুনিক বাংলার বেশী কাছাকাছি। আবার, চর্যার পুথির 'দ', 'প', 'শ' অবশ্যই পঞ্চাকার পুথির তুলনায় আধুনিক। এই সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য থেকে চর্যার পুথির লিপিকাল সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যাচ্ছে না বটে তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে চর্যার পুথিতে অধিকাংশ অক্ষরগুলির 'সংযোগ' নীচুতে নয়, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'অ', 'থ', 'য', 'ব' ইত্যাদি। এটি প্রাচীনত্বের লক্ষণ। প্রাচীনত্বের আর পাঁচটি লক্ষণের কথা উপরে বলা হয়েছে। সেই কারণে আমার অনুমান চর্যার পুথি খুব সম্ভব পঞ্চাকার পুথির আগে লেখা হয়েছিল।

পঞ্চাকার পুথির লিপিকাল যদি যথার্থই ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে হয় তাহলে আমার অনুমান চর্যার পুথির লিপিকাল দ্বাদশ শতকের শেষার্ধ। মনে রাখতে বলি এ-অনুমান এক জোড়া চোখের সাক্ষ্যে এবং স্বল্পসংখ্যক পুথির ভিত্তিতে॥

ডাকের বচন

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

বাংলাদেশে খনা ও ডাক বা ডাকপুরুষের বচন বলিয়া কথিত কতকগুলি সূক্তি প্রচলিত আছে। এগুলির বিষয়বস্তু প্রধানতঃ সাধারণ গৃহস্থ এবং কৃষকগণের জ্ঞাতব্য ও কর্তব্যবিষয়ক এবং আবহতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা ও শাকুনশাস্ত্রমূলক। সাধারণ জ্ঞানের কথাও এগুলিতে অনেক আছে।

এইরূপ সূক্তি অসমীয়া এবং মৈথিলী ভাষাতেও প্রচলিত আছে। কিন্তু আসাম ও মিথিলায় সমস্ত বচনই ডাক বা ডাকপুরুষের প্রতি আরোপিত হয়। পূর্বভারতের উল্লিখিত তিনটি অঞ্চলেই ডাককে জনৈক স্থানীয় জ্ঞানী জ্যোতিষী বলিয়া মনে করা হয়। তিন অঞ্চলেই তাঁহার সম্বন্ধে কিংবদন্তী গড়িয়া উঠিয়াছে।

খনার বচনের সংগ্রহমূলক বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ডাকের বাংলাবচনসমূহও কতিপয় গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। সুশীলকুমার দে মহাশয়ের 'বাংলাপ্রবাদ' সংজ্ঞক সুবিখ্যাত পুস্তকে বহুসংখ্যক ডাক ও খনার বচন উদ্ধৃত দেখা যায়। গ্রন্থখানির পরিশিষ্টে মুদ্রিত প্রমাণপঞ্জীটি খুব মূল্যবান্। বাংলাভাষায় ডাক ও খনার বচন সম্পর্কিত আলোচনার জন্য দীনেশচন্দ্র সেন কৃত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের 'বিশ্বকোষ', আশুতোষ ভট্টাচার্য রচিত 'বাংলা লোকসাহিত্য' প্রভৃতি পুস্তক দ্রষ্টব্য। অসমীয়া ডাকের বচনসমূহ সম্প্রতি দণ্ডীরাম দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। অসমীয়া ভাষায় ডাকসম্বন্ধীয় আলোচনার জন্য উক্ত গ্রন্থের ভূমিকা ও উহার পরিশিষ্টের প্রমাণপঞ্জী, মহেশ্বর নেওগ মহাশয়ের 'অসমীয়া সাহিত্যর রূপরেখা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। J. Christian রচিত Behar Proverbs সংজ্ঞক ইংরেজি গ্রন্থে বহুসংখ্যক মৈথিলীডাকের বচন উদ্ধৃত দেখা যায়।

উল্লিখিত তিনটি পূর্বভারতীয় অঞ্চলের মধ্যে কেবল বাংলা দেশেই ডাক এবং খনা নামীয় দুইজন জ্যোতির্বিদের অস্তিত্ব কল্পনা করা হইয়াছে এবং কতকগুলি বচন ডাকের ও অপর কতকগুলি খনার রচনা বলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু অনেকগুলি খনার বচন আসাম ও মিথিলায় ডাকের বচনরূপে প্রচলিত। আবার দুর্গাগতি মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'ডাকপুরুষের কথা' গ্রন্থখানিতে কৃষিসম্বন্ধীয় যাবতীয় খনার বচনই ডাকের উক্তি বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। এমনকি সুশীলকুমার দে মহাশয়ের 'বাংলা প্রবাদে'ও দুইটি বচন (নং ৬১২২ এবং ৭৯৮১) ডাক এবং খনা উভয়ের নামেই প্রচলিত বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। ইহাতে মনে হয় যে, মূলতঃ বচনগুলি বাংলাদেশেও একই ব্যক্তির উক্তি বলিয়া চলিত। কিন্তু ডাককে পুরুষ এবং খনাকে নারী জ্যোতির্বিদ্ কল্পনা করার ফলে দুইটি স্বতন্ত্র কিংবদন্তী গড়িয়া ওঠার পর কতকগুলি বচন ডাকের এবং অপর কতকগুলি খনার উক্তি বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে এই জাতীয় সূক্তি হয় একজন মাত্র জ্যোতির্বিদের উক্তি অথবা অপর কোনো জ্যোতিষীকে উদ্দেশ করিয়া জ্যোতির্বেত্তা-বিশেষের উক্তি বলিয়া উল্লিখিত হয়। খনার বচনের মধ্যেও কতকগুলি জ্যোতির্বিদ্ বরাহ বা মিহিরের প্রতি খনার উক্তি হিসাবে রচিত দেখা যায়। কতিপয় বচনে বরাহপুত্র (মিহির) কিংবা রাবণের ভণিতা আছে। অবশ্য বহুসংখ্যক ডাক বা খনার বচনে কোনোই ভনিতা নাই।

'খনা' ও 'ডাক' শব্দদ্বয়ের অর্থসম্পর্কে কিছু আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু কিংবদন্তীতে ডাককে পুরুষ এবং খনাকে নারী বলিয়া প্রচার করায় আসল কথা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের বিবেচনায় 'খনা' শব্দ সংস্কৃত 'ক্ষণদ' — প্রাকৃত 'খনঅ' অর্থাৎ গণৎকার হইতে উদ্ভূত। 'ডাক' শব্দটিকে আমরা 'ঘোষিত বাণী' এবং 'ডাকপুরুষ'কে 'বাণীঘোষণাকারী ব্যক্তি' অর্থে গ্রহণের পক্ষপাতী। খনা ও ডাক যে ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, তাহার প্রমাণ আমরা পরে আলোচনা করিব। আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ও বলিয়াছেন, ডাক কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে। তবে তিনি মনে করেন যে, একশ্রেণীর বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধককে ডাক বলা হইত। এই সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া বোধ হয় না। কারণ আমরা পরে দেখিব যে, যে-অঞ্চলে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম কোনো প্রভাব বিস্তার করে নাই, সেখানেও ডাকের বচন জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে।

বাংলাদেশের কিংবদন্তী অনুসারে খনা নাম্নী মহিলা জ্যোতির্বিদ্ উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ বরাহের পুত্র মিহিরের পত্নী ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে একটি চমকপ্রদ উপকথাও বাংলায় প্রচলিত আছে। কিন্তু ইহার সমস্তই কাল্পনিক। কিংবদন্তীর রাজা বিক্রম অনৈতিহাসিক ব্যক্তি। অবশ্য উজ্জয়িনী অঞ্চলে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহমিহির নামক জনৈক সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বেত্তা আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার নামের ভিত্তিতেই বাংলা কিংবদন্তীতে 'বরাহের পুত্র মিহির' কল্পিত হইয়াছেন। আমরা পরে দেখিব যে, এই ধরণের অমূলক জনশ্রুতি অন্যত্রও প্রচারিত আছে। যাহা হউক, পশ্চিম ভারতস্থিত উজ্জয়িনীবাসী জ্যোতিষীর পুত্রবধূ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাংলাভাষায় সূক্তি রচনা করিয়াছিলেন, ইহা অপেক্ষা অধিক হাস্যকর কল্পনা আর কি হইতে পারে ? ডাক সম্বন্ধীয় কিংবদন্তীর ঐতিহাসিক মূল্যও অনুরূপ।

ডাকপুরুষের সম্বন্ধে পূর্বভারতে বিভিন্ন কাহিনী প্রচলিত আছে। বাংলার প্রবাদে ডাক নামক জনৈক গোপজাতীয় ব্যক্তি ডাকের বচনের রচয়িতা। মিথিলার ডাকও গোপজাতীয়। কিন্তু আসামের ডাক কামরূপজেলার অন্তর্গত বরপেটার সাতমাইল দক্ষিণে অবস্থিত লোহিডঙরা (বর্তমান লোহগাঁও) নিবাসী জনৈক কুম্ভকার। তিনি নাকি উজ্জয়িনীবাসী জ্যোতির্বেত্তা মিহিরের বরে এক কুম্ভকারকন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার একটি বচনে তাঁহাকে ব্রাহ্মণবংশীয়ও বলা হইয়াছে। এইরূপ অনৈক্য ব্যক্তিহিসাবে ডাকের অনৈতিহাসিকতা সূচিত করে। ডাক যদি কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম হইত, তবে ডাকের বচন ভারতের আঞ্চলিক ভাষাবিশেষে সীমাবদ্ধ থাকিত। কিন্তু আমরা দেখিব যে, ভারতের পূর্বাঞ্চলের ঐ দেশত্রয় ব্যতীত অন্য কোনো কোনো অঞ্চলেও ডাকের বচন প্রচলিত আছে।

উত্তর প্রদেশে এই ধরণের সূক্তিগুলিতে 'ডাক'এর পরিবর্তে 'ঘাঘ'এর ভনিতা দেখা যায়। আসলে কিন্তু 'ঘাঘ' শব্দের অর্থ 'সুচতুর বৃদ্ধ বা জ্ঞানী ব্যক্তি।' ঘাঘের বচন সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে।[১] কোনো কোনো বচনে 'ভডরী'র উল্লেখ দেখা যায়। এই 'ঘাঘ' এবং 'ভডরী'র সহিত রাজস্থানী ভাষার সূক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। আবার রাজস্থানের কিংবদন্তী বাংলার ডাক ও খনার কাহিনীর উপর অনেকখানি আলোকপাত করে।

রাজস্থানের যোধপুরবাসী স্বর্গীয় জগদীশ সিংহ গহলোত মহাশয়ের 'রাজস্থানী কৃষিকহাবতেঁ' সংজ্ঞক গ্রন্থে বহুসংখ্যক ডাকের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। গহলোত মহাশয় যেমন পূর্বভারতে ডাকের অস্তিত্ব অবগত

১ সম্প্রতি ২০।৮।৬৪ তারিখের Statesman (কলিকাতা) পত্রিকায় এই সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। মিথিলাতেও ডাকের বচনকে অনেক সময় ঘাঘের বচন বলা হয়।

ছিলেন না, তেমনি পূর্বাঞ্চলেও রাজস্থানী ডাকের কাহিনী অজ্ঞাত। এখানে বলা প্রয়োজন যে, রাজস্থানের ডাককে বৌদ্ধ তন্ত্রাচার্যবিশেষ মনে করা কঠিন। কারণ ঐ অঞ্চলে তান্ত্রিক বৌদ্ধপ্রভাব বিস্তার লাভ করে নাই।

গহলোত মহাশয়ের গ্রন্থে খনা ও ডাকের বচনের অনুরূপ যে সূক্তিগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে কতকগুলিতে ভনিতা আছে এবং উহাতে বলা হইয়াছে যে, ঐগুলি ভডলী বা ভড্ডলীর প্রতি ডংকের উক্তি। এই 'ডংক' যে আমাদের 'ডাক' তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কারণ হিন্দীপ্রমুখ ভাষায় 'ডাকিনী'কে সাধারণতঃ 'ডংকিনী'ও বলা হইয়া থাকে। আবার রাজস্থানের ডাকোত সম্প্রদায়ের গ্রহাচার্যগণ আপনাদিগকে ডংকের বংশীয় বলিয়া দাবী করেন। 'ডাকোত' শব্দের অর্থ 'ডাকপুত্র' (ডাকবংশোদ্ভব)। তবে 'ডংক' নামের সহিত 'ডংকা' (নাগারা) শব্দের সম্পর্ক আছে কি না, তাহা বিবেচ্য। অবশ্য প্রাচীন ও মধ্যযুগে জনসাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয় ডংকা বাজাইয়া ঘোষণা করা হইত, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

রাজস্থানী কিংবদন্তী অনুসারে ব্রাহ্মণবংশীয় ডংক মহাভারতপ্রসিদ্ধ রাজা পরিক্ষিতের আমলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং সুপ্রসিদ্ধ ভিষগাচার্য ধন্বন্তরির কন্যা সাবিত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই সাবিত্রীর নামান্তর ভডলী বা ভড্ডলী। তিনিও জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শিনী ছিলেন। আবার ইহাও বলা হয় যে, ডংক সুবিখ্যাত জ্যোতির্বেত্তা বরাহমিহিরের পুত্র। অবশ্য পরিক্ষিৎ, ধন্বন্তরি এবং বরাহমিহিরের সমকালীনতার কল্পনা নিতান্তই হাস্যকর।

গহলোত মহাশয় অনুমান করিয়াছেন যে, ডাকোত গ্রহাচার্যেরাই আপনাদিগের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ডংক ও ভডলীর কাহিনী প্রচারিত করিয়াছে এবং জয়পুর অঞ্চলস্থিত সঙ্গনের নামক স্থানের ভডলী মেলার সহিত ডংকপত্নীর নামের সম্পর্ক রহিয়াছে। অবশ্য পূর্বভারত-প্রচলিত ডাকের কাহিনী লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, ডাকোতেরা ডংককে কল্পনা করে নাই; বরং ডাকোত নামটি ডংক বা ডাক নাম হইতে কল্পিত হইয়াছে।

রাজস্থানের গ্রহাচার্যদিগের ভডলী, গুরড়ে, থবরিয়া, শনিচরিয়া, দিশন্তরী, জোষী (জ্যোতিষী) প্রভৃতি নানা নাম আছে। এই 'ভডলী' সম্প্রদায়ের নাম হইতেই ডংকের পত্নীর নামকরণ হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। হিন্দী অভিধানে এই সাম্প্রদায়িক নামটি 'ভড্ডুর' বা 'ভড্ডর' আকারে দেখা যায়। 'ভডলী' বা 'ভডরী' শব্দের অর্থ গণৎকার বলিয়া বোধ হয়। ইহার সহিত হিন্দী 'ভড়রিয়া' (যাদুকর) শব্দ তুলনীয়। যাহা হউক, যে প্রকারে 'খনা' নারী জ্যোতির্বিদ্‌রূপে কল্পিতা হইয়াছেন, ঠিক সেইরূপেই 'ভডলী' বা 'ভড্ডলী'কে জ্যোতিষিণী কল্পনা করা হইয়াছে। যেমন খনা জ্যোতির্বেত্তা মিহিরের পত্নী, তেমনই 'ভডলী' বা 'ভড্ডলী' জ্যোতিষী ডংকের গৃহিণী। আবার মিহির এবং ডংক উভয়েই জ্যোতির্বিদ্‌ বরাহ বা বরাহমিহিরের পুত্র। প্রকৃতপক্ষে 'খনা' এবং 'ভডলী' (বা 'ভড্ডলী') এই দুইটি শব্দেরই 'অর্থ গণৎকার'।

নিম্নে আমরা গহলোত মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে ডংকের ভনিতাযুক্ত বচনগুলি উদ্ধৃত করিলাম।—

১। পরভাতে গেহ ডংবরা সাঁজে সীলা বাব।
ডংক কহে হে ভড্ডলী কালা তণা সুভাব॥

ডংক কহিতেছেন, "হে ভড্ডলী, যদি প্রভাতে মেঘ সরিয়া যাইতে থাকে এবং সন্ধ্যাকালে শীতলবায়ু প্রবাহিত হয়, তবে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা।"

২। উগংতেরো মাছলো আথঁবতেরো মোখ।
ডংক কহৈ হে ভডলী নদিয়াঁ চঢ়সি গোখ॥

ডংক ভডলীকে কহিতেছেন, "যদি প্রাতঃকালে রামধনু দেখা দেয় এবং সায়ংকালে সূর্যের কিরণ রক্তবর্ণ দেখা যায়, তবে নদীতে বন্যা আসিবে।"

৩। সাবণ পহিলী পংচমী ঝীনী ছাঁট পড়ৈ।
ডংক কহৈ হে ভডলী সফলা রূঁখ ফলৈ॥

ডংক কহিতেছেন, "হে ভডলী, যদি শ্রাবণমাসের কৃষ্ণ-পঞ্চমীতে বৃষ্টি হয়, তবে গাছে প্রচুর ফল ফলে।"

৪। ভাদরবে জগ রেলসী ছট অনুরাধা হোয়।
ডংক কহৈ হে ভডলী করো ন চিংতা কোয়॥

ডংক কহিতেছেন, "যদি ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় ষষ্ঠীতে অনুরাধা নক্ষত্র পড়ে, তবে দেশের সর্বত্র বৃষ্টি হয়। অতএব হে ভডলী, কোনো চিন্তা করিয়ো না।"

৫। চিত্রা দীপক চেতবে স্বাতে গোবরধন।
ডংক কহে হে ভডলী অথগ নীপজে অন্ন॥

ডংক ভডলীকে কহিতেছেন, "যদি চিত্রা নক্ষত্রে দীপাবলী হয় এবং পরদিন প্রাতঃকালে গোবর্ধন পূজার সময় স্বাতীনক্ষত্র পড়ে, তবে দেশে প্রচুর শস্য জন্মে।"

৬। দিবা বীতী পংচমী সোম শুকর গুরু মূল।
ডংক কহে হে ভডলী নিপজে সাতুঁ তূল॥

ডংক কহিতেছেন, "হে ভডলী, দীপাবলীর পর কার্তিক শুক্ল-পঞ্চমীতে যদি মূলা নক্ষত্রে সোম, বৃহস্পতি বা শুক্রবারের সংযোগ হয়, তবে সমস্ত রকমের ফসল প্রচুর জন্মে।"

৭। সুকরবাররী বাদরী রহী সনীসর ছায়।
ডংক কহে হে ভডলী বরস্যা বিনা ন জায়॥

ডংক ভডলীকে কহিতেছেন, "যদি শুক্রবার আকাশে মেঘ দেখা দেয় এবং শনিবার পর্যন্ত উহা থাকে, তবে বৃষ্টিপাত না করিয়া উহা যাইবে না।"

৮। মাহ মংগল জেঠ রবী ভাদরবৈ সন হোয়।
ডংক কহে হে ভডলী বিরলা জীবৈ কোয়॥

ডংক কহিতেছেন, "হে ভডলী, যদি মাঘমাসে পাঁচটি মঙ্গলবার, বা জ্যৈষ্ঠমাসে পাঁচটি রবিবার কিংবা ভাদ্রমাসে পাঁচটি শনিবার পড়ে, তবে ভীষণ দুর্ভিক্ষে সমস্ত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।"

৯। সোমাঁ সুকরাঁ সুরগুরাঁ জে চংদো উগংত।
ডংক কহৈ হে ভডলী জলথল এক করংত॥

ডংক ভডলীকে কহিতেছেন, "যদি আষাঢ়মাসে সোম, শুক্র কিংবা বৃহস্পতিবারে শুক্ল-প্রতিপদ্ তিথি পড়ে, তবে প্রবল বৃষ্টিতে জলস্থল একাকার হইয়া যায়।"

১০। পোহ সবিমল পেখজে চৈত নির্মল চংদ।
ডংক কহে হে ভডলী মন হূতাঁ অন মংদ॥

ডংক কহিতেছেন, "যদি সমস্ত পৌষ মাস আকাশে ঘনমেঘ দেখা যায় এবং চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে আকাশ মেঘমুক্ত থাকে, তবে, হে ভডলী, টাকায় একমণেরও বেশি শস্যাদি বিক্রয় হইবে।"

বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত ডাক(ডংক), ঘাঘ, খনা প্রভৃতির বচনগুলি সংগ্রহ করিয়া কেহ যদি তুলনামূলক আলোচনা করেন, তবে একখানি উপাদেয় গ্রন্থ হইতে পারে।

সংশোধন

বিশ্বভারতী পত্রিকা · বর্ষ ২১ সংখ্যা ২

পৃ ১১১ ছত্র ১৭ he was স্থলে he has

পৃ ১৪৯ বিনয়নী স্থলে বিনয়িনী

সন্দেশরাসকম্‌ কাব্যসমীক্ষা

কালিকারঞ্জন কানুনগো

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে সুপণ্ডিত মুনি জিনবিজয়, গুজরাট রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী "পাটন" (Anhilwarapattan) নগরীর জৈনগ্রন্থভাণ্ডার হইতে সন্দেশরাসকম্‌ কাব্যের এক প্রতিলিপি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই কাব্যের ভাষা সাধু অপভ্রংশ ভাষার "অপভ্রংশ" অর্থাৎ ঠেঠ, গ্রামীণ— যাহা ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পশ্চিম-ভারতের লোক-ভাষা। মুনি জিনবিজয়ের সমকক্ষ অপভ্রংশবিদ্‌ পণ্ডিত সেকালে কেহ ছিলেন না। পুথির পাঠোদ্ধার এবং অর্থবিচার করিতে বসিয়া মুনিজী হতাশ হইলেন, এবং এই কার্যে সহায়তা প্রার্থনা করিয়া প্রতীচ্য পণ্ডিত হেরম্যান য়াকবী-র শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। পাটনের পুথিতে সন-তারিখ টীকা-টীপ্পনি কিছুই ছিল না। দেবসাগর (?) নামক কোনো ভট্টারকের শিষ্য মুনি মানসাগর উহার লিপিকার বা নকলনবীস।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে জিনবিজয় পুনা ভাণ্ডারকর ইনস্টিটিউট্‌ পুথিশালায় সন্দেশরাসকম্‌ কাব্যের দ্বিতীয় প্রতিলিপি আবিষ্কার করেন। এই প্রতিলিপিতে মূল পাঠের সহিত সম্ভবতঃ কোনো ভিন্নব্যক্তি লিখিত অবচূরিকা নামক সংস্কৃত টীকা আছে। ইহার লিপিকার নয়সমুদ্র নামক জৈন সাধু। লিপিকার নিজের কোনো পরিচয় কিংবা স্থান সন তারিখ উল্লেখ করেন নাই।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মারবাড় রাজ্যের অন্তর্গত লোহাবত-নিবাসী জিন হরিসাগরজীর নিকট হইতে মুনি জিনবিজয় সন্দেশরাসকম্‌ কাব্যের এক তৃতীয় প্রতিলিপি পাইয়াছিলেন। এই প্রতিলিপিতে একটি ছোট সংস্কৃত টিপ্পনী আছে। এই টিপ্পনী পুনা-প্রতিলিপির টীকা অবচূরিকা হইতে কিঞ্চিৎ বিশদ, কিন্তু সংস্কৃত অত্যন্ত অশুদ্ধ। ইহার পুষ্পিকা (colophon) হইতে জানা যায় ইহার সংস্কৃত টীকাকার লক্ষ্মীচন্দ্র রুদ্রপল্লীয়গচ্ছ দেবেন্দ্র সূরির শিষ্য। লক্ষ্মীচন্দ্রের পিতার নাম হলিগ, মাতার নাম তিল্‌খু। লক্ষ্মীচন্দ্র হিসারদুর্গে বুধবার শুক্লাষ্টমী তিথিতে লেখনকার্য সমাপ্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন সালে লিখেন নাই। সুলতান ফিরোজ তোগলক পূর্ব পাঞ্জাবের হরিয়ানায় সুবিখ্যাত হিসার দুর্গ (পুরানাম হিসার ফিরোজা) নির্মাণ করিয়াছিলেন। ফিরোজ তোগলক ১৩৫১ হইতে ১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন ; সুতরাং সন্দেশরাসকম্‌ অন্ততঃ ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রচিত হইয়াছিল।

উপরিলিখিত তিন প্রতিলিপির সাহায্যে মুনি জিনবিজয় ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এই কাব্যের প্রথম সংস্করণ (হরিবল্লভ ভায়ানী লিখিত বিশদ সমালোচনা সহ) প্রকাশিত করিয়াছিলেন। প্রথম সংস্করণ ছাপা হইবার কিছু পূর্বে শ্রীযুত অমরচাঁদ নাহটা সন্দেশরাসকম্‌ কাব্যের এক খণ্ডিত প্রতিলিপি (মাত্র সাত পৃষ্ঠা) বিকানীরে আবিষ্কার করেন। ইহাতে যে সংস্কৃত টীকা আছে উহা পুণা প্রতিলিপির অবচূরিকা-র অনুরূপ, কেবল ভূমিকার চতুর্থপাদের শেষে "কুরুতে মুনিপুঙ্গবঃ" স্থানে "কুরুতে লব্ধিসুন্দর" পাঠ পাওয়া যায়, সন তারিখ স্থান অন্য কিছুর উল্লেখ নাই।

প্রথম সংস্করণ ছাপা হইবার পনর বৎসর পরে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী এবং শ্রীযুত বিশ্বনাথ ত্রিপাঠীর যুগ্মসম্পাদনায় এই কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। আচার্য দ্বিবেদীজী

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জয়পুর রাজ্যের এক দিগম্বর জৈন মন্দিরের পুথি-সংগ্রহের মধ্যে সন্দেশরাসকম্ কাব্যের পঞ্চম প্রতিলিপি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই পুথির পত্র সংখ্যা ৩১; কিন্তু প্রারম্ভের দুই পাতা নাই। ইহাতে যে সংস্কৃত টিপ্পনী আছে উহা পুনা-প্রতিলিপির "অবচুরিকা-র সহিত হুবহু মিলিয়া যায়, অথচ উহার মূলপাঠ এবং টিপ্পনীর মধ্যে স্থানে স্থানে অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য দেখা যায়। সম্পাদক দ্বিবেদী মন্তব্য করিয়াছেন,—"ইহাতেই বুঝা যায় লিপিকার এক পুথি হইতে মূলপাঠ এবং অন্য কোনো পুথি হইতে টীকা নকল করিয়াছেন··· এই টীকার কি নাম এবং উহার লেখক কোন ব্যক্তি কিছু নির্দ্ধারণ করা যায় না।" [প্রস্তাবনা, পৃ ২] জয়পুর-প্রতিলিপির অবচুরী নামকরণ করিয়া দ্বিবেদীজী উহা দ্বিতীয় সংস্করণে ছাপাইয়াছেন। এই অবচুরী-র শেষে লিখিত আছে—

সং ১৬০৮ বর্ষে বৈশাখ সুদি ১৪ রবিদিনে শ্রীসরস্বতী পত্তনে পাতিসাহ শ্রীইসিলেম স্যাহি বিজয়রাজ্যে। শ্রীবৃহদ্গচ্ছগগনাংগণ ভাস্করাণাং পূজ্যারাধ্য শ্রীশ্রীউদয়রাজ্য সূরীন্দ্রানাং বিজয় রাজ্যে। পূঃ শ্রীশ্রীসংযম রাজ সূরি শক্রাণাং বিনয়েন বাচনার্থং শ্রীমাণিক্যরাজ মিশ্রবরৈ আলিখ্য স্বপঠনায় বিচার-চতুরৈঃ সুযুক্তা শোধ্যং। যাদৃশং পুস্তকে দৃষ্টং তাদৃশং লিখিতং ময়া। যদি শুদ্ধমুদ্ধং বা মমদোষো ন দীয়তাং··· [বি. সম্বত ১৬০৮ (১৫৫২ খ্রীঃ) বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে রবিবারে শ্রীসরস্বতীপত্তনে শ্রীইসলাম শাহর (শেরশাহ-র পুত্র এবং উত্তরাধিকারী) রাজত্বকালে···শ্রীউদয়রাজ্যসূরির সময়ে পূজ্য শ্রীশ্রীসংযমরাজ সূরির অধ্যাপনার জন্য শ্রীমানিক্যরাজ মিশ্রের দ্বারা লিখিত। বিচার-চতুরগণ নিজে পড়িবার সময় ইহা সুযুক্তি দ্বারা শুদ্ধ করিয়া লইবেন। পুস্তকে যে প্রকার লিখিত আছে আমি সেরকম লিখিয়াছি। শুদ্ধাশুদ্ধির জন্য আমাকে দোষ দিবেন না]

এই "সুযুক্ত্যা শোধ্যম্" অধিকার সম্পাদক, সাহিত্যিক, গবেষক এবং সমালোচকগণ গত বিশ বৎসর যাবৎ এই সন্দেশরাসকম্ কাব্যের উপর নির্বিবাদে চালাইয়াছেন। জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি পড়িয়া মনে হইল, যাহা পূর্বে লেখা হইয়াছে উহার মধ্যে "শোধ্যম্" অনেক কিছু এখনও রহিয়াছে। সন্দেশরাসকম্ কাব্যের সমালোচনায় মধ্যযুগের ইতিহাসজ্ঞান নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই কাব্যের পূর্ববর্তী সমালোচকগণ ভাষাজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে অপরাজেয়; কিন্তু উঁহাদের মধ্যে ইতিহাস হয়তো কাহারও উপজীবিকা নহে। মধ্যযুগের ইতিহাস কোনো কোনো স্থানে তাঁহাদের সিদ্ধান্তের অনুকূল নহে, অনেকে খোলামন লইয়া বিচার করেন নাই। এই প্রবন্ধে আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করিব—

১. সন্দেশরাসকের রচয়িতা কি কোনো ধর্মান্তরিত তন্তুবায় পুত্র?

২. এই কাব্যের টীকাকার ও লিপিকার সকলেই জৈন পণ্ডিত এবং জৈন পণ্ডিতেরাই এই কাব্যের পঠন-পাঠন কেন করিতেন?

৩. এই কাব্যের পটভূমি কোথায়?

৪. দ্বিতীয় সংস্করণের কয়েকটা বিবদমান সিদ্ধান্ত।

৫. কাব্যের আনুমানিক রচনা কাল।

এই কাব্যের "কথাবস্তু" ব্যতীত উপরিলিখিত বিষয়-বিচারে বিশেষ কোনো বহিপ্রমাণ নাই। এই বিতণ্ডায় উভয়পক্ষের কথাবস্তু হইতেই সুযুক্তিগ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর নাই। সমসাময়িক সামাজিক ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ হইতে এই কাব্যের সারাংশ বাঙালি পাঠককে প্রথমে নিবেদন করা হইল।

সন্দেশরাসকম্ শৃঙ্গাররসাত্মক দূতকাব্য। এই কাব্যের অনামিকা নায়িকা গতানুগতিক রাজকন্যা নহেন; কাব্য পড়িয়া মনে হয় তিনি প্রোষিত-ভর্তৃকা সমৃদ্ধ বণিকপত্নী। এই কাব্যে নায়িকার দূত মেঘ, পবন, হংস কিংবা বিনয়পত্রিকাবাহক দরদী মানুষ নহে। দূত মূলতানবাসী এবং নায়িকার সম্পূর্ণ অপরিচিত বিদেশী পথিক। নায়ক অর্থাৎ নায়িকার স্বামীর নাম অজ্ঞাত। এই কাব্যের কথা সমাপ্তির ঠিক পরেই কেবলমাত্র রসভঙ্গ করিবার জন্যই অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার উপস্থিতি।

১. কথাবস্তু-সার[১]

[স্থান পশ্চিম-ভারতের কবি-কল্পিত বিজয়নগরের রাজপথ। সময় পরিণাম-রমণীয় কোনো অজ্ঞাত গ্রীষ্মের অপরাহ্ণ]

সূর্যদেব পাটে নামিয়াছেন। বিজয়নগরবাসিনী কোনো এক বরবর্ণিনী পথের দিকে চাহিয়া অশ্রুভারাক্রান্ত আয়তলোচনদ্বয় দ্বারা প্রবাসী পতির আগমনপথ যেন পরিমাপ করিতেছেন। মরালগামিনী অতিক্ষীণ-মধ্যমা সুন্দরীর কুচদ্বয় স্থূল স্থিরোন্নত। তাঁহার কাঞ্চনগৌর দেহকান্তি দীর্ঘ বিরহাগ্নির ধূমশিখায় পূর্ণগ্রাস-কবলিত শশীকলার ন্যায় শ্যামায়মানা; পাণ্ডুর মুখশ্রীর উপর অসম্বৃত অলকগুচ্ছ সন্ধ্যার অন্ধকারের ন্যায় নামিয়া আসিয়াছে; দীননয়না দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া নিজের আঁচলে ধারাবর্ষী নয়নদ্বয় মুছিতেছেন। এমন সময় তিনি দেখিলেন দূরে বহুদূরে বিপরীত দিক হইতে [উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে] একজন পথচারী যেন বাতাসে ভর করিয়া ঐ পথে আসিতেছেন, পথিকের পা দুইখানা যেন মাটি শুধু ছুঁইয়াই আছে। পথিককে দেখিয়া রোরুদ্যমানা সুন্দরী আত্মহারা হইয়া আলুথালু দৌড় দিলেন। দ্রুত দোদুল্যমান শ্রোণীভারে তাঁহার কিঙ্কিণীমুখরিত বিপুল নিতম্বলম্বিনী মেখলা দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। শক্ত গাঁট দিয়া ছিন্ন মেখলা বাঁধিয়া আবার দৌড়াইতেই উৎকণ্ঠিতার নয় লহরের মুক্তামালা ছিঁড়িয়া গেল। অধীরা বিরহিণী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মুক্তা কিছু কুড়াইয়া কাপড়ে বাঁধিয়া কিছু ফেলিয়াই আবার পথিকের দিকে ছুটিলেন; কয়েক পা যাইতে না যাইতে নূপুর পায়ে প্যাঁচ খাইয়া পদাধিকারিণীকে সটান ভূপাতিত করিল। লজ্জারুণা অথচ সপ্রতিভ রমণী উঠিয়া দাঁড়াইতেই তাঁহার মাথার ওড়না উড়িয়া গেল। মাথার ওড়না ঠিক করিয়া মুগ্ধা আবার চলিলেন; এবার দেখা গেল বুকের রেশমী চোলী ফাটিয়া স্থূল স্তনদ্বয় বাহিরে প্রকাশমান। সলজ্জভাবে কোনোরকমে দুই হাতে উহা ঢাকিয়া নায়িকা দ্রুত চলিতে লাগিলেন যেন দুইটি স্বর্ণকমল কনক-কলসীদ্বয়কে ঢাকিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে। পথিকের নিকটবর্তী হইয়া সাশ্রুনয়না করুণ কণ্ঠে ডাকিলেন, "দাঁড়াও পথিক! দয়া করিয়া আমার দুইটা কথা শুনিয়া যাও।"

নারীকণ্ঠের আর্তস্বর শুনিয়া পথিক কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন। কুচভিন্ন-চোলিকা, খণ্ডিত-রশনা, ব্রীড়ানত-মুখী রোরুদ্যমানা অনিন্দ্যসুন্দরীকে সম্মুখে দেখিয়া পথিকের "ন যযৌ, ন তস্থৌ" অবস্থা হইল। পথিক মূলতানবাসী বিদগ্ধ নাগর। তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্বগত একটি দোহা আবৃত্তি করিলেন—"পুষ্পধন্বার অমোঘ শায়ক তুল্য এ হেন লাবণ্যপুঞ্জাকে যিনি সৃষ্টি করিয়া নিজের কাছে রাখিলেন না, সেই বিধাতাপুরুষ কি অন্ধ? না কি ক্লীব?"

ইহার পর পথিক উচ্চস্বরে এক গাথাষ্টক সুন্দরীকে শুনাইলেন—···শৈলজা পার্বতীকে সৃষ্টি করিবার পর বিধাতা সেই ছাঁচে কিঞ্চিৎ পারিপাট্য করিয়া [সুসবিসেসং] এই বরাঙ্গযষ্টি নির্মাণ করিয়াছেন। স্বয়ং

---

১. ভাষা যথাসম্ভব মূল অপভ্রংশের বাংলা ভাবানুবাদ।

প্রজাপতি যখন সৃষ্টিকার্যে পুনরুক্তিদোষমুক্ত নহেন, কবিগণের "পুনরুক্তিদোষ" কেমন করিয়া নিন্দনীয় হইতে পারে?

এই রূপ-প্রশস্তি শুনিয়া লজ্জারুণা নায়িকা অধোবদনে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মাটি খুঁড়িতে লাগিলেন, (লক্ষণ ভালো নহে)। তিনি পথিককে আরও নিকটে ডাকিয়া কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পথিক! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? এখন কোথায় যাইবে?"

পথিক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নিজের শহর মুলতানের প্রশংসা নায়িকাকে শুনাইতে লাগিলেন।—

"অয়ি কমলদলনয়নে! আমার নিবাস সামোর [শাম্বপুর, মুলতান] ঐ নগরে সকলেই পণ্ডিত ও বিদগ্ধনাগর, গ্রামীণ মূর্খ কেহ নাই। এই নগর তুঙ্গ-ধবলপ্রাকারবেষ্টিত এবং সুরম্য ত্রিপুর-তোরণমণ্ডিত [তিউরি;হিন্দী ত্রিপোলিয়া]। নগরে প্রবেশ করিলেই মধুর প্রাকৃত ছন্দ শ্রুতিগোচর হয়। কোনো স্থানে "চৌবে" (চতুর্বেদী) ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করিতেছেন, কোথায়ও বা মহাভারত নলচরিত ইত্যাদি পাঠ হইতেছে; কোনো জায়গায় দ্বিজবর আশীর্বাদ দিতেছেন, অন্যত্র নিপুণ- নট রামায়ণ অভিনয় করিতেছে; কেহ কেহ বাঁশি বীণা ইত্যাদির বাজনা শুনিতেছে; কোনো স্থানে পথিমধ্যে "সুসমত্ত" উদ্ভিন্নযৌবনা নর্তকীগণের চঞ্চল বসনোত্থিত "চল্ল চল্ল" ধ্বনি বিলাসী নাগরের দেহ মন চলায়মান করিতেছে।

(মুলতান) নগরের "বেশবাড়া"-তে প্রবেশ করিলে অতি সুস্থির মস্তিষ্ক ব্যক্তিও ব্যামোহগ্রস্ত হয়। রূপের হাটে গজেন্দ্রগামিনী কোনো নর্তকী শরাবের নেশায় ধীরমন্থর গতিতে চলিয়াছে, ক্রীড়াচ্ছলে অন্য নর্তকীর মোতির দুলে দোল দিতেছে। কোনো সুন্দরীর সঞ্চারমান ক্ষীণকটি তাঁহার অতিপ্রকট ঘনতুঙ্গ বক্ষস্থলের ভারে কেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে না— দেখিলে মন বিস্ময়ে ভরিয়া উঠে। কোথায়ও দেখা যায় কোনো যৌবনমদমত্তা পথিমধ্যে কোনো কৃতার্থ পুরুষের উপর তীক্ষ্ণ তির্যক্ চাহনি হানিয়া কৃত্রিমকোপের তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক বিদ্রূপের ক্ষীণ হাসি হাসিতে হাসিতে আলাপনিরতা। অন্য লাস্যময়ী "সুবিচক্ষণা" যখন প্রাণভরা বিমল হাসি বিতরণ করেন, তখন তাঁহার শশীপ্রভ কপোলপ্রদেশ রবিকিরণোজ্জ্বল হাস্যচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া চন্দ্রমা মধ্যাহ্ন সূর্যবৎ প্রতীয়মান হয় (প্রভাবিশেষোদয়ে?) [সসি সুর নিবেসিয়]। রূপের হাটে কোনো রাজহংসগামিনীর অতি মন্থর সাবলীল পাদন্যাসে, বিকট-নিতম্বার গুরুশ্রোণীভারে ক্লিষ্ট কণ্ঠরুদ্ধ চর্মপাদুকার মচ্ মচ্ শব্দ পর্যন্ত নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। কোনো সুদন্তী সুভাষিণীর কথা বলিবার সময় তাঁহার তাম্বুলরাগরক্ত হীরক পঙক্তি সদৃশ দন্তরাজি রক্তদন্তিকার আরক্তিম আভা বিকীর্ণ করিতেছে··· "বেসবাড়া" নূপুরের ঝঙ্কারে মেখলার রণুঝুনু রবে বার-নারীর মতোই যেন মুখরা। সেখানে কোনো নর্তকীর লীলাচঞ্চল পাদন্যাসজনিত চর্মপাদুকার "চিক্কণ" (বাং কেঁচ কেঁচ) রব [চিক্কণরউ চম্বাইহিঁ] নব শরৎসমাগমে সারসীর করুণ মধুর ধ্বনির ন্যায় নাগরজনের চিত্ত আকুল করিতেছে। সেখানের পথ সুন্দর মুখনিসৃত পানের পিকে পিচ্ছিল; কান্তা মুখশ্রীর রূপের ধাঁধায় দিশাহারা পথিক পা পিছলাইয়া উহাতে গড়াগড়ি দেওয়ার বিলক্ষণ আশঙ্কা। পদস্খলনের পরেও যদি কাহারও ভ্রমণের অভিলাষ থাকে, তিনি (মুলতান) শহরের বাহিরে দশযোজন ব্যাপী উদ্যানপরম্পরার ছায়াঘন বীথির অন্তরালে সারা সংসার ভুলিয়া থাকিতে পারেন।···

[উদ্যানের গাছপালা পৃঃ ১৫-১৭]

[এই নগরের] তপনতীর্থ নাম প্রসিদ্ধ। পৃথিবী-মধ্যে এই নগর মূলস্থান নামে পরিচিত। ঐ স্থান

হইতে আমার মুনিবের হুকুমে তাঁহার গোপনীয় সাংকেতিক বার্তা লইয়া আমি খাম্বাত (Port of Cambay) যাইতেছি।”

২

পথিকের মুখে “খাম্বাত” নাম শুনিতেই নায়িকা বায়ুতাড়িত কদলীর ন্যায় থর থর কাঁপিতে কাঁপিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ কান্নার পরে সাশ্রুনয়না সুন্দরী গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন, ‘পথিক্! খাম্বাত নাম কর্ণে প্রবেশ করিয়া আমার ধূমায়িত বিরহাগ্নিতে ফুৎকার দিয়াছে। যদি আধাক্ষণ পা গুটাইয়া বস তাহা হইলে সংক্ষেপে প্রিয়তমের কাছে সন্দেশ নিবেদন করিতে পারি; দীর্ঘদিন অতীত হইয়াছে, প্রবাসী প্রিয়তম বাড়ি ফিরে নাই।

[সুন্দরীর সাশ্রুকাকুতি পথিককে পথে বসাইল। অতঃপর নানা ছন্দে বিরহিণীর দুঃখ নিবেদন]··· প্রিয়তমকে বলিও, এক হাতের বালার মধ্যে আমার দুই হাত ঢুকিয়া যায়, কড়ে আঙ্গুলের আংটি “বাহুটী” (armlet) হইয়া গিয়াছে···’ [ইহার পর সংবাদ মারফত কখনও করুণ আবেদন, কখনও শবর, শঠ, কাপালিক ইত্যাদি গালাগালি]

দরদী পথিক বিদেশিনীকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, “অয়ি আয়তাক্ষি! প্রবাসী পুরুষ বিবিধ কার্যে বিদেশে যায়, এখানে সেখানে দৌড়াদৌড়ি করে, নিজের উদ্দেশ্য সফল না করিয়া ফিরে না। হে মুগ্ধে! বিরহকাতর প্রবাসীও গৃহিণীকে স্মরণ করিয়া তোমার মতো দিন দিন ক্ষীণ ও খিন্ন হয়।··· বারবার চোখের জল ফেলিয়া আমার পথযাত্রায় অমঙ্গল করিও না··· যাহা বলিবার আছে শীঘ্র বলিয়া ফেলো। দিন ডুবিয়াছে, আমাকে বিদায় দাও।” সজলনয়নে সুন্দরী পাল্টা আবদার করিয়া বসিলেন, “পথিক্, যাইবার কথা এখন ছাড়ো। এইখানে রাত্রি যাপন করিয়া কাল ভোরে চলিয়া যাইও। যদি থাকিতে না পার এই কয়টি “গাথা” শুনাইয়া দিও।”

[কিন্তু নায়িকার কথা ফুরাইতে চায় না; পূর্বদিকে আঁধার নামিয়াছে, রাস্তা দুর্গম ও ভয়বহুল, রাত্রে চলা যায় না; কাজ কিন্তু অতি জরুরি— ইত্যাদি পথিকের কোনো অজুহাত টিকিল না। বিঘোরে পড়িয়া বিরহিণীর মুখে গোটা বারমাসা[২] শুনিবার পর পথিক কষ্টে রেহাই পাইলেন]···

“হে পথিক! গ্রীষ্ম ঋতুর প্রারম্ভে প্রিয়তম যেদিন প্রবাস যাত্রা করিলেন, সেদিন যখন আমি তাঁহাকে শেষ প্রণাম করিলাম তখন [আমার] সুখও আমাকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গিয়াছে।··· গ্রীষ্মের তাপে [এঁটেল] মাটি চড়্‌চড়্ [মূল “তড়্‌তড়্”] করিয়া ফাটিয়া যায়; বিরহিণীর বুক ফাটে, কলিজা ফাটে না। “আঁধি”-র [ডুঁড্যালক] গরম বাতাস বিরহিণীর গায়ে লাগিলে আঁধিই জ্বালায় অস্থির হয়। আকাশে নূতন মেঘের আশায় চাতক “পিউ পিউ” ডাকে। গ্রীষ্মে আম্রবৃক্ষের শোভাসম্পদ ও আনন্দ বিরহিণীর ঈর্ষার উদ্রেক করে। ফলের ভারে গাছ নুইয়া পড়িয়াছে। ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া পাখি আসিয়া গাছে বসে, পাতার আড়ালে ডালে ডালে দোল খায়, টেঁ টেঁ করে। চাঁদের আলো, শীতল চন্দন, সুখ-স্পর্শ মুক্তার হার কিংবা পঙ্কজমালা বিরহের তাপ উপশম না করিয়া বরং দ্বিগুণিত করে; যেহেতু রবিপ্রিয়া

২. ষড়্‌ঋতু বর্ণনা

কমলিনী সংসর্গদোষে জ্বালাদৃপ্তা, মহাবিষের অগ্রজন্মা শশীকলার শীতরশ্মি বিষদিগ্ধ, ভুজঙ্গালিঙ্গিত হরিচন্দন বিরহরোগীর পক্ষে ঠাণ্ডা বিষ, লবনাম্বুপোষিত মুক্তাফলের স্পর্শ কন্দর্পবাণের ক্ষতের উপর ক্ষারপ্রক্ষেপ মাত্র।

বর্ষা নামে, কিন্তু প্রিয়তম ফিরে না; প্রাবৃটের ঘোরঘটা আঁধার মনে দ্বিগুণ নিরাশার সঞ্চার করে। মেঘসমাগমে ধরিত্রী অভিনব অভিসার-সজ্জায় সাজিয়াছেন। ধরাবধূর অঙ্গে ইন্দ্রগোপ-খচিত [বর্ষার লালপোকার ঝাঁক] রক্ত দুকুল; শুভ্র কর্দম-লেখা কপোলে চন্দনপত্রক রচনা; কদম্বপুষ্প শ্যামাঙ্গিনী বসুধার দেহসুরভি। আমি রাত্রিকে মনের কথা শুনাইয়া বলি, 'হে যামিনী! দুঃখের দিনে তুমি চতুর্গুণ বাড়িয়া থাক, কিন্তু সুখের সময় ছোট হও।'

বর্ষার জল পথিপার্শ্বের জলাশয় ভাসাইয়া পথঘাট ডুবাইয়াছে, পথচারী পায়ের জুতা হাতে লইয়া চলিতেছে; ভরা নদী দুস্তর খরস্রোতা। [গৃহমুখী] প্রবাসী চারিদিকে আট্‌কা পড়িয়াছে। কাজের তাগিদে কাহারও কোথায় যাইতে হইলে পায়ে হাঁটিয়া কিংবা ঘোড়ায় চড়িয়া যাইবার যো নাই, নৌকাই ভরসা।··· সাপগুলি গর্ত হইতে উঠিয়া পথ বিপদসঙ্কুল করিয়াছে··· মশার ভয়ে গরুগুলি ডাঙ্গা জমিতে আশ্রয় লইয়াছে।

অগস্ত্যোদয়ে শরৎসমাগমে আকাশে, বাতাসে, সরোবরে, নদীতটে সর্বত্র আনন্দের শুভ্রহাসি। মেঘমুক্ত আকাশে চন্দ্র-তারকার হাসি, জলাশয়ে উৎফুল্ল নলিনীর হাসি, নদীতীরে সঘন কাশবনের হাসি। গৃহস্থের ঘরে ঘরে রূপের খেলা, ক্রীড়ার লাস্য, সংগীতের আনন্দহিল্লোল। স্বামীসোহাগিনীগণ বিবিধ অলঙ্কারে সাজিয়া নানা রংএর ছাপা শাড়ি পরিয়া রাসনৃত্যগীত করিতেছে, ঘরে ঘরে ঢোলক বাজিতেছে, স্ত্রীলোকেরা স্বামীর সঙ্গে সরোবরের শোভা দেখিতেছে, যুবকেরা খেলিতেছে, বালকেরা খেলা দেখিতেছে। তরুণীগণ রূপের ঢেউ তুলিয়া, বিবিধ বাজনা বাজাইয়া, কুণ্ডলাকারে নাচিতে নাচিতে অলিগলি ফিরিতেছে।

দীপাবলী অমাবস্যায় স্ত্রীলোকেরা দীপ দান করে, নূতন দীপ জ্বালাইয়া ঘর সাজায়, বিবিধ ভঙ্গীতে "বহুবিধ কুটিল তরঙ্গে শোভমান্ কৃষ্ণাম্বর" [শাড়ি? না লেহেঙ্গা?] পরিধান করে; সীমন্তে সাদা ফুলের মালা পরিয়া কৃষ্ণবসনা সুন্দরীগণ কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত তোরণের শীর্ষদেশে চন্দ্রোদয়ের বিভ্রম সৃষ্টি করে।···

হে পথিক! যে দেশে প্রিয়তম প্রবাস করিতেছে সেই দেশের চাঁদে কি জ্যোৎস্না নাই? হংস পদ্মবীজ ভক্ষণ করিয়া সেই দেশে কলরব করে না? কেহ কি মধুর স্বরে সুললিত প্রাকৃত ভাষায় বাক্যালাপ করে না? কিংবা প্রত্যুষে শিশিরসিক্ত সঘন কুসুম-সুষমা চতুর্দিক গন্ধে আমোদিত করে না?

উৎকণ্ঠায় অধীর চিত্তে অপেক্ষা করিতে করিতে কুয়াসার [ওড়না] উপঢৌকন লইয়া হেমন্ত উপস্থিত হইল। এই ঋতুতে প্রসাধনের জন্য স্বৈরন্ধ্রীগণ অভিসারিকার জন্য কর্পূরের সহিত চন্দন পিষে না, অধর ও কপোল রাগের সহিত মোম মিলায়। লোকে এই সময়ে কস্তুরীর সহিত চাঁপাফুলের তেল সেবন করে, জায়ফলের সঙ্গে কর্পূর কিংবা সুপারির সহিত কেয়া ফুলের নির্যাস [কেওড়া] তাম্বুলবিলাসীরা বর্জন করে। রাত্রে স্ত্রীলোকেরা ছাদে বিছানা করে না, ঘরের বারান্দায় শুইতে আরম্ভ করিয়াছে।··· দৈর্ঘ্যে হেমন্তের দিন অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ; কিন্তু অভাগিনীর পক্ষে এ হেন একটা দিনও যেন ব্রহ্মার একটি যুগ।··· [প্রিয়তমের প্রতি] রে মূর্খ! খল! পাপী! তবে কি তুই আমার মরণের খবরের জন্য বসিয়া আছিস?

শীতকাল আসিল; কিন্তু ধূর্ত [প্রণয়ী] এখনও দূরে দূরে ঘুরিতেছে। শীতের কন্‌কনে দম্‌কা বাতাসে গাছে পাতা নাই, ফুল নাই, ফল নাই, পাখিও নাই, বাগানে ফুলের কেয়ারী আধমরা হইয়া খাঁ খাঁ করিতেছে।

লুব্ধ প্রণয়ীজনকে শিলাশীতল কেলিগৃহে বসাইয়া রাখিয়া বিলাসিনীগণ অগ্নিগৃহে তাপ সেবন করে। মদ্যপায়ীরা মদ্যপান ত্যাগ করিয়াছে। এবং বিবিধ গন্ধদ্রব্যে সুবাসিত "রস" [ইক্ষুরস ?] পান আরম্ভ করিয়াছে। যাঁহারা রসিক তাঁহারা অর্ধাবর্ত [আধপোড়া] ইক্ষুরস সেবন করিতেছেন। সীমন্তিনীগণ কুন্দচতুর্থী তিথিতে বাসর শয্যারচনা করিতেছেন [বিবাহবার্ষিকী উদ্‌যাপনার্থ ?]। কোনো রমণী ঋতুরাজ বসন্তের জন্মদিনে [মাঘমাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে] দান দিতেছেন।

মাদৃশা মুগ্ধা অভাগিনী প্রিয়তমকে ফিরাইয়া আনিবার আশায় "মনোদূত" পাঠাইয়াছিল। [হতভাগা] মন আমার কাজ ভুলিয়া প্রিয়তমের কাছেই পড়িয়া রহিল! কানকাটা গর্দভীর[৩] মতো আমি এখন অনুশোচনা করিয়া মরিতেছি [প্রিয়তম মনটাকে ভাগাইয়া লইলেন, লাভের বদলে ক্ষতিই কপালে রহিল]।

বনের ঘাস পর্যন্ত জ্বালাইয়া শীত অবশেষে বিদায় হইয়াছে। বিরহিণীর ধূমায়মান মদনাগ্নিতে মলয়সমীরণ নিরন্তর ফুংকার দিতেছে।...... বৃক্ষসমূহ মধুমাস-লক্ষ্মীর জন্য নবকিশলয় শয্যা রচনা করিতেছে, ভ্রমর মৃদুগুঞ্জনে বসন্তের আগমনী গাহিতেছে। শ্বেতরক্ত পুষ্প-লাঞ্ছিত বিচিত্রবসনা কামিনীগণ সখীপরিবৃতা হইয়া বসন্তসংগীতে মাতিয়া উঠিয়াছে। ঘনসন্নিবিষ্ট কণ্টক পত্রান্তরে প্রচ্ছন্ন কেতকী-কোরকের গন্ধে আকৃষ্ট রসিক ভ্রমর বিফল চেষ্টায় ক্ষোভ ভরে গুন গুন করিতেছে, কেয়া পাতার কাঁটায় পাখা ক্ষত-বিক্ষত হইলেও মরিয়া হইয়া আবার পথ খুঁজিতেছে। রসলুব্ধ যথার্থ প্রেমিক ঈপ্সিত প্রাপ্তির পথে দেহবিসর্জন করিতে কুণ্ঠিত হয় না, প্রেমের [কামের ?] মোহে পাপকে পাপ মনে করে না।...

বসন্ত ঋতুতে বাড়বাগ্নির উত্তাপে সমুদ্র আকুল হইয়া গর্জন করে, ঘূর্ণাবর্তসঙ্কুল ও দুর্বার তরঙ্গবিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। তবুও লাভের আশায় বণিকেরা ভয় বিপদ তুচ্ছ করিয়া সমুদ্রযাত্রা করে। প্রেমের দুর্গে সুরক্ষিত আমার স্বামীও নির্ভয়ে নিরাপদে বাণিজ্য [সামুদ্রিক] করিতেছেন।...

শিমুল গাছ লালে লাল হইয়া গিয়াছে যেন গাছের উপর রক্তবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পলাশ সাক্ষাৎ "পলাশ" [মাংসাহারী রাক্ষস] হইয়াছে, সজিনা [সইজন্] অসুখের কারণ হইয়াছে... অশোক বৃক্ষকে "অশোক" নাম মিথ্যা দেওয়া হইয়াছে, ক্ষণেকের জন্য উহা বিরহিণীকে শোকরহিত করে না; [মাধবীলতার] "সহকার" [আম্রবৃক্ষ] বিরহবিমর্দিত অঙ্গলতাকে আশ্রয় [হিঃ সহরা] দেয় না... নিবিড় নিরন্তর পল্লবস্নিগ্ধ পাটল উন্নতশীর্ষ আম্রবৃক্ষসমূহ আকাশে বসন্তশ্রীর জন্য আসন পাতিয়াছে। কৃষ্ণকোকিল "সুরক্তক" [আম্র ?] বৃক্ষের উপর বসিয়া ভরতমুনির শিষ্যের মতো বিশুদ্ধ তানলয়ে গান ধরিয়াছে। বসন্ত আসিয়াছে; শুকদম্পতি সুখের আশায় নাচিয়া নাচিয়া নীড় নির্মাণ করিতেছে। যৌবনমদমত্তা তরুণীগণ লাস্যচেষ্টিত অঙ্গভঙ্গি করিয়া চতুষ্পথে "চর্চরী" [হোলির নাচ] নৃত্যে মাতিয়াছে; তাহাদের মেখলালম্বিত কিঙ্কিনী সমূহ হাততালির সহিত তাল মিলাইয়া রুণুঝুণু ধ্বনি করিতেছে।...

পথিক! অতিদুঃখে আমার মুখ দিয়া যাহা কটূক্তি বাহির হইয়াছে ঐ গুলি বাদ দিয়া বিনয়-সন্দেশ প্রিয়তমকে এই ভাবে নিবেদন করিবে যেন তিনি রাগ না করেন।"

---

৩ লোককে গুঁতাইবার জন্য এক গর্দভী এক জোড়া শিং প্রার্থনা করিয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট ধর্ণা দিয়াছিল। পিতামহ তাহাকে শিং দিলেন না; অধিকন্তু তাহার দুই খানা কান কাটিয়া রাখিয়া বিদায় দিলেন। গর্দভী হায় হায় করিতে করিতে ফিরিয়া আসিল। পরে অবশ্য ব্রহ্মা তাহাকে ডবল সাইজের দুখানা কান খয়রাত করিয়াছিলেন।— ইতি পশ্চিম ভারতীয় পৌরাণিকী শ্রুতি।

নায়িকা পান্থদূতকে বিদায় দিয়া ঘরমুখী হইলেন এবং দক্ষিণ দিকে রাস্তার মোড় ঘুরিতেই দেখিতে পাইলেন তাঁহার স্বামীও বাড়ির দিকে আসিতেছেন।

ক্ষণার্ধের মধ্যে নায়িকার যেমন অচিন্ত্য মহতী সিদ্ধিলাভ হইল, যাঁহারা এই "রাসক" পাঠ কিংবা শ্রবণ করিবেন তাঁহাদেরও অনুরূপ কার্যসিদ্ধি হউক্! অনাদি অনন্ত অনাগত কালের জয় হউক্!

(ক) "বিজয়নগর" কোথায়?

সন্দেশরাসক প্রেমগাথার নায়িকাকে কবি বলিয়াছেন, "বিজয়নগরের কোনো এক বররমণী"। কিন্তু টীকাকার বিজয়নগরকে "বিক্রমপুর" করিয়াছেন— "সা বিক্রম পুরাং কাচিদ্দূরনায়িকা"। টীকাকার কেন ইহা করিলেন? পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে (১৪০৮ খ্রীঃ) লক্ষ্মীচন্দ্র নামক জৈন সাধু সন্দেশরাসকের প্রথম টীকা লিখিয়াছিলেন। তিনি পরিষ্কার ভাবে বলিয়া দিয়াছেন যে, এই কাব্যের কোনো বৃত্তি টীকা ইত্যাদি নিজের চোখে দেখেন নাই; কিংবা কোনো গুরুর নিকট হইতে এই কাব্যের পাঠ গ্রহণ করেন নাই; কিংবা স্বয়ং গ্রন্থকর্তার মুখে এই কাব্যের পাঠ এবং ব্যাখ্যা শুনিবার সুযোগও তাঁহার ঘটে নাই। ক্ষত্রিয় গাহড়ের মুখে এই কাব্যের ভাবার্থ যাহা কবি শুনিয়াছেন উহাই ঠিক তেমনি রাখিয়াছেন।··· কোনো দোষ ভুল ভ্রান্তি যদি কিছু টীকায় ধরা পড়ে ঐ গুলির জন্য দোষী তিনি নহেন, সত্যমিথ্যা গাহড় ক্ষত্রিয়ই জানেন। সুলতান ফিরোজ শাহর রাজত্ব কালে (১৩৫১-১৩৮৯ খ্রীঃ) পূর্বপাঞ্জাবে হিসার দুর্গ ও শহর নির্মিত হইয়াছিল। এই হিসার দুর্গে বি. ১৪৬৫ [১৪০৯ খ্রীঃ] বুধবার শুক্লাষ্টমী তিথিতে লক্ষ্মীচন্দ্র কাব্যের অবচূরিকা নামক টীকা রচনা সমাপ্ত করিয়া ছিলেন।

লক্ষ্মীচন্দ্র ও তাঁহার উপদেষ্টা গাহড় ক্ষত্রিয়ের সময় উত্তর ভারতে কোনো বিজয়নগর ছিল না, দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন বিজয়নগর তখন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। "রাসকের" কবি মূলতান ও কাম্বের মধ্যবর্তী বিজয়নগর নামক স্থান কোথায় পাইলেন? সুতরাং তাঁহারাই সর্বপ্রথম গবেষণা করিয়া বিজয়নগরকে বিক্রমপুর করিয়াছিলেন। এই বিক্রমপুর কোথায় লক্ষ্মীচন্দ্র স্পষ্ট বলেন নাই। আর একদফা অত্যন্ত আধুনিক হিন্দীগবেষণায় এই বিক্রমপুর জয়সলমীর রাজ্যের অন্তর্গত বিকুঁমপুর হইয়া গিয়াছে।

সন্দেশরাসকের আবিষ্কর্তা এবং ঐ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের সম্পাদক মুনি জিনবিজয় সূরি লক্ষ্মীচন্দ্রের টীকা "বিক্রমপুরাং" এর উপর তস্য টীকা করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই "বিক্রমপুর" জয়সলমীরের অন্তর্গত। দ্বিতীয় সংস্করণের যুগ্ম সম্পাদকও উহাই মানিয়া লইয়াছেন। এই কাব্যের রচনা কাল মুনিজী সিহাবুদ্দীন মহম্মদ ঘোরীর ভারতবর্ষ আক্রমণের পূর্বে অনুমান করিয়াছেন। এই অনুমান সমর্থন করিবার পূর্বে ত্রিপাঠীজী জয়সলমীরের হিন্দী ইতিবৃত্তের পাতা উল্‌টাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিতেন খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত জয়সলমীরের অন্তর্গত বিক্রমপুর বা বিকুঁমপুর বনজঙ্গলের মধ্যে এক পরিত্যক্ত স্থান ছিল। আমীর তৈমুর তোগলক্ সাম্রাজ্যের ছায়ালোপ করিবার পরে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে রাও কেলন (বিকুঁমপুরের কেল্‌না ভাটি শাখার আদি পুরুষ)[৪] এই বিকুঁমপুর পুনঃ স্থাপিত করিয়াছিলেন। সুতরাং

৪ বিকুঁমপুরের দূরত্ব জয়সলমীর শহর হইতে ৭০ ক্রোশ উত্তর দিকে; বিকানীর হইতে ৪০ ক্রোশ পশ্চিমোত্তর এবং মারবাড় রাজ্যের ফলোধি পরগণা হইতে ২৫ ক্রোশ উত্তর-পূর্বে। মূলতান হইতে বর্তমান বাহবলপুর রাজ্যের অন্তর্গত দেরাবল নামক স্থানের [বিকুঁপুর হইতে ৬০ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে] উপর দিয়া বিকানীর ও জয়সলমীর রাজ্যের সহিত বাণিজ্যপথের সংযোগস্থলে বিকুঁমপুর অবস্থিত। [দ্রঃ নৈনসী খ্যাত, দ্বিতীয়ভাগ পৃঃ ৩৫৪-৩৫৫]

দেখা যাইতেছে, বিকুঁপুর টীকাকার লক্ষ্মীচন্দ্রের সময়ে (১৪০৯ ইং) সম্ভবতঃ সমৃদ্ধ ও সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। লক্ষ্মীচন্দ্রের "গাহড় ক্ষত্রিয়" কবি অদ্দহমাণের বিজয়নগরকে বিক্রমপুর করিয়া গোলে-হরি-বোল দিয়াছেন, যেহেতু উত্তর-ভারতে কাম্বে ও মুলতানের মধ্যে বিজয়নগর নামে কোনো শহর কোনো কালে ছিল না। আধুনিক পণ্ডিতমণ্ডলী হয়তো কোনো মানচিত্রে মুলতান হইতে কাম্বে পর্যন্ত সোজা লাইন টানিয়া দেখিয়াছেন উহা জয়সলমীর রাজ্যের উপর দিয়াই যায়, এবং এই জন্যেই বিক্রমপুর সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন, উহা আকাশমার্গ; মুলতান হইতে কাম্বে যাইবার হাঁটা পথ আদৌ কোনো কালে জয়সলমীর রাজ্যের ভিতর দিয়া ছিল না।[৫] সেকালে সার্থবাহগণ বিকুঁমপুর পৌছিয়া কোনো দল বিকানীর-নাগোরের দিকে, কোনো দল জয়সলমীর হইয়া মারবাড় রাজ্যে যাইত। ফিরিবার পথে বণিক্ ও যাত্রীগণ অমরকোট [জয়সলমীর হইতে ৯০ ক্রোশ পশ্চিমে] ও সিন্ধুদেশের ভিতর দিয়া মুলতানে ফিরিত। মুলতান হইতে কাম্বে যাওয়ার প্রধান পথ— মুলতান— রোহরী [সিন্ধুপ্রদেশ] অমরকোট— বড় রুণ (Greater Runn of Kutch) পার হইয়া রাধানপুর— রাধানপুর হইতে ছোট রুণ পার হইয়া সৌরাষ্ট্রগুজরাটের ঢোল্‌কা— দক্ষিণ দিকে কাম্বে উপসাগরের তীরে কাম্বে বন্দর।

১. মুলতান— বাহবলপুরের মরুভূমি—ভাট্‌নের—হিসার—দিল্লী।

২. মুলতান—দেরাবল—বিকুঁমপুর—জয়সলমীর।

৩. মুলতান—উচ্ছ শহর—রোহ্‌রী (সিন্ধু প্রদেশ)—অমরকোট—রাধানপুর—ঢোল্‌কা—কাম্বে।

আধুনিক হিন্দী সাহিত্য সমালোচকগণ কবি-কল্পিত বিজয়নগরকে জয়সলমীরের বিক্রমপুর ভ্রম করিয়া কবির প্রতি অবিচার করিয়াছেন, তাঁহার কবিতা-সরস্বতীকে উট-পাখির উপর বসাইয়াছেন। নায়িকার বিলাপে ও ষড়ঋতুবর্ণনায় রাসকের কবি যে সুজলা সুফলা প্রকৃতির ছবি আঁকিয়াছেন উহা পূর্ববঙ্গ কিংবা লাট-গুর্জর ভূমির বর্ষণ-মুখরা হাস্যময়ী প্রকৃতির ছবি হইতে পারে; রাজপুত মরুস্থলীর উদাসিনী প্রকৃতির করুণাবিমুখ কঠোরতার লেশও উহাতে নাই। রাসক-কাব্যে বিজয়নগরের যে সমাজচিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়াছে উহা মারোয়াড়ী কিংবা বাঙ্গালী সমাজ নহে। ঐ সমাজ সুবিলাসী ঐশ্বর্যশালী গুজরাটী সমাজ; যে সমাজের লাট-নারী বাৎস্যায়নের কাল হইতে রতোৎসবে নৃত্যপরায়ণা ছিল, এবং এই যুগেও যেখানে নিত্য রাস ও গর্বা নাচ লোকজীবনের এক বিশিষ্ট অঙ্গ হইয়া রহিয়াছে। পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে রাসকের নায়িকার দেশে বালু নাই, উট নাই, অন্নজলের দুর্ভিক্ষ নাই, ছাগল ভেড়ার পাল নাই; স্ত্রীলোকের পরণে ও গায়ে মোটা কম্বল নাই, মাথায় জলের কলসী ও হাতে হালকা কুড়োল নাই। এ হেন দেশ কেমন করিয়া ধূ ধূ মরুর বুকে রাসক-কাব্যের বিক্রমপুর হইতে পারে? ইহার পরেও যদি কেহ কুতূহলী হইয়া "বিজয়নগর" কোথায় জিজ্ঞাসা করেন তাহা হইলে আমরা বলিব যেখানে নির্বাসিত যক্ষের অলকাপুরী সেইখানে—ভারতবর্ষের মানচিত্রে নহে।

কাব্য-নাটকে কিংবা লোকগীতি-প্রেমগাথায় ব্যক্তিসত্তা, স্থান ও কালের অনুসন্ধান রামের হেম-মৃগ অন্বেষণ, ইহাতে ব্যাপৃত হইলে "ধীয়োঽপি পুংসাং মলিনীভবন্তি"। সুতরাং মুনিজী-র মতিভ্রম এই ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক নহে।

---

৫ মধ্যযুগে মুলতান হইতে পূর্ব, পূর্ব-দক্ষিণ এবং দক্ষিণ দিকের প্রধান বাণিজ্যপথ।

মহাকবি গ্যেটে

আনুমানিক আটত্রিশ বৎসর বয়সে

কাব্য ও জীবনজিজ্ঞাসা : গ্যেটে

শ্রীদেবব্রত সিংহ

ভূমিকা

কাব্য ও জীবন, সাহিত্যসাধনা ও জীবনানুশীলন—এ দুয়ের অন্তরঙ্গ সন্নিকর্ষ প্রতিভার লক্ষণ হিসাবেই স্বীকৃত হত যে যুগে, সে যুগ প্রায় অতিক্রান্ত। তাই 'কাব্য জীবন-প্রত্যক্ষের বোধগোচর সারমর্ম' [১]— এমন সংজ্ঞানির্দেশ আধুনিক কাব্যজিজ্ঞাসায় কতটা গৃহীত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে। তবে যাঁর এই উক্তি, জর্মানীর কবিপ্রতিভার সেই শ্রেষ্ঠ পুরোধা গ্যেটের আপন কাব্যসাধনা ও প্রতিভার মর্মানুশীলনে উক্তিটি যে একটি সূত্রস্বরূপ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ গ্যেটের কাব্যের তথা সাহিত্যসাধনার ক্রমঃ-পরিণতিতে ও বিপুল ব্যাপ্তিতে আন্তর জীবনের পদক্ষেপ মূর্ত হয়ে উঠেছে। ভূয়োদর্শন আর জীবনচর্যা এসে সমাহৃত হয়েছে নিবিড় জীবনবোধে, এবং তার সাথে অঙ্গীকরণ ঘটেছে সুপরিণত বিশ্ববীক্ষণের— অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় যুগমানসের সার্থকতম অভিব্যক্তি, জর্মানীর কবিশ্রেষ্ঠ য়োহান্ হ্বোল্ফ্গাং গ্যেটের (১৭৪৯-১৮৩২) মধ্যে।

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের ঐতিহ্যগত 'সার্বিক প্রতিভা'র (universal genius) অন্তিম প্রতিভূ গ্যেটে। পরিপূর্ণ জীবননিষ্ঠা, জীবনের সর্বাঙ্গীণ অনুশীলন, বহুবিচিত্রের রসাস্বাদন, অথচ সার্বজনীনতার মধ্যে বিচিত্রের অনুসরণের মধ্যে ঐক্যের সুর—উক্ত সার্বিক মানসের এই লক্ষণ। এই সার্বিকতার দাবী গ্যেটে-প্রতিভায় পুরোমাত্রায় রয়েছে। তাঁর আত্মপ্রকাশের ধারা বিচিত্রগামী হয়েছে, বহুমুখী পরিচয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব সমৃদ্ধ ও মহীয়ান্ হয়েছে। তিনি কবি, 'ফাউস্ট' মহাকাব্যের রচয়িতা আবার তদানীন্তন অভিজাত শাসনতন্ত্রে হ্বাইমারের রাজসভায় তাঁর প্রতিষ্ঠা। তিনি রাজনীতিবিদ্ ও শাসন-পরিচালক ; তিনি বিদগ্ধ, তিনি আবার বৈজ্ঞানিক। জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পচর্চার বিভিন্ন শাখায় বিশেষজ্ঞতার ধারার সূত্রপাত হল ইউরোপে উনবিংশ শতাব্দীতে গ্যেটের উত্তরযুগেই। গ্যেটের আপন কালেও জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিভাগ ও আবিষ্কার এতটা বিস্তার লাভ করে নি যে, বিজ্ঞান ও কাব্যের ব্যবধান অনিবার্য ও দুর্লভ বলে স্বীকৃত হবে।

প্রাণশক্তির ও মানসিক সজীবতার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি যে মানুষের মধ্যে ঘটেছিল, তাঁরই মধ্যে মিলেছিল অনন্য কবিপ্রতিভা যুগাবগাহী মননশীলতা, রাজনীতিজ্ঞের বিচক্ষণতা এবং বিজ্ঞানীর অনুসন্ধিৎসা। আধুনিক ইংরাজ কবি স্টীফেন স্পেণ্ডার যথার্থই মন্তব্য করেছেন : "Rather than the last Renaissance genius, one might say that Goethe was the first, and also the last, complete modern individual"। বিশেষত বিজ্ঞানোচিত বস্তুনিষ্ঠ প্রত্যক্ষানুসারী মন এবং কল্পনাশ্রয়ী স্বজ্ঞানিষ্ঠ অধিরোহী মন— এ দুয়ের এমন সার্থক সহ-অবস্থান গ্যেটের পূর্বে এবং পরে কোনো কবি মনীষীর মধ্যে ঘটেছে কিনা সন্দেহ।

প্রশ্ন উঠতে পারে : গ্যেটের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বে উল্লিখিত রেনেসাঁসধর্মী সনাতনী সুস্থিতি কি জন্মসিদ্ধ ?

---

১ "Dichtung ist sinnliches Resumée der Lebenserfahrung"—গ্যেটে-সংলাপের রীমার (Riemer)-কৃত উদ্ধৃতি।

না তাঁর জীবনবোধেরও ইতিহাস রয়েছে— জীবনের বহুবিচিত্র উপাদানের সংঘাতে জীবনদর্শনের ক্রমবিকাশ রয়েছে ? সিদ্ধ পুরুষের দৈবানুপ্রেরিত উপলব্ধি বলে যদি এক কথায় গ্যেটে-প্রতিভাকে— তথা যে-কোনো প্রতিভাধর পুরুষকে— মেনে নেওয়া না হয়, তবে জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে আত্ম-পরিচয়ের ধারাকে অনুসরণ করে গ্যেটের জীবনবেদের পর্যালোচনা করাই সংগত। কারণ সব সার্বিক প্রতিভার ক্ষেত্রেই যেমন, তেমনি গ্যেটের ক্ষেত্রেও তাঁর সর্বানুগ্রাহী পরিপূর্তি সাধন করতে সমগ্র জীবনকালের বিস্তারের অপেক্ষা করেছিল। আর গ্যেটের জীবনের ব্যাপ্তি ছিল সুদীর্ঘ আট দশক ধরে। এই প্রসঙ্গে গ্যেটের পরম অনুধ্যায়ী এ যুগের ইউরোপীয় সাহিত্যে ক্লাসিক্যাল ঐতিহ্যের সম্ভবত শেষতম অনুসারী টমাস মান-এর উক্তি উল্লেখযোগ্য :[২] 'গ্যেটের অনেক সময়ের প্রয়োজন হ'তো সব কিছুর জন্য। তাঁর জীবনটাই ছিল স্থায়িত্বের পটভূমিকায় পাতা।' গ্যেটের স্বভাবগত কাল-তিতিক্ষাকে এমন কি আলস্য ও দীর্ঘসূত্রিতা বলেও মনে করা হয়েছে। আমাদের এযুগের স্বভাবসুলভ ক্ষিপ্রতা ও ব্যস্ততার সাথে এই ধ্রুব মন্থর জীবনানুশীলনের পার্থক্য সহজেই লক্ষ্যগোচর হয়। তবু জীবনশিল্পী গ্যেটের সংক্ষুব্ধ চেতনাতেই আবার প্রকট হয়েছে এই দুরন্ত সত্য ('ফাউস্টে' হ্বাগ্‌নারের মুখে) : শিল্প সুদূরপ্রসারী আর সংক্ষিপ্ত আমাদের জীবন। ("Die Kunst ist lang, und kurz ist unser Leben")।

নিজের সমগ্র শিল্পকে ও সৃষ্টিকে গ্যেটে এক সুদীর্ঘ আত্মচরিত বলে অভিহিত করেছেন। নিজের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের ঋতুপরিবর্তনে মূর্ত হয়ে উঠেছে আন্তর জীবনে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। প্রথম সৃজনী পর্যায়ের যে স্বতঃস্ফূর্ত দুর্বার আত্মপ্রকাশ তা ক্রমে অপসৃত হল জীবন-পরিক্রমার সাথে সাথে, এবং পরিণতিলাভ করল নিবিড়তর চেতনা ও আত্মসংহতিতে। গ্যেটের প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা "তরুণ হ্বার্থারের দুঃখ" (Die Leiden des jungen Werthers) এবং আদি যৌবনের কবিতা ব্যক্তিগত সংক্ষোভ ও রোমান্টিক জীবনদৃষ্টিরই অভিব্যক্তি ছিল। এই নবীন জীবন ক্রমে ক্রমে সংহত হল পরিপক্ক সুস্থিত জীবনবোধে। তাই গ্যেটের চল্লিশোত্তর জীবনে ক্রমশ যেন জীবনই তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াল। স্পেণ্ডার এই প্রসঙ্গে বলেছেন : "At first his life wrote his poetry; after, his greatness wrote his life।"[৩]

গ্যেটে-প্রতিভায় কাব্য ও জীবনের এই পরস্পর-প্রতিফলনের ধারাকে অনুশীলনের প্রয়াসে বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর জীবনদর্শনের অভিব্যক্তির ক্রমন্বয়ী সূত্রকে অনুসরণ করা প্রয়োজন। সে সূত্রের অনুসন্ধান মিলতে পারে বিভিন্ন পর্যায়ের জীবনজিজ্ঞাসার আধার বিশিষ্ট-লক্ষণ-ধর্মী কয়েকটি কবিতায়। আপন বিশ্ববীক্ষণের (Weltanschauung) কোনো তাত্ত্বিক ব্যাখ্যানে গ্যেটের অনুভূতিনিষ্ঠ কবিমানস স্বভাবতই প্রবৃত্ত হয় নি, কিন্তু তাঁর সৃজনী সাহিত্য থেকে সে বীক্ষণ উদ্ধার করা কিছু দুঃসাধ্য নয়।

আদি পর্ব

স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণশক্তির ও আবেগপ্রবণতার চূড়ান্ত রূপ যেন তরুণ গ্যেটের মধ্যে মূর্ত হয়েছিল। কবির এই নবীন মূর্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে গ্যেটের উত্তরসূরী জর্মান কাব্যের রোমান্টিক ধারার চূড়ান্ত প্রতিভূ হাইনে

২ **দ্রষ্টব্য** : Thomas Mann, Leiden and Grösse der Meister ("Essays of three Decades").
Stephen Spender, Introduction, "Great Writing of Goethe".

বলেছেন : "all strength and energy from crown to toe ; a heart filled with emotion, a fiery spirit, soaring with the wings of an eagle !" তাঁর এই সময়ের সাহিত্যসৃষ্টিতে দেখি প্রাণধর্মের অকুণ্ঠ অভিব্যক্তি ও অকৃত্রিম আবেগময়তা। অপরিসীম আত্মবিশ্বাস ও প্রতিভার প্রথম স্ফুরণে নিজের মধ্যে অনন্ত ক্ষমতার নেশায় যেন উন্মত্ত এই তরুণ।

প্রথম যৌবনের দুরন্ত স্পর্ধা ও আবেগ স্বকীয় লক্ষণে প্রকাশ পেয়েছে গ্যেটে-প্রতিভার বিকাশের আদিপর্বে একটি বিশিষ্ট কবিতায়। মানুষের সমস্ত বৃত্তির পরিস্ফুরণের যে সুবর্ণ অধ্যায়, যখন মনের দুর্বার ক্ষুধা, অন্তরের অনন্ত তৃষ্ণা পৃথিবীকে জীবনকে জানবার জন্য, ভোগ করবার জন্য, আত্মসাৎ করবার জন্য দুনিয়ার বিচিত্র রসভাণ্ডার— তারই প্রমত্ত আবেগ মূর্ত হয়েছে এই অপূর্ব বলিষ্ঠ কবিতাটিতে। কবিতাটির নাম "প্রমীথিয়ুস" (Prometheus)—প্রসঙ্গ বলা বাহুল্য ক্লাসিক্যাল। গ্রীক পুরাণের প্রমীথিয়ুস মানুষের কল্যাণের উদ্দেশে স্বর্গ থেকে দেবতাদের অগ্নি আহরণ করে এনেছিলেন পৃথিবীতে, আর হয়েছিলেন দেবতাদের অপরিসীম রোষের পাত্র। এই কবিতার প্রসঙ্গে গ্যেটে আত্মজীবনীতে বলেছেন : 'প্রমীথিয়ুসের কাহিনী আমার মনে আবার জীবন পরিগ্রহ করল।'

প্রমীথিয়ুস অতিপার্থিব দেবত্বের বিরুদ্ধে মানবতার চিরবিদ্রোহের জ্বলন্ত বিগ্রহ। যে বিদ্রোহী যৌবনের আবেগকে লক্ষ্য করে বলতে হয়, 'এ যৌবনজলতরঙ্গ রোধিবে কে', তারই এক বলিষ্ঠ চিত্র রূপায়িত করেছেন গ্যেটে প্রমীথিয়ুসের রূপককে সম্মুখে রেখে। গ্রীক দেবরাজ জীয়ুসকে (Zeus) উদ্দেশ করে কবি শুরু করছেন :

আবৃত কর তোমার আকাশ
মেঘের বাষ্প দিয়ে ;
শিশুর হাতে ছিন্ন যেমন ঘাস—
কৌশলে তব কাঁপে
ওকের শীর্ষ গিরির শৃঙ্গ আর।

কিন্তু যৌবনের মেজাজ উদ্ধত, দৈব শাসনের তথা দৈব অনুগ্রহের তীব্র বিরোধিতায় মুখর। আপন শক্তির উপর অকুণ্ঠ তার বিশ্বাস, কোনো অলৌকিক শক্তির নির্দেশ সে মানতে নারাজ। স্পর্ধিত আহ্বানে কবি তাই ইঙ্গিত করছেন মাটির পৃথিবীর দিকে— যে পৃথিবী মানুষের ভোগ্যা, যাকে সে রচনা করে নিয়েছে আপন খুশিতে, আপন ইচ্ছায় ও প্রয়োজনে।

ধরিত্রী সে তো আমারই লাগি,
গেহ আমার রয়েছে সে তো জানি—
রচেছ কি তুমি তারে ?
আছে আমার ঘরের আগুনখানি,
সে শিখা তব ঈর্ষা জাগায় আমার পরে।

দেবতার বিরুদ্ধে স্পর্ধিত যৌবনের বিদ্রূপে কবি মুখর ; বলছেন : এ বিশ্বে দেবরাজের চেয়ে দীন আর কে আছে ? যত শিশু আর যত ভিখারীর দল মিলে প্রার্থনা আর মিনতির মধ্য দিয়ে দেবতাকে জিইয়ে

রাখে—তাদের নির্বুদ্ধিতার তুলনা নেই। নিজের শৈশবকে মনে করে কবি বলছেন, পৃথিবী সম্বন্ধে বোধ যখন স্পষ্ট হয় নি, তখন তিনি অসহায়ের মতো দেবতার করুণা ভিক্ষা করতেন। আজ যখন আত্মপরিচয় ঘটেছে, তখন কবি বুঝতে পারছেন, দেবতা তো তাঁকে মৃত্যুর হাত থেকে দাসত্বের কবল থেকে বাঁচান নি। "হে মোর জ্বলন্ত হৃদয়, তুমি নিজেই কি সব সাধন কর নি? আর অজ্ঞতার বশে আত্মপ্রবঞ্চনা কর নি কি সেই দেবতার উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে?" কেন তোমায় শ্রদ্ধার্ঘ জানাই—এই জিজ্ঞাসায় কবির অন্তর বিক্ষুব্ধ, অসহিষ্ণু হয়েছে তাঁর মন অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে। তাঁর প্রশ্ন তাই দেবতার কাছে! 'তুমি কি ব্যথিতের বেদনা প্রশমিত করেছ? শান্ত করেছ কি ক্ষুব্ধের অশ্রু?'

কেবল বিদ্রোহী উন্মাদনাতেই কবির আত্মপ্রকাশ ক্ষান্ত হয় নি; প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয়ে উদ্দীপিত হয়েছে কবির মন। অবজ্ঞার ব্যঙ্গ নিয়ে দেবতাকে উদ্দেশ করছেন, 'তুমি কি মনে কর জীবনকে অস্বীকার করি আমি, পালিয়ে যাই মরুভূমিতে—সব স্বপ্ন সার্থক হয় না বলে?' কবি উপসংহারে এই দৃপ্ত আশা প্রচার করছেন যে তিনি পৃথিবীতে থেকে গড়তে বসেছেন সেই অনাগত মানবসমাজকে, যারা তাঁরই মতো 'কষ্ট পাবে, কাঁদবে, ভোগ করবে, হাসবে, অথচ দৃকপাত করবে না সেই স্বর্গবাসী দেবতার দিকে।'

মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে প্রকাশিত (১৭৭৪) এই কবিতাটি সৃজনোন্মুখ মনের স্বাতন্ত্র্যস্পৃহা ও অপরিমিত আত্মপ্রত্যয়ের স্বাক্ষর বহন করে। এই প্রসঙ্গে গ্যেটে তাঁর আত্মজীবনীতে মন্তব্য করেছেন: মানুষের অদৃষ্ট তাদেরই পক্ষে একান্ত বেদনাদায়ক হয় যাঁদের মানসিক ক্ষমতা অল্পবয়সে ও তাড়াতাড়ি বাড়ে। অন্যত্র গ্যেটে বলেছেন, প্রতি শিল্পীর মধ্যেই একটা ঔদ্ধত্যের সুর আছে, আর সেটা ছাড়া কোনো শিল্পী-প্রতিভাকে কল্পনা করা যায় না। গ্যেটের এই শিল্পীজনোচিত ঔদ্ধত্যের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে টমাস মান এই অভিমত পোষণ করেছেন যে এর উদ্ভব হয়েছে কামজীবনে ও বৌদ্ধিক জীবনে গ্যেটের বিশিষ্ট ভূমিকা থেকে। কারণ, এই দুই ব্যাপারেই গ্যেটের অনন্যসাধারণ তীব্রতা তাঁকে স্বভাবতই বিপ্লবী, এবং গতানুগতিকের অনুবর্তনের পরিপন্থী করে তুলেছিল। অবশ্য এই মনোভাবের অত্যধিক একমুখীনতায় একরকম অসুস্থতারই উপক্রম করেছিল; আর তার মূলে ছিল একদিকে যেমন জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তরুণের অভিজ্ঞতার স্বল্পতা, অপরদিকে আত্মকেন্দ্রিক (তথা জগৎবিমুখ) ভাবসর্বস্বতা।

গ্যেটের প্রতিভা-বিকাশের আদিপর্বে এই বিদ্রোহী-চেতনার পিছনে রয়েছে একটি পুরোমাত্রায় রোমান্টিক মন ও জীবনগতি। যৌবনে গ্যেটে একটি অতি-রোমান্টিকতার অসুস্থ অবস্থা অতিক্রম করেছেন। এমন-কি তা তাঁকে নৈরাশ্য, আত্মহত্যা ও উন্মত্ততার উপান্তদেশে নিয়ে এসেছিল। হতাশার চূড়ান্ত অবসাদের মধ্য দিয়ে অনেক সময় এই কল্পনাবিষ্ট যুবকটিকে কাটাতে হয়েছে। এক দুরন্ত মৃত্যু-বিলাসিতায় তাঁর মন এসময়ে পীড়িত হয়েছিল। এইসব অভিজ্ঞতাই বোধ করি উত্তরকালে গ্যেটেকে এই সত্যে উদ্বুদ্ধ করেছিল যে, যা ক্লাসিক্যাল তা স্বাস্থ্যের, এবং যা রোমান্টিক তা অসুস্থতারই পরিচায়ক।[৪]

এই প্রসঙ্গে গ্যেটের ব্যক্তিজীবনের প্রণয়-ইতিহাস ও সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আদি পর্বের শ্রেষ্ঠ রচনা "তরুণ হ্বার্থারের দুঃখ" স্বভাবতই আলোচ্য। গ্যেটের প্রণয়প্রতিভা সুবিদিত। কৈশোর থেকে প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত জীবনের নানা পর্যায়ে—বিশেষত যৌবনকালে—গ্যেটে বিভিন্ন নারীর প্রেমে সাড়া দিয়েছিলেন, আর

৪ দ্রষ্টব্য: "The classical is health and the romantic disease"—Maxims and Reflections.

তা থেকে আনন্দবেদনার বিচিত্র রসে সিঞ্চিত করেছেন আপন সত্তাকে, উজ্জীবিত করেছেন আপন মানসলোক।[৫] গ্যেটে তাঁর আত্মজীবনী "Dichtung und Wahrheit" (*Poetry and Truth from my own life*) গ্রন্থে অপূর্ব বস্তুনিষ্ঠা সহকারে তাঁর জীবনের প্রথম ছাব্বিশ বছরের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন— আর তাতে কিশোর বয়স থেকে তাঁর বিভিন্ন প্রেম-কাহিনীও বিবৃত আছে। নিজের জীবনকথার এত বিষয়ানুগ প্রদর্শন— যেন নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাসেরই সমগোত্রীয়— এত সত্যনিষ্ঠা বোধ হয় কবিমহলে বিরল ; হয়তো ইউরোপীয় মনীষী বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। বার্ধক্যের প্রায় উপান্তদেশে এসে এই আত্মকাহিনীতে গ্যেটে যেন নিরপেক্ষ দ্রষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন— আর আপন প্রতিভার বিকাশের প্রথম পর্ব শিল্পীর গঠনোন্মুখ পর্যায়কে উপস্থিত করেছেন। জর্মানীর শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভা নিজেকে জগতের কাছে ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হয়েছেন, আর তাই ইঙ্গিত করেছেন তাঁর শিল্পীসত্তার সংগঠনে ক্রিয়মান বিচিত্র প্রভাবরাশির প্রতি। আত্মচরিতের ভূমিকায় এ সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্য সুস্পষ্ট : জীবনচরিতের প্রধান উদ্দেশ্য আমার মনে হয়, মানুষকে তাঁর কালের পরিপ্রেক্ষিতে দেখানো, আর দেখানো কতটা এই পরিবেশ তাঁর পক্ষে প্রতিকূল বা অনুকূল হয়েছিল ; কি করে তিনি তা থেকে জগৎ ও মানুষ সম্পর্কে একটা জীবনদর্শন গড়ে তুললেন এবং কি করেই বা তিনি শিল্পী কবি বা গ্রন্থকার হয়ে এই দৃষ্টিভঙ্গীকে মূর্তভাবে উপস্থিত করলেন।

যাই হোক্‌, যে গ্রন্থটি তরুণ গ্যেটেকে প্রায় রাতারাতি তদানীন্তন জর্মান সাহিত্যের পুরোভাগে নিয়ে এল, তার মৌলিক রচনাশৈলী ও আবেগ-মুখরতার জন্য, তা হল "তরুণ হ্বার্থারের দুঃখ" (ডি লাইডেন ডেস্ ইয়ুংগেন হ্বার্থার্স্)। আর ব্যক্তিগত জীবনে তার পটভূমিকা রচিত হয়েছিল এই পর্যায়ে গ্যেটের জীবনে একটি অন্তরঙ্গ প্রণয়ব্যাপারে। সাধারণ এক ধর্মযাজকের কিশোরী কন্যা ফ্রেডারিকার সাথে মধুর প্রেমের অধ্যায়টি তরুণ গ্যেটে যখন উত্তীর্ণ হতে চলেছেন, আনন্দবিহ্বল সাহচর্যের পর বিচ্ছেদের বেদনা যখন ঘনায়মান, সেই আলো-আঁধারি চিত্তসংক্ষোভের মধ্যে এই রচনাসৃষ্টির পরিকল্পনা গ্যেটের মনে উদয় হয়। তা ছাড়া এ সময়ে গ্যেটে পূর্বসূরীদের সৌন্দর্যচিন্তার সাথে পরিচয় লাভ করতে গিয়ে উপলব্ধি করলেন যে তাঁদের অনুভূতির পটভূমিকার সাথে নিজের উপলব্ধিকে মেলাতে পারছেন না। তখনই গ্যেটের মধ্যে সেই অকৃত্রিম অভীপ্সা জাগলো আপন বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তরপ্রকৃতিকে অন্বীক্ষণ করবার, আর গভীর বিস্ময়ে সেই পরিচয়ের সম্মুখে মনকে মেলে ধরবার। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, তৎকালীন জর্মান সাহিত্যে যে প্রেরণাপ্রধান 'ঝড়ঝাপটা' আন্দোলনের (Storm and Stress) পুরোধা ছিলেন তরুণ গ্যেটে, তারই পরাকাষ্ঠা হ্বার্থার রচনায় (১৭৭৪)। এই ঝড়ঝাপটা-যুগের মূলতত্ত্ব ছিল—জন্মগত ঐশীপ্রতিভা কোনো প্রচলিত রীতি বা শৈলী অনুসরণ করে না, নূতন নীতি বা শৈলী তৈরি করে নেয়।

হ্বার্থার-রচনার পটভূমিকার কথা উল্লেখ করে গ্যেটে তাঁর আত্মকাহিনীতে লিখেছেন : তিনি চাইলেন তাঁর আন্তর জীবনকে সব রকম বিজাতীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করতে। আপনার পরিবেশী সবাইকে প্রেমের দৃষ্টিতে দেখতে, এবং মানুষ থেকে ক্ষুদ্রতম প্রাণী পর্যন্ত প্রত্যেক জীবের প্রভাবে নিজেকে উন্মুক্ত করতে।

৫ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথের সতেরো বছর বয়সে লেখা একটি প্রবন্ধ, "গ্যেটে ও তাঁর প্রণয়িনীগণ"— বাংলা ১২৮৫ সালে কার্তিক সংখ্যায় "ভারতী" পত্রিকায় প্রকাশিত— যা থেকে রবীন্দ্রনাথের তরুণ বিকাশমান কবিমানসের উপর জর্মান কবির প্রভাব অনুমান করা অসংগত হবে না।

এইভাবে প্রকৃতির সাথে বিশ্বচরাচরের সাথে যেন এক সুরে বাঁধা হল তাঁর অন্তরের তন্ত্রী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে 'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি, জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি'— এই অনুভূতিতে অবগাহন যতটা সহজসিদ্ধ হতে পেরেছিল, হয়তো আরও ইহনিষ্ঠ ইউরোপীয় কবির পক্ষে তা নিতান্ত সহজ হয় নি। নিবিড় মানবিক সম্পর্কের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিবেশে সংবেদনশীল মনে শূন্যতা এসে জমেছিল, অবসাদের মালিন্য ছিল। গ্যেটে আত্মকাহিনীতে সে কথার আভাস দিয়েছেন স্পষ্টই। তবু জীবনকুঞ্জের যে মধুররসে আপন চিত্তকে সঞ্জীবিত করতে পেরেছিলেন, তারই উদ্দীপনা অন্তরকে জুড়ে ছিল। সাময়িক অবসাদ তাই তাঁর সৃজনী আত্মপ্রকাশকে ব্যাহত করতে পারে নি। আত্মগ্লানি ও বৈনাশিকতার মোহ থেকে নিজেকে সবলে মুক্ত করলেন গ্যেটে, তাঁর এই প্রথম উপন্যাস রচনা করে— আর সেটা হল মৌলিক এক বিয়োগান্তক রচনা!

সমসাময়িক এক মর্মান্তিক ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে গ্যটেকে এই রচনায় প্রেরণা ও উপাদান যুগিয়েছিল সন্দেহ নেই। সে সময়ে ফ্রাঙ্কফুর্টে—গ্যেটে যে শহরে আজন্ম বাস করছিলেন— এক প্রতিষ্ঠাবান্ যুবক আত্মহত্যা করেছিল বন্ধুপত্নীর প্রতি অনুরাগের ফলে। হ্বার্থারের অদৃষ্ট নিয়ে গ্যেটের যে কল্পনা ইতিপূর্বেই ক্রীড়া করছিল, মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তা রূপ পরিগ্রহ করল নাতিদীর্ঘ সেই প্রেমের ট্র্যাজেডির মধ্যে। কেবল রোমাঞ্চপ্রীতি নয়, সংবেদনশীলতাই হ্বার্থার গ্রন্থের মূলসূত্র, এবং এই অনুভূতির তন্ময়তা বিরহের সুরে গাঁথা। গ্যেটের নায়ক একান্তই রোমান্টিকস্বভাব; যে সুখের অঙ্গুলিসংকেতে প্রতিনিয়ত সে অস্থির হচ্ছে সে সুখ তার নাগালের বাইরে। সংসারের বিরুদ্ধে তার ক্ষোভ এই যে, সংসার তাকে ভুল বোঝে। 'আমাদের মতো মানুষের ভাগ্যই এমন যে লোকে আমাদের ভুল বোঝে'— এই আত্মপীড়ণের বিলাসে অহংকেন্দ্রিক হ্বার্থার নিমজ্জমান।

এই রচনা গ্যেটের আন্তর জীবনে এক নূতন অধ্যায়ে পদক্ষেপের সূচনা করল। আত্মকাহিনীতে এই প্রসঙ্গে গ্যেটে লিখেছেন: 'আমি অনুভব করলাম যেন সাধারণভাবে আমি এক স্বীকারোক্তি করেছি, আর তার ফলে আবার যেন মুক্তি ও আনন্দ পেয়েছি, এবং এইভাবে নূতন জীবন সুরু করবার যোগ্যতা লাভ করেছি।' ("I felt as if I had made a general confession, and was once more free and happy, and justified in beginning a new life")[৬] বস্তুত গ্যেটের আপন বিচারে তাঁর সব-কটি সার্থক সৃষ্টিই—হ্বার্থার, টাসো, ফাউস্ট, হ্বিল্‌হেল্‌ম্ মাইস্টার ইত্যাদি—এক মহৎ স্বীকারোক্তিরই যেন অঙ্গীভূত। অবশ্য হ্বার্থারের প্রকাশের পর গ্যেটের দেশে—এমন-কি ইউরোপের অন্যত্রও, বিশেষত ফ্রান্সে—কিছুদিন ধরে বুদ্ধিবাদী মহলে হ্বার্থার-সুলভ 'বিশ্ববেদনা' (Weltschmerz) প্রায় একটা ঢঙে পরিণত হল— এবং তার চেয়েও বিস্ময়কর, তরুণদের মধ্যে আত্মহত্যার যেন এক হিড়িক পড়ে গেল। সে সময়ে জনপ্রিয়তার উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ তরুণ লেখক উপভোগ করেছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু গ্যেটের স্বভাবমূলে তার প্রতি আকর্ষণ কমই ছিল। পপুলার প্রতিধ্বনির কথা বাদ দিলেও এই শক্তিশালী স্বকীয়তাব্যঞ্জক রচনাটির উৎকর্ষ নিয়ে সমসাময়িক ও পরবর্তীকালে বাদানুবাদ যথেষ্ট হয়েছে। কিন্তু গ্যেটে নিজেই বলেছেন, সে সব জল্পনা তাঁর সৃষ্টির প্রকৃত তাৎপর্য ধরতে পারে নি। সে তাৎপর্য তাঁর আনন্দ-

৬ Poetry and Truth from my own Life, Vol. II, (trans. by Minna S. Smith).

বেদনাময় জীবনরসেই নিহিত আছে। হ্বার্থারের স্রষ্টা সেই যুবক লোকসমাজের কোলাহলের অন্তরালে আত্মপরিপূর্তির ধাপে ধাপে নীরবে অগ্রসর হয়েছেন। গ্যেটের নিজেরই কথায়— 'প্রতিভা পুষ্ট হয় নির্জনতায়, চরিত্র তৈরি হয় জনসংঘাতে।'

মধ্যপর্ব

হ্বার্থারের বিশ্বলীন আবেগময়তায় ও প্রমীথিয়ুসের বিদ্রোহী উদ্দীপনায় যে মনের অভিব্যক্তি ঘটেছিল, তার ভাবান্তর লক্ষ্য করি মানস বিবর্তনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে— পরিণত যৌবনের পর্যায়ে। পূর্বোক্ত 'ঝড়ঝাপটার যুগ' গ্যেটের জীবনে মাত্র পাঁচ বছর স্থায়ী হয়েছিল। পরিপক্ক জীবনজিজ্ঞাসার পথে এই পাঁচ বছরে কবি একটা ফলপ্রসূ পর্ব অতিক্রম করেছিলেন আত্মিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে। প্রতিভার স্বতঃস্ফূর্তি এবং আবেগে ও অতিরাগে আত্মসমর্পণ— ঝড়ঝাপটাযুগের এই মূলমন্ত্র মানবিক নিয়তির প্রশ্নে কবিচেতনায় কোনো তৃপ্তিদায়ক সমাধান উপস্থিত করতে পারে নি। ফলে আত্মিক নিঃস্বতার বোধই কবির মধ্যে প্রকট হয়েছিল। জীবনজিজ্ঞাসার এই সংকট উত্তীর্ণ হয়ে কবির মানস স্থৈর্যকে পুনরুদ্ধার করবার অবকাশ এল হ্বাইমারের কাজে নিযুক্তির সাথে। বিশ্ববীক্ষণের পরিণতির পথে মধ্যপর্বে এই পদক্ষেপ। অশান্ত প্রমীথিয়ুস ক্রমে আত্মচেতনায় অবগাহী হলেন, ফলে অন্তর্মুখী কবিচেতনা সসীমতার বোধে সংযত হল। মানুষের শক্তি একান্ত সীমিত এই বোধ কবির বিক্ষুব্ধ অন্তরে সমতা আনবার উপক্রম করল। বিশ্বনিয়ন্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের মূঢ়তা উপলব্ধি করলেন কবি, ক্রমে দেখা দিল একটা গ্রহণশীলতার ভাব উত্তরযৌবনের সনাতনী জীবনবেদে।

জীবনজিজ্ঞাসার এই নবরূপায়ণের লক্ষণ বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়েছে প্রায় বত্রিশ বছর বয়সে রচিত একটি কবিতায় (১৭৮১)— "মানবতার সীমা" (Grenzen der Menschheit)। মানবপ্রকৃতির একান্ত সসীমতার কথাই প্রচার করেছেন কবি এই কবিতাটিতে। "যখন সুপ্রাচীন দেবরাজ জীয়ুস মৃদু হস্তে ঘূর্ণমান মেঘরাশি থেকে বিদ্যুতের আশিষখানি পাঠান, চুম্বন করি আমি তাঁর বসনের শেষপ্রান্তটুকু, আর জাগে আমার অনুগত হৃদয়ে নবীন কম্পন।" 'প্রমীথিয়ুস'এর মতো এ কবিতার সূত্রও ক্লাসিক্যাল সন্দেহ নেই ; কিন্তু পূর্ব কবিতার সুর এখানে যেন রূপান্তরিত, প্রায় অন্তর্হিত। এ কবিতায় দেবতার মাহাত্ম্যই কবি গেয়েছেন অকুণ্ঠচিত্তে, সানন্দে। স্বীকার করতে তাঁর কোনো আক্ষেপ বা দ্বিধা নেই যে 'দেবতার সাথে পরিমাপ হয় না কোনো মানুষের'। বিশ্বব্যাপ্ত প্রকৃতির শাশ্বত নিয়মকে স্বীকার করাতেই প্রজ্ঞার পরিচয়। মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষমতায় এই অপার বিশ্বরহস্যের কতটুকু ধরতে পারে। বিপুলা বিশ্বশক্তিকে যুঝবার সংকল্প তো নিতান্তই শিশুর উন্মত্ততা ছাড়া কিছু নয়! কবির কথায়, এই বিশ্বসৃষ্টির অনাদি প্রবাহের তরঙ্গপাতে আমরা উঠছি পড়ছি ; সামান্য অক্ষম জীব আমরা এই বিরাট বিশ্বের পটভূমিকায়। আমাদের গোটা জীবন যেন এক সীমার বাঁধনে ঘেরা ; সে বাঁধনের ওপারে আছে সৃষ্টির অনন্ত ক্ষেত্র। আর এই গণ্ডী কেবল ব্যক্তির সত্তায় নয়, সমষ্টিজীবনেও এই একই বাঁধন।

কবিতাটিতে একটি ভাব ফুটমান হয়েছে, যাকে এক কথায় বোধ হয় বলা যায় 'নিয়তিবাদ'— বা ব্যাপকতরভাবে অভিহিত করা যায় নির্দেশ্যবাদ। অবশ্য এ নিয়তিবাদ মানবজীবনের অদৃশ্য পরিচালক 'দৈবে'র উপর অন্ধ বিশ্বাসের সগোত্র নয়। এ বিশ্বাস আরও উন্মুক্ত আরও প্রশস্ত। মানুষ শুদ্ধ সমস্ত

বিশ্বসৃষ্টিই এক দুর্নিবার নিয়মের নিগড়ে বাঁধা। প্রাচীন গ্রীক নাটকগুলিতে মানবজীবনের যে ট্র্যাজেডি আঁকা হত, তার পিছনে আগাগোড়া স্বীকৃতি পেত দৈবের (Fates) খেলা। গ্যেটের ক্লাসিক অভিমুখী মন এই ধ্রুবা দৃষ্টিকে স্বীকার করল বটে, কিন্তু তাঁর অন্তর্দৃষ্টি 'দৈব'তে এসে থেমে গেল না। তা বিশ্বসৃষ্টির মূলতত্ত্বের অন্বীক্ষণে তৎপর, আর সেই তত্ত্বের সাথে মানবসত্তার যোগসূত্রসাধনে প্রয়াসী। তরুণ কবির প্রকৃতি-বীক্ষণে অতিপ্রাকৃতের যে স্বীকৃতি জড়িয়ে ছিল, কবিমানসে তা দুরূহ প্রশ্নের সূচনা করেছিল। যা প্রকৃতিতে বিরোধের মধ্যে ব্যক্ত, এবং একটি প্রত্যয়ের দ্বারা যার নির্বচন সম্ভব নয়, সে তত্ত্ব দেবসুলভ নয়, মানবসুলভও নয়, কিংবা দেবদূতসুলভও নয়; সে তত্ত্ব যেন নিয়তির সগোত্র। তাই ক্লাসিক্যাল সূত্র অনুসরণ করে গ্যেটে তাকে অভিহিত করতে চেয়েছেন 'দানব-তত্ত্ব' (Daemonic) ব'লে।

বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে নিয়ন্ত্রণধারার অনুপ্রবাহ এবং অনন্তের ব্যঞ্জনায় ব্যক্তিসত্তার তাৎপর্য নির্দেশ গ্যেটের এই বিশ্ববীক্ষায় যেন প্রতিধ্বনিত হয়েছে ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক স্পিনোজার (Spinoza) সর্বব্রহ্মবাদী চিন্তাধারা (pantheism)। বিশ্বব্যাপ্ত নৈর্ব্যক্তিক নির্ধারণতত্ত্বের অনুসারী ব্যক্তিজীবনে সম্বুদ্ধ ক্ষান্তি—সংক্ষেপে স্পিনোজার দর্শনের এই মূল কথা। জীবনচরিতে গ্যেটে উল্লেখ করেছেন, যৌবনে স্পিনোজার ভাবধারার সংস্পর্শে এসে তাঁর মনে গভীর রেখাপাত হয়েছিল—উত্তরকালে যার প্রভাব রূপায়িত হয়েছিল তাঁর ব্যক্তিমানসে।[৭] সপ্তদশ শতাব্দীর এই অসাধারণ মনীষার সাথে প্রথম পরিচয়ের প্রসঙ্গে গ্যেটে লিখেছেন, যে সাধারণ থেকে স্বতন্ত্র তাঁর প্রকৃতিকে মার্জিত করবার উপায় জগতে অনুসন্ধান করে বিফল হয়ে তিনি অবশেষে এই দার্শনিকের "নীতিদর্শনে" (Ethics) প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। নিছক তত্ত্বানুশীলনেই নয়, স্পিনোজা-দর্শনে গ্যেটে পেলেন তাঁর অভিব্যক্তির প্রশমন এবং প্রত্যক্ষ ও নৈতিক জগতের এক অপার মুক্তির আস্বাদন। যা তাঁকে সবচেয়ে আকৃষ্ট করেছিল, তা হল স্পিনোজার বাণীর মর্মস্থলে নিরাসক্তির সুর। সব কিছুতে বিশেষত প্রেমে ও সখ্যে নিরাসক্তি অর্জন করাই ছিল গ্যেটের মহত্তম অভীপ্সা, তাঁর জীবনচর্যার আদর্শ সূত্র। এই দৃষ্টির পরিপূর্তি লক্ষ্য করা যায় গ্যেটের উত্তরজীবনে (অন্তপর্ব দ্রষ্টব্য)— তাঁর মর্ম-উৎসারিত এই কথায়: 'তোমায় যদি বাসি ভালো, তোমার তাতে কি ?'

যাই হোক্, উল্লিখিত কবিতাটি সেই সীমাসচেতনতারই স্বাক্ষর বহন করছে, যার মাধ্যমে ঘটেছে রোমান্টিক কবির ঔদ্ধত্য-বিলাপ থেকে নির্মুক্তি এবং মহত্তর বিশ্ব-স্বীকৃতির বোধে উত্তরণ। কিন্তু গ্যেটের এই ভাবানুক্রমের পিছনে রয়েছে আবার জীবননাট্যের বিচিত্র দৃশ্যান্তর। কারণ গ্যেটের সৃষ্টির মূল্যায়ন করতে গিয়ে এযুগের অপর গ্যেটে-অনুধ্যায়ী মনীষী সোয়াইৎসরের উক্তির যাথার্থ্যই প্রমাণিত হয় 'Everything that he offers is what he himself has experienced in thought and in events, material which he worked up into a higher reality. It is only through experience that we come nearer to him.'[৮]

---

৭ জীবন-কথায় গ্যেটে স্পিনোজার প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন—তাঁর চিত্তে প্রশান্তি সঞ্চারের মূলে স্পিনোজার প্রভাব উল্লেখ করেছেন। দ্রষ্টব্য Poetry and truth, Vol. II.

৮ Albert Schweitzer, *Goethe*.

গ্যেটের জীবনের তিনটি বিশিষ্ট ঘটনা তাঁর পরিণত পুরুষসত্তার রূপায়ণে যেমন তেমনি পূর্ণাঙ্গ জীবনবোধের সম্প্রাপ্তিতে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। প্রথমত জর্মান রাজ্য হ্বাইমারের ডিউক কার্ল অগাস্টের রাজকার্যে সহায়তার জন্য ১৭৭৫ সালে ডিউকের আমন্ত্রণে মন্ত্রী হিসাবে যোগদান—গ্যেটের বয়স তখন ছাব্বিশ। এগারো বছর হ্বাইমারে বাস এবং শাসনকার্য থেকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা পর্যন্ত বহুমুখী কার্যসূচীর ফলপ্রসূ অনুসরণ। দ্বিতীয়ত, এইখানে শার্লট ফন্ স্টাইনের সাথে তাঁর পরিচয় ও দীর্ঘ বারো বৎসরব্যাপী অনুরাগের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এগারো বছর হ্বাইমার-বাসের পর মন্ত্রীত্বের কাজ থেকে ছুটি নিয়ে ইতালী পরিভ্রমণ তৃতীয় ঘটনা। এই তিনটি ব্যাপারের সমবায়ে গ্যেটে-মানস ক্রমে ধ্রুপদী আদর্শের অনুরক্তিতে সুস্থিতিলাভ করল।

হ্বাইমারে (Weimar) মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণের সাথে সাথে সেই ভাবোন্মত্ত যুবার রূপান্তর সুরু হল; ঝড়ঝাপটার প্রবাহে সে আর নিজেকে ছেড়ে দিল না, ক্রমে সে হল তার আপন নিয়তির কারু—যে নিয়তি তার কাব্যকে মূর্তিদান করল। বলা যায়, ১৭৮৪ সাল থেকেই গ্যেটে এমন এক নূতন জীবনধারার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, যার মধ্যে সমাবেশ ঘটবে সুস্থতা, স্বাভাবিকতা ও সুসমতার। হ্বাইমার ও রোম তাঁর এই এষণার পরিণতি সাধন করল। হ্বাইমারের রাজসভায় অভিজাততান্ত্রিক পরিবেশে রাষ্ট্রিক দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে গ্যেটে নিজের আত্মিক বেগকে নিয়মিত করতে চেয়েছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু রোমান্টিকোত্তর কাব্যের সুনিশ্চিত ভূমিকা তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন রোমে গিয়ে—ইউরোপীয় সনাতনী সভ্যতা-সংস্কৃতির পীঠস্থানে। তাঁর ইতালী পর্যটনে গ্যেটের কবিচেতনায় প্রধানত পুরাকীর্তির মহিমাই উদ্ঘাটিত হয়েছে। কবিচিত্তের সেই সশ্রদ্ধ পুলক গ্রথিত হয়েছে তাঁর বিখ্যাত "রোমক শোকগাথা"তে (Roman Elegies)—"সনাতনী ভূমি এই, হেথা আমি পুলকিত পেয়েছি প্রেরণা।"

হ্বাইমারের রাজকার্য ও ইতালীয় ভ্রমণের অন্তর্বর্তী আর-একটি অন্তরঙ্গ ব্যাপার গ্যেটের মানবজীবনের উত্তরণে গভীর প্রভাব সঞ্চার করেছিল। পরিণত যৌবনের এই পর্বে গ্যেটের নিবিড় অনুরাগের পাত্র ছিলেন শার্লট—বয়সে সাত বছরের বড়ো, রাজসভার পদস্থ কর্মচারীর পত্নী, সাতটি সন্তানের জননী। তাঁর হ্বার্থার যেমনভাবে ভালোবেসেছিল লোটেকে (Lotte), তেমনি অতিরাগের সাথে গ্যেটে ভালোবেসেছিলেন শার্লটকে। কিন্তু সে ভালোবাসায় ছিল বিষণ্ণতা, ছিল একটা ক্ষীণ সংশয়—শার্লটের বিনম্র নির্দেশেও সে সংশয় অব্যাহত ছিল। অপরিপূর্তির দ্বিধায় এই প্রেমসম্পর্ক স্বভাবত ব্যাহত হলেও উচ্চগ্রামে বাঁধা ছিল সন্দেহ নেই—প্রায় প্লেটোনিক প্রেমেই পর্যবসান! তবু নিঃসন্দেহে অশান্ত প্রমীথিয়ুস প্রকৃতিস্থ হয়েছিল এই নারীর শান্ত প্রেমের প্রভাবে। প্রায় বারো বছর ধরে গ্যেটের ভাবজীবনের নিরন্তর আত্মিক কেন্দ্র রচিত হয়েছিল এই নারীকে আশ্রয় করে। উপরন্তু শার্লট-সাহচর্যের প্রভাবেই গ্যেটে-মানসে ধ্রুপদী নিষ্ঠার উদ্‌বোধন ঘটল—জীবনে ও শিল্পে সংযম, সামঞ্জস্য ও পরিপূর্তির আবাহন হল। কিন্তু শার্লট-প্রেমের অতিরিক্ত মানস-নিষ্ঠতা ও অমূর্তরূপতা গ্যেটের পক্ষেও শেষে পীড়াদায়ক হয়ে উঠল। তিনি সেই ভাবনিষ্ঠ প্রেমের উত্তুঙ্গ আবেশ কাটাতে চাইলেন প্রাণপণে, আর সে নিষ্ক্রমণের সুযোগ মিলল ইতালী-পর্যটনে।

ভাবসর্বস্বতার উত্তুঙ্গ শিখর থেকে লোকায়তিক ইন্দ্রিয়নিষ্ঠার স্তরে অবরোহণ গ্যেটের পক্ষে

যেন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। অসুস্থপ্রায় 'অমূর্ত' প্রেমানুশীলনের প্রতিক্রিয়া হিসাবেই যেন গ্যটে স্বেচ্ছায় ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় নিমজ্জিত হলেন— রোমের লোকায়তিক পেগান পরিবেশে। হ্বাইমারের জীবনচর্যার অনীহায়— কি রাজকার্যে কি প্রেমজীবনে কাব্যের যে মূলধারা বিশুষ্কপ্রায় হয়ে উঠেছিল, তাকে রোমক ঐতিহ্যানুসারী আদিম ভোগৈষণার বেগে আবার সঞ্জীবিত করতে প্রয়াসী হলেন গ্যেটে। তাঁর চরিত্রে এই আপাত-বিরোধী দিকটি নিঃসন্দেহে একটি স্বল্পস্থায়ী পর্যায়কে সূচিত করে। কিন্তু তাঁর সমগ্র জীবনবেদের পরিণতি প্রাপ্তিতে এর অবদানও নিতান্ত কম নয়। কারণ কোনো নেতিবাদী অস্বীকৃতি বা আত্মবঞ্চনার উপর গ্যেটের সামগ্রিক জীবনদর্শন গড়ে ওঠে নি। বরং প্রত্যক্ষের সম্যক্ গ্রহণই তাঁর জীবনবেদে প্রতিফলিত। "বর্তমানই একমাত্র দেবী, যাঁর আমি আরাধনা করি"— এমন উক্তিও গ্যেটের কথোপকথনে নিবদ্ধ হয়েছে। গ্যেটের চরিত্রানুশীলনে সোয়াইৎসরের উক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : "The fundamental basis of his personality, which is unchanging, is sincerity, combined with simplicity"। নিজের ও অপরের কাছে সত্য হওয়া—এই ঐকান্তিকতার মধ্যেই গ্যেটের সমগ্র নীতিবোধ বিধৃত।

বস্তুত গ্যটের সমন্বয়ধর্মী প্রতিভা বিরোধগ্রহণে পরাঙ্মুখ নয়। জীবনে ও চিন্তনে বিপরীতমুখী ধারাকে গ্রহণ করে উর্ধ্বতর সমন্বয়ী দৃষ্টিতে মিলিত করবার ক্ষমতা গ্যেটে-প্রতিভার অসাধারণ লক্ষণ। এবিষয়ে গ্যেটে যেন তাঁর সমসাময়িক দার্শনিকপ্রবর হেগেলেরই সগোত্র। বিরোধী সত্তার দ্বন্দ্বপ্রক্রিয়ামূলক সমন্বয় (dialeatical synthesis) ছিল হেগেলীয় দর্শনের মূলসূত্র। (অবশ্য নিছক তাত্ত্বিক ব্যাখ্যানের প্রতি আগ্রহ গ্যেটের মধ্যে কোনোসময়েই প্রকট হয় নি।) জর্মান এবং ইউরোপীয়-ক্লাসিক্যাল— এই দুই ধারার বলিষ্ঠ সমন্বয় সাধন করেছিলেন গ্যেটে, কারণ দুটিতেই তাঁর মানসলোক অভিষিক্ত হয়েছিল। অনুরূপ সমন্বয় ঘটেছিল সহজাত ক্ষমতা ও যুক্তিশীলতার মধ্যে, রহস্যময়তা ও সুস্পষ্টতার মধ্যে। গ্যেটের জীবন-কীর্তি ফাউস্ট-মহাকাব্যের মধ্যেও মানুষের কাম্যের ঐকান্তিক অন্বেষণের ভূমিকায় জীবনে ভালো ও মন্দের, মঙ্গল ও অমঙ্গলের নিরন্তর দ্বন্দ্বই রূপায়িত হয়েছে। খ্রীষ্টান ঐতিহ্যে মন্দ-তত্ত্বের স্বতন্ত্র ভূমিকা 'শয়তান'এর মারফত যে দ্বিধাহীন স্বীকৃতি পেয়েছে তারই মূর্ত রূপায়ণ ঘটেছে ফাউস্ট নাটকের মেফিস্টোফিলিস চরিত্রে। সে আপনাকে ফাউস্টের কাছে 'মন্দের প্রতিমূর্তি' বলেই পরিচয় দিচ্ছে—'যে সব কিছু অস্বীকার করে'। তাঁর আপন স্বভাবের মধ্যে ভালো মন্দের দুটি দিকই সক্রিয়—এই প্রত্যভিজ্ঞাই গ্যেটের সমন্বয়ী প্রয়াসকে আরও সুতীব্র করে তুলেছে।

যেমন ভালোমন্দ দ্বন্দ্বের তেমনি দুর্বলতার সচেতনতাও গ্যেটে-মানসে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এমন কি তাঁর পক্ষে দুর্বলতা যুগধর্মিতারই অনুগ্রাহক ছিল ; তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে 'মহত্তম পুরুষরা আপন যুগের সাথে কোনো না কোনো দুর্বলতার মাধ্যমেই যুক্ত থাকেন'। গভীরভাবে মানবতাবাদী গ্যেটে তাই একদিকে যেমন আপন সমসাময়িক যুগে সীমিত থাকতে অস্বীকার করেন, তেমনি আবার তাঁর জীবিতকালে ইউরোপের প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা ফরাসী বিপ্লব এবং তার পরবর্তী নেপোলিয়ন যুগকেও কখনও উপেক্ষা করেন নি। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে গ্যেটে যৌবনের প্রায় উপান্তদেশে —তা তাঁর ভাবধারাকে স্বভাবতই আন্দোলিত ও প্রভাবিত করেছিল। তবু এ ব্যাপারে তাঁর মনোভাব নিতান্ত দ্বিধামুক্ত ছিল না। গ্যেটে ছিলেন দৃষ্টিভঙ্গীতে অভিজাতধর্মী— সুশিক্ষিত অভিজাত-

শাসনেই তাঁর প্রকৃত আস্থা ছিল। তবু জনগণের কল্যাণকেই তিনি আদর্শ বলে স্বীকার করেন। ফরাসী বিপ্লবের মাত্রাধিক্যে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু এই বিপ্লবের মধ্যে অভিজাতশ্রেণীর উচ্ছেদের স্পষ্ট ইঙ্গিত তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। আর বিপ্লবের যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি, সেটাকে তিনি প্রধানতঃ শাসনতন্ত্রের ত্রুটি বলেই স্বীকার করেন—জনগণের ত্রুটি বলে নয়।

যৌবনের অন্তর্দাহ ও বিক্ষোভ থেকে শান্ত আত্মসীমিতির মধ্যে উত্তরণের তাৎপর্যগভীর অধ্যায়টিকে গ্যেটে আপন ইচ্ছায় নাটকায়িত করেছেন তাঁর ইতালী পরিক্রমান্তে প্রকাশিত ক্লাসিকধর্মী নাটক "ইফিগেনিতে" (Iphigenie)। গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিডিসের নাটকের নামানুসারে এবং কাহিনী অবলম্বনেই গ্যেটে নাটকটি সৃষ্টি করেন। ভাগ্যদেবীর (গ্রীক পুরাণের "Fates") তাড়নায় ক্লিষ্ট ওরিস্টিস অবশেষে হৃদয়ের শান্তি পেল এক মহীয়সী নারীর সান্নিধ্যে— অশান্ত গ্যেটে যেমন শান্তি পেয়েছিলেন শার্লট ফন স্টাইনের সুস্থিত প্রেমে। প্রেম এবং বিশুদ্ধ মানবতাই অন্তরের ক্ষত এবং অতীতের গ্লানি থেকে নির্মুক্ত করতে পারে। প্রায় তিরিশ বছর বয়সে গ্যেটে নাটকটি রচনায় প্রবৃত্ত হন, সমাপ্ত করেন প্রায় দশ বছর পরে। এই নাটকের রূপায়ণের মধ্য দিয়ে যেন কবির পক্ষে মানসিক সুস্থতা অর্জনের পথ সুগম হল।

কিন্তু এই সুস্থিত বিশ্ববীক্ষণে উত্তরণ কবির পক্ষে নেহাৎ সহজগম্য হয় নি। পরিণত যৌবনে মানবস্বভাবের অবশ্যম্ভাবী সসীমতার চেতনা কবি ব্যক্ত করেছিলেন বটে, কিন্তু কবিচেতনার অন্তঃস্থলে মানুষের একান্ত গণ্ডীবদ্ধতার এই স্বীকৃতি প্রথম পর্যায়ে মোটেই আনন্দদায়ক হয় নি, বরং বেদনাদায়কই হয়েছে। এই বোধের প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে কবির অন্তরে এসেছে নৈরাশ্য ও অবসাদ। জীবন-জিজ্ঞাসার এই স্বল্পস্থায়ী অন্তর্বর্তী পর্যায়টি ব্যক্ত হয়েছে উক্ত "ইফিগেনী" নাটকের অন্তর্ভুক্ত একটি কবিতায়। নাটকের চতুর্থ অঙ্কে যে "ভাগ্যদেবীর গান" (Das Lied der Parzens) রয়েছে, তাতে মানুষের জীবনে বিধির বিধানে চূড়ান্ত প্রভাব নির্দেশ করা হয়েছে। "দেবতাদের ভয় পায় মানবজাতি ; দেবতারা শাশ্বত শাসনে প্রভুত্ব করেন, আর আপন খুশিমত ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।" ভাগ্যদেবীদের এই গানে নিয়তির দৃষ্টিতে মানুষের সীমিত অসহায় অবস্থাকেই যেন বিদ্রূপ করা হয়েছে। কিন্তু এই আত্মপরাভবের গ্লানিতে গ্যেটের জীবনবীক্ষণের পরিণতি নয়। তাকে উত্তীর্ণ হয়ে এক মহত্তর আত্মসমর্পণ-বোধের প্রতিষ্ঠাতেই তার সম্যক পরিপূর্তি।

অন্তপর্ব

গ্যেটের পঁয়তাল্লিশতম জন্মদিবস উপলক্ষে শীলার তাঁকে যে পত্র লেখেন তা গ্যেটে-প্রতিভার সপ্রশংস বিচারে মুখর। শীলার লেখেন, 'ধীরভাবে বিশ্লেষণ করে যার অনুসন্ধান করা হয়, আপনার অভ্রান্ত অনুভবে তা তো ধরা পড়েই, বরং আরও বেশি কিছু ; আর তা সমগ্রভাবে আপনার মধ্যে রয়েছে বলেই নিজের সম্পদ আপনার কাছে প্রচ্ছন্ন থাকে।' তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুরাগীর এই পত্রের উত্তরে গ্যেটে সানন্দে স্বীকার করেন যে তাঁর সত্তার সারমর্ম শীলার উদ্ধার করেছেন। এবং তাঁকে আন্তর ঐশ্বর্যের আরও সজীব অনুশীলনে গভীর উদ্দীপনা জুগিয়েছেন। এই আত্মপরিচয়ের অনুশীলনই গ্যেটের সুদীর্ঘ জীবনপটে গাঁথা রয়েছে, তাঁর রচনার অন্তরে প্রবেশ করলে এই গভীরতর আত্ম-অনুধ্যানেরই পরিচয় মেলে।

গ্যেটে একটি পত্রে (Zelterকে লিখিত) এই সত্যটির প্রতি নির্দেশ করেছেন: কেউ যদি চান ভাবীপুরুষের জন্য এমন কিছু রেখে যেতে যা থেকে তাঁরা লাভবান হতে পারেন তবে সেটা হচ্ছে অঙ্গীকার।

অবশ্য গ্যেটের জীবনে ও শিল্পে আত্মানুসন্ধানের এই নিরন্তর চর্চা অহমিকাকে স্থচিত করে না। তরুণ গ্যেটের আত্মমুখীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও অহংনিষ্ঠা হ্বাইমার জীবনের প্রথম পর্বেই (প্রাক্-ইতালীয়) উন্নীত হয়েছিল সনাতনী বিষয়নিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীতে। আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মহত্তর বিষয়মুখীনতায় এই উত্তরণ 'ফাউস্ট' মহাকাব্যের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বৈপরীত্যে প্রতীয়মান হয়।[১] ফাউস্টের আত্ম-উদ্ঘাটনের ম্যাজিক-আশ্রয়ী বিষয়ীগত জগৎ নিয়েই প্রথম খণ্ড প্রধানত রচিত; আর দ্বিতীয় খণ্ডে আত্মিকজগৎ থেকে বিষয়গত জগৎই প্রাধান্য পেয়েছে। সে জগতে বরং স্থান পেয়েছে পুরাকীর্তি, ধর্ম ও শিল্প, আর প্রকৃতির রূপান্তরকারী বিজ্ঞান। প্রথম খণ্ড সম্বন্ধে গ্যেটের নিজের উক্তি বিচার্য, "এটা প্রায় সম্পূর্ণ ই আত্মগত; এটা এক বিভ্রান্ত, সীমিত ও অতিরাগরক্ত স্বভাবের প্রকাশ।" অপর দিকে দ্বিতীয় খণ্ড সম্বন্ধে তিনি স্পষ্টই বলেছেন যে, এর অভিনয় বিস্তৃততর দৃশ্যপটে; যে মানুষ জগতের মধ্যে বাস করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নি, তার পক্ষে এটা বোঝা দুষ্কর। প্রথম খণ্ডে ফাউস্ট স্বতন্ত্র এক ব্যক্তিমাত্র— অন্য ব্যক্তির সাথে তার যোগসূত্র সংকীর্ণ। আত্মানুসন্ধানে তার সহকারী হয়েছে ইন্দ্রজাল। আর দ্বিতীয় খণ্ডে ফাউস্ট জাগতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ, মানুষের কর্মপ্রয়াসে ও গঠনব্যাপারে সে অংশীদার। সাথে সাথে দেখি সনাতনী জগতের ভীতি, তমসা ও রহস্য এবং অতিমানবিক শক্তিপুঞ্জ মিলে এমন এক পরিবেশ রচনা করেছে, যা অতিব্যক্তিক এক জীবনেরই পরিচয় বহন করে। সে রহস্যের পটভূমিকায় মহত্তম মানুষও যেন নিমিত্তমাত্রে পরিণত হয়।

এই মহানাটকের দ্বিতীয় খণ্ডে যেমন, গ্যেটের আপন জীবনের শেষ অঙ্কেও তেমনি গ্যেটে বস্তুগত শক্তিকেই স্বীকার করে নিলেন। ফাউস্টের প্রথম পরিচয় অসহিষ্ণুতার, আত্ম-অপরিতৃপ্তির। নিজের মধ্যে দুর্জ্ঞেয় রহস্যভেদের অসীম ক্ষমতা সঞ্চারের জন্য আবাহন করেছেন তিনি নানা আধিদৈবিক শক্তিকে। আপনাকে নিয়েই ফাউস্ট মত্ত। ক্রমশ গ্রেৎশেনের প্রেমের মধ্য দিয়ে এবং নাটকের শেষে (প্রথমখণ্ডে) বিয়োগান্তক পরিণতির মধ্য দিয়ে যেন ফাউস্টের অতিব্যক্তিক জগতে নিষ্ক্রমণের পথ উন্মুক্ত হল। হ্বাইমারের কর্মজীবন ও ফ্রাউ স্টাইনের শান্ত প্রেম— এ দুয়ের স্বতন্ত্র প্রভাব রোমান্টিক গ্যেটেকে ক্লাসিক সুস্থিতির পর্যায়ে উন্নীত করেছিল। গ্যেটে নিজেই স্বীকার করেছেন, সমস্ত সুস্থ প্রকৃতির গতিই অন্তর থেকে বহির্বিশ্বের অভিমুখী; যা আত্মগত তাকে বিষয়গত করাই গ্যেটের লক্ষ্য। আবার "প্রবচন ও চিন্তন"এর (Maxims and Reflections) মধ্যে শিল্পসাধনা এবং জগৎ-চেতনার সম্পর্ক নির্দেশ করতে গিয়ে গ্যেটে বলেছেন: শিল্পচর্চার চেয়ে জগৎ-পরিহারের শ্রেষ্ঠতর উপায় আর নেই, আবার জগতের সাথে আপনার সংযোগ সাধনের উপায়ও শিল্পের চেয়ে অব্যর্থতর আর কিছু নেই। প্রথম যৌবনের রোমান্টিক দুঃখবিলাসে যদি বা প্রথম পথটি গ্যেটেকে আকৃষ্ট করেছিল, তাঁর পরিণত জীবনদৃষ্টি বরং সন্নিবদ্ধ হয়েছিল শিল্পের এই দ্বিতীয় ভূমিকাতেই।

---

১ প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে এই মহাকাব্য রচনার সূচনা হয়, আর গ্যেটের একাশী বছর বয়সে দ্বিতীয় খণ্ডের পরিসমাপ্তি; পুরো প্রথম খণ্ড যখন প্রকাশিত হয়, গ্যেটের বয়স তখন পঞ্চান্ন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে গ্যেটের স্বভাবনিষ্ঠ অভিজাতসুলভ স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা মধ্যবয়সে এক কাব্যিক নিঃসঙ্গতার উপক্রম করেছিল। এবং সে নিঃসঙ্গতা থেকে নিষ্ক্রমণের উপায় মিলেছিল কনিষ্ঠ সমসাময়িক যশস্বী কবি-নাট্যকার শীলারের (Fridrich Schiller) সাথে গভীর ও বিচিত্র সখ্যের মধ্যে। গ্যেটে ও শীলারের মধ্যে এই ঐতিহাসিক বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয় ১৭৯৪ সালে। বিচিত্র এই যে, এই প্রগাঢ় বন্ধুত্বের আদিপর্বে একে অপরজনকে তাঁর বিপরীত বলেই মনে করতেন এবং পরস্পরের প্রতি বিচিত্র এক ঈর্ষামিশ্রিত গুণগ্রাহিতা ও আকর্ষণ প্রকট ছিল। উভয়ের মধ্যে বয়সের ব্যবধান দশ বছর— গ্যেটে অগ্রজ। গ্যেটের সাথে প্রথম সাক্ষাৎকারের পর শীলার এক বন্ধুকে লেখেন : "আমার সন্দেহ আছে আমরা (শীলার ও গ্যেটে) কখনও অন্তরঙ্গ হব কিনা।... তাঁর জগৎ আমার জগৎ নয়, আমাদের দুজনের দৃষ্টিভঙ্গী একান্ত ভিন্ন বলে মনে হয়।" দুজনের দৃষ্টিভঙ্গী, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সৃজনকুশলতা, অভ্যাস— সব কিছুই ভিন্ন ছিল সন্দেহ নেই। এই অনুপম বন্ধুত্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে "Genius and Character" গ্রন্থে Emil Ludwig লিখেছেন : 'শীলার চান শাসন করতে, গ্যেটে চান সাধন করতে। শীলারের কাছে জীবন আসে শিল্পের পর, যে কারণে তাঁর ভোগৈষণা এত অসমঞ্জস। গ্যেটের কাছে জীবন শিল্পের মূলে, তাই শিল্প আপনা থেকে প্রস্ফুটিত হয়। শীলার যখন অনুভব করেন, তখন সর্বদাই চিন্তা করেন; গ্যেটে যখন চিন্তা করেন, তখনও প্রত্যক্ষ করেন'। ভালো-মন্দের দ্বন্দ্ব নিয়ে উভয়ের অভিজ্ঞার তফাৎ রয়েছে— শীলার সরবে জগতের সাথে সংগ্রাম করেন, গ্যেটে নীরবে তাঁর শয়তানের সাথে যুঝে যান। এক কথায় লুড্‌হ্বিগের ভাষায়, শীলার লড়াই করেন, গ্যেটে বাড়েন। ("Schiller battles, Goethe grows.") তবু গ্যেটের যখন পঁয়তাল্লিশ ও শীলারের পঁয়ত্রিশ বছর বয়স, তখন থেকে উভয়ের মধ্যে যে সৌহার্দ্যের সূচনা হয়েছিল, এগারো বছর ধরে ১৮০৫ সালে শীলারের মৃত্যু পর্যন্ত তার গতি অব্যাহত থাকল। এই সৌহার্দ্যের ক্ষেত্রেও গ্যেটের অহম্-উত্তীর্ণ সমন্বয়ী প্রতিভারই পরিচয় মেলে।

গ্যেটের স্বভাবমূলে যে আভিজাত্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেটা নিছক বহিরঙ্গতায় পর্যবসিত হয় নি; সেটা কবির একান্ত আত্মস্থতারই নামান্তর। তরুণ কবির প্রথম সার্থক গ্রন্থ হ্বার্থার উপন্যাসের চমকপ্রদ সাফল্যেও জনপ্রিয়তার প্রতি গ্যেটের কথঞ্চিৎ ঔদাসীন্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে (১ম পর্ব)। জনতার মনোরঞ্জনে এই নির্বেদকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে টমাস মান বলেছেন, এটা অভিজাত-মানবতাবাদী প্রত্যাখ্যানেরই (aristocratic-humanistic refusal) নামান্তর। এই নির্লিপ্ততাই প্রকাশ পেয়েছে গ্যেটে-সংলাপের অনুলিপিকার সুধী একারমানের (Eckermann) প্রতি গ্যেটের এই উক্তিতে যে, তাঁর এইসব অনুলিপি হয়তো জনপ্রিয় হবে না। অবশ্য এতে একারমান আন্তরিকভাবে ক্ষুণ্ণই হয়েছিলেন। লোকপ্রিয়তার প্রতি উপেক্ষার পরিপোষক যে আভিজাত্য গ্যেটের উত্তরজীবনে বিশেষভাবে প্রকট হয়, তার মূল নিহিত ছিল গ্যেটে-চরিত্রের গভীরে।

মহাকাব্যের নায়ক ফাউস্টের বিভিন্ন ভূমিকায় গ্যেটের মানস-জীবনের বিচিত্র রসায়নেরই বিভিন্ন পর্যায় প্রতিফলিত হয়েছে নায়কের জীবনের বিশেষ সমস্যাগুলির সূত্রায়ণে। যৌবনে যে ফাউস্টকে গ্যেটে রূপায়িত করেছেন, সে ফাউস্ট যেন অসুর টাইটানের মতো প্রতিদ্বন্দ্বী সংগ্রামী, আর সে প্রণয়লীলায় ভাস্বর। কিন্তু ইতালী পর্যটনান্তে চল্লিশোত্তর গ্যেটের হাতে যে ফাউস্ট ক্রমে রূপ পরিগ্রহ করল, তার ভূমিকায় হেলেনার বিয়োগান্তক কাহিনীই মুখ্য (২য় খণ্ড)। আর প্রৌঢ়ত্বের পরিণত বয়সে যে ফাউস্টের

সৃষ্টি, তার ভূমিকা সজ্জিত হয়েছে প্রকৃতিগ্রাহী রহস্যবাদে যার সাথে এসে মিলেছে পুনর্জীবনের, অমরত্বের চিন্তা। আদিযৌবনের রোমান্টিকধর্মী বীররস এবং পরিণত যৌবনের বুদ্ধিনিষ্ঠ সংশয়মুখীনতা প্রৌঢ়ত্বের পর্যায়ে পরিণত হয়েছে শান্তরসে। এই পর্যায়ের সাধারণ লক্ষণ যে শান্তরস, তার অবশ্য পূর্বাভাস মেলে কবির যৌবনে রচিত (মাত্র ৩১ বছর বয়সে) একটি ছোটো কবিতায়—"পান্থজনের নৈশগীতি" (Wanderers Nachtlied):

পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়
সব শান্ত স্তব্ধ
কোনো বৃক্ষচূড়ার কুলায়ে
কোনো সাড়াশব্দ
শোনা যায় না আর।
পাখীরা ঘুমায় গাছে গাছে।
ধৈর্য ধরো লগ্ন এল কাছে
শান্ত হবে তুমিও এবার।[১০]

হৃদয়ের শান্তির সন্ধানে যৌবনকালে কবিকে নিরন্তর যুঝতে হয়েছে। হ্বাইমার-বাসের প্রথম পর্যায়ে একদা ভ্রমণরত গ্যেটে পাহাড়-ঘেরা নিস্তব্ধ এক আরণ্যক পরিবেশে পর্বতশিখরে বসে প্রকৃতির অন্তরে বিরাজমান নিবিড় শান্তি উপলব্ধি করেছিলেন, আর সেখানেই কুটিরস্থ কাঠের দেয়ালে লিখে রেখেছিলেন এই পংক্তিগুচ্ছ। (সুদীর্ঘ একান্ন বছর পর— মৃত্যুর মাত্র মাস ছয়েক পূর্বে, ১৮৩১ সালে—স্থবির গ্যেটে আবার একবার সে জায়গায় খুঁজে আসেন, আর "পান্থজনের নৈশগীতি"তে অভিব্যক্ত তাঁর পরিণত যৌবনের ভাবটিতে যেন অবগাহন করেন!)

যে শান্তরসলীন অন্তর্দৃষ্টির ইঙ্গিত উদধৃত কবিতাটি স্পষ্ট বহন করে, তা জীবনবীক্ষায় সাধন করতে কবিকে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল— অনেক সংঘাত-বেদনার মধ্য দিয়ে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়েছিল। আলোর পথেরই অভিযাত্রী গ্যেটে, অন্তরের মুক্তির অভিসারী তিনি। হতাশা, নৈতিবাদ, দুঃখাত্মক জীবনদৃষ্টি তাঁর আত্মিক অভিযানে সাময়িক পর্যায়মাত্র। কষ্ট স্বীকারের আত্মনিগ্রহেরও প্রয়োজন আছে পরিশুদ্ধ জীবনবেদকে অর্জন করবার জন্য। কারণ সে জীবনবেদ ক্ষুদ্র অহমিকাকে, অহংনিষ্ঠ বস্তু-নির্বেদকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। গ্যেটের সুদীর্ঘ জীবন অনুশীলন করলে দেখতে পাই সমাহিত জীবন-নিস্পৃহতা তিনি অর্জন করেছেন জীবনবিমুখতার মধ্য দিয়ে নয়, বরং সুখদুঃখের অধিষ্ঠান জগতের কেন্দ্রে অবস্থান করেই। নিজের সমস্ত কর্মকে, এমন-কি তাঁর আনন্দ ও অতিরক্তিকেও তিনি যাচাই করেছেন আপন ব্যক্তিসত্তা ও শিল্পের উপর তাদের প্রভাবের মাধ্যমে।

"ফাউস্টে"র সূচনাতেই ("দেবলোকে অবতরণিকা"—"Prologue im Himmel") পরমপ্রভুর মুখ দিয়ে এই চূড়ান্ত সত্যটি গ্যেটে উত্থাপন করেছেন — মানুষ যতক্ষণ তার অভীপ্সার তাড়ণায় সংগ্রাম করে চলে, তার পক্ষে ভুল করা স্বাভাবিক ("Es irrt der Mensch so lang er strebt")। ভ্রান্তি মানবিক ধর্ম,

১০ বিষ্ণু দে -কৃত অনুবাদ, "জর্মান শ্রেষ্ঠ কবিতা," সম্পাদনা ধীরেন মুখোপাধ্যায়, দীপায়ন।

কিন্তু তার উদ্ভব মানুষের স্বভাবসুলভ অহংনিষ্ঠা থেকে। মানব-স্বভাবের গতিময় সংগ্রামশীলতাকে মেনে গ্যেটে খ্রীষ্টান তথা ইউরোপীয় ঐতিহ্যের মর্মকথাকেই প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সসীম মানুষের এই সংগ্রামশীলতা নিছক অন্ধ প্রবৃত্তি নয়, এটা ঊর্ধ্বমুখী লক্ষ্য দ্বারা সঞ্জীবিত। এই প্রসঙ্গেই নাটকের অবতরণিকায় বলা হয়েছে যে মানুষ কল্যাণকামী, তার দ্বিধাজড়িত প্রয়াসের মধ্য দিয়ে সেই প্রকৃষ্ট পন্থাটির চেতনাই অনির্বাণ থাকে।[১১] চিরকল্যাণের ও আনন্দের এই ধ্রুবচেতনায় উত্তরণ গ্যেটে-চরিত্রের ও প্রতিভার অন্তিম পর্যায়কে মহীয়ান্ করে তুলেছে।

সৌন্দর্যসাধক গ্যেটের দৃষ্টিভঙ্গীর বিবর্তন এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সৌন্দর্যপিয়াসীর দৃষ্টি নিয়েই গ্যেটের কবিচেতনার সূচনা ; এই সৌন্দর্যানুশীলনের আগ্রহে গ্যেটে কল্যাণের আদর্শকে উপেক্ষা করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। সে পর্যায়ে তাঁর অভিমত ছিল—সুন্দর মঙ্গলের অধিক, কারণ মঙ্গল সুন্দরেরই অন্তর্বর্তী। ইংরাজি সাহিত্যের রথী অস্কার ওয়াইল্ডও এই অবিমিশ্র সৌন্দর্যবাদী মতের প্রচারক ছিলেন। কিন্তু এই সৌন্দর্যসর্বস্বতায় গ্যেটের প্রতিভা ক্ষান্ত হয় নি, ওয়াইল্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। ওয়াইল্ডের শেষ কথা নিছক সৌন্দর্যসাধনা ; উত্তরপর্যায়ে গ্যেটে আর বিশুদ্ধ শিল্পচর্চাকেই চরম ও পরম বলে স্বীকার করেন নি।[১২] তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে পরম কল্যাণের আদর্শের প্রতি, যা কালোত্তর তার প্রতি। গ্যেটে তাঁর পরিণত জীবনবেদকে সূত্রিত করেছিলেন এই ব'লে যে, মানুষকে বাঁচতে হবে কল্যাণের ও সুন্দরের জন্য, এবং সবার সুখের জন্য—জগদ্ধিতায়। এই সুস্পষ্ট মঙ্গলবোধেই গ্যেটের শিল্পসাধনার পরিসমাপ্তি, সৌন্দর্যপিয়াসী শিল্পীসত্তা গ্যেটে-প্রতিভার যথার্থ পরিচয় নয়।

নবীন গ্যেটে যেমন উত্তুঙ্গ রোমান্টিক ভাববাদে নিবিষ্ট হয়েছিলেন, প্রবীণ গ্যেটে তেমনি এক মহত্তর বাস্তববাদে উপনীত হলেন—যা প্রায় মরমিয়া রহস্যবাদেরই (mysticism) এক অভিব্যক্তি। উভয়ের অন্তর্বর্তী ছিল পরিণত যৌবনের সংশয় ও দ্বন্দ্ব। ভাবাকুল আত্মলীনতার প্রান্ত থেকে সচেতন দ্বিধাসংশয়ের মধ্য দিয়ে কবি উত্তীর্ণ হলেন সম্বুদ্ধ ক্ষান্তিতে। মানুষের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের স্বাভাবিক ক্রমানুসারী জীবনদর্শনের ব্যাখ্যানে গ্যেটে এই অভিমত পোষণ করতেন ("Maxims and Reflections") যে, বিভিন্ন বয়সে মানুষ বিভিন্ন জীবনদর্শনে সাড়া দেয়। শিশু আত্মপ্রকাশ করে নিছক বাস্তববাদীর ভূমিকায় ; আর যুবা হয় আন্তর আবেগে মথিত, তাই সে আত্মসচেতন, আর ক্রমে যেন পরিণত হয় ভাববাদীতে। যৌবনের এই ভাববাদী দৃষ্টি ক্রমে আচ্ছন্ন হয় সংশয়বাদে ; আর পরিণত যৌবনের সংশয়নিষ্ঠাকে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে যদি যথার্থ উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তবে ক্রমে প্রৌঢ়ত্বের পরিক্রমার সাথে সাথে মরমিয়াবাদী দৃষ্টির সার্থক রূপায়ণ সম্ভব। গ্যেটের ক্ষেত্রে এই অন্তিম পর্যায়ে উত্তরণ সম্ভব হয়েছিল।

---

১১ দ্রষ্টব্য "A good man, through obscurest aspiration,
Has still an instinct of the one true way".
Faust, "Prologue in Heaven", (trans. Taylor).

১২ তুলনীয় ওয়াইল্ডের জীবনীকার Frank Harris-এর মন্তব্য : "Oscar Wilde stopped where the religion of Goethe began, he was far more of a pagan and individualist than the great German".

যে শান্তরসের আবাহন গ্যেটের যৌবনকালের কবিতাটিতে ("পান্থজনের নৈশগীতি") লক্ষিত হয়, এবং যে শান্তরসের আভাস গ্যেটের উত্তররচনায় অনুস্যূত হয়ে আছে, তারই গভীরতর প্রতিষ্ঠা ঘটেছে প্রৌঢ়ত্বের পর্যায়ে গ্যেটের বিশিষ্ট রচনায়— ১৮১৯ সালে প্রকাশিত প্রতীচ্য-প্রাচ্য-সঞ্চয়ন (West-Oestlicher Diwan)। প্রজ্ঞা ও প্রেমের কাব্য এই সঞ্চয়ন ; বিশেষত হাফিজের পারসী রচনার অনুবাদ পড়ে গ্যেটে এই কাব্য প্রয়াসে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন (১৮১২)। তদানীন্তন ইউরোপ নেপোলিয়নের যুদ্ধযাত্রায় বিপর্যস্ত ও ক্লান্ত ; সমসাময়িক কালের এই ঝঞ্ঝাবাত্যায় গ্যেটেও যেন শ্রান্তপ্রায়। মানবতাধর্মী শাশ্বতরসের পিয়াসী গ্যটে আপনার জন্য একান্তভাবে নির্জনতার অবকাশ সন্ধান করছিলেন। প্রায় চারশো বছরের অগ্রসূরী পারস্যের এই মরমিয়াবাদী কবির জীবনে ও কাব্যে গ্যেটে যেন আত্মীয়তাসূত্র আবিষ্কার করলেন। নেপোলিয়নের সমসাময়িক এবং ধর্মভ্রষ্ট বলে বহুল পরিচিত ইউরোপের এই কবি তাঁর নিয়তি ও মানসের সহমর্মী পেলেন প্রাচ্যের সেই হাফিজের মধ্যে— যিনিও প্রথমে বিধর্মী বলে আপন সমাজে গণ্য হয়েছিলেন ও পরে গৌরবের শিখরে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, আর যাঁর ভাগ্যে একদা ঘটেছিল নিষ্ঠুর তৈমুরের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা। অবশ্য গ্যেটের প্রাচ্যলোকে এই অবগাহন তাঁর স্বকীয় জীবনবেদ থেকে তাঁকে উৎক্ষিপ্ত করে নি ; বরং গীতিকবিতাগুলি তাঁর আপন হৃদয়রাগেই রঞ্জিত, আর রূপায়িত করেছে তাঁর উপলব্ধিকে প্রাত্যহিক অনুভূতি ও চিন্তার সংযোগে।

এই সঞ্চয়ণের প্রথম সর্গের একটি কবিতায় কবি সন্নিবদ্ধ করেছেন তাঁর সুপরিণত জীবনবেদ— তাঁর সংজ্ঞান ও বিশ্ববীক্ষণ সূত্রায়িত হয়েছে তাতে। সার্থক নাম কবিতাটির ; "কৃতার্থ অভীপ্সা" (Selige Sehnsucht)। কবির 'কৃতার্থ অভীপ্সা' ব্যক্ত হয়েছে এইভাবে :

বলি আমি শুধু প্রাজ্ঞজনের তরে—
জনতা হবে যে বিদ্রূপে মুখরিত—
বন্দনা করি সেই জীবন্তেরে,
অগ্নিশিখায় মরণ কামনা ব্রত।

শিখাময় অবলুপ্তির অভিসারী যে জীবন, তারই পূজারী কবি। মিলন-বিরহের আনন্দ-বেদনায় মানব-প্রেমের যে সার্থক রূপায়ন, তারই মধ্যে কবি এই অভীপ্সার সাক্ষ্য খুঁজে পান। "যে প্রণয়রজনীর স্নিগ্ধতায় সৃষ্টির লীলা চলে, তার মধ্যে বিচিত্র অনুভূতি তোমায় এসে অভিভূত করে— আর তখন জলতে থাকে শান্ত প্রদীপখানি।" "আঁধারের আবরণে তুমি আর আচ্ছন্ন থাকবে না, ঊর্ধ্বতর মিলনের নূতন কামনায় তুমি আবার উন্মুখ হবে।"— আত্ম-উন্মোচনের সার্থক পর্যবসান নিছক মানবিক প্রেমের মধ্যে নয়, তাকে উত্তীর্ণ হয়েই সম্ভব। ঊর্ধ্বতর সত্যের পানে যে আকুতি তা আপনাকে দগ্ধ করতে উদ্যত হয় পতঙ্গেরই মতো। "কোনো ব্যবধান তুমি সইতে পার না, তাই উড়ে আস তুমি যে বিমুগ্ধ। অবশেষে দগ্ধ তুমি, হে পতঙ্গ আলোলোভাতুর!" কিন্তু কবি জানেন, এ দহন প্রকৃত বিনাশ নয়, এ তন্ময়তারই নামান্তর, ঊর্ধ্বতর সত্তাতে এর উত্তরণ। তাই সমাপ্তিতে কবি বলেছেন : "মৃত্যু আর পুনর্ভব : এ দুয়ের বিহনে ম্লান এই পৃথিবীর বুকে শুধু বিষণ্ণ অতিথি হয়ে বিরাজ করা ছাড়া তোমার আর গতি কি!"

প্রায় পঁয়ষট্টি বছর বয়সের এই কবিতাটি নিঃসন্দেহে এক অন্তর্নিহিত ধর্মবোধের সাক্ষ্য বহন করে। সার্বিক সত্যের কাছে অন্তর থেকে সমর্পণের সুর কবিচেতনায় ইতিপূর্বেই (মধ্যম পর্বে) পরিস্ফুট হয়েছিল। এখন পরিপক্ক জীবনবোধে সে সুরের সাথে এসে মিলল অমরত্বের প্রতীতি। জীবনের উদ্দেশে মৃত্যুকে বরণ করবার যে নির্দেশ ("die to live") হেগেলীয় দর্শন থেকে উদ্ভূত, তারই যেন কাব্যিক রূপায়ণ লক্ষিত হয় এই কবিতার মর্মবাণীতে। জীবনের উপর গ্যেটের অগাধ বিশ্বাস ; সে বিশ্বাসে মরণের বিয়োগান্তক রূপটিও অন্তর্হিত। মৃত্যু তাঁর শত্রু নয়, বরং গোড়া থেকেই তিনি মৃত্যুর সাথে সখ্যসূত্র স্বীকার করে এসেছেন। পুনর্জীবনে গ্যেটে বিশ্বাসী। সুদীর্ঘ আট দশক ধরে তাঁর জীবনের ভূমিকা পাতা, জীবনের শেষ পরিপূর্ণতারূপেই মৃত্যুকে তিনি অবলোকন করেন। খ্রীষ্টমতাবলম্বী হয়েও এক এক বিশ্বাতীত ঈশ্বর-ব্যক্তিতে বিশ্বাসেই গ্যেটের জীবন-দর্শনের পরিণতি নয়। তা উত্তীর্ণ হয়েছিল বিশ্বপ্রপঞ্চে প্রকাশমান পরমসত্তার সাথে প্রকৃতির ঐক্যের বোধে। এই বিশ্ববীক্ষাই গ্যেটে উপস্থিত করেছেন 'ফাউস্টে'র দ্বিতীয় খণ্ডে। নাটকের পরিসমাপ্তিতে এই বাণীই ধ্বনিত হয়েছে যে, পৃথিবীতে যা কিছু বিরাজমান তা ঐশীশাশ্বতেরই প্রতিবিম্ব—'যা কিছু অনিত্য তা শুধু যেন প্রতিরূপ'। "প্রবচন ও চিন্তনে'র মধ্যে যথার্থ প্রতীকতার (symbolism) স্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে গ্যেটে বলেছেন : যেখানে বিশেষ হয়েছে সার্বিকের প্রতিভূ— ছায়াবিগ্রহ নয়, অচিন্ত্যের জীবন্ত প্রকাশ— সেখানেই যথার্থ প্রতীক।"

তাঁর বিরাশীতম—এবং অন্তিম— জন্মবার্ষিকীতে গ্যেটে 'ফাউস্টে'র দ্বিতীয় খণ্ডের সমগ্র পাণ্ডুলিপিটি তাঁর মৃত্যুর পর খুলে প্রকাশ করবার উদ্দেশে সিলমোহর করে রাখেন (১৮৩১)। এই প্রসঙ্গে একারমানকে তিনি বলেন : 'এখন থেকে আমার জীবনকে এক বিশুদ্ধ উপহারের দৃষ্টিতে দেখব।' এর পর মাত্র সাত মাস কবি বেঁচে ছিলেন। নিজের জীবন নিয়ে এই নৈর্ব্যক্তিক নিরাসক্তিই ব্যক্ত হয়েছে আশী বছর বয়সে 'ফাউস্টে'র ফরাসী অনুবাদ প্রসঙ্গে কবির মন্তব্যে। তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁর মহাকাব্যে বর্ণিত মানবাত্মার ক্রমপরিণতির পর্যায়গুলি— বেদনা, বিক্ষোভ, বিরাগ ও আনন্দের মধ্য দিয়ে। আর সে প্রসঙ্গে বলেছেন : 'গ্রন্থকার এখন এসব পরিস্থিতি থেকে অনেক দূরে সরে এসেছেন।··· আর ইতিমধ্যে সংসারের রূপ কিছুটা পরিবর্তিত হলেও, আনন্দ-বেদনায় মানুষের অবস্থা অনেকটা একই রয়ে গেছে।'

লৌকিক জীবনের সাথে অতি-লৌকিক মহিমার, পার্থিব সত্তার সাথে ঐশ্বরিক সত্তার ঘনিষ্ঠ সেতুবন্ধনেই গ্যেটের বিশ্ববীক্ষার পরাকাষ্ঠা। জগৎ ও মানুষের সাথে সুদীর্ঘ আত্মীয়তার মধ্য দিয়ে অনুভূতি ও অভিজ্ঞতায় যে বিচিত্র রসঘন পট আপন জীবনে রচিত হয়েছিল, তারই মাধ্যমে গ্যেটে উপলব্ধি করেছেন মানবজীবনের মহিমা—অসীমের পটভূমিকায়। যে ফাউস্ট স্বভাবত অপরিপূর্ণ, তার মুক্তি ঘটল শেষ পর্যন্ত অপার্থিব প্রেমের প্রভাবে। সে প্রেমের উৎস শাশ্বত নারী—তাঁরই সাহচর্যবোধ ও করুণার স্বীকৃতি গ্যেটের কাব্যে ও জীবনে ক্রিয়মান। সেই অমর্ত্য মহিমা পৃথিবীর নারীর মধ্যে প্রকাশমান। খ্রীষ্ট-জননী মেরীর দেবীমূর্তির মধ্যেই গ্যেটে শাশ্বত এই নারীরূপের চরিতার্থতা খুঁজে পান। সেই চিরন্তনী কল্যাণময়ী শক্তির বন্দনায় নাটকের পরিসমাপ্তি : শাশ্বত সেই নারী আমাদের ঊর্ধ্বপানে আকর্ষণ করেন। ("Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan.")[১৩]

১৩ All things transitory
But as symbols are sent;

দ্বন্দ্বমুখর পার্থিব জীবনকে তার সমগ্র সসীমতায় গ্রহণ করেও ঐশী চেতনার অভিমুখী হওয়া— গ্যেটের জীবন ও কাব্যের এই মর্মকথা। 'যা কিছু অনুসন্ধেয় তার অনুসন্ধান করা আর যা অনুসন্ধানের অগম্য তাকে শান্তভাবে শ্রদ্ধা করা'— এই জীবনবেদের মননদ্যুতিতে গ্যেটে-প্রতিভা চিরভাস্বর।

Earth's insufficiency
Here grows to Event:
The Indescribable,
Here it is done:
The Woman-Soul leadeth us
Upward and on!

Faust, Part II, (trans. Bayard Taylor).

বিষ্ণুপুর ঘরানা। দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৬। পাঁচ টাকা।

সঙ্গীতসাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীতকল্পতরু। দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়। জিজ্ঞাসা, কলিকাতা ৯। ছয় টাকা।

ত্রয়ীস্বরে ভারতীয় সংগীত। শ্রীসুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বাক্-সাহিত্য, কলিকাতা ৯। আট টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বিষ্ণুপুরে বহুকাল থেকে ধ্রুপদের বিশেষ চর্চার ফলে একটি বিশিষ্ট ধরন কায়েমী হয়ে গেছে। একেই বলা হয় বিষ্ণুপুর ঘরানা। বিষ্ণুপুরে গায়কদের বিশ্বাস অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথের দরবারে তানসেনবংশীয় বাহাদুর খাঁ তানসেন প্রবর্তিত অর্থাৎ সেনী ধ্রুপদের প্রবর্তন করেন। শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায় উপযুক্ত প্রমাণসহ এই মতটি খণ্ডন করে প্রতিপন্ন করেছেন যে রঘুনাথের সময় বাহাদুর খাঁর অস্তিত্ব সম্ভব নয়। এই বাহাদুর খাঁ আদৌ একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি না সে সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন কারণ যে সব তথ্য পাওয়া যায় তাতে উক্ত বাহাদুর খাঁকে বিষ্ণুপুরে সেনী ঘরানার প্রবর্তক হিসাবে গণ্য করা সম্ভব হয় না। দিলীপবাবুর মতে বিষ্ণুপুরের যে সাংগীতিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তার মূলে আছেন রামশঙ্কর ভট্টাচার্য। ইনি আগ্রা অঞ্চলের কোনো প্রবীণ সংগীতজ্ঞের কাছে প্রায় দুই বৎসরকাল সংগীতে শিক্ষালাভ করেন। তাঁর বিশ্বাস আগ্রা মথুরা অঞ্চলের কোনো সংগীতগুণীর কাছে, তিনি যে বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন তা থেকেই বিষ্ণুপুর ঘরানার উৎপত্তি হয়েছে। রামশঙ্কর অষ্টাদশ শতাব্দীর অপরার্ধে জীবিত ছিলেন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ভূমিকায় যে মত প্রকাশ করেছেন তাতে মনে হয় তাঁর বিশ্বাস সেনী ও মথুরা-বৃন্দাবনে প্রচলিত ধ্রুপদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। তিনি বলছেন—"অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে বোধ হয় বলা অসমীচীন হবে না যে সেনী ও মথুরা বৃন্দাবন এই উভয় ঘরানারই মূল ও প্রেরণাকেন্দ্র ছিল গোয়ালিয়র ঘরানা। সুতরাং বিষ্ণুপুর ঘরানার মূল উৎস পশ্চিমী আগ্রা বা মথুরাবৃন্দাবন বলে গণ্য হলেও সেনী ঘরানার মতোই তার প্রাণকেন্দ্র ছিল সংগীত-পীঠস্থান গোয়ালিয়র। অবশ্য পরে তারা স্বতন্ত্র মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।"

পুস্তকটিতে নটি প্রধান অধ্যায় আছে। এই অধ্যায়গুলির বিষয়বস্তু হচ্ছে—ঘরানার কথা, বিষ্ণুপুর ঘরানা, বিষ্ণুপুর ঘরানার উৎপত্তি—প্রচলিত মত, রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথের কথা, বাহাদুর খাঁর জীবনকাল, বাহাদুর খাঁর বিষ্ণুপুরী শিষ্য, বিষ্ণুপুরের সংগীতগুরু রামশঙ্কর, রামশঙ্করের গুরুকরণ এবং বিষ্ণুপুর সেনী ঘরানার বহির্ভূত এই মতস্থাপন। গ্রন্থশেষে রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের বংশতালিকা দেওয়া হয়েছে এবং শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য ও স্বর্গত ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিষ্ণুপুর সম্বন্ধীয় আলোচনা যোজিত হয়েছে।

বিষ্ণুপুরের সাংগীতিক ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কেউ সংশয় প্রকাশ করেন নি, কারণ এ বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা কেউ অনুভব করেন নি। শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় বিশেষ নৈপুণ্যসহকারে ঐতিহাসিক ক্রম অনুযায়ী আলোচনা করে দেখালেন যে বাংলার সাংগীতিক ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়ের পুনরালোচনার বিশেষ প্রয়োজন। এ বিষয়ে গবেষকদের সচেতন করে দিয়ে তিনি মহৎ উপকার করেছেন।

বিষ্ণুপুরের তথাকথিত ইতিহাসে যে সময় বাহাদুর খাঁকে স্থাপন করা হচ্ছে সেই সময় তাঁর অস্তিত্ব সম্ভব নয় এটি এই পুস্তকে যথার্থভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তবে তানসেনের বংশপঞ্জী বা অপর যে সব উপাদান লেখক সংগ্রহ করেছেন সেগুলির বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ বর্তমান। তানসেন বা সেনীধারা নিয়ে বর্তমানে যাঁরা আলোচনা করেন তাঁদের মধ্যে কেউ মুঘলযুগের প্রামাণিক গ্রন্থাদি পর্যালোচনা করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করেছেন বলে আমার জানা নেই। বর্তমানে যাঁরা নিজেদের সেনীঘরের প্রচারক বলে দাবী করেন তাঁদের মতে কিছুমাত্র আস্থা স্থাপন করা যায় না। সেনী ঘরানা যে কী বস্তু তাও হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। তানসেন নিজে কোনো ঘরানার প্রতিভূ ছিলেন না এবং তাঁর শিষ্যের সংখ্যাও খুবই কম ছিল। বিলাস খাঁ ছাড়া তাঁর অপর পুত্রদের ক্রিয়াকলাপের পরিচয় পাওয়া যায় না বললে অত্যুক্তি হয় না। বিলাস খাঁ নিজে অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। অতএব তাঁর শিষ্যদের বিলাসখানী ঘরানার অংশীদার বলাই সংগত। তানসেনের গানগুলি বহুল পরিমাণে মিশ্রিত এবং পরিবর্তিত হয়ে চলে এসেছে। এই প্রসঙ্গে আরও একটি অপ্রিয় সত্য উদ্ঘাটিত করা প্রয়োজন। উনবিংশ শতকের প্রথমদিকে যখন রাগের উল্লেখ সমেত তানসেনপ্রমুখ বহু সুরকার এবং গীতকারের গানের সংকলন প্রকাশিত হতে থাকে তখন বিভিন্ন ধ্রুপদী এইসব গানে দ্রুত সুর সংযোগ করে এগুলিকে নিজ নিজ ঘরানার অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেন। এই ব্যাপারটিতে প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করা আরও দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। বিষ্ণুপুরের গানের বিশুদ্ধ ঢঙ দেখে এটা অনুমান হয় যে এখানে ধ্রুপদের একটি বিশিষ্ট শুদ্ধরীতির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং এই রীতি তথাকথিত সেনীরীতির অনুবর্তী নয়। তথাপি যাকে আমরা সেনীধারার গান বলি তা যে বিষ্ণুপুরে প্রচলিত হবার চেষ্টা হয়েছিল এটি প্রমাণিত হয় এই কারণে যে বহু সেনী গীতি বিষ্ণুপুরে দীর্ঘকাল থেকে প্রচলিত আছে। কিন্তু বিষ্ণুপুরের গায়কেরা বোধ হয় নিজেদের প্রাচীন রীতিকে পরিত্যাগ করতে পারেন নি তাই তাঁরা অধিক অলংকার যোগ করে এইসব গান পরিবেশন করেন না অথচ ধ্রুপদের সংগঠনকে বিশেষ নিষ্ঠার সঙ্গে রক্ষা করেন।

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় রামশঙ্করের সংগীতশিক্ষার যে বিবরণ দিয়েছেন তা অবিশ্বাস করবার কারণ নেই, তবে বিবৃতিটি আরও প্রমাণনির্ভর হলে পাঠকদের প্রতীতি দৃঢ়তর হত।

বিষ্ণুপুর সেনীসংগীতের প্রতিষ্ঠা নিয়েই গৌরব অর্জন করে নি উত্তম ধ্রুপদে তার বহুকাল থেকেই অধিকার ছিল। তথাকথিত সেনবংশীয় বাহাদুর খাঁর ঐতিহাসিক অস্তিত্ব না থাকলেও বিষ্ণুপুরের সাংগীতিক কৌলীন্য অক্ষুণ্ণ থাকবে।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সন্ন্যাস জীবনের পূর্বে সংঙ্গীতকল্পতরু নামক একটি সংগীতগ্রন্থ রচনা করেছিলেন এ খবর খুব কম লোকেরই জানা। এই গ্রন্থটি পুনরায় আবিষ্কার করে লেখক স্বামীজির জীবনের একটি দিক সম্পর্কে যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। সঙ্গীতকল্পতরু গ্রন্থটি ১২৯৪ সালে অর্থাৎ আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৮৭ খৃস্টাব্দে ১১৮নং অপার চিৎপুর, কলকাতা, আর্য পুস্তকালয় থেকে প্রকাশিত হয়। লেখকের নামের স্থলে মুদ্রিত ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত বি. এ. ও বৈষ্ণবচরণ বসাক কর্তৃক সংগৃহীত। বইটির তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল এবং কয়েক বছর ধরে সাধারণে প্রচলিত ছিল। এই গ্রন্থের দুটি বিভাগ ছিল। একটি গীতিবিভাগ অপরটি তত্ত্ববিষয়ক আলোচনা। বইটি সর্বাংশে স্বামীজির প্রচেষ্টাতেই রচিত হয়। কয়েক বছর পরে সঙ্গীতকল্পতরু নামটির বিলোপসাধনপূর্বক বৈষ্ণবচরণ বসাক গ্রন্থটিকে

সচিত্র বিশ্বসঙ্গীত নামে প্রকাশ করেন এবং উক্ত গ্রন্থ থেকে নরেন্দ্রনাথ দত্ত নামটিও বিলুপ্ত হয়। সে যুগের তুলনায় গ্রন্থের গীতসংগ্রহটি বিশেষ প্রশংসনীয়। স্বামীজির নিজের চেষ্টায় এই সংগ্রহ সম্ভব হয়েছিল।

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থে কেবলমাত্র তত্ত্ব অংশটি মুদ্রিত করেছেন। বর্তমানে হয়ত এই তত্ত্ব অংশের খুব গুরুত্ব নেই কিন্তু যখন সঙ্গীতকল্পতরু রচিত হয়েছিল তখন এই আলোচনার যথেষ্ট আবশ্যকতা ছিল। বিবেকানন্দ আমাদের সংগীতসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং এই প্রযত্নে সাফল্যও অর্জন করেছিলেন। লেখক এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র সংগীতজীবনের খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়ে বইটিকে তথ্যনিষ্ঠ করে তুলেছেন। বিবেকানন্দের সংগীতজীবন সম্বন্ধে এই নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক গ্রন্থটি বর্তমান সংগীতসাহিত্যের অনুসন্ধিৎসু পাঠকসমাজকে বহুলভাবে উপকৃত করবে।

সংগীতকে নিছক গাণিতিক নিয়মে পর্যবেক্ষণ করে শ্রীসুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একটি আধুনিক পদ্ধতির বিবরণ প্রদান করেছেন। এর আগেও কোনো কোনো গ্রন্থে এই মতবাদ বর্ণিত হয়েছে। সা, গা, পা, নি— এই চারটি প্রধান স্বরকে তিন তিন হিসাবে ভাগ করে সগপ এবং গপন এই দুটি ভাগ করা হয়েছে। এই তিনটি স্বরের একত্রে নামকরণ করা হয়েছে মাতৃকা। এই ত্রয়ীস্বরের সমাবেশ অনুসারে রাগরাগিণীর বিচার করা হয়েছে। গ্রন্থকারের মতে মাতৃকার সাহায্যে রাগরাগিণীর স্বরগঠনের পার্থক্য নিরূপণ, রাগরাগিণীর মিশ্রণের মাননির্ণয়, রাগরাগিণীর শুদ্ধাশুদ্ধতা বিচার, প্রচলিত রাগরাগিণীর ত্রুটি সংশোধন প্রভৃতি বহুতর দুঃসাধ্য কার্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করা যেতে পারে। লেখক যেভাবে রাগসংগীতকে পর্যবেক্ষণ করেছেন তাতে এই রীতি প্রয়োগ করলে নিশ্চিতভাবেই সুফল পাওয়া যাবে কারণ গণিত কখনো মিথ্যা হতে পারে না। তবে কথা হচ্ছে আমাদের সংগীত ঠিক গাণিতিক নিয়মেই শ্রীবৃদ্ধিলাভ করে নি তার বিকাশ বহুপ্রকারে নানা স্বতন্ত্রপদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। অতএব এইটাই যে একমাত্র উৎকৃষ্ট পদ্ধতি সে বিষয়ে অনেক সন্দেহের অবকাশ আছে। তাছাড়া মাতৃকাপদ্ধতি যে আমাদের শাস্ত্রীয় পদ্ধতি নয় এবং আমাদের রাগসংগীতের বিকাশ কিভাবে হয়েছে সে সম্বন্ধে কোনো আলোচনার প্রয়োজনীয়তা লেখক অনুভব করেন নি।

স্বীয় মত স্থাপনের উৎসাহে লেখক কিছু অধিক পরিমাণে সংগীতশাস্ত্রের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ সঙ্গীতরত্নাকর সম্বন্ধে তাঁর মত উদ্ধৃত করি। তিনি বলছেন: "সঙ্গীতরত্নাকরে রাগসংখ্যা মাত্র ২৬৪টি পাইয়া নিশ্চয় মনে করিব যে রাগরাগিণীর সৃষ্টির মূলকথা তিনিও জানিতে পারেন নাই এবং ঐ বৃহৎ পুস্তকে বিভিন্ন পুস্তকাদির মতের আলোচনাই করিয়াছেন। তিনি উক্ত ২৬৪টি রাগেরও সম্যক সর্বপ্রকার উদাহরণ এবং সূত্রও উল্লেখ করিতে অপারগ হইয়া, মনে হয় পুস্তকে জটিল হইতে জটিলতর বহু অর্থযুক্ত বাক্য সংযোজনায় দুর্বোধ্য করিয়াছেন।" এই মন্তব্যে আমার এক প্রবীণ সংগীতজ্ঞের কথা মনে পড়ল। তিনিও এইরকম অভিমতই পোষণ করেন। কিন্তু এই মন্তব্যে এই কথাই মনে হয় যে লেখক সঙ্গীতরত্নাকরের উদ্দেশ্যই বুঝতে অসমর্থ হয়েছেন। সঙ্গীতরত্নাকরে রাগসংগীতের ক্রমবিকাশ বর্ণিত হয়েছে এবং সেটি যেভাবে হয়েছ তা বিজ্ঞানসম্মত।

আমাদের ইতিহাস যেখান থেকে আরম্ভ হচ্ছে সেখানে মাগধী, অর্ধমাগধী সম্ভাবিতা, পৃথুলা— এইসব গানের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এইসব গীতিকে অবলম্বন করেই জাতিগায়ন পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছিল।

জাতিগুলি ষড়্‌জাদি বিভিন্ন স্বরের গুরুত্ব অনুসারে গঠিত হয়েছিল। প্রথমে ছিল সাতটি শুদ্ধজাতি। পরে এই জাতিগুলির সংমিশ্রণে আরও এগারটি জাতির উদ্ভব হয়েছিল। পরবর্তী যুগে পাঁচটি গীতির প্রাধান্য স্বীকৃত হয়; যথা— শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, বেসরা এবং সাধারণী। এই গীতিগুলিকে আশ্রয় করে যে গায়নপদ্ধতির বিকাশ হয়েছিল তা আর জাতি নামে পরিচিত নয় তার আখ্যা হল গ্রামরাগ। জাতিগায়নপদ্ধতির সঙ্গে এদের সম্বন্ধ ছিল নিবিড়। দেশদেশান্তরে এবং বিভিন্ন জাতিতে এই সব গ্রামরাগের ব্যাপ্তির ফলে বহুতর মিশ্রণ ঘটল। এই মিশ্রণ অনুসারে মূল থেকে যে পরিবর্তন সাধিত হল সেই পরিবর্তনের পরিমাণ অনুসারে তাদের নাম হল ভাষা বিভাষা অন্তরভাষা। এই শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি শার্ঙ্গদেব তদীয় সঙ্গীতরত্নাকরে নিজেই নির্দেশ করেছেন। ক্রমে আরও পরিবর্তন এবং মিশ্রণের ফলে যে নতুন শ্রেণীকরণ হল তার পরিচায়ক আখ্যাগুলি হচ্ছে রাগ ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ এবং উপাঙ্গ। এই পর্যায়ে আমরা দেখছি রাগসংগীত বিভিন্ন দেশী ক্রিয়াকলাপেও ছড়িয়ে পড়েছে। রাগসংগীত এইভাবে দেশীসংগীতের মধ্যে স্বীকৃতিলাভ করল। ধীরে ধীরে এই অঙ্গরাগগুলিও ক্রমাগত মিশ্রণের ফলে তাদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলল। তখন একটি মাত্র বৃহৎ শ্রেণী অবশিষ্ট রইল; সেটি হচ্ছে রাগ। এই বৃহৎ শ্রেণীটি নিয়েই আজ আমাদের যত তর্ক, বিতর্ক, আলোচনা।

এইটিই হল রাগসংগীতের প্রকৃত ইতিবৃত্ত। ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক উভয়দিক বিচার করে সঙ্গীতরত্নাকরের মতো অপর কোনোও গ্রন্থে রাগসংগীতের আলোচনা হয় নি। রাগসংগীত গাণিতিক পথে পরিভ্রমণ করে নি, করেছে মানবিক নিয়মে ইতিহাস এবং ভূগোলের অস্তিত্বকে স্বীকার করে। ত্রয়ীশ্বরে বিরচিত মাতৃকাতন্ত্রের মহিমাকীর্তন প্রসঙ্গে এই সত্যকে অস্বীকার করা কোনোক্রমেই সমীচীন হবে না।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

জর্জ বার্নাড শ। শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ১২
দশ টাকা।

বার্নাড শ-এর মৃত্যু হয়েছে পুরো পনের বছরও হয় নি কিন্তু এরই মধ্যে তাঁর খ্যাতিপ্রতিপত্তি বেশ খানিকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। আমাদের এই অতি সুসভ্য যুগে সময় অতিমাত্রায় দ্রুতগামী আর সময় যে পরিমাণে দ্রুতগামী মানুষের কীর্তি সে পরিমাণে দ্রুতক্ষয়ী। আজকে যা কীর্তিত কালকে তা নিন্দিত; আবার আজকে যার অনাদর কালকে তার সমাদর হওয়াও কিছুই বিচিত্র নয়। মানুষের রুচি ক্ষণস্থায়ী হলে নিন্দা যশও ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য। আমাদের ছাত্রাবস্থায় বার্নাড শ-এর নাম যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করত আজকের ছাত্রমহলে সে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় না। অথচ আমাদের কালে বার্নাড শ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিলেন না, এখন হয়েছেন। দেখা যাচ্ছে এককালে বিশ্ববিদ্যালয় যে নিরাপত্তার আশ্বাস দিতে পারত আজকে তা পারছে না। অবশ্য ছাত্রমহলের বাইরেও যে শ-এর খুব একটা প্রতিপত্তি আছে এমন মনে হয় না।

বলা বাহুল্য বার্নাড শ নিজেই এর জন্যে অংশতঃ দায়ী— সারাজীবন প্রাণপণে নতুন কথা বলবার চেষ্টা করেছেন। নতুন কথা বলার বিপদ এই যে সহজেই তা পুরোনো হয়ে যায়। কথার জৌলস বেশি

দিন থাকে না, বিশেষ করে ছাপার অক্ষরে কথা। শাস্ত্রে বলেছে, শত কথা মুখে বোলো, লেখায় লিখো না। ডক্টর জনসন শাস্ত্রবাক্য মেনে চলেছেন। চমকপ্রদ কথা তিনিও প্রচুর বলেছেন। কিন্তু সেসব কথা মুখে বলেছেন লেখায় লেখেন নি। মানুষের মুখে মুখে তার প্রচার হয়েছে। মুখে মুখে যে কথা প্রচারিত হয় দিনে দিনে তার ধার এবং জৌলস বাড়তে থাকে। পুথির পাতায় ছাপার অক্ষরে কথা মিইয়ে যায়। বার্নাড শ-এর অনেক কথা মিইয়ে যাচ্ছে। সাহিত্যে নতুন কথাটাই বড়ো কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, আমরা নতুনকে চাইনে, চাই নবীনকে। সাহিত্যে চিরকাল নতুনের চাইতে নবীন বড়। নতুন পুরাতন হয়, নবীনের নবীনতা এবং সজীবতা কখনো নষ্ট হয় না।

অমিট-রায়ের বোন সিসি বলেছিল, ও সকালবেলা উঠেই সারা দিনের মতো শানিয়ে বলা কথা বানিয়ে রেখে দেয়। শ-এর বেলায় কতকটা তাই হয়েছে। ওঁর কথাগুলি সব সময়ে জ্যান্ত নয়। নাটকের দুই চরিত্রে দুই প্রতিপক্ষ খাড়া করে wit-এর ঠোকাঠুকি চলতে থাকে, খানিকটা যেন কথার ফুলঝুরি। খানিকক্ষণ বেশ লাগে, পরে ক্লান্তি আসে। জনসনের কথা ছিল জ্যান্ত কারণ তিনি পুথির পাতায় কথা বলেন নি। বলেছেন খাবার টেবিলে, চায়ের দোকানে, বন্ধু মজলিশে। তাঁর প্রতিপক্ষ কাল্পনিক প্রতিপক্ষ নয়। নিত্যকার আলোচনা প্রসঙ্গে যুক্তিতর্কের ঘাত প্রতিঘাতে সেই বাক্য স্বতঃ উৎসারিত। শানিয়ে বলা কথা তাঁকে আগে থেকে বানিয়ে রাখতে হত না, শানিত বাক্য তাঁর জিহ্বাগ্রে প্রস্তুত থাকত। কথাপ্রসঙ্গে বার্নাড শ-এর মুখেও অনেক সুতীক্ষ্ণ বাক্য, অনেক সুভাষিত উচ্চারিত হয়েছে। লেখনী নিঃসৃত বাক্যের চাইতে এসব কথাই বরং অধিকতর দীর্ঘায়ু হবে।

অবশ্য বার্নাড শ কেবলমাত্র নতুন কথা বলেছেন এমন কথা বললে তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়, খাঁটি কথাও প্রচুর বলেছেন। কিন্তু খাঁটি কথা বললেই যে খাঁটি সাহিত্য হবে এমন কথা কেউ জোর করে বলতে পারে না। সত্যাত্মক বাক্যকেও সর্বাগ্রে রসাত্মক হতে হয়। বলা বাহুল্য তাঁর অনেক খাঁটি কথা অর্থাৎ সত্য কথা রসের পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হয়েছে। সাহিত্যে ওটাই অগ্নিপরীক্ষা। তথাপি সাহিত্যে যতখানি সম্মান তাঁর প্রাপ্য ছিল তা যে তিনি পান নি তার কারণ প্রধানতঃ যে ইংরেজ সমাজকে উদ্দেশ করে তিনি কথা বলেছেন তারা তাকে বড়ো একটা আমল দেয় নি। চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। ইংরেজ রক্ষণশীল জাতি—চিরাচরিত বিশ্বাসকে সে সহজে ছাড়তে চায় না। যে মানুষ নতুন কথা বলে তাকে সে বরাবর সন্দেহের চোখে দেখে।

অমিত রায়ের সঙ্গে আর-একটা ব্যাপারেও শ-এর স্বভাবের মিল আছে। "অমিতের বোনেরা ওর যে অভ্যাসটা নিয়ে ভারি বিরক্ত সে হচ্ছে ওর উল্টো কথা বলা। সজ্জন-সভায় যা কিছু সর্বজনের অনুমোদিত ও তার বিপরীত কিছু একটা বলে বসবেই।" শ-এর বিরুদ্ধে পাঠকসমাজের বিশেষ করে ব্রিটিশ জাতির ঠিক এই অভিযোগ। অথচ একটু অনুধাবন করলে দেখা যাবে আপাতদৃষ্টিতে শ-এর কথাবার্তা যতটা উল্টো বা উদ্ভট বলে মনে হয় কার্যতঃ ততটা উদ্ভট নয়। আসলে আমাদের অনেক ধারণা অনেক বিশ্বাস, অনেক কার্যকলাপ অত্যন্ত অযৌক্তিক। শ নিখুঁত যুক্তি এবং নির্মম পরিহাসের সঙ্গে এ সবের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করে দিয়েছেন। আমরা তাঁর যুক্তি খণ্ডন করতে পারি নি এবং পারি নি বলেই তাঁকে একটা উপদ্রব বলে মনে করেছি। শ-এর এক গুণগ্রাহী বন্ধু বলেছেন, "It has

been said that Shaw irritates people by always standing on his head, and calling black white and white black. But only simpletons either offer or accept this account···what is really puzzling is that Shaw irritates as intensely by standing on his feet and telling as that black is black and white white, whilst we please ourselves by professing what every one knows to be false."

কঠোর ভাষায় হোক আর পরিহাসের সুরে হোক অনেক পিলে-চমকানো কথা তিনি বলেছেন, কিন্তু এ যুগে মানুষের পিলে এত বেশি মজবুদ যে কোনো কিছুতেই পিলে ফাটবার লক্ষণ দেখা যায় না। সভ্য মানুষ কোনো ব্যাপারেই সহজে বিচলিত হয় না। বোধ করি এই কারণেই অসামান্য প্রতিভা সত্ত্বেও যতখানি প্রভাব বিস্তার করার কথা ছিল ততখানি তিনি করতে পারেন নি। এই সূত্রে আর একটি কথাও স্মরণ রাখা কর্তব্য। মনুসংহিতা শাস্ত্র হিসাবে বড়ো হতে পারে কিন্তু সাহিত্য হিসাবে বড়ো কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে। বার্নাড শ এ যুগের সমাজকে নতুন করে গড়বার উদ্দেশ্যে এক নতুন সমাজনীতি বা শাস্ত্র রচনা করবার চেষ্টা করেছেন। অনেক ন্যায্য কথা বলেছেন; সর্বত্র একটি কঠোর ন্যায়-নিষ্ঠা এবং শুচিতাবোধ বিদ্যমান। কিন্তু সবটা মিলিয়ে একটি শুচিবাইগ্রস্ত মনের আভাস আছে। এ যুগের মানুষ যেমন মনুসংহিতাকে প্রশ্রয় দেয় না তেমনি শ-সংহিতাকেও খুব একটা আমল দেবে বলে মনে হয় না। অন্ততঃ ইংরেজ জাত এ পর্যন্ত দেয় নি। যতদূর মনে পড়ছে তাঁর নাটকের প্রথম অভিনয় স্বদেশে না হয়ে আমেরিকায় হয়েছে। গুণগ্রাহী পাঠকের সংখ্যা স্বদেশের চাইতে বিদেশেই বেশি। এমন-কি ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজে যতখানি সমাদর হয়েছে ইংলণ্ডে ততখানি হয় নি। শিল্পী সাহিত্যিকরা যদিচ 'সর্বত্র পূজ্যতে' বলে খ্যাত তথাপি বলব আপন দেশের পূজাই আসল পূজা। কোনো সাহিত্যিককে আপন দেশ যদি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ না করে তবে অপরে তাঁকে বড়ো করতে পারে না।

এ যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে এমন বিপুল পরিমাণে খুব কম লেখকই লিখেছেন, এমন অধিক পরিমাণে ন্যায্য কথাও বোধ করি আর কেউ বলেন নি। কিন্তু সাহিত্যের পক্ষে সেটাই বড়ো কথা নয়। সাহিত্যে sense এবং nonsense দুইয়েরই সমান আদর। বার্নাড শ-এর নাটকে যেমন enormous lot of sound sense, শেক্সপীয়ারের নাটকে (কমেডিতে তো বটেই, অন্যবিধ নাটকেও) তেমনি enormous lot of delightful nonsense। লক্ষ্য করবার বিষয় যে চার শ' বছর পরেও শেক্সপীয়ার পাঠকসমাজে, রঙ্গমঞ্চে এবং ছায়াছবিতে তাঁর অপ্রতিহত প্রাধান্য বজায় রেখেছেন। বার্নাড শ আজ রঙ্গমঞ্চেও নেই সিনেমার পর্দায়ও নেই; পাঠকসমাজেও স্থান সংকুচিত হয়ে আসচে। অথচ আজকের দিনের সমস্যা নিয়ে আজকের দিনের উপযোগী নাটক তিনিই সব চাইতে বেশি লিখেছেন। মুশকিল হয়েছে এই যে, সারাক্ষণ যুক্তিযুক্ত কথা শোনার ধৈর্য সকল মানুষের থাকে না। অতিরিক্ত অর্থপূর্ণ কথা সাহিত্যে অনেক সময় অনর্থ ঘটায়। ভারবির অর্থগৌরব তাঁকে সাহিত্যে খুব বড়ো স্থান দেয় নি। নিরর্থক কথার ফাঁকে ফাঁকে অর্থপূর্ণ কথা বললে তবেই কথার অর্থগৌরব বাড়ে।

তথাপি বলব বার্নাড শ-এর এই অনাদর কোনো দেশেরই পঠকসমাজের পক্ষে স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। Intellectual discipline বা বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার পক্ষে বার্নাড শ এ যুগে অপরিহার্য। বহু যুগ সঞ্চিত ধ্যান ধারণার ফলে আজকের সমাজ অব্যবস্থিত-চিত্ত। আমাদের সমাজব্যবস্থায় ভারসাম্য ফিরিয়ে আনবার

জন্যে বার্নাড শ যতখানি করেছেন এমন আর কোনো সাহিত্যিক করেছেন বলে মনে করি না। এই কারণেই বলছিলাম যে শ-কে বাদ দিলে এ যুগের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এককালে বার্নাড শ এবং বার্ট্রাণ্ড রাসেলকে যথেষ্ট মূল্য দিয়েছেন। আজকে কেন দিচ্ছেন না, সে আমি বুঝতে পারি না। এঁদের গ্রন্থের বঙ্গানুবাদও তেমন হয় নি। হ'লে ভাষার জোর বাড়ত। আমাদের ভাষায় এখনও যুক্তিতর্কের আট-বাঁধুনি তেমন আসে নি।

আমাদের পাঠকসমাজ ইদানীং যে শৈথিল্য দেখিয়েছেন সে লজ্জার কথঞ্চিৎ নিরসন করেছেন শ্রীযুত ভবানী মুখোপাধ্যায়। তিনি বার্নাড শ-এর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত রচনা করে বাঙালি পাঠক মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। শ সম্বন্ধে এরূপ বিস্তৃত আলোচনা আমাদের ভাষায় ইতিপূর্বে হয় নি। বহু তথ্যের সমাবেশে গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। তথ্যানুসন্ধান জীবনীকারের অন্যতম কর্তব্য কিন্তু তাঁর প্রধান কৃতিত্ব তথ্যের পরিবেশনে। একটি অনন্যসাধারণ জীবনের অনন্যতাকে পরিস্ফুট করে তোলা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। সেই কঠিন পরীক্ষায় ভবানীবাবু কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়েছেন। অপরপক্ষে শ-রসের সরস বর্ণনায়ও যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

শ যে শুধু নাট্যরচয়িতা এমন নয়, তাঁর সমগ্র জীবনটিই নাটকীয়। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যেমন বলা যায় তাঁর জীবনই তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য তেমনি বার্নাড শ এর জীবনই তাঁর রচিত শ্রেষ্ঠ নাট্য। এই সত্যটি ভবানীবাবুর গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। প্রতিভাবান ব্যক্তিমাত্রই ছিটগ্রস্ত মানুষ। প্রতিভার ছটাই মাথার ছিটে পরিণত হয়। অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছে। রঙ্গমঞ্চের সংস্পর্শে এলে যা হয়, অনেক নটনটীর ঘনিষ্ঠতা অর্জন করেছেন, বহু নারীর সংস্পর্শে এসেছেন। এর সুযোগ নিয়ে সস্তা রোমাঞ্চের সৃষ্টি করা যেত এবং জীবনচরিত অনায়াসেই উপন্যাসে পরিণত হতে পারত। কিন্তু সত্যান্বেষী পাঠকমাত্রই জানেন যে শ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে বরাবর একটি সাত্ত্বিকতা বজায় রেখে চলেছেন। সুখের বিষয় এই জীবনচরিতে সেই সত্যটি কোনোক্রমে আচ্ছন্ন হয় নি। শ যেমন জীবনের দুর্গম দুঃসাহসিক পথেও পদস্খলন থেকে আত্মরক্ষা করে চলেছেন তাঁর জীবনীকারও তেমনি সুলভ রোমাঞ্চকতার লোভনীয় পথকে সযত্নে পরিহার করে গিয়েছেন। এইজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

বার্নাড শ-এর স্তিমিত প্রভাব যদি ক্রমে পুনরুজ্জীবিত হয় তবেই ভবানীবাবুর শ্রম সার্থক হবে।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

স্বরলিপি

এসেছিনু দ্বারে তব শ্রাবণরাতে,
প্রদীপ নিভালে কেন অঞ্চলঘাতে ॥
অন্তরে কালো ছায়া পড়ে আঁকা,
বিমুখ মুখের ছবি মনে রয় ঢাকা,
দুঃখের সাথি তারা ফিরিছে সাথে ॥
কেন দিলে না মাধুরীকণা, হায় রে কৃপণা ।
লাবণ্যলক্ষ্মী বিরাজে ভুবন-মাঝে,
তারি লিপি দিলে না হাতে ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

II র্সর্রা -া । র্সর্রা -া র্সা -া I ণা -ধা । পধা -া পমা -গা I মা -া । পা -া -া -া I
এ ০ সে০ ০ ছি ০ নু ০ দ্বা০ ০ রে০ ০ ত ০ ব ০ ০ ০

I গা -া । মা -া মা -গা I মণা -া । ধা -া -া -া I ধা -া । ধা -া ধা -া I
শ্রা ০ ব ০ ণ ০ রা০ ০ তে ০ ০ ০ প্র ০ দী প্ নি ০

I ধা -া । ধা -া ধা -া I ধা -া । -ণা -া -া -া I ণা -া । ণা -া ণা -া I
ভা ০ লে ০ কে ০ ন ০ ০ ০ ০ ০ অ ন্ চ ০ ল ০

I ণা -র্সা । ধা -া -না -া I না -া । না -া না -া I না -া । না -া না -া I
ঘা ০ তে ০ ০ ০ প্র ০ দী প্ নি ০ ভা ০ লে ০ কে ০

I নর্সা -া । -া -া -পা -ধা I ণা -র্রা । র্রা -র্সা র্সা -র্রা I র্সা -া । র্সা -ণা -া -া I
ন০ ০ ০ ০ ০ ০ অ ন্ চ ০ ল ০ ঘা ০ তে ০ ০ ০

I ধা -ণা । ধা -ণা ধা -া I পা -া । মা -া গরা -গা I মা -া । পা -া -া -া I
এ ০ সে ০ ছি ০ নু ০ দ্বা ০ রে০ ০ ত ০ ব ০ ০ ০

I { গা -া । মা -ণা ধা -না I না -া । না -া না -া I র্সা -া । -া -া -া -না I
অ ন্ ত ০ রে ০ কা ০ লো ০ ছা ০ য়া ০ ০ ০ ০ ০

I না -া । না -া না -া I র্সা -া । -া -া -পা -া I মা -া । মা -পা পা -া I
প ০ ড়ে ০ আঁ ০ কা ০ ০ ০ ০ ০ বি ০ মু ০ খ ০

I পা -া । পা -া ধা -া I ধা -া । ধা -া -ণা -া I ধা -র্সা । ণা -া ণা -ধা I
মু ০ খে ০ র ০ ছ ০ বি ০ ০ ০ ম ০ নে ০ র য়্

I পধা -ণা । ধা -া -া -া } I র্সা -া । র্সা -র্মা র্মা -া I র্গা -া । র্মা -া র্মা -র্গা I
ঢা০ ০ কা ০ ০ ০ দু ক্ খে ০ র ০ সা ০ থি ০ তা ০

I র্রা -র্জ্ঞা । র্রা -র্জ্ঞা র্রা -া I র্সা -া । না -া র্সা -া I না -র্সা । নর্সা -র্রা র্সা -া I
রা ০ ফি ০ রি ০ ছে ০ সা ০ থে ০ এ ০ সে০ ০ ছি ০

I ণা -া । পা -ধা পমা -গা I মা -া । পা -া -া -া I { ধা -া । ধা -া ধা -া I
দু ০ য়া ০ রে০ ০ ত ০ ব ০ ০ ০ কে ০ ন ০ দি ০

I ধা -া । ধা -া -ণা -া I ণা -া । ণা -া ণা -া I ণা -া । ণা -র্সা -ণা -া I
লে ০ না ০ ০ ০ মা ০ ধু ০ রী ০ ক ০ ণা ০ ০ ০

I ণর্সা -ণা । ণর্সা -ণা ণা -ধা I পধা -ণা । ধা -া -া -া } I র্গা -া । র্গা -া র্গা -া I
হা০ য়্ রে০ ০ কু ০ প০ ০ ণা ০ ০ ০ লা ০ ব ণ্ ণ ০

I র্গা -া । র্গা -া র্গা -া I র্গা -া । র্গা -া -র্মা -া I র্গা -া । র্রা -া র্সা -না I
ল ক্ ষী ০ বি ০ রা ০ জে ০ ০ ০ ভু ০ ব ০ ন ০

I না -া । সা -া -া -া I না -া । না -া না -া I ন্র্সা -া । -া -া -পা -ধা
মা • ঝে • • • তা • রি • লি • পি • • • • •

I ণা -র্রা । র্রা -র্সা র্সা -া I র্সা -ণা । ধা -া পা -ধা I পা -ধা । পা -ধা পা -া]
দি • লে • না • হা • তে • এ • সে • ছি • হু •

I মা -গা । রা -গা মা -া I পা -া । -া -া -া -া II II
ঘা • রে • ত • ব • • • • •

সম্পাদকের নিবেদন

অপরিণত বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন বিবেকানন্দ। তাঁর জন্ম ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি এবং মৃত্যু ১৯০২ সালের ৪ জুলাই তারিখে। পুরো চল্লিশ বৎসরও তিনি জীবিত ছিলেন না। জীবনের মেয়াদ তাঁর বড় ছিল না বলেই সম্ভবত তাঁর জীবনের কাজ তাঁকে করতে হয়েছে দ্রুতগতিতে। বিশ্বখ্যাতি তিনি লাভ করেন ১৮৯৩ সালে, তখন তাঁর বয়স মাত্র ত্রিশ। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি রূপে অভিষিক্ত হন ১৯১৩ সালে। রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল স্থির, লক্ষ্যের পথে দ্রুতগতিতে তাঁকে অগ্রসর হতে হয় নি।

অপরিণত বয়সে লোকান্তরিত হলেও বিবেকানন্দের চিন্তায় ও কর্মে পরিণতির লক্ষণ স্পষ্ট। বহু বিষয়ে তিনি চিন্তা করেছেন, তার মধ্যে বাংলা ভাষাও একটি। মৃত্যুর বছর-তুই আগে, ১৯০০ সালে, তিনি বাংলাভাষা সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেন আমরা এখানে তা থেকে সামান্য একটু অংশ উদ্‌ধৃত করি—

"আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুণ, বিদ্বান ও সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত—যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা— যা অপ্রাকৃত, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি পাণ্ডিত্য হয় না? চল্‌তি ভাষায় কি শিল্পনৈপুণ্য হয় না?"

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ প্রায়-সমবয়সী। বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে কথা লিখেছেন রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে তার একটি অংশ ও রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য উক্তি এই সংখ্যায় মুদ্রণ করে আমরা বিবেকানন্দের জন্মশতপূর্তি উপলক্ষে নূতন করে তাঁকে স্মরণ করলাম। এবং সেই সঙ্গে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে একটি রচনাও প্রকাশ করা হল।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩) মহাশয়ের জন্মশতপূর্তি এই বছর। এই উপলক্ষে আমরা তাঁর সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করে রবীন্দ্রসুহৃদ্ রামানন্দকেও স্মরণ করার সুযোগ গ্রহণ করেছি।

স্বীকৃতি

বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্ররচনার পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত।

বিবেকানন্দের চিত্রের ব্লক উদ্বোধন'এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সহ-সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

পুরাতন সংখ্যা

বিশ্বভারতী পত্রিকার পুরাতন সংখ্যা কিছু আছে। যাঁরা সংখ্যাগুলি সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক, তাঁদের অবগতির জন্য নিম্নে সেগুলির বিবরণ দেওয়া হল—

¶ প্রথম বর্ষের মাসিক বিশ্বভারতী পত্রিকার চার সংখ্যা, একত্র ১˙০০।

¶ তৃতীয় বর্ষের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা, প্রতি সংখ্যা ১˙০০।

¶ পঞ্চম বর্ষের দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, প্রতি সংখ্যা ১˙০০।

¶ অষ্টম বর্ষের প্রথম তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, প্রতি সংখ্যা ১˙০০।

¶ নবম বর্ষের প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, প্রতি সংখ্যা ১˙০০।

¶ ষষ্ঠ সপ্তম দশম একাদশ ও চতুর্দশ বর্ষের সম্পূর্ণ সেট পাওয়া যায়। প্রতি সেট ৪˙০০, রেজেষ্ট্রী ডাকে ৬˙০০।

¶ পঞ্চদশ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা ৩˙০০, বাঁধাই ৫˙০০; তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, প্রতিটি ১˙০০।

¶ ষোড়শ বর্ষের দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুক্ত-সংখ্যা, ৩˙০০।

¶ অষ্টাদশ বর্ষের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়, উনবিংশ বর্ষের তৃতীয় এবং বিংশ বর্ষের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা পাওয়া যায়, প্রতি সংখ্যা ১˙০০।

বিশ্বভারতী পত্রিকা

কলকাতার গ্রাহকবর্গ

স্থানীয় গ্রাহকদের সুবিধার জন্য কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়মিত ক্রেতারূপে নাম রেজিস্ট্রি করবার এবং বার্ষিক চার সংখ্যার মূল্য ৪˙০০ টাকা অগ্রিম জমা নেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এইসকল কেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা উল্লিখিত হল—

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ কলেজ স্কোয়ার

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন

জিজ্ঞাসা
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
৩৩ কলেজ রো

ভবানীপুর বুক ব্যুরো
২বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড

যাঁরা এইরূপ গ্রাহক হবেন, পত্রিকার কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হলেই তাঁদের সংবাদ দেওয়া হবে এবং সেই অনুযায়ী গ্রাহকগণ তাঁদের সংখ্যা সংগ্রহ করে নিতে পারবেন। এই ব্যবস্থায় ডাকব্যয় বহন করবার প্রয়োজন হবে না এবং পত্রিকা হারাবার সম্ভাবনা থাকে না।

মফস্বলের গ্রাহকবর্গ

যাঁরা ডাকে কাগজ নিতে চান তাঁরা বার্ষিক মূল্য ৫˙৫০ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কলিকাতা ৭ ঠিকানায় পাঠাবেন। যদিও কাগজ সার্টিফিকেট অব পোস্টিং রেখে পাঠানো হয়, তবুও কাগজ রেজিস্ট্রি ডাকে নেওয়াই অধিকতর নিরাপদ। রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠানোর জন্য অতিরিক্ত ২্ লাগে।

॥ শ্রাবণ থেকে বর্ষ আরম্ভ ॥

বহু শতাব্দী পূর্বে
জনৈক ভারতীয় সন্ন্যাসী
চা-এর গুণ
আবিষ্কার করেন
১৯৫৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের "বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস ফাউনডেশন" নামক একটি বৈজ্ঞানিক সংস্থার বিশেষজ্ঞেরা তাঁদের এই অভিমত লিপিবদ্ধ করেছেন যে চা অবসাদ দূর করতে সাহায্য করে।
ক্লান্তি দূরীকরণে চা-এর গুণের কথা নাকি বহু শতাব্দী আগে আবিষ্কার করেছিলেন ভারতেরই জনৈক সন্ন্যাসী। তাঁর নাম দারুমা। চীন ও জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি ৫২০ খৃষ্টাব্দে ভারত থেকে যাত্রা করেন।
আজ লক্ষ লক্ষ পরিবারে চা যে শুধু একটি দৈনন্দিন পানীয় হিসেবেই গৃহীত হয়েছে তা নয়, চা আতিথেয়তার প্রতীক হিসেবেও স্বীকৃতি লাভ করেছে,—চা খেতে খেতে যে কোন আলাপ আলোচনা সরস হয়ে ওঠে, ভাবনা চিন্তা দূরে চলে যায়।
আমার নাম চা—আমি মৈত্রীর প্রতীক
TEA BOARD
INDIA

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২১ সংখ্যা ৪ · বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭২ · ১৮৮৭ শক

সম্পাদক শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

মূল্য এক টাকা

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২১ সংখ্যা ৪ · বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭২ · ১৮৮৭ শক

চিঠিপত্র পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

মারবুর্গ

১

প্রীতিনমস্কার

শাস্ত্রীমশায়, বকদানবের জন্যে আমি অনেক চেষ্টা করেচি— কোনো স্থায়ী ফল আজ পর্যন্ত হোলো না। তাই থেকে থেকে আর্তনাদ ওঠে। আপনি তো বৌদ্ধশাস্ত্রে পারদর্শী— জানেন, দুঃখ নিবৃত্তির উপায় এ রাস্তায় নেই। ক্ষণে ক্ষণে ভিক্ষার টাকা দিয়ে স্পৃহা-কে চাপা দেবার জো নেই। যখন বিশেষ টানাটানি পড়ে তখন নির্বাণমুক্তির কথাটা মনে ওঠে— কিন্তু তার পালাটা এত বেশি লম্বা যে, শেষ পর্যন্ত পৌঁছবার আগে পেট ভরবার জন্যে যা দরকার ইতিমধ্যে তার আয়োজন করতে করতেই দিন গেল। মুক্তিসাধনার মুস্কিল এই যে মুক্তির আগে মুক্তি পাওয়া যায় না, কাজেই বদ্ধজীবের দাবী যতই মেটাতে যাই মুক্তজীবের আবির্ভাব ততই সঙ্কটাপন্ন হতে থাকে। সেই কারণেই আমি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি এই বাক্যটা আপাতত ব্যবহার করতে পারচিনে। বকদানবের এবং আপনাদের সকলের কথাই চিন্তা করে মনের মধ্যে নিয়ত ধ্বনিত হচ্চে রকফেলারং শরণং গচ্ছামি। কিন্তু বুদ্ধের শরণমন্ত্রও আজ আমার পক্ষে যতটা ফলদায়ক অন্যটাও তার চেয়ে বেশি না হতে পারে। তবু যদি চিন্তা করে দেখেন তবে নিশ্চয় স্বীকার করতে হবে যে শেষেরটা হয়তো বা কিছু পরিমাণ সার্থক হতেও পারে। বিপদ এই যে য়ুরোপীয় অতিথিদের তাহা বেশি— আমাদের স্বদেশী দম্পতির অভাব ৭৫ টাকাতে একরকম করে মেটে— দুশো টাকাতেও ওদের পেট ভরে না। সেইজন্যেই আমরা নিজেদের বঞ্চিত করেও এদের জন্যে যতই চেষ্টা করি ওরা অসন্তুষ্ট হয়েই থাকে— প্রিয়সম্ভাষণও করতে পারে না, বিদায় সম্ভাষণও না। কুঁড়ে ঘরে হাতি পুষতে গেলে হাতিটা যদি বা কষ্টেসৃষ্টে থাকে গৃহস্থের থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে। আমাদের সমস্যাই হচ্চে ঐ— ৭৫ টাকার জীবনযাত্রার আদর্শে ২০০ টাকার জীবনযাত্রা ভরাতে হবে, তাতে ৭৫ বেচারীর জিভ বেরিয়ে পড়ে। যাই হোক এবার কিছুদিনের মত বকদানবের মেয়াদ বহু চেষ্টায় বাড়াতে পেরেচি। তারপরে রকফেলারং শরণং গচ্ছামি— আপনাদের আশীর্বাদে মন্ত্রসিদ্ধি যদি ঘটে তাহলেই ৭ম অঙ্কের পরিণামে বলতে পারব সর্বং সর্বত্র নন্দতু। যশ য়ুরোপে যথেষ্ট লাভ করেছি অন্য লাভটার জন্যে আর একটা সমুদ্র পাড়ি দিতে হবে। তারপরে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে

যখন আপনাদের সম্মুখে দাঁড়াব তখন উজাড় করে ঢেলে দেব— ক্ষুদকুঁড়োর চেয়ে যদি বেশি জোটে তাহলে ভোজের আয়োজন করবেন তাতে বকদানবেরও নিমন্ত্রণ রইল। ইতি ২৮ জুলাই ১৯৩০

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ শর্ম্মণ

ওঁ

২

Williamstown
Massachusetts

প্রীতিনমস্কার

শাস্ত্রীমশায়, ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে ফিরচি। অন্নপূর্ণার আসন আছে এদেশে, কিন্তু নন্দী ভৃঙ্গীর শাসনও খুব কঠিন। আপাতত দ্বারীদের তুষ্ট করে বেড়ানো আমার কাজ— মিষ্ট ভাষা আমার একমাত্র সম্বল— বাণীর সাহায্যে লক্ষ্মীর আনুকূল্য প্রত্যাশা করা ছাড়া আমার আর গতি নেই।

অন্নপূর্ণার কোলের কাছেই থাকেন সিদ্ধিদাতা গণপতি— এখানে তিনি তাঁর গণতন্ত্র বিস্তার করেচেন। প্রণাম তাঁকে— ভজন পূজন জানিনে, আমি অতি অভাজন— অবকাশ পেলে মাঝে মাঝে তাঁর স্তবমন্ত্র আওড়াবেন।

ভিক্ষা ব্যবসায় দৈববশে অর্থকর হতেও পারে কিন্তু কোনোমতেই স্বাস্থ্যকর নয়। শান্তিনিকেতনের বিপরীত পথেই তার গতিবিধি— শরীর ক্লান্ত, মন পীড়িত কিন্তু ঝুলি হয়েচে কম্‌লির মতো, কিছুতেই ছোড়তি নেহি। স্পৃহা মরীচিকা যতই মনকে মরুপথে ঘোরায় ততই স্পৃহার প্রকোপ বাড়ে। আক্ষেপ করবনা— সব দুঃখ মেনে নিলুম— একদা আপনাদের সহাস্য মুখ দেখব এই প্রত্যাশায়।

সার্ চার্লস্ এণ্ড্রুজ এমেরিকাতেই তাঁর গদী পেতেছেন, ভালো হয়েচে। এখানে সকলেই তাঁর প্রতি প্রসন্ন। এখানে তিনি আমাদের জন্যে যত কাজ করতে পারবেন এমন তাঁর স্বদেশে বা আমার স্বদেশে নয়। আমি তাঁকে আশীর্বাদ করেছি এখানেই তাঁর গদী অচলপ্রতিষ্ঠ হোক, মহাত্মাজিরও সেই আশীর্বাদ। যো যস্য মিত্রং নহি তস্য দূরং।

জেনিভায় আমি ছিলুম মিস্ স্টোরির অতিথি। তাঁরই কাছে খবর পেলুম আমাদের ওখানে যে সব য়ুরোপীয় অতিথি আছেন, পাশ্চাত্য অভ্যাগতের কাছে তাঁরা সর্বদাই আমাদের নিন্দা করে থাকেন। এতে করে আমাদের যে গুরুতর ক্ষতি হয়ে থাকে আমরা তা জানতেও পাইনে। নিজের ঘরে যার অন্ন নেই সে যত চেষ্টাই করুক শুধু শুভ ইচ্ছার দ্বারা অতিথির পেট ভরাতে পারে না। অভুক্ত জঠরের উপরেই অপ্রসন্ন চিত্তের বাসা। আপনি জানেন আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি, নিজেদের ক্ষতি করেও— নৈবেদ্য পুরোমাত্রায় জোগাতে পারিনি সে আমার দোষ নয়। এ সম্বন্ধে রথী আমাকে অনেকবার বলেচেন যে, জীবকে রক্ষা করতে হলে তার জীবন রক্ষার আয়োজনে একটুও ত্রুটি হলে চলবে না— ক্ষুধিত জীব পোষণের মতো শত্রুতা পোষণের আর উপায় নেই। আগামী বৎসর থেকে পাশ্চাত্য-দেশাগত ছাত্র ও পথিকদের সংখ্যা বাড়বে তাঁদের কর্ণকুহরকে যদি আশ্রমের নিন্দা থেকে বাঁচাতে চান তাহলে এইবেলা ঘর পরিষ্কার করতে হবে। ব্যক্তি বিশেষকে দয়া করবার উপলক্ষ্যে যজ্ঞক্ষেত্রকে

কলুষিত করা সদ্ধর্ম নয়। ফুলের গাছকে রক্ষা করা যদি কর্তব্য বলে মানেন তবে ফুলের কীটকে নির্ব্বাসন দিতে দ্বিধা করাই ধর্মবিরুদ্ধ। সে দয়া দুর্ব্বলতা যেখানে দয়ার দ্বারা ব্রতপালনে বাধা ঘটে। আপনাদের দরবারে আমার সানুনয় প্রার্থনা এই যে, আশ্রমের মর্ম্মস্থলশায়ী ব্যাধিগুলিকে দূর করতে বিলম্ব করবেন না।

জনশ্রুতি এই যে রকফেলারবংশীয়দের মধ্যে একজন তাঁর নববধূসহ আমাদের আশ্রম দেখতে যাবেন, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই। ষোড়শোপচারের প্রয়োজন নেই কিন্তু যথাসাধ্য আতিথ্যের ত্রুটি যেন না হয়। রথীর উদয়নের বাড়িতে তাঁদের বাসা দেবেন। আলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীমান সুরেন ও আশ্রমের প্রবীণমণ্ডলীকে এই চিঠি দেখাবেন এবং সকলকে আমার যথাবিহিত অভিবাদন জানাবেন। ইতি ১৩ অক্টোবর ১৯৩০

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২ মার্চ ১৯৩০ থেকে ৩১ জানুয়ারি ১৯৩১ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ-আমেরিকা পরিভ্রমণ-রত ছিলেন।

শাস্ত্রী-মহাশয়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠি ১৩৬০ শারদীয়া দেশ পত্রিকায় মুদ্রিত আছে।

চিঠিপত্র সুপ্রীতি দেবীকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

মা, তোমার জন্মদিনে তুমি আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

আমরা পৃথিবীতে জন্মেছি বটে কিন্তু আমাদের সকল চোখ খোলেনি। যা আমাদের চোখে ঠেকচে তার বেশি আমরা দেখতে পাই নে, যা আমরা স্পর্শ করচি তার বেশি আমরা অনুভব করিনে, বাইরে ঘটনা যা ঘটচে তাকেই আমরা চরম করে জানচি। আমাদের অন্তরাত্মার মধ্যে একটি আনন্দের চোখ খোলবার প্রতীক্ষায় আছে—সেইটি খোলবামাত্র আমরা পরম সত্যকে একেবারে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই—তখন আকাশকে আর শূন্য দেখিনে, জগৎকে আর বস্তুপুঞ্জরচিত যন্ত্র বলে ভ্রম হয় না, নিজের জীবনকে আর নিজের অহঙ্কারের সমষ্টি বলে মনে রাখতে পারিনে—তখন সত্যের আবির্ভাবে সমস্ত একেবারে নিবিড় হয়ে ওঠে—মাছ যেমন জলের মধ্যে বাস করে এবং চলে তেমনি সর্ব্বত্রই আমরা সত্যের মধ্যে সঞ্চরণ করি—আমাদের শরীর মন তার স্পর্শে একেবারে পূর্ণ হয়ে ওঠে—তখন আমাদের চির আশ্রয় যে কোন্‌খানে তা জানবার জন্যে তর্ক করতে হয় না, কাউকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয় না, যা কিছু আছে, সর্ব্বত্রই সেই আশ্রয়কে অতি সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। তোমার জন্মদিনে সেই অন্তরাত্মার মহাজাগরণের আহ্বান আজ তোমার চিত্তের দ্বারে এসে আঘাত করুক—তোমার জীবন আজ সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে সংসারের সমস্ত সুখদুঃখের উপরে গিয়ে দাঁড়াক। যিনি তোমার আপনার পরম আপন, অন্তরতম শ্রেয়, প্রতিদিন তাঁকে ডাকতে ডাকতে তোমার আবরণ ক্ষয় হয়ে গিয়ে তিনিই প্রকাশমান হতে থাকুন। সকল সময়েই ভোল তোমার আপনাকে—কথায় কথায় আপনার দিকে তাকিয়ো না। বিশ্বজননী তোমার মধ্যে তাঁর কল্যাণময়ী মূর্তিকে পরিস্ফুট করুন, তোমার হৃদয়ে তিনি পবিত্র প্রীতির উৎস উৎসারিত করে পুণ্যধারায় তোমার সংসারকে অভিষিক্ত করে দিন এই আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি।

কাল আমি কলকাতায় যাব—গোলেমালে সেখানে সময় পাবনা বলে এই শান্তিনিকেতনে বসে তোমার আগামী জন্মদিনের উপহারস্বরূপে আমার হৃদয়ের মঙ্গলকামনা আজ প্রভাতে লিপিবদ্ধ করলুম।

ইতি ৫ই অগ্রহায়ণ ১৩১৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

ওঁ

কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু

মা, আমি কাল রাত্রের গাড়িতে কলম্বোর দিকে যাচ্চি। সেখান থেকে খুব সম্ভব হয় পূর্ব্বে নয় পশ্চিমে চলে যাব। এবার ৫৫ বৎসর বয়সে পড়েচি এখন ঘরের মায়া কাটিয়ে পথিকের পন্থা অবলম্বন করবার সময় হল। চল্‌তে চল্‌তে জীবনের বন্ধন ক্ষয় হয়ে আসে— বসে থাক্‌লেই প্রতিদিনের আবর্জ্জনা কেবল জমে উঠ্‌তে থাকে। যাবার পূর্ব্বে তোমাদের আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানিয়ে যাই। জীবনে আমরা কত অযাচিত আনন্দ পেয়ে থাকি বাইরে থেকে সে দেখ্‌তে ছোট, কিন্তু অন্তরের দিকে তার মূল্য কম নয়। তোমরা তোমাদের নির্ম্মল শ্রদ্ধাটুকু নিয়ে কবে একদিন আমার কাছে এসে পড়েচ সে কি আমাকে কম তৃপ্তি দিয়েচে। জীবনে ত ভাঙাচোরা আঘাত অপমানের সীমা নেই, এর মধ্যে ঈশ্বরের ছোট বড় দানগুলি কেমন অখণ্ড পূর্ণ সুন্দর রূপ নিয়ে দেখা দেয়। আমরা জীবনে যা চাই অথচ পাইনে, যা পেয়েছি অথচ মুঠোর মধ্যে ভেঙেচুরে গেছে কেবল তারই ব্যথা জমে [জমা] করে তুলি, আর দিনে রাত্রে কত না-চাওয়া আদর আমাদের জীবনকে ভরে ভরে তুল্‌চে তার কি কোনো হিসাবই রাখব না? আমার আয়ু এখন অস্তাচলের দিকে হেলেচে— অনেক দুঃখ বেদনা পেয়েছি কিন্তু যে সব জিনিষ সত্য, যে সব জিনিষ সুন্দর, যারা নিদ্রায় জাগরণে কত রকম করে আত্মাকে স্পর্শ করেচে তাদের ত সংখ্যা নেই— আজ তাদের কথাই ভাবব। আমার সেই হিসাবের খাতাটির মধ্যে তোমাদের তরুণ সুন্দর জীবনের পাত্রে আমাকে যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধার অমৃতটুকু দিয়েছ তা জমা হয়ে রয়েচে। তার পরিবর্ত্তে আমি তোমাদের আমার সর্ব্বান্তঃকরণের আশীর্ব্বাদমাত্র দিচ্চি।

বিধাতা তোমার জীবনে এই বয়সে একটি দুঃখের আগুন জ্বালিয়েচেন— কিন্তু সে নির্ম্মল আগুন। তাতে তুমি যে আহুতি দিচ্চ সে তোমার জীবনকে বিশুদ্ধ করে তুল্‌চে। তপস্যার দ্বারা তোমার জীবন তুমি আরম্ভ করেচ— এ তপস্যা ব্যর্থ হবে না। সার্থক হোক্ তোমার জীবন, কল্যাণে পূর্ণ হোক্। ইতি
৩০ বৈশাখ ১৩২২

একান্ত শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

ওঁ

কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু

আমার যাবার সময়[১] নিকটবর্ত্তী তাই অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। শনিবারে যাবার কথা ছিল কিন্তু জাহাজের গতিকে সোমবারে পিছিয়ে গেল। তবু সময়ের টানাটানি ঘুচ্‌চে না— কারণ বিদায় দেওয়া-

১ এই পত্ররচনার অনতি পরে, ২০ বৈশাখ (৩ মে ১৯১৬) তারিখে, রবীন্দ্রনাথ জাপানের পথে আমেরিকা যাত্রা করেন।

নেওয়ার ভিড় অত্যন্ত বেড়ে গেছে। তাই পোঁটলা বাঁধার কাজে এখনো হাত দিতে পারচি নে। মনটাও ভিতরে ভিতরে চঞ্চল রয়েচে।

যেদিন এসেছিলে সেদিন তোমাদের সঙ্গে বেশ একটু স্থির হয়ে কথাবার্তা কবার সময় পাওয়া গেল না। তা হোক্ আবার ফিরে এসে দেখা হবে। বিদেশে যে কয় দিন থাকব সে দিনগুলিকে ভর্ত্তি করে আনবার চেষ্টা করব। যখন তোমাদের মাঝখানে ফিরে আসব তখন শূন্যহাতে ফিরবনা এই আশা করচি।

তোমাদের মধ্যে প্রতিদিন জীবনের বিকাশ হতে থাক্— যা বদ্ধ আছে তা মুক্ত হোক্, যা অস্ফুট আছে তা পরিস্ফুট হোক্— সার্থকতার ক্ষেত্র সম্মুখে রয়েচে এ কথা নিশ্চয় জেনে মনকে অবসাদ থেকে নৈরাশ্য থেকে উদ্ধার কর। ইতি ১৬ই বৈশাখ ১৩২৩

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বেবিকে এবং তোমার বোনদের আমাদের আশীর্ব্বাদ জানিয়ো।

৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার দিন ভাল যাচ্চে না— বোঝা ভারী হয়ে উঠেচে। কিন্তু হার মানতে চাইনে। ঢেউয়ের দিকে না তাকিয়ে কূলের দিকে চেয়ে আছি।

মানুষের জীবনের বিচিত্র বিকাশ আছে— যখন পাতা ঝরচে তখনো ফল ধরচে, যখন ফুল ফুরিয়েছে তখনো পাতা বেরচ্চে। একটা দিকে লোকসান দেখা দিয়েচে বলে দোকানপাট বন্ধ করা চলে না— লাভলোকসান সমস্তকেই মেনে জীবনটাকে মোটের উপর এগিয়ে নিয়ে চল্‌তে হবে। আসল কথা হচ্চে, নমস্তেস্তু— সুখেই হোক্ দুঃখেই হোক্।

"আমার ধর্ম"[১] লেখাটা ছাপাখানায় চলে গেছে— সেখানকার কালী সংগ্রহ করে যখন ফিরবে তখন তোমাকে দিতে আমার কোনো বাধা নেই। ইতি ১৯ আশ্বিন ১৩২৪

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আজকাল শরীরটা ভিতরে ভিতরে এত ক্লান্ত যে চিঠি লিখ্‌তে বিতৃষ্ণা ধরে এবং ভুলে যাই। কিন্তু তোমার জন্মদিনের আশীর্ব্বাদ তোমাকে না দিয়ে আমি যেতে পারিনে। আমি জানি তোমার মনে বল আছে— সকলপ্রকার অবসাদ ও নৈরাশ্যের সঙ্গে তুমি লড়াই করতে পারবে। সেই লড়াইয়ে তুমি জয়ী হও আমার কামনা কেবল যে এই তা নয়— অন্তরের স্বত উৎসারিত প্রাণরসে তোমার দিনরাত্রির কর্ম

১ দ্র° সবুজপত্র ১৩২৪ আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা। পরে 'আত্মপরিচয়' (১৩৫০) গ্রন্থে সংকলিত

এবং বিশ্রাম সহজ আনন্দে অভিষিক্ত হয়ে থাক্ এই আমার আশীর্ব্বাদ— চিরপ্রফুল্লতায় তোমার চারিদিককে তুমি প্রসন্ন করে রাখ্‌বে এই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে উঠুক্, সংসারকে তুমি আনন্দদান কর। ইতি ২৮ নবেম্বর ১৯১৭

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

ওঁ

পীঠাপুরম্[১]
[পোস্টমার্ক পীঠাপুরম্ ১৬ অক্টোবর ১৯১৮]

কল্যাণীয়াসু

স্মৃতি, তোমার চিঠিখানি পেয়ে বড় খুসি হলুম। অনেকদিন থেকে মনে হচ্ছিল আমার জীবনে, অন্তত তার একটা তীরে, যেন ভাঙন্ ধরেচে। যারা আপন ছিল তারা চলে গেল, যারা কাছে ছিল তারা সরে গেল, এমনি কেমন একটা উৎপাত। তার মধ্যে ভাবছিলুম, আমার ভাগ্যের এই গোল্‌মেলে হাওয়ায় তোমরাও হয়ত পালাই পালাই করচ। আমি তাই নিজের জনশূন্যতার মধ্যে স্থির হয়ে বসবার জন্যে কোমর বেঁধেছিলুম— খুব কসে ইস্কুলমাস্টারি করে ছেলেদের পড়িয়ে দিনগুলিকে ভরিয়ে তোলবার আয়োজন করছিলুম। এমন সময় তোমার চিঠিখানি পেয়ে বুঝলুম সম্পূর্ণ দেউলে হবার লক্ষণ এখনো ঘটেনি। ক্ষণে ক্ষণে জীবন স্রোতের এক একটা তীর কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে আসে— মনে হয় বুঝি সবটাই মিলিয়ে গেল— আবার তটরেখা কিছু কছু দেখা যায়।— বার বার নিমন্ত্রণ পেয়ে অবশেষে পীঠাপুরমের রাজার এখানে এবার ছুটিতে এসেছি। আরো দক্ষিণে যাবার কথা ছিল কিন্তু এমনি ক্লান্ত হয়ে পড়লুম যে আবার আশ্রমে ফেরবার জন্যে মন উৎসুক হয়ে উঠেচে। পর্শু শুক্রবারে এখান থেকে দৌড় দেব। শনিবার দুপুর বেলায় কলকাতায় পৌঁছব। যদি সে সময় কলকাতায় থাক, শান্তিনিকেতনে যাবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করে যাব। এখানে সমস্ত দিন লোকজনদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ আলাপঅভ্যার্থনার হাঙ্গামে হয়রান হয়ে আছি। ছুটির আশ্রমে প্রফুল্ল শিউলি বনের হাওয়ায় গিয়ে বাঁচা যাবে। মীরা[২] হায়দ্রাবাদে। তার সেখানে war fever হয়েচে— তাই মনটা নিতান্তই ব্যাকুল হয়ে আছে— নগেন[৩]কে সেখানে পাঠিয়ে দিয়েচি একটু ভাল হলে নিয়ে আসবে।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১ শান্তিনিকেতন আশ্রমের পূজাবকাশে সুরেন্দ্রনাথ কর ও ভীমরাও শাস্ত্রী-সহ রবীন্দ্রনাথ মাদ্রাজ অভিমুখে রওনা হন, কিন্তু তথায় যাওয়া হয় না, মধ্যপথে এখানে অবতরণ করেন।

২ কন্যা মীরা দেবী।

৩ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার উত্তরকাণ্ডের মধ্যে আছি— অর্থাৎ শরীর মন ক্লান্ত আছে— কোনো কাজে হাত দিতে ইচ্ছা করেনা। অথচ বিদ্যালয়ের কাজ সুরু করে দিয়েছি।

ফ্রান্সিস্ টমসন রোমান ক্যাথলিক ছিলেন বোধহয় তাই ওঁর সঙ্গে আমাদের ভাবের অনেকটা মিল আছে। ওঁর কবিতা আমারো খুব ভালো লাগে।

আমার পিঠ বলচে তাকিয়ায় হেলান্ দিয়ে বিছানায় পা ছড়িয়ে দিতে— কিন্তু আমার ঘড়ি বলচে এখনি ছেলের দল আসবে আমার কাছে তারা ইংরেজি পড়বে— তাই খাড়া হয়ে বসে তাদের জন্যে অপেক্ষা করচি আর এই ফাঁকে তোমাকে দু চার লাইন লিখে দিলুম। ইতি ৫ই ভাদ্র ১৩২৬

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮

ওঁ

Brahmacharya Ashram
Santiniketan, Birbhum

কল্যাণীয়াসু

নিজের মধ্যেই নিজের একটি সম্পদ আছে সেইটিকে অনুভব করে আনন্দিত হও। যখনি ক্ষোভ এসে তোমাকে আক্রমণ করে, তখনি তার সঙ্গে লড়াই শেষ না করে ছেড়ো না। যেখানে তোমার আত্মা পৃথিবীর সমস্ত ঘটনার উপরে, জন্মমৃত্যুর অতি ছোট বন্ধনীর বাইরে, যেখানে তোমার সত্য অসীমকালের মধ্যে বিস্তীর্ণ— যেখানে তুমি একলা নও, তুমি সমস্ত বিশ্বমানবের, যেখানে তোমার বীর্য, তোমার ত্যাগ, তোমার আত্মোপলব্ধি সমস্ত মানুষের মহিমাকে কোনো-না-অংশে গড়ে তুলচে, আপনার জীবনের মধ্যে যেটুকু অমর সেইটুকুকে সংসারের নিত্যসৃজনকার্য্যের উপাদানরূপে রেখে যাচ্চে সেইখানে তুমি আত্মাকে স্পর্শ কর, এবং ধন্য হও এবং বিষাদ অবসাদের মোহজালকে বিদীর্ণ করে ফেল। অদৃষ্টের উপরে কিছুই দাবী কোরো না— নিজের অন্তরের চিরসম্পদের গৌরবে তুমি যা দিতে পার তাই প্রসন্নমনে প্রফুল্ল মুখে দিয়ে যাও। একেই বলে জীবনসংগ্রামে জয়ী হওয়া— পরের মুখের দিকে তাকিয়ে বাইরের দিকে হাত পেতে ভিক্ষার ঝুলি ভরে নেওয়াকে জয় বলেনা। ফেলে দাও সব ঝোলাঝুলি, আত্মপ্রতিষ্ঠিত হও, আনন্দিত হও, আনন্দ দান কর। ইতি ১০ অগ্রহায়ণ ১৩২৬

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুরীতি দেবী (১৮৯২-১৯৫৩) রবীন্দ্রসুহৃদ্ ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয়ের ভাগিনেয়ী; এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ তাঁর ঘটে। আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র হিমাংশুমোহন বসুর সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়।

সীমা ও অসীম শ্রুতি

ক্ষিতিমোহন সেন

বিশ্বতত্ত্বের ও সৃষ্টিতত্ত্বের ধ্যান করিতে গেলেই সীমা অসীম দুইই মানিতে হয়। না মানিলে পরমশূন্যতার মধ্যে আসিয়া পড়িতে হয়। আমাদের দেশে এই সব সত্যের জীবন্ত সাক্ষ্যের মধ্যে শ্রুতিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রবীণ। তাহার আগাগোড়া সাক্ষ্য দিবার অবসর এখানে নাই। দুই-একটি কথায় তাহার মোট বক্তব্যই দেখা যাবে।

সৃষ্টির পূর্বেকার পরম শূন্যতা বুঝাইতে গিয়া ঋষি বলিলেন

না সদাসীন্ন সদাসীত্তদানীম্।

ঋগ্বেদ, ১০, ১২৯, ১

তখন না ছিল অসৎ না ছিল সৎ।

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি।

ঋগ্বেদ ১০, ১২৯, ২

তখন না ছিল মৃত্যু না ছিল অমৃত।

তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চ নাস॥

ঋগ্বেদ ১০, ১২৯, ২

তাঁহাকে ছাড়া কিছুই আর ছিল না।

তখন ছিল সকল দিকে কেবল অন্ধকার

তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে।

ঋগ্বেদ ১২৯, ৩

সৃষ্টির পূর্বে তখন অন্ধকার দিয়া আবৃত ছিল অন্ধকার।

তখনকার কথা কে-ই বা বলিতে পারে

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ

কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ॥

ঋগ্বেদ ১২৯, ৬

কেই-বা ইহার রহস্য যথার্থ ভাবে জানে, কেই-বা ইহা পারে বর্ণিতে, কোথা হইতে জন্ম এই সব, কোথা হইতে আসিল এই বহুধা বিচিত্র সৃষ্টি!

যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্

সো অংগ বেদ যদি বা ন বেদ॥

ঋগ্বেদ ১২৯, ৭

স্বরূপ পরম ধামে বিরাজমান যিনি ইহার অধ্যক্ষ, তিনিই হয়তো এই রহস্য জানেন, হয়তো তিনিও ইহা নাও জানিতে পারেন।

যে অবস্থায় এই কল্পনা, তাহাকে মৃত্যু ছাড়া আর কি বলা যায়? তাই বৃহদারণ্যক বলিলেন—

নৈবেহ কিংচনাগ্র আসীন্ মৃত্যুর্নৈবেদমাবৃতমাসীৎ

সেই আদিতে তাই বিশ্বে কিছুই ছিল না। মৃত্যুর দ্বারাই যেন সব কিছু ছিল সমাচ্ছন্ন।

সেই জন্য তৈত্তিরীয়োপনিষৎ এই অবস্থাকে বলিয়াছেন "অসৎ"

অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ॥ ততো বৈ সদজায়ত॥ তৈত্তিরীয় উ, ব্রহ্মান্দবল্লী। ৭

সেই আদিম অবস্থায় অসৎই ছিল। তাহার পর হইল সৎ।

কাজেই সীমাহীন সৃষ্টিহীন পরম শূন্যতার মধ্যে অসীম পরব্রহ্ম ছিলেন নিরানন্দ। রসের তখন স্থান কোথায়?

ঐতরেয় উপনিষৎ বলিলেন, সেই আদিতে এক পরমাত্মাই ছিলেন

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ॥ ১, ১

বৃহদারণ্যক বলিলেন, সেই আদিতে ছিলেন এক পরব্রহ্ম।

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ॥ ১, ৪, ১০-১১

মৈত্রী উপনিষৎ বলিলেন, তিনি একাকী থাকায় তাঁহার কোনো আনন্দ ছিল না।

স নার মতৈকঃ॥ ২, ৬

বৃহদারণ্যক বলিলেন, তাঁহার কিছুমাত্র আনন্দ ছিল না, একাকী কাহারও আনন্দ হয় না।

স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে॥ ১, ৪, ৩

তিনি দ্বিতীয় সহচর চাহিলেন, তাই এই আত্মাকেই তিনি দ্বিধাবিভক্ত করিলেন।

স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ। স ইমমেবাত্মানং দ্বিধা পাতয়ৎ॥

তিনি কামনা করিয়াছিলেন, আমার দ্বিতীয় একটি আত্মা হউক।

সোঽকাময়ত দ্বিতীয়ো ম আত্মা জায়েত ইতি।

বৃহদারণ্যক ১, ৪, ৩

অসীমে ও সীমায় এই সৃষ্টি পূর্ণ হইয়া উঠিল। এই দ্বিতীয় সহচর আত্মা তো তাঁহার মত অনন্ত অসীম নয়। ক্রমে প্রাণ, দিক্, কাল, বিচিত্র সৃষ্টি তাহা হইতেই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সৃষ্টি সূক্ষ্ম হইতে ক্রমে স্থূলের দিকে চলিল। তাঁহার কামনা পূর্ণ হইল।

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়ানিচ।

খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥

মুণ্ডক, ২, ১, ৩

ইহা হইতে প্রাণ মন সর্ব ইন্দ্রিয় আকাশ বায়ু জ্যোতি জল এবং বিশ্ববৈচিত্র্যের আধারভূতা পৃথিবী জায়মান হইয়া চলিল।

সূক্ষ্ম ক্রমে স্থূলরূপ ধরিয়া চলিল। এই রূপ ধারণের মধ্যে বন্ধনকে স্বীকার করিতেই হয়। কিন্তু এই বন্ধন তাঁহার নিজের বন্ধন। প্রেমে তিনি আপনার বন্ধন আপনিই স্বীকার করিলেন। কাজেই ইহাতে কোনোই লজ্জার কথা নাই। বন্ধনহীনা নারী যেমন আপন প্রেমে আপনাকে পত্নীরূপে বা মাতৃরূপে ধরা দেন এও তাই। সেই বন্ধনই তাঁহার গৌরব।

গাঁঠ বাঁধিতে বাঁধিতে তিনি আসিলেন সীমার দিকে। তাই তাহার সহিত দেখা করিতে হইলে গাঁঠ খুলিতে খুলিতে আমাদের চলিতে হইবে অসীমের দিকে। উভয়েই যদি এক পথে যাত্রা করি তবে আর দেখা হইবে কেমন করিয়া ?

তিনি আপনিই বিভক্ত হইয়া হইলেন সীমা ও অসীম জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুইরূপ। ঋগ্বেদে ঋষি দীর্ঘতমা বলিলেন

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্‌পলংস্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্না ন্যোঽভিচাকশীতি ॥ —১, ১৬৪, ২০

দুই সুন্দর সদা-সহচর ও পরস্পর সখ্যযুক্ত পক্ষী এক বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া বিরাজিত। তন্মধ্যে একটি সুস্বাদু ফল ভোজন রত অন্যটি কিছু না খাইয়া শুধু দেখিয়াই তৃপ্ত।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৪,৬) ও মুণ্ডক উপনিষদেও (৩,১,১) ঠিক এই বাণীটি আছে।

এখানে ভাগবতের শ্লোক দুইটিও তুলনীয়—

সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌচবৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্‌পলান্নম্ অন্যোনি রন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্ ॥ ৬
আত্মানমন্যং চ স বেদ বিদ্বান্ অপিপ্‌পাদঃ নতু পিপ্পলাদঃ।
যোঽ বিদ্যয়াযুক্ স তু নিত্যবদ্ধো বিদ্যামযোয়াযঃ স তু নিত্যমুক্তঃ ॥ ৭

শ্রীমদ্‌ভাগবত ১১ স্কন্ধ, ১১ অধ্যায়

যে পক্ষীটি ফল ভোজন রত সে জীব ; সে ভোগ সত্ত্বেও অনীশ বলিয়া আপন সীমায় দুঃখে মুহ্যমান। কিন্তু তার সখা পরমাত্মা অসীমের মহিমায় সে যায় আপন দুঃখ ভুলিয়া। তাই মুণ্ডক (৩, ১, ২) ও শ্বেতাশ্বরত (৪, ৭) বলিতেছেন,

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽ নীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমান মিতি বীতশোকঃ ॥

দেহাশ্রিত জীব একই বৃক্ষে নিমগ্ন থাকিয়া আপন দীনতাবশতঃ শোকগ্রস্ত ও মুহ্যমান। কিন্তু যখন সে নিখিল সেবিত আপন সহচর ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে দেখে তখন সে হয় বীতশোক।

সেই নিত্যসখা পরমাত্মা জীবের এই দৈন্য অনীশত্ব প্রসূত দুঃখ দূর করিবার জন্য আপন মহিমায় সর্বক্ষণ সর্বদিক দিয়া থাকেন তাহাকে ঘিরিয়া ও পূর্ণ করিয়া। তাই ছান্দোগ্য বলেন

স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্বম্ ॥ ৭, ২৫, ১

তিনি নিম্নে তিনি উর্ধ্বে ; তিনি পশ্চাতে তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে তিনি উত্তরে।

শুধু স্থানে নহে সর্বকালের নিয়ন্তা হইয়া তিনি রহিলেন তাহাকে সর্বতোভাবে ঘিরিয়া। তাই কঠ বলেন ঈশানো ভূত ভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ ॥ ১, ৪, ১৩

ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা তিনি যেমন আজ বিরাজিত তেমনি কালও থাকিবেন বিরাজিত।

সেই একই মহাসত্তা অন্তর বাহির দূর নিকট সর্বত্র বিরাজমান। তাই উপনিষৎ বলেন, তিনি সচলও বটে অচলও বটে, তিনি দূরে তিনি নিকটে। তিনিই সবার অন্তরে তিনিই সবার বাহিরে।"

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥ ঈশ ১, ৫

মুণ্ডক বলিলেন, তিনি মহান্ দিব্য দীপ্যমান্ ও অচিন্ত্যরূপ। সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মরূপে তিনি বিভাসিত। দূর হইতেও তিনি সুদূরে, তিনিই আবার এই স্থানে নিকটে; এইস্থানে, এইসব সচেতন জীবগণের আত্মাতে তিনিই বিরাজমান।

বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্য রূপং
সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ
পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্॥ ৩, ১, ৭

এই যে জীবে ব্রহ্মে সীমায় অসীমে এত মাখামাখি তাহাতে তাঁহারও গরজ আছে। অসীম ছাড়া সীমার কোনো অর্থ নাই আবার সীমা ছাড়াও অসীমের কোনো প্রকাশ নাই। উভয়ই তাই উভয়কে চায়। উভয়ের ব্যাকুল প্রার্থনা না থাকিলে তাহা আর প্রেম কিসের? এইসব কথা ভালো করিয়া বুঝা যাইবে মধ্যযুগের সব ভক্তবাণীতে। সীমার সঙ্গে সীমার এবং সীমায় ও অসীমে যে সুসামঞ্জস্য আছে পাছে তাহার কোনো ওজন নষ্ট হয় তাই তিনি রহিলেন সেতু স্বরূপ হইয়া। তাই ছান্দোগ্য কহিলেন, এই যে আত্মা ইনিই আছেন এই সমস্ত লোকের অসম্ভেদের জন্য সকলের বিধৃতি স্বরূপ যোগ স্বরূপ হইয়া।

অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়। ৮, ৪, ১

বৃহদারণ্যকও এই কথাই বলিয়াছেন। ৪, ৪, ২২

কাজেই দেখা যাইতেছে অসীম হইলেন সীমায় আশ্রয়। এই আশ্রয় তিনি হইতে গেলেন কেন সে তত্ত্ব পাই আমরা মধ্যযুগের মরমিয়াদের বাণীতে। এখন অসীমের আশ্রয় কি? কোথায় তাহার প্রতিষ্ঠা? ছান্দোগ্য উপনিষদে তাই প্রশ্ন দেখি

স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ। ৭, ২৪, ১

হে ভগবন্, তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত?

উত্তর হইল

স্বে মহিম্নি ৭, ২৪, ১

আপন মহিমায়।

সেই অসীম আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত বটেন কিন্তু সেখানে তাঁহার প্রকাশ কোথায়? সীমার মধ্য দিয়া ছাড়া অসীমের প্রকাশ নাই। এই প্রকাশ তাঁহার চাই। তারপরে ভক্ত সাধকের সকল কথার উপরের কথায় তিনি প্রেমময়। প্রেমের জন্য তাঁহার সীমাকে চাই, প্রেমের জন্য তিনি আপনাকে বাঁধিলেন। ঋগ্বেদে ঋষি দীর্ঘতমা বলিতেছেন,

স হি বন্ধু রিত্থা। ১, ১৫৪, ৫

"তাই তো তিনি বন্ধু"। বন্ধু এ কত বড় কথা! যিনি বন্ধনের অতীত হইয়াও বন্ধন স্বীকার করিলেন। প্রেমের অনুরোধে এই যে তিনি বন্ধনাতীত হইয়াও বন্ধন স্বীকার করিলেন ইহাতে অগৌরবের কথা কি

আছে? এই বন্ধন যে তাঁর আপনারই বন্ধন। বাহির হইতে চাপানো বাঁধন তো নয়। মাতা বা পত্নী যে প্রেমের বন্ধনে আপনাকে বাঁধেন তাহাতে কি কোনো হীনতা সূচিত হয়?

এই দীর্ঘতমা সেই সঙ্গেই বলিতেছেন, সেই সর্বত্র বিস্তারশীল দেবতার পরম পদেই অমৃতের উৎস উচ্ছ্বসিত।

বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ॥ ঋ, ১, ১৫৪, ৫

সীমায় ও অসীমে নিত্যকাল চলিয়াছে এই প্রেমের নিবিড় যোগ। তাই তাঁহার আনন্দ আমাতে ও আমার আনন্দ তাঁহাতে। অসীমেই আমার আনন্দ। প্রয়োজনের জন্য এই আনন্দ নয়, যে আনন্দ আমাদের বিনা প্রয়োজনের সমুদ্রে, সে আনন্দ কেন নাই তবে প্রয়োজনের কূপে? অসীমের মধ্যে আমার মহিমা বা সত্যতা, এ কথাও যথেষ্ট নয়। তাঁহার মধ্যে আমার প্রেম চরিতার্থ, ইহাই হইল সকল কথার আসল কথা। অন্ততঃ ভক্তের এই কথাই সার। ছান্দোগ্য বলিলেন, যিনি ভূমা মহান্ তিনিই আনন্দস্বরূপ, ক্ষুদ্র স্বরূপে কোনো আনন্দ নাই। ভূমাই আনন্দ, তাই তিনিই বিজিজ্ঞাসিতব্য।"

যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। ছান্দোগ্য. ৭, ২৩

ইহার পরেই ছান্দোগ্য বলিতেছেন, যাহা ভূমা তাহাই অমৃত, যাহা অল্প তাহা মৃত্যুশীল।

যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্॥ ছান্দোগ্য ৭, ২৪, ১

আবার সীমাকে ছাড়িয়াও অসীম আপনাকে প্রকাশ করিতে অক্ষম। সীমাই তাঁহার শক্তি। তাঁহাকে ছাড়া শিব হইলেও তিনি পঙ্গু ও অশক্ত। তাই আনন্দ লহরীতে শঙ্করাচার্য বলিলেন, শিব যদি শক্তির সঙ্গে যুক্ত হন তবেই তিনি প্রভু শক্তিসম্পন্ন। নইলে এমন যে দেবতা, একটু স্পন্দিত হইবার ক্ষমতাও তাঁহার নাই।

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুম্।
ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি॥ ১

বাংলা সংগীতচিন্তার নবজন্ম

সুধীর চক্রবর্তী

জাতিহিসাবে সর্বক্ষেত্রে বাঙালির নবজন্মের সূচনা উনবিংশ শতাব্দীতে। বাংলা সংগীতচিন্তার নবজন্ম বাঙালির সর্বাত্মক জাগরণের সঙ্গে নিবিড় তাৎপর্যে সংযুক্ত। অর্থাৎ মানবতাবোধের প্রসার, যুক্তির সমুন্নতি, বিজ্ঞান ও ইতিহাসাশ্রিত মুক্ত মূল্যবোধের বিকাশ, নারীজাতির প্রতি নবদৃষ্টিপাত প্রভৃতি নবজাগরণের সর্বস্বীকৃত লক্ষণের সঙ্গে বাংলা সংগীতের নবরূপান্তর, প্রচার ও সংরক্ষণ -প্রবণতার সহযোগ অবিচ্ছিন্ন। দেশকালের তালে লয়-গাঁথার এই বিশেষত্ব সংগীতে আবহমানকাল থেকে স্পন্দিত। য়ুরোপীয় নবজাগরণের সূত্রে উৎসারিত তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সমকালীন সংগীতে প্রস্ফুট হয়েছিল; তার ফলে রাজসভা ও চার্চের শুদ্ধরীতিবদ্ধ ধর্মাশ্রিত সংগীত ধারা বর্জন ক'রে সেই সময়ে শিল্পী-ব্যক্তির স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম লক্ষ্য করা গেছে। য়োহান্ সেবাস্টিয়ান্ বাখ্ থেকে শুরু ক'রে, বেতোফেনকে ঘিরে, সংগীতের সেই প্রচণ্ড একক স্বাতন্ত্র্যসংগ্রামে য়ুরোপীয় নবজাগরণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত। অবশ্য সর্বকালেই সংগীত এইভাবে সমকালীন সমাজ ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। তাই লক্ষ্য করা যায়, উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপে ডারুইনের বিবর্তনবাদ ও সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের মনোবিকলন-সংক্রান্ত শাস্ত্ররচনার সমকালে সংগীতযন্ত্র পিয়ানো শ্রেষ্ঠতা ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। আত্মস্থ দৃষ্টিতে বোঝা যায়: ডারুইনের তত্ত্বে মানুষের ক্রমবিকাশের গূঢ় সূত্রসন্ধান, ফ্রয়েডের তত্ত্বে মানবিক অন্তর্মনের সূক্ষ্মতম তরঙ্গের অনুধাবন প্রয়াস এবং পিয়ানোর অসংখ্য স্বরসামর্থ্যের মধ্যে মানবহৃদয়ের অনুপুঙ্খ স্বরধ্বনি প্রকাশের প্রবণতা—এই তিন প্রচেষ্টা রূপের দিক থেকে স্বতন্ত্র হলেও আত্ম-আবিষ্কারের মৌল ভাবের অন্তর্গত।

সম্প্রতি, কিছুকাল থেকে, নানাভাবে বাংলা নবজাগরণের স্বরূপ ও তাৎপর্যসন্ধান চলছে। ধর্মান্দোলন, জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি সাধনা, মানবতাবোধের বিকাশ, সাহিত্যের ভাব ও রূপের পালাবদল প্রভৃতি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বাংলার নবজাগরণকে প্রতিষ্ঠাদান করা হয়েছে। কিন্তু সেই অভিনব ভাবপ্রবাহের গভীরে অনুস্যূত সংগীতের সূত্রটি এ ক্ষেত্রে প্রয়োগ ক'রে দেখা হয় নি। অথচ তথ্য ও তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক'রে দেখা যায়, উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে সংগীতচিন্তা তথা সামগ্রিকভাবে বাংলা সংগীতের ক্ষেত্রে নবজন্মের সূচনা হয়েছিল। বাংলার আবহমান দেশ ও কালের বাতাবরণে সেই সাংগীতিক নবজন্ম সকর্মক, নিগূঢ় ও বহুবিচিত্র রূপান্তরের বার্তাবহ। বর্তমান রচনায় বাংলা নবজাগরণের সেই উপেক্ষিত কিন্তু অপরিহার্য সংগীতসূত্র অনুসন্ধান করবার চেষ্টা হয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত, মূলত রাজনৈতিক অ-স্থিরতায়, বাংলাদেশে অবক্ষয়ের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। মানবতার শোচনীয় ও অপমানিত অস্তিত্ব, নারীজাতির অশ্রুসর্বস্ব বন্দীত্ব, স্থূল অশ্লীলতার প্রতি পক্ষপাত, দেশীয় ঐতিহ্যবিহীন ভাবনা ও অপরিকল্পিত সাহিত্যসৃষ্টি প্রভৃতি অবক্ষয়ের মধ্যে বাংলার দেশগত ও জাতিগত কোনো বিশেষত্ব ছিল না। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-দেবেন্দ্রনাথ-মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েক দশক ব্যাপী জীবনসাধনার মূলমন্ত্র ছিল দেশের এই আত্মদৈন্য মোচন ক'রে নবভাবের প্রবর্তন। সেই প্রবর্তনা কখনও বুদ্ধি ও যুক্তির পথে প্রাগ্রসর হয়েছে, কখনও স্বদেশীয় মহৎ

ধর্মাদর্শের মার্গে, আবার কখনও বিদেশী চিন্তানায়কদের নির্দেশিত পথে। তারই পরিণামে নারীত্বের তথা মানবতার স্বীকৃতি, ধর্মনিরপেক্ষ শুভবুদ্ধি, দেশীয় ঐতিহ্য ভাবনা ও বিদেশী নবভাবনার সমীকরণ প্রভৃতির মাধ্যমে বিশিষ্ট ভাবে বাংলা ও বাঙালির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। তৎকালীন সমাজ রাষ্ট্র সাহিত্য ও সমগ্রভাবে চিন্তাধারায় সেই মহাভাববন্যা যদি প্রকৃতই নবীনতার জনয়িতা হয়ে থাকে, তবে বাংলা সংগীতধারায় সেই নবজন্ম কতখানি ব্যাপ্ত ও কী পরিমাণ সৃজনধর্মী তার বিশ্লেষণ অবশ্য কর্তব্য।

ঐতিহাসিক বিচারে বলা হয়, রামপ্রসাদী গানের পরই বাংলাগানের সৃজনপর্ব অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। কেননা উত্তর-রামপ্রসাদ বাংলাগানে ব্যক্তির মহৎ ভাবাদর্শের পরিবর্তে প্রাধান্য পেয়েছিল একধরণের ঐহিক তারল্য ও স্থূল ইন্দ্রিয়তন্ত্র। গানের বাণীতেও অশালীনতার সংক্রাম ঘটেছিল। অর্থাৎ, লৌকিকতার প্রতি অতি-আনুগত্য অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর যুগসন্ধিক্ষণের গীতকারদের আবহমান সাংগীতিক ঐতিহ্য থেকে ভ্রষ্ট ক'রে জন-মনোরঞ্জনের তরল প্রচেষ্টার অভিমুখী করেছিল। সেই কারণেই হাফ-আখরাই, তরজা, খেউড়, পক্ষীদলের গান প্রভৃতি গীতিরীতিতে সৃজনের মত্ততা আছে কিন্তু সৃষ্টির শুদ্ধতা নেই। সে সময়ের গান ভাবের বিচারে নিরাবেগ ও অশালীন, বাণীর বিচারে আনুপ্রাসিক ক্লান্তিময়। গীতরূপায়ণেও প্রাধান্য ছিল তালোন্মত্ত উৎসাহের। অতঃপর, নীলকণ্ঠের মতো সমকালীনতার তীব্র গরলটুকু আত্মসাৎ ক'রে যিনি সৃষ্টির অমৃত পদ্ম প্রস্ফুটিত করলেন তিনি রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু।

অবক্ষয়ের কালে বাস ক'রেও নিধুবাবু (১৭৪১-১৮৩৯) যে সার্থক সৃষ্টিধর্মী ছিলেন তার কারণ মুখ্যত তাঁর শিল্পী-ব্যক্তিত্ব, কিন্তু গৌণত তাঁর দীর্ঘ জীবন। প্রায়-শতায়ু জীবনক্রমায় তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন: ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল রচনা, রামপ্রসাদের সাধনসংগীতের স্বর্গ, পলাশির যুদ্ধ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জনিত জমিদারী বিপর্যয়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন, ছাপাখানা ও বাংলা গদ্যের সূচনা, রামমোহনের বেদান্তচর্চা, বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার, ইয়ংবেঙ্গলের উন্মাদনা প্রভৃতি বিচিত্র অভিজ্ঞতার। সেই অভিজ্ঞতার সারদর্শী নিধুবাবু হয়ে উঠেছিলেন একজন ব্যক্তিমানুষ। সেইজন্য বাংলাসংগীতকে অবক্ষয়ের বৈচিত্র্যহীনতা থেকে মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে তিনি ভাবের দিক থেকে গ্রহণ করলেন লিরিকের মন্ময় আবেগ এবং রূপায়ণের অভিনবত্ব ফোটালেন পশ্চিম ভারতীয় টপ্পা-রীতির অন্তর্ময় লাবণ্যস্পর্শে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, লিরিকের মন্ময় সৌন্দর্য বাংলা সংগীত ও সাহিত্য নিধুবাবুর আগে প্রকৃষ্ট ভাবে ফুটে ওঠে নি এবং পাঞ্জাবী টপ্পার রূপকল্প নিধুবাবুর আগে বাংলাগানে অজ্ঞাত ছিল। এই বিশেষ সংগীতের স্বরূপ অনুশীলন ও স্বীকরণের জন্য তিনি দীর্ঘকাল পশ্চিম ভারতে অবস্থান করেছিলেন। তাঁর পরবর্তীকালের সার্থক গীতকারদের (যেমন: রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদ) রচনায় লিরিকের মন্ময় সৌন্দর্য ও টপ্পার দানা— এই দুইই বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। এইজন্য নিধুবাবু বাংলাসংগীতে ক্রান্তিকালের যুগন্ধর শিল্পী। সংগীতের ভাব ও রূপের ক্ষেত্রে তাঁর নবীনচিন্তা পরবর্তীকালে পথিকৃৎ হয়েছে।

অবশ্য কোনো দেশের সাংগীতিক পশ্চাদ্‌গামিতা কোনো-একজন ব্যক্তিশিল্পীর একক সাধনায় মোচন হয় না; সেজন্য প্রয়োজন হয় দেশব্যাপী সচেতন জাগৃতি ও সামগ্রিক সক্রিয়তা। সাংগীতিক নবজন্ম সামগ্রিকতার বোধ থেকে উৎসারিত হয়। বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে সেই সম্মিলিত উদ্যমে ব্যাপক সংগীত -আন্দোলনের সূচনা ঘটে। সে আন্দোলন কখনও নিতান্তব্যক্তিগত উদ্যম, কখনও প্রাতিষ্ঠানিক, কোথাও সংগীতবিষয়ক পত্রিকাপ্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ, কোথাও

সার্বজনিক স্বরলিপি-পদ্ধতি আবিষ্কারের সাহায্যে গীতপ্রচারের কর্তব্যপ্রণোদিত শুভবুদ্ধি। তৎকালীন সংগীত-আন্দোলনের বিভিন্ন কার্যকলাপের অন্তরালে বাংলাদেশে আধুনিক নানা গীতরীতি এবং স্বরূপত সত্যিকারের বাংলাগান উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি স্মরণীয় যে, এই আন্দোলনের পরিণতি ও প্রভাব হয়েছে ব্যাপক ও বিস্তৃত। তার প্রমাণস্বরূপ দেখা যায়, এই সংগীত-আন্দোলনের নেপথ্যভূমি থেকে ও প্রত্যক্ষভাবে উপাদান সংগ্রহ ক'রে রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ-নজরুলের রচিত ও সুরারোপিত গানগুলি বাংলার সারস্বতসাধনায় শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যরূপে নিবেদিত হয়েছে।

সংগীতচিন্তার নবভাবনা

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে সংগীতক্ষেত্রে যেসব নবভাবনা ও নবপ্রয়াস ঘটেছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত উল্লেখপঞ্জী সম্মুখে রেখে, সে ব্যাপারে তৎকালীন বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও কর্মীদের সক্রিয় ভূমিকা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। এই পর্বের সাংগীতিক প্রয়াসগুলি ছিল প্রধানত :

এক. নতুন যুগের ভাবানুযায়ী গান রচনা (ভাব ও ভাষা উভয়তই) এবং সেই গানের ভাবের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ গীতরীতি-অনুসরণ। এই প্রচেষ্টা থেকেই মূলত ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্‌খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতির প্রবর্তন ও ক্রমোৎকর্ষ ঘটে। নতুন তালেরও (যেমন মধ্যমান ও একতাল) উদ্‌ভব ঘটে।

দুই. অর্কেস্ট্রা, হার্মনি, অপেরা প্রভৃতি বিদেশাগত সুরবৈশিষ্ট্য বা গীতরীতি সুসমঞ্জসরূপে বাংলাগানে গ্রহণ ও ভাবপ্রকাশের নতুন উপাদানরূপে ব্যবহার।

তিন. দেশে-বিদেশে প্রচলিত নানাপ্রকার স্বরলিপি-পদ্ধতির সারাৎসার ক'রে সর্বজনবোধ্য সরল ও স্বল্পব্যয়ে মুদ্রণোপযোগী একটি স্বরলিপি-পদ্ধতি প্রণয়ন এবং তার সাহায্যে বাংলা ও ভারতীয় গানের প্রচার ও সংরক্ষণ।

চার. সংগীতবিষয়ক পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মনে সংগীত সম্পর্কে অনুরাগ ও কৌতূহল সৃষ্টি এবং সংগীতসংক্রান্ত সংবাদ প্রচার।

পাঁচ. সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সংগীতবিষয়ক প্রামাণিক কোষগ্রন্থসমূহের বঙ্গানুবাদ, সংগীতসংক্রান্ত নতুন গ্রন্থ রচনা, ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগীতের ইতিহাস প্রণয়ন।

ছয়. প্রাক্তন গীতকারদের জীবনী রচনা ও গীত সংকলন সম্পাদনার সাহায্যে দেশের প্রবহমান গানের সঙ্গে নবীন সংগীতোৎসাহীদের মেলবন্ধন।

সাত. সংগীত-উন্নয়নী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগীতবিদ্যালয় স্থাপন ক'রে প্রত্যক্ষভাবে তরুণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান, সংগীত প্রচার ও স্বদেশে সংগীতের মানোন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি।

আট. ভারতীয় কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রবাদ্যের কালানুক্রমিক ইতিহাস ও বিবরণ ইংরাজি ভাষায় রচনা ক'রে জগৎসভায় ভারতীয় সংগীতের বহুশতাব্দীবাহিত ঐতিহ্যের পরিচয় প্রদান।

নবভাবনায় রূপায়ণ। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান

সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে এমন অনেক মহৎ কর্মীপুরুষ জন্মেছেন এবং স্বদেশ ও স্বসমাজের উন্নতিবিধানে আজীবন সাধনা করেছেন যে, সেই সময়ের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান শব্দদুটি প্রায় সমার্থক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ, সে যুগের ব্যক্তিরাই ছিলেন এক একটি প্রতিষ্ঠান। বাংলাসংগীতের নবজন্মের ক্ষেত্রেও ব্যক্তিত্বের এই দ্বৈত ভূমিকা লক্ষণীয়।

কালক্রমের দিক থেকে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাসংগীত-আন্দোলনে প্রথম উল্লেখযোগ্য নাম: রাধামোহন সেন। আনুমানিক ১৬৭৪ খৃস্টাব্দে লিখিত মির্জা খানের 'তুহ্‌ফাং-উল-হিন্দ্' নামে পার্শিভাষায় লেখা সংগীতকোষ অবলম্বনে তিনি বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম সংগীতের কোষগ্রন্থ ভাষান্তরণ করেন। এই গ্রন্থের নাম 'সঙ্গীত তরঙ্গ'। ১২২৫ বঙ্গাব্দের ২৫শে আষাঢ় (ইং ১৮১৮ খৃস্টাব্দ) তারিখে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় রাধামোহন লিখেছেন :

সংগীত বিদ্যার বহুতর গ্রন্থ হয়।
তাবতের ভাষা করা যুক্তিযুক্ত নয় ॥
অতএব কতগুলি গ্রন্থকে ভাঙ্গিয়া।
প্রকাশ করিব আমি নানা ভাষা দিয়া ॥

লেখকের সংকল্প অনুধাবন করলে বোঝা যায়, 'সঙ্গীত তরঙ্গ' আসলে ভারতের একাধিক সংগীত-আকর-গ্রন্থের সারানুবাদ প্রয়াস। তার সমর্থন মেলে রাধামোহনের আরেকটি মন্তব্যে :

সঙ্গীত দর্পণ আর দেখ দামোদর।
রত্নাকর মকরন্দ রূপ রত্নাকর ॥
মান কুতূহল সভা বিনোদ সঙ্গীত।
পারিজাতক প্রভৃতি গ্রন্থ বিরচিত ॥

গত শতাব্দীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংগীতের সংকলন ও কোষগ্রন্থ কৃষ্ণানন্দ ব্যাস -কৃত 'সঙ্গীত রাগ কল্পদ্রুম' (১৮৩৪) বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক।

রাধামোহনের পরে উল্লেখযোগ্য রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নাম। সংগীতের পরম ভক্ত, পণ্ডিত ও প্রচারক হিসাবে তাঁর সমপর্যায়ের ব্যক্তি যে কোনো দেশেই বিরল। অবশ্য রাজা শৌরীন্দ্রমোহনের সঙ্গে তাঁর সহযোগী ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর নামও স্মরণীয়। এই দুই অসামান্য সংগীতবেত্তা প্রাচীন হিন্দু-সংগীত ও ভারতীয় যন্ত্রসংগীতের স্বাতন্ত্র্যপ্রচারে আজীবন সংগ্রাম ক'রে গেছেন। বিবরণে পাওয়া যায়, রাজা শৌরীন্দ্রমোহন একটি 'মিউজিক অ্যাকাডেমি'র সূচনা করেন। সেখানে ভারতীয় কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীতের কয়েকজন সার্থক শিল্পী ছাড়াও কয়েকজন সংস্কৃত ভাষায় বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতকেও গ্রহণ করা হয়েছিল। শেষোক্তদের কাজ ছিল সংস্কৃত সাহিত্যধারা থেকে ভাবগ্রহণ ক'রে উচ্চ ভাবধারার গান রচনা। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মীদের মধ্যে ছিলেন শৌরীন্দ্রমোহন স্বয়ং, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, লছমীপ্রসাদ মিশ্র ও কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। দশ বছরের পরিশ্রমে এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'যন্ত্র-ক্ষেত্র-দীপিকা', 'সংগীত-সার' 'কণ্ঠ-কৌমুদী' গ্রন্থ তিনটি এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দের অন্তর্গত কয়েকটি গানের স্বরলিপি। শৌরীন্দ্রমোহন নিজে এগারোখানি গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেন। তিনি বিশেষভাবে ভাবিত ছিলেন হিন্দুসংগীতে পাশ্চাত্য হার্মনির সংযোগ প্রতিষ্ঠায়। এই প্রসঙ্গে তাঁর রচিত 'The musical Scales of the Hindus : with remarks on the applicability of harmony to Hindu music' গ্রন্থটির চিন্তাধারায় নবভাবনা স্মরণীয় হয়ে আছে। হিন্দুসংগীত সম্পর্কে পাশ্চাত্য সংগীতবেত্তাদের মতামত তিনি সযত্নে সংগ্রহ ক'রে সংকলন করেন 'Hindu-music from various authors' গ্রন্থে। হিন্দুসংগীতের মহিমা ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য

তিনি এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই পরিকল্পনা তাঁর দেশানুরাগ ও দেশীও সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধার অবিস্মরণীয় স্মারক। কিন্তু সংগীত সম্পর্কে রাজা শৌরীন্দ্রমোহনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'Universal history of music' গ্রন্থরচনা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, যখন বিশ্বের ইতিহাস রচনার উপাদান ছিল অপ্রতুল সেই সময় তিনি যে অমানুষিক শ্রমে এ গ্রন্থ রচনা করেছেন তাতে মূর্ত হয়েছে তাঁর ইতিহাসবোধ তথা বিশ্ববোধ। সেইসঙ্গে ফুটে উঠেছে সংগীতের ক্ষেত্রে পারস্পরিক ভাববিনিময়ের আগ্রহ ও চিত্তের ঔদার্য। সৌভাগ্যত, শৌরীন্দ্রমোহন তাঁর দায়িত্বের গভীরতা সম্পর্কে সচেতন মন্তব্য করেছেন গ্রন্থটির ভূমিকায় :

> 'The study of music of various nations is advantageous to the musicians for a number of reasons. The study is important from an ethnological point of view, as it affords him an insight into the inward man and displays the character and temperament of different races, and the relation they bear to one another. It is also important from a historical standpoint, for it shows the different stages of progress which music has made in different countries.'

রাজা শৌরীন্দ্রমোহনের রচনাবলী সম্পূর্ণত ইংরাজিভাষায় লিখিত; তার কারণ, এইসব রচনার মূল উদ্দেশ্য বিশ্বের সংগীতসভায় ভারতীয় সংগীতের পরিচয় প্রদান এবং ভারতীয় সংগীত সম্পর্কে বিশ্ববাসীর সশ্রদ্ধ মন্তব্য উন্নাসিক ও ঐতিহ্যভ্রষ্ট ভারতীয়দের সম্মুখে উপস্থাপন।[১]

শৌরীন্দ্রমোহনের পর বাংলার সংগীতক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বদেশে সংগীতপ্রচারের জন্য তিনি আত্মদান করেছেন বললে ভুল হয় না। জীবনের অপরাহ্নে লেখা তাঁর একটি পত্রাংশে তাঁর গীতাত্মপ্রাণ আত্মজীবনীর প্রকৃতচিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি লিখেছেন :

> 'আমি একসময়ে সঙ্গীতে পাগল হইয়াছিলাম। সঙ্গীতচর্চ্চার জন্য উপযুক্ত সাবকাশ পাইতাম না বলিয়া, আমি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অধীনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটী পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, যে-পদ এখন লোকে মাথা খুঁড়িয়াও পায় না।'[২]

কৃষ্ণধনের ইচ্ছা ছিল য়ুরোপীয় সাংকেতিক স্বরলিপি এ দেশে প্রচার করা। সেজন্য তিনি বহু চেষ্টা করেন এবং বহু অর্থব্যয়ও করেন; কিন্তু তাঁর ইচ্ছা সাফল্যমণ্ডিত হয় নি। কেননা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর -প্রবর্তিত আকার মাত্রিক স্বরলিপি শেষ পর্যন্ত সকলে গ্রহণ করেন। সে প্রসঙ্গ অন্যত্র ব্যাপক ভাবে আলোচিত হবে। আপাতত স্মরণীয় যে, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পূর্ণ নিজব্যয়ে অনেকগুলি সংগীত-

---

১ প্রসঙ্গত শৌরীন্দ্রমোহন কর্তৃক ইংরাজিভাষায় রচিত প্রধান সংগীত-গ্রন্থগুলির কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া গেল :

1. Hindu music from various authors 1875 2. Short notices of Hindu musical instruments 1877 3. Six principal ragas, with a brief view of Hindu music 1877 4. A few specimens of Indian songs 1879 5. Eight tunes 1880 6. The musical scales of the Hindus 1884 7. The twenty-two musical Srutis of the Hindus 1886 8. Six ragas and thirty-six raginis of the Hindus 1887 9. Universal history of music 1896

২ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত। গীতবিতান বার্ষিকী ১৩৫০। পৃ ২৫

বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৮৬৭ সালে প্রথম প্রকাশ পায় 'বঙ্গৈকতান'। এই গ্রন্থে ছিল ঐকতান বাদ্যের গৎ। ১৮৬৮ সালে প্রকাশ পায় 'Hindustani Airs arranged for the Pianoforte' ও 'সংগীতশিক্ষা' নামে দুটি বই। ১৮৭৩ সালে প্রকাশ পায় 'সেতারশিক্ষা'। এইসব গ্রন্থরচনার পশ্চাদপটে পাশ্চাত্য সুরকে এদেশী গানে গ্রহণ করবার এবং দেশী-বিদেশী যন্ত্রসংগীত সম্পর্কে তাঁর উৎসাহের প্রমাণ মেলে। কিন্তু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'গীতসূত্রসার'। নানা অসুবিধার মধ্যে দীর্ঘ দশ বছরের শ্রমে আবদ্ধ ঊনবিংশ শতাব্দীর এই মহৎগ্রন্থ ১৮৮৫ সালে প্রকাশ পায়। ভারতীয় সংগীতের ঔপপত্তিক ও ক্রিয়াত্মক উভয়তই এই গ্রন্থ আজ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ। ভূমিকার সূচনায় লেখক উল্লেখ করেছেন : 'কণ্ঠে গীতচর্চ্চার বিস্তৃতি ও উৎকর্ষ বিধানার্থ এই পুস্তক প্রণীত ও প্রকাশিত হইল।' ভূমিকার শেষে লেখক জানিয়েছেন: 'এই পুস্তকদ্বারা স্বদেশীয় একটি লোকেরও বিশুদ্ধ সংগীতজ্ঞানের, ও গান শক্তির উন্নতি সাধিত হইলে, শ্রম সফল জ্ঞান করিব'। কৃষ্ণধনের এই আবেগ ও আকূতি মর্ম্মস্পর্শী। তাঁর অসামান্য স্বাদেশিকতা ও গীতপ্রীতির অভিজ্ঞান 'গীতসূত্রসার'-এর পাঁচশত পৃষ্ঠা।

বাংলা সংগীতের নবরূপায়ণ ও প্রচার ব্যাপারে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। নিজে অপেরা ঢঙে নাটক রচনা ক'রে এবং কিশোর রবীন্দ্রনাথের কাছে দেশীবিদেশী সংগীতের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে তিনি বাংলার সংগীতক্ষেত্রে প্রবক্তার গৌরব অর্জন করেছেন। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে নি ; নানা প্রতিষ্ঠান ও সংগীত উন্নয়নী সভার কাজে ব্যাপ্ত হয়েছিল। অর্কেস্ট্রা প্রবর্তন, সংগীতপত্রিকা সম্পাদন, সংগীতসমাজ স্থাপন, স্বরলিপির সরলীকরণ প্রভৃতি নানা কাজে তাঁর যুগান্তকারী শিল্পবুদ্ধি সার্থকতা দেখিয়েছে। নিজের জীবনস্মৃতিতে নবীন সংগীতসৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এই ব'লে : 'কি সৌখীন কি পেশাদার কোনও গায়কের কোনও গান ভাল লাগিলেই, অমনি সেটি টুকিয়া লইয়া, আমরা ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিতে বসিতাম। এইরূপে ব্রহ্মসঙ্গীতে অনেক বড় বড় ওস্তাদী সুর ও তাল প্রবেশলাভ করিয়াছে।'

লক্ষণীয় যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সে যুগের অন্যান্য সংগীতবেত্তাদের মতো সংগীতের ইতিহাস বা কোষগ্রন্থ রচনা করেন নি, কেননা তাঁর দৃষ্টি ছিল মূলত প্র্যাকটিকাল। সেইজন্য সংগীতকে প্রত্যক্ষভাবে সাধারণ্যে প্রচার করাই ছিল তাঁর ধ্যান ও ধর্ম। ১৮৯৭ সালের জুন মাসে তিনি ১৬৮টি গানের স্বরলিপি সংকলন ক'রে যে 'স্বরলিপি গীতি-মালা' প্রকাশ করেন, প্রসংগত সেই গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি লক্ষ্য করা যেতে পারে :

> 'যদি কোন শিক্ষার্থী স্বরলিপির কোন অংশ ঠিক বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলে আমাকে পত্রের দ্বারা জানাইলে আমি তাহা বুঝাইয়া দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। অথবা গ্রন্থস্থিত কোন গান যদি মৌখিক শুনিতে ইচ্ছা করেন, কিংবা নিয়মিতরূপে গান শিক্ষা করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাহারও বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।'

উদ্ধৃত বিজ্ঞপ্তিতে যে সদিচ্ছা ব্যক্ত হয়েছে তাতে সংগীতপ্রাণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রকৃত পরিচয় ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশের সংগীত উন্নয়নে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আগ্রহ ও আবেগ আরও সার্থক ভাবে ব্যক্ত

হয়েছিল 'আদি ব্রাহ্মসমাজ সংগীত বিদ্যালয়' এবং 'ভারত সংগীত সমাজ' নামে দুটি সংগীতপ্রতিষ্ঠানের প্রবর্তন ও পরিচালনার মধ্যে।[৩]

'আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসঙ্গীতের স্থায়িত্ব ও উন্নতিসাধনের জন্য' ১৮৭৫ সালের ৪ঠা জুন আদি ব্রাহ্মসমাজ সংগীতবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটি একা পরিচালনা করতেন সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। সেখানে ছাত্রদের বিনাবেতনে উচ্চাঙ্গ, কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত শিক্ষা দেওয়া হত। শিক্ষক ছিলেন যদুভট্ট। দুর্ভাগ্যত, ক্ষণজীবী এই প্রতিষ্ঠানটির সমগ্র কার্যবিবরণ পাওয়া যায় নি। সেই বিবরণ সংগৃহীত হলে বাংলা ধ্রুপদচর্চার প্রকৃত ইতিহাস সকলে জানতে পারবেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় সংগীতপ্রতিষ্ঠান 'ভারত সংগীত সমাজ' কিন্তু দীর্ঘজীবী হয়েছিল।[৪] পুণায় অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের কাছে অবস্থানকালে সেখানকার 'গায়ন সমাজ' দেখে কলকাতায় অনুরূপ এক সভাস্থাপনের ইচ্ছা জাগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনে। 'ভারত সংগীত সমাজ' সেই ইচ্ছারই ফলিত রূপ। সমাজের উদ্দেশ্য ছিল 'বাংলাদেশে সঙ্গীতশিক্ষা, সঙ্গীতঅধ্যাপনা, প্রচার এবং বাংলার অভিজাত ও মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যে সদ্ভাবস্থাপন।' সংগীতসমাজ প্রতিষ্ঠাকল্পে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একহাজার টাকা দান করেন এবং ঠাকুরপরিবার থেকে আরো সহস্রাধিক টাকা সংগৃহীত হয়।[৫] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন সংগীতসমাজের প্রথম সম্পাদক। এই প্রসঙ্গে কলিকাতার ডোয়ার্কিন কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী দ্বারকানাথ ঘোষের নামও উল্লেখযোগ্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় ইনি 'স্বরলিপি গীতি-মালা' নিজ ব্যয়ে প্রকাশ করেন। বাংলাদেশে হার্মোনিয়ম বাদ্যযন্ত্রের স্রষ্টা ও প্রবর্তক হিসাবেও দ্বারকানাথ প্রসিদ্ধ। উৎকৃষ্ট হার্মোনিয়মবাদকরূপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সুনাম অর্জন করেন এবং ব্রাহ্মসমাজে বাংলা গানে হার্মোনিয়ম বাজিয়ে তিনি বাংলা সংগীতক্ষেত্রে পালাবদলের সূচনা করেন।

বাংলা নাটকে অর্কেস্ট্রার সার্থক প্রয়োগ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্যতম কীর্তি। তাঁর পূর্বে ১৮৫৮ সালে ৩১শে জুলাই বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে 'রত্নাবলী' নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে বাংলা অর্কেস্ট্রা সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও যদুনাথ পাল।[৬] কিন্তু তাঁদের উদ্যমে ঐকতানসৃষ্টির চাহিদা ছিল গৌণ আর তাঁদের রচিত সুর ছিল ভারতীয় রাগরাগিনীর আশ্রয়ে পুষ্ট। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের

---

৩ ছাত্রদের সংগীত শিক্ষাদান ও সংগীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সর্বপ্রথম কৃতিত্ব রামনিধি গুপ্তের প্রাপ্য। জানা যাচ্ছে,

'His fame as a singer spread far and wide. Youngmen having a penchant for music clustered around him. Unlike professional songsters, he unreservedly gave them lessons in vocal music. . . . Ramnidhi established a society composed mostly of youngmen, for cultivation of music, chiefly vocal music.'

দ্রষ্টব্য: ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী, ভবতোষ দত্ত, পৃ ৪০৫

৪ দ্রষ্টব্য: ভারতসঙ্গীত সমাজ, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৩৬০

৫ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ ২১৭-২১৮

৬ 'An individual orchestra was composed of genuine ragas and raginis by Kshetramohon Gosain and Jadunath Paul.' (First performance of Ratnavali)

The Theatre: by Ahindra Choudhury, pp. 293

Studies in the Bengali Renaissance

The National Council of Education, Bengal, Jadavpur 1958

প্রয়াসে বাংলা অর্কেস্ট্রা দেশী-বিদেশী সুরের সমন্বয়ে রচিত এবং ঐকতানে রূপায়িত হয়। এই অর্কেস্ট্রা প্রথম রূপায়িত হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই পরিচালনায় ১৮৬৭ সালের ৫ই জানুয়ারি, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে, 'নবনাটক'-এর প্রথম অভিনয় রজনীতে। কনসার্টে যেসব বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়েছিল তা হল: হার্মোনিয়ম, দুই তিনখানি বেহালা, ক্ল্যারিওনেট, পিক্‌লো, বড়ো বাস-বেহালা, করতাল, ঢোল, বাঁয়াতবলা ও মন্দিরা।[৭] দেশী-বিদেশী বাদ্যযন্ত্রের এই মিশ্র সমারোহে সেই সময়কার সংগীতজগতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে নবযুগের আভাস এনেছিলেন তার গুরুত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের পরিমাপ আজও হয় নি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতো বাংলাসংগীতের উন্নতিকল্পে সকর্মক উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন মনোমোহন বসু। বাংলা অপেরার জনয়িতা মনোমোহন বাংলাগানের সমুন্নতিকল্পে প্রধানত প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সেকালের বিভিন্ন সভাসমিতিতে তিনি বাংলা সংগীতের পক্ষে বক্তৃতা করতেন। ১২৭৩ সালে (এপ্রিল ১৮৬৭) কলিকাতায় যে হিন্দুমেলার সূচনা হয়, তার অন্তর্ভুক্ত জাতীয়-মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে মনোমোহন ছয়টি প্রস্তাব উত্থাপন করেন; তার মধ্যে পঞ্চম প্রস্তাবটি ছিল সংগীত প্রাসঙ্গিক। তিনি সেই প্রস্তাবে আশা প্রকাশ করেছিলেন: 'যাহাতে মেলাস্থলে বিবিধপ্রকার সঙ্গীতজ্ঞ গুণিমণ্ডলীর গুণপ্রকাশ, যন্ত্রাদি প্রদর্শন ও সঙ্গীত সম্বন্ধে দেশে সুধারার প্রবর্তন হয়।'

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা রঙ্গমঞ্চে পরিবর্তনের স্পর্শ লাগে। বিদেশী নাটকের রূপরীতি এ দেশের নাটকে অঙ্গীকৃত করা এবং দেশীয় যাত্রাগানের ধারার সঙ্গে বিদেশী অপেরার সাযুজ্যসাধন এই সময়ের নাট্যনির্মাতা ও প্রয়োগকর্তাদের অন্যতম উদ্‌যোগ ছিল। তারই ফলে, বাংলা-নাটকে গান ও আবহসংগীতের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্পর্কে যুগোপযোগী চিন্তাভাবনা চলতে থাকে। এই চিন্তাভাবনা ও প্রয়োগকর্মের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিণামে গিরিশচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে গানের যথাযথ এবং তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পরবর্তীকালে লক্ষিত হয়।

নাটকে গানের এই সংগতিপূর্ণ সন্নিবেশ প্রসঙ্গের প্রথম প্রস্তাবক সম্ভবত মনোমোহন বসু। ১৮৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের জাতীয় নাট্যশালার উদ্বোধন হয়। নাট্যশালার প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব সভায় মনোমোহন যে ভাষণ দেন তাতে সারা বাংলার গীতময়তার চমৎকার বিশ্লেষণ রয়েছে।[৮]

> 'দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করা আপাততঃ অত্যন্ত আবশ্যক বোধ করিতেছি। তাহার প্রথমটি গীতের প্রসঙ্গ। আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, নাট্যাভিনয়ে গানের বড় আবশ্যক করে না। ইউরোপীয় রঙ্গভূমিতে নাটকাভিনয়কালে গানের অভাব দেখিয়াই তাঁহারা এই সংস্কারের বশতাপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ যে ইউরোপ নয়, ইউরোপীয় সমাজ আর স্বদেশীয় সমাজ যে বিস্তর বিভিন্ন, ইউরোপীয় রুচি ও দেশীয় রুচি যে সম্যক স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। যে দেশে সকল সময়ে সকলস্থানে সকলকার্যেই গান নহিলে চলে না…সে দেশের হাড়ে হাড়ে যে সঙ্গীতের রস প্রবিষ্ট হইয়া আছে তাহাও কি আবার অন্য উপায়ে বুঝাইয়া দিতে হইবে?

৭ '"নবনাটক" নাটক হ'ল; জ্যোতিকা' মশায় অর্গ্যান বাজালেন। সেইবারেই প্রথম অর্গ্যান বাজলো।'—আমাদের পারিবারিক সংগীত চর্চা: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান বার্ষিকী ১৩৫০, পৃ ১৯

৮ সাহিত্যসাধক চরিতমালা: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫১ খণ্ড

'আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় এই বোধ হয়, যে, অভিনেতৃগণ অধুনা যেরূপে অভিনয়ের নিমিত্ত যত্ন পান, তৎসঙ্গে গানের পারিপাট্য সাধনার্থ যদি তদ্রূপ মনোযোগী হইতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাদের অভিনয় দর্শনসময়ে শ্রোতা ও দর্শকমণ্ডলী এককালে মোহে অভিভূত হইয়া গলিয়া যাইবেন। আমি এমন বলিতেছি না, যে, যাত্রাওয়ালারা যেমন কথায় কথায়, অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্তৃতার পর কেবলই গানের আধিক্য করিয়া থাকে, নাটকেও তদ্রূপ হউক। আমার অভিপ্রায় এই, যে, স্বভাবোক্তির পর যেখানে যেখানে গান খাটিতে পারে, তাহা উক্ত স্বাভাবিক নিয়মে সংখ্যায় যতই কেন হউক না ফলতঃ যে কয়টি গান হইবে, সে কয়টি যেন উত্তমরূপে গাওয়া হয়। ফল কথা, আমরা মধ্যস্থ মানুষ; আমরা চাই দেশে পূর্বে যাহা ছিল, তাহার ধ্বংস না করিয়া তাহাকে সংশোধিত করিয়া লও।'

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের সর্বপ্রকার নবভাবনার মূলমন্ত্র ছিল, পূর্বাগত ধারাকে বিলোপ না ক'রে নতুন যুগের উপযোগী পরিমার্জিত রূপান্তর সাধন। এই পরিমার্জনের জন্য আদর্শহিসাবে গৃহীত হয়েছে কখনও ভারতের অন্যপ্রদেশের ধারা ও সংস্কৃত মহৎ ঐতিহ্য, কখনও বৈদেশিক ধারা। বাংলা সংগীতের নবভাবনাতেও এই পরিমার্জন-সংস্কার ব্যাপারে ভাবের দিক থেকে আদর্শ হিসাবে গৃহীত হয়েছিল ঔপনিষদিক মহৎ গাম্ভীর্য; রূপের দিক থেকে গৃহীত হয়েছিল উদাত্ত ধ্রুপদ, উচ্ছল খেয়াল ও অন্তর্মমী টপ্পা। বিদেশী সংগীতের রূপরীতি, বিশেষত অপেরার ভঙ্গীও বাংলাগানে বিশেষ আদর্শরূপে গৃহীত হয়েছিল।

অবশ্য অন্যপ্রদেশের গীতধারা বাংলা গানে গ্রহণ করবার জন্য গত শতাব্দীর যেসব বাঙালি সংগীতব্রতী সক্রিয় অনুশীলন করেছিলেন তাঁদের সকলের নাম জানা যায় না। ব্যক্তিগত সাধনার নীরব প্রাঙ্গণ থেকে তাঁরা কদাচিৎ সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশ করতেন। কিন্তু তাঁদের কর্মসাধনার পরোক্ষপ্রভাব এখনকার বাংলাগানেও পাওয়া যায়। পাঞ্জাবি টপ্পাকে বাংলাগানে প্রয়োগ ক'রে কীর্তিমান হয়েছেন নিধুবাবু এবং বাংলাগানের সঙ্গে য়ুরোপীয় সুরের পরিণয় সাধনে আচার্যের ভূমিকা নিয়ে প্রসিদ্ধ হয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। এঁদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্বল্পজ্ঞাত যে-দুজন উদ্যমী সংগীতশিল্পীর নাম উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন কালী মির্জা ও মহেশ মুখুজ্যে।

কালী মির্জা (কালিদাস চট্টোপাধ্যায়) উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের একজন গায়ক ও গীতরচয়িতা। সংস্কৃত ও পার্শিভাষায় তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে কাশী গিয়ে তিনি বেদান্ত ও সংগীতচর্চা করেন। উত্তরভারতীয় গীতরীতির ব্যাপকতর চর্চার জন্য পরে তিনি লক্ষ্ণৌ ও দিল্লী যান। ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সে বাংলাদেশে ফিরে সংগীতরচনা ও শিক্ষা দান ক'রে বাকি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। কালী মির্জার কাছে রামমোহন রায় সংগীতশিক্ষা করেন বলে শোনা যায় এবং 'মির্জা মহাশয়ের সমীপে সঙ্গীত শিক্ষা সময়ে মহাত্মা রামমোহনের হৃদয়ে অদ্বৈতবাদিতার বীজ প্রথম রোপিত হয়'—এই তথ্য স্মরণীয়।[১]

মহেশ মুখুজ্যে উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকের একজন বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ। টপ্পা ও টপ্-খেয়াল সংগীতে তিনি ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ গুণী। পাঞ্জাবি টপ্পা ও গোয়ালিয়র-ঘরানার ধ্রুপদ-খেয়াল সম্পর্কে প্রত্যক্ষ শিক্ষালাভ করতে তিনি গোয়ালিয়র যান এবং পশ্চিমী টপ্পার একজন পারদর্শীরূপে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন

১ দ্রষ্টব্য: ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী: ভবতোষ দত্ত, পৃ ৪০৯

করেন। পরবর্তীকালে তাঁর শিক্ষাদানে বাংলাসংগীতে পশ্চিমী টপ্পার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি (অর্থাৎ, শোরী, হামেদুন ও মস্ত বুলবুল্-এর বিখ্যাত গান) সমীকৃত হয়।[১০]

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণে বহু প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি এবং বহু প্রতিষ্ঠান (যেমন তত্ত্ববোধিনী সভা, স্কুল বুক সোসাইটি, হিন্দুমেলা, সঞ্জীবনীসভা প্রভৃতি) সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ঠিক তেমনই বাংলা সংগীতের নবজাগরণে বহু প্রখ্যাত গীতকার, গায়ক ও নাট্যকার ছাড়াও বহু সংগীতউৎসাহী কর্মী ও প্রতিষ্ঠান দেশের সংগীত উন্নয়নে আত্মদান করেছেন। তাঁদের সাধনা ও সংকল্পের পূর্ণ পরিচয় প্রকাশিত হলে আমাদের স্বদেশসাধনার এক নব ইতিহাস জানা যাবে।[১১]

সংগ্রহ ও সংকলন : সংরক্ষণ

রেনেশাঁসের অন্যতম লক্ষণ ইতিহাসচেতনা এবং সেই চেতনার পরিচয় ফুটে ওঠে দেশের অতীতের প্রতি নব দৃষ্টিপাতে, প্রাক্তন ঐতিহ্যের নতুন ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণপ্রবণতায়। এই অর্থেই রেনেশাঁসের নামান্তর পুনর্জন্ম বা নবজন্ম। কোনো জাতি যখন ভাবতে পারে : তাদের কী ছিল, কী হয়েছে এবং কী তাদের হওয়া দরকার, তখন সেই জাতির ঘটে নবজাগরণ তথা নবজন্ম। এই নবজন্মের ভিত্তি আসলে এক অবিচ্ছিন্ন পারম্পর্যের বোধ, যে বোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নবচেতনার সৃষ্টিসম্ভারপ্রকাশ করে।

সুখের বিষয়, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই অতীতপ্রীতি এবং দিগদর্শী ইতিহাসচেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন। জীবনের প্রারম্ভ পর্যায়ে তিনি কবিওয়ালাদের দলে গান বাঁধতেন এবং তাঁর চেতনা দেশের অতীত কবি-গীতকারদের সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান ছিল। প্রাক্তনের প্রতি তাঁর এই সশ্রদ্ধ অনুরাগ মূলত ব্যক্তিগত কিন্তু অংশত তৎকালীন নবজাগরণের উত্তেজনাজাত। বাংলাদেশের অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে তাঁর সশ্রদ্ধ মনোভাব থেকে তিনি তাঁর কয়েকজন যোগ্য সাহিত্যশিষ্যকে জাতীয়তাবাদের অম্লান আদর্শে দীক্ষিত করেন। বাংলার প্রাক্তন কবি ও গীতকারদের জীবনচরিত ও রচনা সংগ্রহ ব্যাপারে ঈশ্বর গুপ্ত আকুল আগ্রহ প্রকাশ ক'রে আবেদন করেছিলেন :

> 'এতদ্দেশীয় যে সকল প্রাচীন কবি মহাশয়েরা বঙ্গ ভাষায় কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রণীত পুরাতন কবিতা ও সংগীত সকল এবং সেই সেই পুরুষের জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়া যিনি আমারদিগের নিকট প্রেরণ করিবেন, আমরা মহোপকার স্বীকার পূর্বক যাবজ্জীন তাঁহার স্থানে কৃতজ্ঞতা-ঋণে বদ্ধ রহিব, এবং তাঁহাকে দেশহিতৈষি-দলের প্রধান শ্রেণী মধ্যে গণ্য করিব। এই মহা মঙ্গলময় ব্যাপারে ক্লেশ ও শ্রমস্বীকার জন্য যদিস্যাৎ কেহ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রত্যাশা করেন, আমরা যথাসাধ্য ও যথাসম্ভব অংপ্রদানেও বিরত হইব না।··· যদবধি এই দেহের সৎকার্য্য না হয় তদবধি এই সৎকার্য্য সাধনে যদ্যপি সর্বস্ব যায়, নিঃস্ব হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হয় তথাচ আমরা এই কর্তব্যকল্পে কখনই ক্ষান্ত হইব না।'

---

১০ দ্রষ্টব্য : Music and Song by Amiyanath Sanyal. Studies in the Bengali Renaissance. pp. 311

১১ এই প্রসঙ্গে প্রাথমিক কর্মহিসাবে দ্রষ্টব্য :

শতবর্ষের বাংলা গানের দিগ্‌দর্শনী : অমিয়নাথ সান্যাল। Krishnagar College Centenary Commemoration Volume 1948

ঈশ্বর গুপ্তের এই অঙ্গীকার ব্যর্থ হয় নি। ১৮৫৩ সাল থেকে ১৮৫৫ সালের মধ্যে তিনি বাংলার প্রাচীন কবি-গীতকারদের জীবনী ও রচনা সংগ্রহ ক'রে সংকলিত করেন। ভারতচন্দ্র ও কবিওয়ালাদের সমুদয় রচনা ও বিবরণ সংগ্রহ ক'রে তিনি যেমন বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন, তেমনই রামপ্রসাদ ও রামনিধি গুপ্ত-সংক্রান্ত সমুদয় জীবনী-তথ্য ও গীতসংগ্রহ ক'রে বাংলাসংগীতের অতীত সূত্রটি নির্দেশ করেছেন। অতীতের সংগীতনায়কদের জীবনবৃত্তান্ত সংকলন এবং প্রাক্তন গীতসংগ্রহের প্রয়াস বাংলাদেশে ঈশ্বর গুপ্তই সর্বপ্রথম সম্পন্ন করেন।

ঈশ্বর গুপ্তের আবেদন অনুসারে আর কজন বাঙালি গীতসংগ্রহ ও জীবনীরচনায় উৎসাহী হয়েছিলেন তার সামগ্রিক বিবৃতিদান সম্ভব নয়। তবে ঈশ্বর গুপ্ত প্রবর্তিত ও নির্দেশিত জীবনীরচনা ও গীতসংগ্রহের রীতি দীর্ঘকাল চলেছিল। তার প্রমাণ মেলে ১৩১০ বঙ্গাব্দের মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যা 'সঙ্গীত প্রকাশিকা' মাসিক পত্রিকার দুটি সংখ্যায়। মাঘ সংখ্যায় ও ফাল্গুন সংখ্যায় বলীন্দ্র সিংহদেব যথাক্রমে সংগীত-গুরু ৺ রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের ও সংগীতাচার্য ৺ অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী রচনা করেন।

প্রাচীন গীতসংকলন ব্যাপারেও এই শতাব্দীতে বিশেষ উন্মাদনা সৃষ্টি হয়। তার কারণ, বাংলাগানের বহুশতাব্দীবাহিত ঐতিহ্যের দিকে এইসময়ে বহুজনের আগ্রহদৃষ্টি প্রসারিত হয়। বিশেষভাবে সংগ্রহ ও সংকলিত হয় বৈষ্ণব পদগীতি। সংকলনগুলির নামে যে 'রত্ন' শব্দটির প্রয়োগ আছে তার থেকেই গানগুলির সংগ্রাহক ও সম্পাদকগণের সশ্রদ্ধ অনুরক্তির পরিচয় আছে। এ জাতীয় সংকলনগুলি আত্মপ্রকাশ করে প্রধানত উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে। প্রধান গীতসংকলনগুলির এক কালানুক্রমিক তালিকা এখানে সংযোজিত করা হল।

গ্রন্থের নাম	প্রকাশ কাল	সম্পাদক বা সংকলয়িতার নাম
গীতরত্ন	১২৪৪	রামনিধি গুপ্ত
কমলাকান্ত পদাবলী	১২৯২	শ্রীকান্ত মল্লিক
প্রেম সংগীত	১২৯৪	—
গুপ্তরত্নোদ্ধার	১৩০১	কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
গীতরত্নমালা	১৩০৩	অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়
গীতাবলী	১৩০৩	বৈষ্ণবচরণ বসাক
প্রীতি গীতি	১৩০৫	অবিনাশচন্দ্র ঘোষ
সাধক সংগীত	১৩০৬	কৈলাসচন্দ্র সিংহ

তালিকাটি নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণ, কিন্তু গীতসংকলন প্রণয়ন করবার এই প্রবণতা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুইদশক পর্যন্ত প্রবাহিত ছিল। তার থেকে বোঝা যায়, এ জাতীয় সংকলন প্রণয়নের পশ্চাদ্‌পটে বাঙালির তাৎক্ষণিক ভাববিলাস ছিল না, এই প্রবণতা বস্তুত এক বৃহৎ ভাবান্দোলনের প্রতীকস্বরূপ।

সংগীত-বিষয়ক পত্রিকা

বাংলাগদ্যে লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮০১ খৃস্টাব্দে। প্রথম বাংলা সংবাদ ও সাময়িক পত্র প্রকাশিত ১৮১৮ খৃস্টাব্দে। 'দিগদর্শন' বা 'সমাচারদর্পণ' প্রভৃতি প্রথমদিকের কয়েকটি শিশুপত্রিকাকে সূত্র ক'রে অচিরে বাংলাদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাব ও আদর্শগত সংঘাত-সংগ্রাম শুরু হল। তার ফলে

একাদিক্রমে আরো অনেকগুলি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের অন্যতম যুগসমস্যা ছিল ধর্মাদর্শের দ্বন্দ্ব। একদিকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র ক'রে নবাগত ইংরাজদের খৃস্ট-ধর্মপ্রচারের চেষ্টা; আরেকদিকে নব আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার এবং সনাতন হিন্দুধর্মের সমর্থকগণের ভাবান্দোলন। ত্রিধাবিভক্ত এই ধর্মাদর্শগত সংগ্রাম রূপায়িত হতে লাগল প্রত্যেক দলের নিজ নিজ পত্রিকার মাধ্যমে। সেইজন্য প্রাথমিক বাংলা সাময়িক পত্রগুলি ধীরে ধীরে বিতণ্ডার অস্ত্র হয়ে উঠল। অবশ্য সেই প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বের নেপথ্যে দেশ ও জাতির কল্যাণচিন্তার একটি অলক্ষ্য সদিচ্ছা অন্তর্লীন ছিল ধর্ম ও দল নির্বিশেষে। ক্রমশ বাংলার শিক্ষিত সমাজে ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, সাহিত্যাদর্শ প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে দল ও মতের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পেল পত্রিকার সংখ্যাধিক্য সেই পরিমাণে হল। কালক্রমে অবশ্য বাংলা সাময়িক পত্রের এই যুযুধান অস্থিরতা কেটে গিয়ে সুস্থ ও গভীর গঠনমূলক কর্মে নিয়োজিত হয়। 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সূত্রে শিক্ষিত বাঙালির মননচিন্তা, মহৎ ভাবাদর্শ, মানবিকতার শুভ্র সাধনা, সাহিত্যের নবরূপ প্রভৃতি বিকশিত হয়। বাংলাগদ্যের বিকাশেও সাময়িকপত্রের ভূমিকা নিগূঢ়।

বাংলা সাময়িকপত্রের এই গুরুতর কর্মপ্রয়াসের পাশাপাশি আরেকধরণের লঘুস্বভাবের সাময়িক পত্র বেশ প্রচলিত ও জনপ্রিয় ছিল। মূলত উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে শেষ দশক পর্যন্ত নানা বিচিত্র ধরণের পত্র-পত্রিকা, অনেকটা ফ্যাশনের মতো, সচল ছিল। রঙ্গতামাসার পত্রিকা, নাটক ও নাট্যমঞ্চ-সংক্রান্ত পত্রিকা, এমনকি পশুদের সম্পর্কে একটি পত্রিকা, পশ্বাবলী-র খবর পাওয়া যায়। এই জাতীয় বিচিত্র ভাবধারার তরঙ্গেই সম্ভবত উনবিংশ শতাব্দীতে সংগীতবিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কিন্তু অচিরে আরো অনেক সংগীত-পত্রিকা বেরোতে থাকে, তার সব কটাই কিছু ফ্যাশনের টানে আসে নি। বরং সংগীত সম্পর্কে গভীর মনস্কতা ও অন্যান্য নানা যুগোপযোগী চিন্তাধারা সেসব পত্র-পত্রিকায় লক্ষ্য করা যায়। সেইজন্য এ সিদ্ধান্ত অসংগত নয় যে, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংগীতক্ষেত্রের নবভাবনার টানে সংগীত-পত্রিকাগুলি স্বতঃই আত্মপ্রকাশ করে। এই অনুমান দৃঢ়তর হয়, পত্রিকাগুলির অন্তর্ভুক্ত তিনটি উদ্দেশ্য লক্ষ্য ক'রে। প্রথমত, নিছক রঙ্গতামাশা বা জনমনোরঞ্জন সম্পর্কে পত্রিকাগুলির কর্তৃপক্ষের অনাগ্রহ; দ্বিতীয়ত, পত্রিকাগুলি অবলম্বন ক'রে সংগীতক্ষেত্রে বিতণ্ডাসৃষ্টির অনিচ্ছা; তৃতীয়ত, গানের স্বরলিপি-প্রকাশ, নানাজাতীয় গান-সংগ্রহ, সংস্কৃতভাষায় লেখা সংগীতের কোষগ্রন্থগুলির অনুবাদ, সংগীতবিষয়ক প্রবন্ধ রচনা প্রভৃতি সংপ্রয়াসের সাহায্যে দেশীয় সংগীতের উন্নয়ন ও প্রচারব্রত। সংগীত সম্পর্কে উৎসাহী নানা ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের আগ্রহ ও পোষকতায় এইজাতীয় সংগীত-পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। ক্রমশ এই জাতীয় পত্রিকার উদ্যমে সংগীত-আন্দোলন ব্যাপক রূপলাভ করে এবং সমকালীন অন্যান্যবিষয়ক পত্রিকাতেও সংগীত প্রসঙ্গ সংযুক্ত হতে থাকে কিংবা ক্রোড়পত্ররূপে স্বীকৃত হতে থাকে। 'তত্ত্ববোধিনী', 'সাধনা', 'ভারতী' প্রভৃতির মতো সেকালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যপত্রগুলিতে সংগীত-প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্তি নিঃসন্দেহে বাংলাসংগীতের নবভাবনার পরম স্বীকৃতি।

বস্তুত, যে কোনো দেশের সংগীতকলার মানোন্নয়ন, প্রচার ও সংরক্ষণ -ব্যাপারে সংগীত-পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকৃত হয়। যে-জর্মান-সংগীতের শ্রেষ্ঠত্ব আজ বিশ্বস্বীকৃতি পেয়েছে তার মূল্যায়ন ও প্রচারে সর্বপ্রথম অগ্রণী হয়েছিল ১৭২২ খৃস্টাব্দে ম্যাথেসনের 'Musica Critica' এবং ১৭২৮ খৃস্টাব্দে টেলম্যানের 'Der Getreve Musik-Meister' নামে দুইটি জর্মান পত্রিকা। ইংলণ্ড থেকে প্রকাশিত 'Quarterly

Musical Magazine' (প্রথম প্রকাশ ১৮১৮ খৃস্টাব্দ) এবং ন্যু-ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সুপ্রসিদ্ধ 'The Musical Quarterly' (১৯১৫ খৃস্টাব্দে রুডল্‌ফ্‌ স্বিরমার প্রতিষ্ঠিত) অথবা সম্প্রতিলুপ্ত 'Penguin Music Magazine' আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংগীত সম্পর্কে নিত্য-নূতন চিন্তাধারা ও সম্ভাবনাকে বারবার লোকসমক্ষে হাজির করেছে। কোনো কোনো প্রসিদ্ধ সংগীতনায়ক কোনো সংগীত-পত্রিকাকে আশ্রয় ক'রে তাঁর মতবাদ ও সৃজনকর্ম বিষয়ে মনের ভাবকে অনর্গলিত করেছেন, তার ফলে পরবর্তীকালে সংগীতপিপাসুরা অনেক মূল্যবান সূত্র পেয়েছেন। উদাহরণত উল্লেখযোগ্য প্রখ্যাত জর্মান সংগীতজ্ঞ হুগো উল্‌ফের নাম, যিনি জর্মানীর 'Wiener Salonblatt' নামে সংগীত-পত্রিকায় রোমান্টিক সংগীতের বিরুদ্ধে আলোচনার ঝড় তুলেছিলেন। সংগীত-পত্রিকা কেমনভাবে একজন মহান শিল্পীকে সকলের সামনে পরিচিত ক'রে দেয় তার অবিস্মরণীয় বিবরণ বহন করছে জর্মানীর 'Neue Zeitschrift für Musik' পত্রিকা। পত্রিকা-সম্পাদক বিশ্ববিশ্রুত সুরকার রবার্ট শুমান এই পত্রিকাতেই New Path প্রবন্ধের মাধ্যমে জোহানেস ব্রাহ্‌মসের সংগীত প্রতিভাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে লিখেছিলেন :

> 'I thought that sooner or later someone would and must appear, distined to give ideal expression to the spirit of the times ; one who could not gradually show the development of his genius, but who, like Minerva, would spring fully armed from the head of Jove. And he has come, a young blood at whose cradle Graces and Meroes kept watch. His name is Johannes Brahms . . . . He bears all the inner characteristics and outword signs that proclaim that he is one of the elect.'[১২]

শুমানের এই স্বাগত-প্রবন্ধ কী ভাবে জোনানেস্ ব্রাহ্‌মসের শিল্পীজীবনকে নতুন পথে পরিচালিত করেছিল তার বিবরণ[১৩] যেমন আকর্ষণীয় তেমনই অভিনব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংগীত-পত্রিকাগুলি আন্তর্জাতিক সংগীতক্ষেত্রে বিশেষ সক্রিয় না হলেও (বাংলা ভাষার সীমাবদ্ধতায় যা অসম্ভব) এই দেশের সংগীত-ভাবনা ও কর্ম-রূপায়ণের প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিল। অবশ্য এখনকার শিক্ষিত মানুষ সেইসব পত্রিকার সক্রিয় কর্মসাধনের সংবাদ সম্পূর্ণতি অবগত নন এবং পত্রিকাগুলির নামও সম্ভবত অনেকে জানেন না। এর কারণ, হয়ত, সংগীত সম্পর্কে বর্তমানকালের বাঙালির অসামান্য নিরুৎসুক স্বভাব কিংবা অন্যান্য প্রসঙ্গে অতি উৎসাহ। যাইহোক, বাংলাসংগীতের নবরূপায়ণের বাতাবরণে বাংলার সংগীত-পত্রিকাগুলি যে-সকল ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল, তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি বিষয় ছিল : ১. বাংলাসংগীতের প্রচার ২. স্বরলিপি-পদ্ধতির স্বপক্ষে যুক্তি ও জনমত সৃষ্টি ৩. সংগীত-সংক্রান্ত প্রামাণিক কোষগ্রন্থগুলির অনুবাদ ৪. য়ুরোপীয় ও বিশেষত বিলাতি সংগীতের সুর ও ঢং বাংলাসংগীতে গ্রহণ করার অনুকূলে সংগ্রাম ৫. লুপ্তমান ও বিস্মৃতপ্রায় গানের সংগ্রহ ৬. বাংলা ও ভারতের বিশিষ্ট সুরশিল্পীদের জীবনীরচনা এবং ৭. সংগীত-সমালোচনার প্রবর্তন।

---

১২ Brahms. by Ralph Hill. Duckworth. London. pp. 35-36

১৩ দ্রষ্টব্য : Schumann. by André Boucourechliev. Evergreen Profile Book 2. New York

বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম সংগীত-পত্রিকার নাম 'সংগীত চিত্তসন্তোষ'। পত্রিকার পরিচালক ছিলেন উমাচরণ সেন ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু। ১২৭৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (ইং ১৮৭০ খৃস্টাব্দ) মাসিক পত্রিকারূপে এটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু অল্পদিন চলে বন্ধ হয়ে যায়।

রাজা শৌরীন্দ্রমোহনের উদ্‌যোগে ১২৭৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিনমাসে (ইং ১৮৭২ খৃস্টাব্দ) 'সংগীত-সমালোচনী' প্রকাশ পায়। সম্ভবত এটি শৌরীন্দ্রমোহনের 'মিউজিক অ্যাকাডেমি'-র মুখপত্র ছিল। সম্পাদক ছিলেন প্রখ্যাত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। পত্রিকার আয়ুষ্কাল ছয়মাস। এর পর ১২৮৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (ইং ১৮৭৮ খৃস্টাব্দ) রাজকৃষ্ণ রায়ের সম্পাদনায় নতুন একটি সংগীত-পত্রিকা 'বীণা' আত্মপ্রকাশ করে। এই পত্রিকাটিতে বেশ কিছুদিন গানের স্বরলিপি ছাপা হয়েছিল। পত্রিকাটির আয়ুষ্কাল অজ্ঞাত।[১৪]

ইতিমধ্যে বাংলাভাষায় অন্যান্য বিষয়ক সাময়িক পত্রিকাগুলিতে কিন্তু সংগীত-সম্পর্কিত প্রসঙ্গোক্তি ও আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হ'তে থাকে। সেই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, ১৮৬৯ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসের 'তত্ত্ববোধিনী'-পত্রিকার শেষে অতিরিক্ত ছয় পৃষ্ঠার ক্রোড়পত্রে সংযোজিত : 'সংগীত লিপিবদ্ধ করিবার চিহ্নাবলী' এবং তার অনুষঙ্গে পাঁচটি ব্রহ্মসংগীতের স্বরলিপি। মুদ্রিত আকারে স্বরলিপি প্রচারের উদ্যম সর্বপ্রথম এইখানেই লক্ষ করা যায়। এর বেশ কয়েক বছর পরে ১২৯২ বঙ্গাব্দের বৈশাখমাসের 'বালক' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ঠাকুরপরিবারের প্রতিভাদেবী 'সহজে গান শিক্ষা' এবং দ্বিতীয় সংখ্যায় 'গান অভ্যাস' শিরোনামে স্বরলিপি প্রচারে সক্রিয় হয়েছিলেন। ঐ পত্রিকায় তৃতীয় সংখ্যায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'বোম্বায়ের গানবাজনা' প্রবন্ধে ভিন্নপ্রাদেশিক সংগীত-ধারা সম্পর্কে বাঙালির নবজাগ্রত কৌতূহলের চিহ্ন রয়েছে। একাদশ সংখ্যায় মুদ্রিত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বাঙ্গালীর গান' প্রবন্ধে নতুন যুগচিন্তা ও সংগীতের নবভাবনার চমৎকার পরিচয় রয়েছে :

> 'ইংরাজি সংবাদপত্রই বল আর বাঙ্গালা মাসিক পত্রই বল, বাঙ্গালির সংবাদ, বাঙ্গালির গান কোথাও পাইবে না।··· বাঙ্গালী একা থাকিয়া কিছু করিতে পারিত না, ইংরাজ আসিয়া তাহার দশা ফিরিয়াছে, তাহার মুখের ভাব আর একরকম হইয়াছে। এখন আবার ভারতবর্ষের অন্য জায়গা হইতে স্রোত বহিয়া বঙ্গদেশে যাইতেছে। বাঙ্গালির গান ভারতবর্ষের গান হওয়া চাই, তবেই সে গান টিঁকিবে।'

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা কর্তব্য যে, 'বালক' পত্রিকাতেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত, হর্বার্ট স্পেনসর -প্রভাবিত 'সুরে নাটক' বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়ার স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছিল।

'বালক' পত্রিকার মতো সংগীত-সচেতনতা, সম্ভবত যুগবৈশিষ্ট্যবশত, সমকালের অন্যান্য সাময়িক পত্রেতেও লক্ষ করা যায়। এই সূত্রে স্মরণীয় যে, 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় 'সহজে গানশিক্ষা' এবং 'সংগীত-শিক্ষা' নামে ধারাবদ্ধ স্বরলিপিপ্রচার নিয়মিত চলেছে। এই বিভাগটি পরিচালনা করতেন ঠাকুরবাড়ির প্রতিভা দেবী, সরলা দেবী, ও ইন্দিরা দেবী। স্বরলিপি প্রকাশ ব্যাপারে এই পত্রিকার সক্রিয়তা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয় হয়, ১২৯৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় বর্ষার গানের স্বরলিপি, মাঘ সংখ্যায় বেদগানের, আষাঢ়

---

১৪ 'সংগীত চিত্তসন্তোষ', 'সংগীত-সমালোচনী' ও 'বীণা'-র ফাইল বর্তমান লেখক কোথাও পান নি। কেউ এ সম্পর্কে আলোকপাত করলে ইতিহাসের ছিন্নসূত্র যোজিত হবে।

সংখ্যায় মহীশূরী গানের স্বরলিপি প্রভৃতির মধ্যে। ১২৮৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'বীণা' নামক সংগীত-পত্রিকার পর ১২৯৪ বঙ্গাব্দে নতুন অংশত একটি সংগীত-পত্রিকা 'গান ও গল্প' প্রকাশ পায়। পত্রিকাটিতে কিছু গান ও গল্প মুদ্রিত হয়েছিল। গানগুলিতে রাগ ও তালের নির্দেশ থাকত কিন্তু স্বরলিপি থাকত না। এরপর ১২৯৭ বঙ্গাব্দে দুর্গাদাস দে-র প্রকাশনায় 'মজলিস' নামে যে-পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে তার নামপত্রে যদিও উল্লেখ ছিল 'বৈঠকী আলাপ, সঙ্গীত, কবিতা, খোসগল্প, চরিত্রসমালোচন, চুটকী, রং তামাসাপূর্ণ মাসিক পত্রিকা', তবু শেষ পর্যন্ত সংগীতই এ পত্রিকায় প্রধান স্থান পায়। তার কারণ, প্রকাশক সর্বপ্রকার সংগীতসংগ্রহে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। পত্রিকার 'গোড়ার কথা'-য় তিনি নিবেদন জানান :

> 'সরস সঙ্গীতের মধ্যে প্রেম সঙ্গীতই, বোধহয়, বিশেষ চিত্তরঞ্জক : সুতরাং নির্বাচনকালে তৎপ্রতিই আমাদের বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে। অন্যান্য সঙ্গীত যে আদৌ থাকিবে না, এমন কথা বলিতেছি না। প্রথমে আমরা ভাল ভাল পুরাতন সঙ্গীত সকল গ্রহণ করিব।'

বাংলা সংগীত-পত্রিকার ক্ষেত্রে যুগান্তর আনেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। ডোয়ার্কিন কোম্পানীর অর্থানুকূল্যে তিনি ১৩০৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে (ইং ১৮৯৭ খৃস্টাব্দ) 'বীণাবাদিনী' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন। বাংলাদেশে সংগীতপ্রচার ও সংরক্ষণ -ব্যাপারে এই পত্রিকার এক স্থায়ী অবদান রয়েছে। মাত্র দুই বৎসরে 'বীণাবাদিনী' বাংলার সংগীতসমাজে বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার করে। পত্রিকাটির ঐতিহাসিক দিক থেকেও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে; কেননা স্বরলিপিপদ্ধতির সরলীকরণের যুক্তিসমূহ এই পত্রিকার পাতাতেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেন এবং সেই সূত্রে বাংলাদেশের সংগীতামোদী জনসাধারণকে আকার মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির অনুরাগী ক'রে তোলেন। তাঁর প্রবর্তিত এই আকারমাত্রিক পদ্ধতিই বাংলা সংগীতে গৃহীত হয়েছে এবং সর্বাধুনিক কালেও প্রচলিত রয়েছে। সম্পাদকরূপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সবরকমের গানের স্বরলিপি সংগ্রহের ব্রত নিয়েছিলেন। 'বীণাবাদিনী'-র আশ্বিন, ১৩০৪ সংখ্যায় 'সম্পাদকের নিবেদন' অংশে দেশ ও জাতির সংগীত সংরক্ষণের আকাঙ্ক্ষা তাঁর ভাষার গভীর আন্তরিকতায় স্পন্দমান। তিনি লিখেছেন :

> 'স্বরলিপি-লেখক মহাশয়দিগের প্রতি সানুনয় নিবেদন এই, শ্যামাবিষয়ক গান, কৃষ্ণবিষয়ক গান, বাউলের গান, কীর্ত্তনের গান, যাত্রার গান, থিয়েটারের গান, হাসির গান, হিন্দুস্থানী গান প্রভৃতি বিবিধপ্রকার গানের মধ্যে, যিনি যাহা জানেন, তাহার স্বরলিপি করিয়া যদি তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দেন তবে বড়ই ভাল হয়। হিন্দু-সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিয়া উহার স্থায়িত্ব বিধান করাই বীণাবাদিনীর মুখ্য উদ্দেশ্য।'

অন্যান্য সংগীত-পত্রিকার মতো 'বীণাবাদিনী'-তেও নিয়মিত স্বরলিপি ছাপা হত; অধিকন্তু সংগীত সম্পর্কে গভীরতর চিন্তাভাবনাবাহী রচনাও লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত, সংগীতের ঔপপত্তিক ও ক্রিয়াত্মক এই উভয়বিধ বিষয়ে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম আলোচনার সূত্রপাত হয় 'বীণাবাদিনী'-তে।[১৫] ১৩০৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় 'রাগের মূর্ছনা, স্বর-মিল রহস্য' প্রবন্ধ এবং আশ্বিন সংখ্যায় 'তাল কাহাকে বলে' প্রবন্ধ গভীরতর দৃষ্টির পরিচয় বহন করছে।

---

১৫ অবশ্য গ্রন্থাকারে এই দুই বিষয়ে বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল এর আগে; শৌরীন্দ্রমোহন ও কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগীত গ্রন্থাবলী প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য। তবে ঐ বিষয়ে পত্রিকাকেন্দ্রিক Discourse 'বীণাবাদিনী'-তেই প্রথম শুরু হয়।

তৎকালীন বাংলাসংগীতে বিদেশাগত অর্কেস্ট্রারীতি সম্পর্কে নতুন চিন্তা ও পরিকল্পনার আভাস 'বীণাবাদিনী' পত্রিকায় বিশেষ স্থান লাভ করেছিল। ১৩০৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সমবেত-বাদ্য সম্বন্ধে মন্তব্য প্রবন্ধে মত প্রকাশ করা হয়েছে যে :

'বহুমিলের অভাবে, আমাদের সমবেত বাদ্য, অনেক সময়ে একঘেয়ে হইয়া পড়ে। উহাতে আর একটুকু বিচিত্রতা সঞ্চার করা আবশ্যক। বহুমিলের অভাবে, বিচিত্রতা সম্পাদনের একটি উপায় আছে। কোন একটি বিশেষ রাগরাগিণী বাজাইবার সময়, ঝাঁপতাল, সুর ফাঁকতাল একতালা, কাওয়ালি প্রভৃতি বিভিন্ন ছন্দের তালের ফেরতায় যদি সেই সুরটি সমবেত বাদ্যে বাজান যায়, তাহা হইলে উহার একঘেয়ে ভাব অনেক পরিমাণে দূর হইতে পারে।'

'বীণাবাদিনী' পত্রিকা দুই বছর চলে বন্ধ হয়ে যায়; তার কারণ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইতিমধ্যে 'ভারত সঙ্গীত সমাজ' স্থাপন করেন এবং ত্রিপুরার রাধাকিশোর মাণিক্যদেব বর্মণের অনুরোধে সংগীতসমাজের মুখপত্ররূপে 'সংগীত প্রকাশিকা' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। সুতরাং 'সঙ্গীত প্রকাশিকা' যদিও ১৩০৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে, অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর সূচনায় আত্মপ্রকাশ করে, তবু তা 'বীণাবাদিনী'র অনুপূরক তথা উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংগীতের নবভাবনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। পত্রিকাটি দশ বছর চলেছিল। 'সঙ্গীত প্রকাশিকা'-র সম্পাদকরূপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রধান লক্ষ্য ছিল সংস্কৃত ভাষায় লেখা সংগীতের কোষগ্রন্থগুলির বঙ্গানুবাদ। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য' শিরোনামে সে কথা স্পষ্টত উল্লেখ করা হয়েছিল :

'আজকাল, শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ কাব্য প্রভৃতি বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থ-সকল অনুবাদিত হইয়া জন-সাধারণের মধ্যে বহুলরূপে প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ পর্যন্ত সঙ্গীত-বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থাদির অনুবাদ কার্যে কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। সঙ্গীত-নির্ণয়, সঙ্গীত-দর্পণ, সঙ্গীত-দামোদর, রাগ-বিরোধ, রাগ-সর্বস্ব-সার, রাগার্ণব, নারদ সংহিতা, ধ্বনি মঞ্জরী, প্রভৃতি বিবিধ সঙ্গীত-গ্রন্থের মধ্যে অধিকাংশই পাণ্ডুলিপি অবস্থায় রহিয়াছে—দুই একখানি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে মাত্র।... এই সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া মূল ও অনুবাদ আমরা ক্রমশঃ এই পত্রিকায় প্রকাশ করিব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি।

'আমাদের আরেকটি উদ্দেশ্য— তানসেন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ওস্তাদদিগের পুরাতন গীতগুলি স্বরলিপিবদ্ধ করা। স্বর-লিপির অভাবে, অনেকগুলি পুরাতন গান বিলুপ্ত হইয়াছে এবং যাহা এখনও প্রচলিত আছে তাহাও কালক্রমে মুখ-পরম্পরায় বিকৃত হইয়া যাইতেছে। অতএব, এ বিষয়ে আমাদের আর উদাসীন থাকা উচিত নয়; যাহাতে পুরাতন গীতগুলি স্বরলিপিবদ্ধ হয়, সঙ্গীত-বেত্তা মাত্রেরই সে বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত।'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই সংকল্প অংশত সার্থক হয়েছিল। 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা'-র প্রথম সংখ্যা থেকেই সোমেশ্বর-কৃত 'রাগবিরোধ' গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। অনুবাদক ছিলেন পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন। এ ছাড়া সারদাপ্রসাদ ঘোষ ধারাবাহিকভাবে লিখতেন 'রাগ-রাগিণীর পরিচয়'। 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা' পুরানো সংখ্যাগুলিতে ইতস্তত নানা বিচিত্র ও মূল্যবান সংগীত সংক্রান্ত রচনা ছড়িয়ে আছে। সেগুলির বিষয় কখনও 'প্রথম শতাব্দিতে ভারতে সঙ্গীত' অথবা 'সংস্কৃত ছন্দ ও সঙ্গীতের তাল' প্রভৃতি

জটিল অথচ উপভোগ্য চিন্তায় সমৃদ্ধ। এগুলি একত্রে সংকলিত হলে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংগীত-সমালোচনার বিষয়বৈচিত্র্য ও আদর্শ দুই-ই পাওয়া যাবে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে সর্বশেষ যে সংগীত পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় তার নাম 'আলাপিনী'। পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ১লা কার্তিক। এতে প্রধানত স্বরলিপি-প্রচার চলত। প্রথম সংখ্যার 'অবতরণিকা'-য় বলা হয়েছিল :

> 'স্বরলিপি চর্চা ও অভ্যাস যতই বৃদ্ধি পাইবে সঙ্গীতশিক্ষা সম্বন্ধে ততই মঙ্গল ও উন্নতির পথ পরিষ্কার হইবে। স্বরলিপির আলোচনা যাহাতে আরও বৃদ্ধি হয় এবং উহা দেখিয়া সহজে সকলে সঙ্গীতশিক্ষা করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে এই পত্রিকা প্রকাশ করা হইল।··· প্রতি খণ্ডে দুই তিন পৃষ্ঠা করিয়া কেবল গানের স্বরলিপি থাকিবে। সঙ্গীত সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি এবং বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়াদিও ইহাতে বর্ণিত হইবে।··· স্বরলিপির অভাবে কোন একটি গীতের স্বর চিরকাল সমান স্বরে স্থায়ী থাকে না, সেইজন্য একই গান বিভিন্ন কণ্ঠে বিভিন্ন স্বরে গাহিতে শুনা যায়। অতএব যাহাতে স্বরলিপির চর্চা খুব বৃদ্ধি হয় সঙ্গীতপ্রিয় সকল ব্যক্তিই সেজন্য বিশেষ চেষ্টা ও সহায়তা করেন ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।'

'আলাপিনী' পত্রিকার এক উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টতা ছিল, ইংরাজি গান, আইরিশ পোলকা প্রভৃতি জনপ্রিয় সুরের স্বরলিপি মুদ্রণ।

আগে উল্লিখিত হয়েছে যে, বিশিষ্টভাবে সংগীত-পত্রিকা না হয়েও যুগবৈশিষ্ট্যের কারণে উনবিংশ শতাব্দীর অনেক সাময়িক পত্রিকা সংগীত সম্পর্কে নানা আলোচনা ও মন্তব্যাদি প্রকাশ ক'রে সমকালীন সংগীতের নবভাবনায় অংশ নিয়েছিল। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই প্রাচীন বাংলা-গানের সংগ্রহগুলি মুদ্রিত হয়েছিল। সেইসূত্রে কবিওয়ালাদের জীবনী ও রচনা এবং বিশেষত রামপ্রসাদ ও নিধুবাবুর সম্পর্কে সর্বপ্রথম তথ্যাদি পাওয়া গেছে। 'তত্ত্ববোধিনী'-র সাংগীতিক প্রয়াসের কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। আপাতত, এই প্রসঙ্গে বাংলার সংগীতে নবভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে 'ভারতী' ও 'সাধনা' পত্রিকাদুটির ভূমিকা বিশদভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। 'ভারতী' ও 'সাধনা' এই দুটি পত্রিকাই ছিল প্রধানত সাহিত্যসম্বন্ধীয় উচ্চমানের সাময়িক পত্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যদের সংগীত-সমালোচনা অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে পত্রিকাদুটি তৎকালীন সংগীত-আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়েছে। সত্যিকারের সংগীত-সমালোচনা যাকে বলে, অর্থাৎ— সংগীতের উৎপত্তি, উপযোগিতা, স্বরূপ সন্ধান ও অন্যতর শিল্পরূপের সঙ্গে সংগীতকলার সম্পর্ক নির্ণয় প্রভৃতি গূঢ় নানা বিষয়ে গভীর অন্তদৃষ্টিময় প্রবন্ধ এখানেই সর্বপ্রথম প্রকাশ হয়। আর সেই বিশেষ ধরণের আলোচনায় আচার্যের ভূমিকা নিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রসঙ্গত মনে রাখা কর্তব্য যে, রবীন্দ্রনাথ মূলত কবিরূপে বিশ্বস্বীকৃতি পেলেও গানের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশের সাধনা ও নিরীক্ষা তিনি বিশেষভাবে করে গেছেন। এই উপলক্ষে সংগীত সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ও আদর্শ প্রবন্ধাকারে বারবার লিখে বোঝাতে হয়েছে।

দশম শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশের সকল লেখক কাব্যের মাধ্যমে আত্মবিকাশের সাধনা করেছিলেন। অবশ্য সেই কাব্যের রূপায়ণ হত আবৃত্তিতে নয়, সুরে। কদাচিৎ সেই সুর আবৃত্তির গদ্যধর্মকে মেনে নিত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর আগে বাংলা সাহিত্যে এখনকার মতো সুরবিযুক্ত

পাঠ্য কবিতা ও গানের মধ্যে কোনো স্বাতন্ত্র্য ছিল না। ঈশ্বর গুপ্তই সম্ভবত সুরবিযুক্ত পাঠ্য কবিতা লেখেন; অবশ্য তাঁর কবিদৃষ্টি বস্তুময় ছিল বলেই লিরিকের লাবণ্যসন্ধান তিনি আদৌ করেন নি। তাঁর পরবর্তীকালে হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, মধুসূদন, বিহারীলাল ও নবীনচন্দ্র বাংলা কাব্যের দ্বিচারিতায় অস্থির ছিলেন; সেইজন্য তাঁদের রচিত কাব্যের ইতস্তত গানের উপস্থিতি অথবা কবিধর্মে সংগীত-সংক্রাম লক্ষ করা যায়। কিন্তু যেহেতু তাঁরা কেউই একসঙ্গে শ্রেষ্ঠ কবি ও শ্রেষ্ঠগীতিকার ছিলেন না তাই এ জাতীয় সমস্যা তাঁদের সৃষ্টিকর্মকে ব্যাহত করে নি; শুধু দ্বিধাগ্রস্ত করেছে এইমাত্র। অথচ, রবীন্দ্রনাথ একাধারে একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও শ্রেষ্ঠ গীতকার ছিলেন বলেই বাংলা কবিতার দ্বিচারী সমস্যাটিকে এড়াতে পারেন নি। তার ফলে কবিতা ও গানের পারস্পারিক স্বরূপ, ঐক্য এবং বিরোধ-প্রসঙ্গ তাঁর সৃষ্টিভাবনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের বাণীসাধনায় কবিতা ও গান একই সঙ্গে উচ্ছ্রিত ও স্বীকৃত। কখনও তিনি কবিতার অনুক্ত কথাটুকু সুরের আভায় ব্যক্ত করেছেন, কখনও সুরের সীমাহীন ভাবের মধ্যে কবিতার সুনির্দিষ্ট রূপটি প্রক্ষেপ ক'রে দেখতে চেয়েছেন। সংগীত সম্পর্কে তাঁর এই বিশেষ ধরণের নিরীক্ষা ও প্রয়োগসিদ্ধি স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। বর্তমানে শুধু প্রাসঙ্গিকভাবে স্মরণীয় যে, তাঁর গান ও কবিতা বিষয়ে নানা পরীক্ষার ফলিত উদাহরণ গীতবিতানের অসংখ্য গানে ধরা পড়েছে কিন্তু সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার তাত্ত্বিক ও ঔপপাত্তিক নানা সমস্যা তিনি লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন 'ভারতী' ও 'সাধনা'-র পৃষ্ঠায়। সেগুলি সংকলন ক'রে বিশ্লেষণ করলে দুটি বিষয় স্বচ্ছ হয়ে উঠবে। প্রথমত, একজন সার্থক লিরিক কবি কেন গান লিখতে বাধ্য হলেন; দ্বিতীয়ত, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংগীতে নবভাবনার সাধনা কেমন ভাবে একজন ব্যক্তি-শিল্পীর সৃষ্টির পথকে সব রকম আকীর্ণ ধূসরতা থেকে মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। আর, শিল্পীর ক্ষেত্রে মুক্তি মানেই তো আত্মতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

সংগীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নবচেতনার উদ্বোধনে একজন পাশ্চাত্য চিন্তানায়কের স্পর্শ ছিল। ১৮৮০ খৃস্টাব্দে বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তন করবার পর আকস্মিক ভাবে হার্বার্ট স্পেনসরের এক প্রবন্ধ 'The Origin and function of Music' পাঠ করে রবীন্দ্রনাথের মনে সংগীত সম্পর্কে নবভাবনা জেগে ওঠে।[১৬] তার ফলে, এক দিকে তাঁর সৃষ্টি উৎসের নতুন দ্বার খুলে যায়—'বাল্মীকি প্রতিভা', 'কালমৃগয়া' প্রভৃতি রচনার সূত্রে; আরেকদিকে তাত্ত্বিক চিন্তা জেগে ওঠে। সেই তাত্ত্বিক চিন্তার প্রথম লিখিত রূপ 'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধ। ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ৮ই বৈশাখ বেথুন সোসাইটিতে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি পাঠ করেন এবং 'ভারতী' পত্রিকায় ১২৮৮ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় সেটি পত্রস্থ হয়। সংগীত সম্পর্কে সেই প্রবন্ধে যে-নবভাবনা ব্যক্ত হয়েছিল তা যুগান্তরের বার্তাবাহী। তিনি লিখেছিলেন:

> 'সঙ্গীত মনোভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম উপায়মাত্র। আমরা যখন কবিতা পাঠ করি, তখন তাহাতে অঙ্গহীনতা থাকিয়া যায়, সঙ্গীত আর কিছু নয়, সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে কবিতা পাঠ করা।...আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপর দাঁড় করাইতে চাই।...আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।'

'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধের মূল বক্তব্যের সমর্থনে পরের সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় (আষাঢ় ১২৮৮) রবীন্দ্রনাথ

---

১৬ এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্রজীবনী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড, পৃ ৯১ এবং জীবনস্মৃতি: রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, পৃ ৩৮২

'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা' নামে প্রবন্ধ লেখেন। 'আমাদের মনোভাব গাঢ়তম তীব্রতমরূপে প্রকাশ করিবার উপায়-স্বরূপে সঙ্গীতের স্বাভাবিক উৎপত্তি'— এই ছিল তাঁর বক্তব্য।

সংগীত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ 'সংগীত ও কবিতা' প্রকাশিত হয় ১২৮৮ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যার 'ভারতী' পত্রিকায়। সেই প্রবন্ধে তাঁর সংগীত বিষয়ক নবভাবনা সম্পূর্ণ উচ্চারিত হয়েছিল। তিনি সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন :

> 'আমরা কবিতাকে যে চক্ষে দেখি, সঙ্গীতকেও ঠিক সেই চক্ষে দেখিব। বলাবাহুল্য, আমরা যখন একটি কবিতা পড়ি, তখন তাকে আমরা শুদ্ধমাত্র কথার সমষ্টি স্বরূপে দেখি না— কথার সহিত ভাবের সম্পর্ক বিচার করি। ভাবই মুখ্য লক্ষ্য। কথা ভাবের আশ্রয় স্বরূপ। আমরা সঙ্গীতকেও সেইরূপে দেখিতে চাই। সঙ্গীতসুরের রাগরাগিণী নহে, সঙ্গীতভাবের রাগরাগিণী। আমাদের কথা এই যে, কবিতা যেমন ভাবের ভাষা, সঙ্গীতও তেমনই ভাবের ভাষা।'

'ভারতী'-র পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের লেখা সংগীত সংক্রান্ত রচনাগুলি পড়লে, সংগীতের ক্ষেত্রে একটি সমগ্র যুগ এবং সেই যুগের এক প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশের অদম্য অস্থিরতা অনুভব করা যায়। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন মন্তব্যে সমকালীন সাংগীতিক সমস্যার ইঙ্গিত ও সমাধানের চেষ্টা আছে। অবশ্য সে-সমাধান নিতান্তই তাঁর ব্যক্তিগত সামর্থ্যনির্ভর। তাতে পরিতাপের কারণ নেই, কেননা সমগ্রের অভীপ্সা প্রায়শই একজনের মধ্যে রূপায়িত হয়ে থাকে।

'ভারতী'-র মতো 'সাধনা' পত্রিকাতেও[১৭] রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি সংগীতবিষয়ক রচনা বা সংগীত-সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক মন্তব্য আছে। সেগুলির মধ্যে থেকে একটি প্রবন্ধের একাংশ বিশেষ উদ্ধৃতিযোগ্য। 'বাংলা শব্দ ও ছন্দ' নামে প্রকাশিত প্রবন্ধটি ১২৯৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা 'সাধনা' পত্রিকার অন্তর্ভুক্ত। তাতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> 'উচ্চারণ হিসাবে বাংলা ভাষা বঙ্গদেশের সমতল-প্রসারিত প্রান্তরভূমির মতো সর্বত্র সমান।··· শব্দের সহিত শব্দের সংঘর্ষণে যে বিচিত্র সংগীত উৎপন্ন হয় তাহা সাধারণত বাংলা ভাষায় অসম্ভব। বাংলা শব্দের মধ্যে এই ধ্বনির অভাবশত বাংলায় পদ্যের অপেক্ষা গীতের প্রচলনই অধিক। কারণ, গীত সুরের সাহায্যে প্রত্যেক কথাটিকে মনের মধ্যে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট করিয়া দেয়। কথায় যে অভাব আছে সুরে তাহা পূর্ণ হয়।···এইজন্য প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে গান ছাড়া আর কবিতা নাই বলিলে হয়।'

রবীন্দ্রনাথের উপরে উদ্ধৃত মন্তব্যের মধ্যে বাংলা কবিতা সম্পর্কে তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর চমৎকার সূত্র। এই ধারাতেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের প্রকৃষ্ট মূল্যায়ন সম্ভব বলে মনে হয়।

সৌভাগ্যক্রমে, সংগীত সম্পর্কে এমনই মুক্ত চেতনা ও চিন্তার নবভাবনা এইসময়ে অন্যান্যদের লেখাতেও লক্ষ করা যায়। ১৩০১ বঙ্গাব্দের 'সাধনা' পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর

---

১৭ আরও অনেক পত্রিকাতে রবীন্দ্রনাথের সংগীত-সংক্রান্ত রচনাবলী ছড়িয়ে আছে। উৎসাহী পাঠকের অবগতির জন্য উল্লেখ করা যেতে পারে 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের চৈত্র ও কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাউল গান' ও 'আলাপ-আলোচনা' এবং ঐ পত্রিকায় ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত 'শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান'।

প্রবন্ধ 'সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা' এই প্রসঙ্গে অবিস্মরণীয় উদাহরণ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেই উপেন্দ্রকিশোর তাঁর ভাবাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীতে বুঝতে পেরেছিলেন :

> 'সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা দুই বিষয়ের দুইটি মূল— শব্দ ও বর্ণ (আলোক)। তরঙ্গের রাজ্যে ইহারা প্রতিবেশী। এই তরঙ্গ মূলকত্বই ইহাদের ঘনিষ্ঠতার কারণ বলিয়া বোধ হয়।...সাতস্বর; সাতরঙ। লোহিতাদি সাতটি রঙ, ইহারা ক্রমান্বয়ে চিত্রবিদ্যার "সা রি গা মা"র স্থানীয়।...চিত্রের পক্ষে যেমন স্থান, সঙ্গীতের পক্ষে তেমনই সময়।...সীমারেখা চিত্রের পক্ষে যাহা করে, তাল সঙ্গীতের পক্ষে তাহা করে।...কবিতা উভয়েরই সঙ্গিনী।'

উদ্ধৃত রচনাংশটুকু পড়লে বোঝা যায় উনবিংশ শতাব্দীতে সংগীতের নবভাবনা ক্রিয়াত্মক ও ঔপপাত্তিক শাস্ত্রজ্ঞানে পরিসমাপ্ত না হয়ে সম্পূর্ণ ভাবাত্মক দৃষ্টিপ্রক্ষেপে সংগীতের প্রকৃতিসন্ধানে প্রযুক্ত হয়েছে। সৃষ্টি ও প্রজ্ঞার এই সমন্বয়ই রেনেশাঁসের মূল কথা।

সেইজন্যই মনে হয়, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংগীতের নব আদর্শসন্ধান, বিদেশী সংগীতের সংস্পর্শ, গীতরীতির রূপান্তর, অর্থাৎ সংক্ষেপে নবযুগের সংগীতরূপের উৎস-অগ্রগতি-পরিণতির সামগ্রিকতাটুকু তৎকালীন পত্রিকাগুলিতে সার্থকভাবে মুকুরিত। সংগীত-পত্রিকাগুলি সেই সূত্রে আরও স্পন্দমান এবং নিহিত সৃষ্টিশীলতায় মহৎ।

অলডাস হাকসলি ১৮৯৪-১৯৬৩

শিশিরকুমার ঘোষ

অলডাস হাকসলির বিভিন্ন কালের বহুবিচিত্র সাহিত্যকর্মের মূল্যায়নের উপযুক্ত ক্ষণ হয়তো আজ নয়; হাকসলি-মানসের ক্রমবিকাশের গতিবিশ্লেষণের চেষ্টা থেকেও আমি বিরত থাকব, কেন না সে-আলোচনা সুদীর্ঘ অবকাশের অপেক্ষা রাখে। ভারতীয় মনের কাছে হাকসলির যে বিশেষ আবেদন সেখানেও এই অসামান্য বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা সাগ্রহে লক্ষ্য করবার মতো; যে-বিষয় ভারতীয়দের মনোগ্রাহী, সেখানেও হাকসলীয় চিন্তার বিবর্তন বা পালাবদল বিস্ময়কর— এখানে তারই একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।

অন্য যে কোনো সাহিত্যিকের তুলনায় হাকসলি ওয়াকিবহাল, তাঁর অধ্যয়ন-পরিধিও প্রায় তুলনারহিত সে তো তাঁর অপরাধ নয়। আপাতদৃষ্টিতে যাই মনে হোক-না কেন তিনি যে মূলত: 'সিরিয়াস' লেখক এ কথার প্রতিবাদ একমাত্র বিমূঢ়-জনের পক্ষেই সম্ভব। অলডাস হাকসলিকে অনেকেই 'সিনিক' বা তেতো লেখক বলেই জানেন। কিন্তু ভুললে চলবে না, তিনি আবার মুমুক্ষুও বটে। 'আফটার মেনি এ সামার' উপন্যাসে তাঁর মুখপাত্র প্রপ্টার বলছে: "সিনিকাল্ হওয়া ভালো, যদি জানা থাকে কোথায় থামতে হবে।" অলডাস হাকসলি একাধিকবার থেমেছেন, তাঁর সিনিসিজমেরও রূপভেদ আছে। তাঁর চরিত্র বা রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্যই এই যে তিনি এককালে যা-কিছু বিশ্বাস করতেন পরে আবার তাকেই অগ্রাহ্য করেছেন; আবার পূর্বে যা ছিল তাঁর উপহাসের বস্তু পরে তাই হয়েছে তাঁর পরম নির্ভর। এই স্বতোবিরোধের হাত থেকে কোনোকালেই তাঁর নিষ্কৃতি ছিল না। তাঁর এককালীন প্রিয় লেখক ব্লেইকের ভাষায়, Without contraries there is no progression, বৈপরীত্য বিনা প্রগতি কোথায়?

স্বীকার করি বা না করি, এই বিদগ্ধ সহস্রশীর্ষ লেখকের কাছে আমরা অনেকেই কম-বেশি ঋণী— সে তাঁর পটপরিবর্তন সত্ত্বেও বা সেই কারণেই কি না সে কথা ভিন্ন। তাঁর যুক্তি বা বিন্যাসে তীব্র বিরোধ আদি ও অন্তে। দীর্ঘকাল তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ অনেক মনোধর্মী লেখা বহুজনের মনোরঞ্জন করেছে, এমন-কি তাঁর সরস শৈলীর ফলে অনেকেই তাঁকে বিনোদনের দোসর বলেই জেনেছেন। তাঁদের কাছে তিনি মূলত: অব্যবস্থিত বুদ্ধিজীবী, weathercock ছাড়া আর কিছু নন। এ ধারণা নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, কিন্তু এ কথা না মেনে উপায় থাকে না যে এই ভ্রান্ত ধারণায় ইন্ধন জুগিয়েছেন তিনি নিজেই। অথচ তাঁর শেষ পর্বের রচনায় তিনিই সেই সর্বজ্ঞ মহৎ শিল্পী যিনি আজকের এই হিংসাজর্জর পৃথিবীর ব্যর্থতার নিরাভরণ সনাতনী ব্যাখ্যা বিবৃত করেছেন নানা ভাবে নানা বিচিত্র মাধ্যমে। তৃপ্ত লেখকদের মধ্যে তিনি একজন নন। ড্রাগ-মাহাত্ম্য অথবা অনাধুনিক 'পেরেনিয়াল ফিলসফি'র সনাতন তত্ত্ব— তাঁর রচনার বিষয়বস্তু যাই হোক-না কেন, তাঁর হাত জাত-ওস্তাদের। তাঁর বহু-বিচিত্র জিজ্ঞাসা ও অমেয় জ্ঞান, দুর্লভ শিল্পবোধ হাকসলিকে এ যুগের চিন্তামন্থনক্ষম লেখকদের মধ্যে অগ্রগণ্য করেছে। "আজ হাকসলি যা ভাববেন, সারা ইংল্যাণ্ড কাল তা চিন্তা করবে" এক সময় রাসেল মন্তব্য করেছিলেন। উক্তিটি সত্য না হলেও, হাকসলির ভাবনার বিষয় সকলেরই ভাবনার বিষয়, নূতন করে ভাববার। সে দিক দিয়ে তিনি এ যুগের অদ্বিতীয়

অলডাস হাকসলি

দীপক (দংশক !)। আর ভাবনার সে কি বিস্তৃতি! রেনেশাসের কৌতূহল ও বোধিকে অতিক্রম করেছে তার ব্যাপ্তি, কেননা হাকসলি বিদ্রূপে ও আত্মবিদ্রূপে দক্ষ— প্রাণোচ্ছল রেনেশাসের সে দায় ছিল না বললেই চলে। ব্যঙ্গ ও মুমুক্ষা, যৌন ও জিজীবিষা, আদিরস ও বিজ্ঞানবাদ, যান্ত্রিকতা ও তুরীয় ভাবনা, 'মেসকালিন' ও মরমীবাদ—এই হল হাকসলির জগৎ ও জীবনায়নের Yin ও Yang, সে-জগৎ ও জীবনায়ন দাঁড়িয়ে আছে অনুভবের এক ম্যানিকীয় দ্বৈতবোধের উপর। 'ডু হোয়াট ইউ উইল্' প্রবন্ধগ্রন্থে তিনি বলেছিলেন: "বিভিন্ন মুহূর্তে বিভিন্ন ভাবে বেঁচে থাকতে হবে। বর্তমানের বহু-বিন্যস্ত জটিল পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে দ্বৈত সত্তার প্রয়োজন।" কখনো তিনি নিজেকে জীবজন্তুর কাহিনীকার রূপে বর্ণনা করেছেন, অথচ সে লেখকও যে নীতিপ্রবণ, এ কথা জানাতে তিনি ভোলেন নি। এক এক সময় মনে হয়েছে এই দুই হাকসলির— ব্যঙ্গবিদ্ ও নীতিবিদ্, মর্কটধর্মী ও আত্মসন্ধানী— কোন্‌টি সত্য বা কোন্‌টিরই বা চিরন্তন মর্যাদা। তাঁর বই পড়া নিজের আত্মচরিত পড়ার সামিল ; দ্বিখণ্ডিত সত্তা অথচ ঐক্যপ্রয়াসী— এই তাঁর নায়কের স্বরূপ। (এবং— তত্ত্বমসি !) এদের হয়তো স্বতন্ত্র করে দেখা চলে না। সব মিলিয়ে, এবং অন্যভাবে বলতে গেলে, অলডাস হাকসলি এ যুগের মুখপাত্র এবং তাঁর বিভিন্ন রচনা একাধারে আধুনিকতার নিদর্শন ও সমালোচনা। আমি যে হাকসলির বিবর্তনের বা পালাবদলের কথা বলছি, তা কোনো ব্যক্তিবিশেষের কাহিনী নয়। এ আমাদের ক্রান্তির ক্লান্ত ক্লেদাক্ত বিদ্রূপশাণিত টুকরো টুকরো ছবি। সাম্প্রতিক কালের বিজ্ঞান রাজনীতি ও উন্মার্গ দর্শন— এ যুগের মানুষকে যা-কিছু চালিত বা ব্যর্থ করেছে— তার প্রায় সব কিছুকেই যদি হাকসলি নস্যাৎ করে থাকেন, তা হলেও এ কথা ভুললে চলবে না যে বিপক্ষ দলের যুক্তিও তাঁর নখাগ্রে। বস্তুতঃ তিনি একাধারে অভিযোক্তা ও অভিযুক্ত। যে-আধুনিকতাকে তিনি আজ নির্মূল করতে তৎপর তার শিকড় তাঁর মনোজগতের গভীরে প্রোথিত। এক আত্মঘাতী দহনজ্বালা শেষ ক্ষণ অবধি তাঁকে অনুসরণ করেছে।

সমকালীন বিদেশী লেখকদের মধ্যে হাকসলি ভারতীয় মনকে বেশি আকৃষ্ট করেন— এ তত্ত্বের সমর্থনে হাকসলির চরিত্রবৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ সাহিত্যকর্মের উল্লেখ করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে হাকসলির বুদ্ধিদীপ্ত ও অধুনা প্রায় অপঠিত তাঁর যৌবনকালের রচনা 'জেস্টিং পাইলেট' ভ্রমণকাহিনীর নামই প্রথমে মনে আসে। সেই গ্রন্থে, আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে, তিনি লিখেছিলেন, "ভারতবর্ষের মতো আর কোনো দেশ আমাকে এতখানি দমিয়ে দেয় নি··· আমি যদি এখানকার ধনকুবের হতাম, তা হলে আমার সমস্ত সম্পদ সর্বভারতীয় নিরীশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের হাতে তুলে দিয়ে যেতাম।" সে সময়ে, যাকে বলে 'টোয়েন্টিজ', তিনি আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন বোধ বা তোয়াক্কা করতেন না, সে কথা অন্যত্র জানিয়েছেন। কিন্তু ১৯৬৫ সালে দক্ষিণ-ভারতে বন্ধুকে লেখা চিঠিতে অন্য সুর বেজেছে: "পৃথিবীতে যদি আবার কখনো শান্তি ফিরে আসে, তা হলে ভারতবর্ষে ফেরার ইচ্ছা রইলো। যে চোখ দিয়ে আগের বার তাকে দেখেছিলাম অন্য চোখ দিয়ে এবার দেখব তাকে।" পরিহাসরসিক পাইলেট সত্য ও মূল্যবোধ নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলেই ক্ষান্ত হন নি, সারা জীবন নানা পথে-বিপথে সন্ধান করেছেন সত্য, মূল্যবোধ ও অভেদের। এমন-কি তাঁর শেষের রচনার একাংশ নব্য-ব্রাহ্মণের (Neo-Brahmin) রচিত বলে আখ্যাত হয়েছে— সেই নব্য-ব্রাহ্মণ যিনি মধ্যস্থতা করেছেন বর্তমান ও শাশ্বত, প্রকৃতি ও বোধি, ইন্দ্রিয়বোধ ও তুরীয়, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে। বহুমুখী মানবপ্রকৃতি ও বিভিন্ন কৃষ্টির আপাতদ্বন্দ্বের অন্তর্নিহিত ঐক্য বা সমাহারের উপর নির্ভর করছে মানবজাতি ও সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ। মহৎ শিল্পীর এ এক নূতন দায়িত্ব। 'জুর্নাল আঁতির'-এ এমিয়েল

অনেক আগেই উপলব্ধি করেছিলেন সে সত্য : "পশ্চিমের সর্বগ্রাসী কর্মযজ্ঞের মাঝে দু-চারিটি ব্রাহ্মণ থাকা মন্দ নয়।" আর সে ব্রাহ্মণ যদি হন জাত-শিল্পী বা বার্নাড শ যাকে বলেছেন শিল্পী-দার্শনিক তা হলে তো কথাই নেই। অলডাস হাকসলি নিঃসন্দেহে তাঁদেরই সগোত্র। বর্তমান সভ্যতা— বা অ-সভ্যতায়— সর্বত্র দেখা দিয়েছে যে বিভ্রান্তি বা অসংযত বুদ্ধি, মূল্যবোধের যে বিলুপ্তি তার প্রচণ্ড প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হলে প্রয়োজন হবে, যেমন রেনে গ্যয়নঁ বলেছিলেন, "ঐতিহ্যবাদী সংস্কৃতির সঙ্গে নূতন করে সংযোগ স্থাপন করা এবং একমাত্র প্রাচ্য দেশেই সে বোধ অক্ষুণ্ণ।" এই পরিস্থিতিতে হাকসলির অক্লান্ত অনুসন্ধিৎসা, প্রাচীন বোধি, বেদান্ত ও বৌদ্ধধর্মের সমর্থন আমাদের সকলের পক্ষে ঘরে ফেরার সামিল, বিংশ শতাব্দীর তীর্থযাত্রীর পরিক্রমা। যুগ ও মেজাজের তাগিদেই তিনি এ পথে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন। এবং এর ফলে— অন্তত: তিনি তাই মনে করেন— তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে এমন একটি জীবনদর্শনের নির্দেশ দেওয়া যাতে অভিব্যক্ত হবে "মানব-অভিজ্ঞতার একটি সামগ্রিক রূপ, সব ঘটনা বা অভিজ্ঞতাই যার অন্তর্ভুক্ত, শুধু কয়েকটি মাত্র নয়।" অর্থাৎ সে হবে এক নব্য সর্বঅভিজ্ঞতাসার দর্শন, সত্যের পূর্ণ রূপ। এ জাতীয় তাত্ত্বিক বা শাস্ত্রীয় নিষ্ঠা শিল্পীর পক্ষে ব্যতিক্রম। এই মহৎ উদ্দেশ্য বা সচেতন আগ্রহের প্রকাশ তাঁর লেখায় কতখানি কাজ করেছে বা তিনি "সব ঘটনা ও অভিজ্ঞতা"কে যথার্থ গ্রহণ করতে পেরেছেন কি না তা নিয়ে মতবিরোধ থাকা সম্ভব। বাম ও দক্ষিণ উভয় পক্ষ থেকেই তাঁর কঠোর সমালোচনা শোনা গিয়েছে। কিন্তু তাঁর নির্দেশ বা মতাদর্শ আমাদের সমর্থন পাক বা না পাক, এই শিল্পীর মৌল সিদ্ধান্ত ও দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল রূপান্তর আমাদের সকলের পক্ষেই কৌতূহলের ও কৌতূহলের অতিরিক্ত, শিক্ষা ও সাবধানের ইঙ্গিত। শেষ পর্বের একাধিক রচনায় হাকসলির বক্তব্য তাঁর পূর্ব অভিমতের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। 'প্রপার স্টাডিজ'-এ তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল "প্রত্যেক মনের ক্ষমতা নিতান্ত সীমিত; আমাদের সকলেরই আছে জন্মগত কিছু অনন্যতা বা নিজস্ব অনুভবরীতি, মূল্যবোধের ভিন্ন ক্রমের সোপান; কারুর পক্ষেই সম্ভব নয় যা থেকে মুক্ত হওয়া।" আবার, বহু বৎসর পরে, 'আফটার মেনি এ সামার'-এ শোনা যাবে অন্য কণ্ঠ : "কোনো মানবসমাজেরই ভালো হয়ে ওঠা সুপ্রত্যক্ষ হতে পারে না, যতক্ষণ না সে-সমাজের বেশ কিছু সংখ্যক লোক উপলব্ধি করতে পারছেন যে তাঁদের বর্তমান অবস্থাই মানবসভ্যতার বা চৈতন্যের শেষ কথা নয়— তাঁদের সচেতন প্রয়াসই হবে মর্তসীমা অতিক্রম করে নূতন জীবনবেদ রচনা করা।" সামান্য ড্রাগের প্রসঙ্গেও হাকসলির চিন্তাধারার বিবর্তন লক্ষ্য করবার মতো। 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড'-এ এর সম্ভাবনা নিয়ে রঙ্গরসিকতা করেছেন এবং সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন অথচ শেষ জীবনে 'ডোর্স অফ পার্সেপশান্', 'হেভন্ অ্যাণ্ড হেল্' এবং অন্যান্য লেখায় রসায়নের সাহায্যে মানবচেতনার উন্নয়নের তান্ত্রিকী স্বপক্ষাচরণ করেছেন। 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড' থেকে 'আইল্যাণ্ড' কী দুস্তর পার্থক্য! অথচ দুয়ের পিছনে কাজ করছে একই মন। অবশ্য সর্ব-প্রকার পক্ষপাতের সাফাই গাইবার কৌশল তাঁর করায়ত্ত। তাঁর নিজের কথাতেই, "বড়ো বেশি একদেশদর্শিতা অথবা সংগতি দেহমন উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর···সম্পূর্ণ সুসংগত হওয়া মৃতের লক্ষণ।" বৈপরীত্য যদি হয় জীবনের লক্ষণ, হাকসলি পরিপূর্ণরূপে বেঁচে ছিলেন সর্বতোভাবে।

যাই হোক-না কেন তাঁর বক্তব্য বা রচনাকৌশল, দীর্ঘকাল ধরে আমাদের অনেকের কাছে 'অসংগত' নানা রঙের রঙ্গী হাকসলি পথের সাথী ও উজ্জ্বল ব্যাখ্যাতা হিসাবে বিরাজ করে এসেছে। সেই অসাধারণ বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে তাঁর বেদনা ও আত্মঘাতী ব্যর্থতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় গভীর হয় নি। হাকসলি-ফর্মুলার

সিনিসিজমএর কড়া 'ডোজ' অস্বীকার করার উপায় নেই। এক এক সময়ে মনে হয় তাঁর পরিব্যাপ্ত বিশ্বকোষমণ্ডিত জ্ঞান, সর্বশ্রুতিশিরোরত্নসমুদ্ভাসিতমূর্তয়ে, তাঁর সম্পূর্ণ সুখকর হয় নি। অবশ্য সিনিকের মুখোশ, যত কাল চলেছিল, তাঁকে ভালোই মানিয়েছে। অনেকে তো তাঁর অন্য কোনো ভূমিকার কথা জানতেন না বা মানতে রাজী ছিলেন না। "ধর্মযাজক, ব্যাঙ্কমালিক, অধ্যাপক ও রাজনীতিবিদদের নির্বোধ মতামতের সম্পর্কে পুরোপুরি ও সরাসরি সিনিকাল্ না হওয়া পর্যন্ত রক্ষা পাবার আর কোনো রাস্তা নেই," যৌবনকালে হাকসলি বলেছিলেন। কিন্তু পরে এ সত্যও তাঁর উপলব্ধিতে ধরা পড়েছিল যে, "সিনিসিজম-এর অর্থই হল সেই বিদ্রূপাশ্রিত জ্ঞান যে বর্তমানে যা-কিছু ঘটছে তার চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না এবং তাকেই স্বীকার করে নিতে হবে। এবং যে ব্যক্তি এই তত্ত্বে পাকা, সে এই দুঃসহ অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর দায় থেকে মুক্ত।" কিন্তু যিনি যাই বলুন, এই 'দুঃসহ অবস্থা'র পরিবর্তন-সাধনের দায়িত্ব থেকে হাকসলি কোনো কালেই মুক্ত ছিলেন না। রম্যরচনা বা তরলতাই তাঁর সব, এ কথা কখনোই তাঁর সত্য পরিচয় নয়।

হাকসলির চিন্তাধারার বিবর্তন লক্ষ্য করার মতো। ভাবগ্রাহী তিনি, তাঁর শেষকালীন রচনায় ঘুরে ফিরে একই কথা তিনি বলেছেন, মরমীবাদ বা অদ্বৈত ভিন্ন গতি নাই। ঋষিকুলের বাইরে আধুনিক যুগে অধ্যাত্মকালের সপক্ষে তাঁর তুল্য কম কণ্ঠস্বরই ধ্বনিত হয়েছে। সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা ধ্যানী-জ্ঞানী ভিন্ন সম্ভব নয়, এ কথা তিনি বারবার বলেছেন। "অধ্যাত্মবিদেরা সেই স্রোতপ্রবাহ— যার ধারা বেয়ে অজ্ঞান ও মায়ার পৃথিবীতে নেমে আসে বিদ্যার ক্ষীণ রশ্মিধারা। সম্পূর্ণ অধ্যাত্মতাৎপর্য-বর্জিত পৃথিবী বললেই বুঝতে হবে একেবারে অন্ধ ও উন্মত্ত পৃথিবী," এই তাঁর ধ্রুব সিদ্ধান্ত। (ইতিহাসও কি সেই সাক্ষ্য দিচ্ছে না?)

যদি বলেন, এ তো জানা কথা, আপনার আগেই হাকসলি, নিজের মতো করে, সে কথা বলে রেখেছেন। খুব কম সমালোচকই তাঁকে এমন কথা বলতে পারেন যা তাঁর জানা নেই। জীবনের মৌল বা আখেরি সিদ্ধান্ত তো "সবই জানা কথা, সেই প্রাচীন ক্লাস্তিকর সত্য অসম্ভব যার হাত এড়ানো," বলছেন হাকসলি। "সাধারণত আমরা অজ্ঞান, বাসনা ও বিভীষিকার রাজ্যে বাস করে থাকি। অজ্ঞান, বাসনা ও বিভীষিকার ফলে কারুর বা সাময়িক তৃপ্তি হতে পারে, বেশির ভাগের ভাগ্যেই জোটে অন্তহীন দুর্দশা, অন্তিম ব্যর্থতা। এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় স্পষ্ট, কিন্তু সেই মতো কাজ করা বা সে-সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করা প্রায় অসাধ্য।"

এই 'বাধাবিঘ্নে'র মধ্যে বিজ্ঞানের ব্যর্থতা অন্যতম। বিজ্ঞান যে আমাদের বিশ্বসংসারের একটি সম্পূর্ণ বা সত্য পরিচয় দিতে অক্ষম হাকসলির ছত্রে ছত্রে সেই ব্যর্থতার হতাশ স্বাক্ষর। এর পিছনে কিছুটা করুণ শ্লেষও আছে, কেননা এককালে হাকসলি বিজ্ঞানের গোঁড়া ভক্ত বা সমর্থক রূপে সক্রিয়ভাবে প্রচার চালিয়েছিলেন যুক্তিবাদের সপক্ষে। আমাদের লিভার অন্য অনেক-কিছুর সঙ্গে আমাদের জীবনাদর্শকেও পরিচালিত করে, এই সুসমাচার তিনি সুযোগ পেলেই পেশ করে এসেছেন। পরবর্তী কালে মরমীদের ব্যাখ্যাতেও বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও পরিভাষার ছড়াছড়ি। বিষয়টি পেশ করবার জন্য শিল্পী-সাধকের দ্বারস্থ হলেও অধুনাতম পরিভাষার সাহায্যেই তিনি সে তথ্য পরিবেশন করে থাকেন, বেশ মজার বা ভয় পাইয়ে দেবার মতো অভ্যস্ত সেই রীতি, 'ক'কে 'খ'এর সাহায্যে

বোঝানোর— তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রীতি। বিজ্ঞানের সঙ্গে জীবন ও সাহিত্যের সম্পর্ক নিয়ে তাঁর আগ্রহ বরাবরকার। (তাঁর শেষ বইটির নাম: সাহিত্য ও বিজ্ঞান)। এ যুগে বিজ্ঞানে এত উৎসাহী বা জানাশোনা লেখক বোধ হয় একমাত্র এইচ. জি. ওয়েলস, কিন্তু সেইখানেই তাঁদের একমাত্র মিল। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ আলাদা। 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড'এ হাকসলি পরে সে কথা স্বীকার করেছেন, কিয়দংশে ওয়েলস-বর্ণিত বৈজ্ঞানিক কল্পরাজ্যের ব্যঙ্গরূপ, ইউটোপিয়ার প্যারডি। তবে বিজ্ঞান সম্পর্কে হাকসলির দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক হেরফের হয়েছে। আজ তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অসম্পূর্ণতার কথা বলেই ক্ষান্ত নন, বিজ্ঞানের বর্বর প্রয়োগ-প্রথার বিরুদ্ধেও তিনি কশাঘাত করেছেন। বিজ্ঞানের প্রয়োগ, তিনি বলেছেন, ম্যাজিকের মতোই, যাদুকরের টুপি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নরম তুলতুলে খরগোসের বাচ্ছা বা রক্ত-জল-করা ডাইনি বুড়ি। 'এণ্ডস অ্যাণ্ড মীনস'এ নির্মোহ কণ্ঠে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে: "বিজ্ঞানের প্রাথমিক সাফল্যের উন্মাদনার মধ্যে আমরা আর বাস করছি না, আমরা বেঁচে আছি উন্মত্ত রজনীর অবসানে মোহভঙ্গের সেই মুহূর্তে যখন বেশ বোঝা যাচ্ছে যে আজ পর্যন্ত এই অহংকৃত বিজ্ঞান যা করেছে তা হল হীন বা আদতে অধঃপতিত আদর্শ চরিতার্থ করার উপায়।" যে প্রশ্ন আর এড়ানো সম্ভব নয় সেই প্রশ্ন তিনি তুলেছেন; কয়েক বৎসর আগে— তিনি নিজেই বলছেন— সে কথা তাঁর মনেও আসত না। কিন্তু আজ এসেছে। সে হল বিজ্ঞানের কথা ততটা নয়, নবজীবনের বেদনাই তাতে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। "কি করে আজকের সমাজকে মহাপুরুষদের বর্ণিত আদর্শ সমাজে পরিণত করা যায়?" এই তাঁর মূল প্রশ্ন। "কি করে সাধারণ ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিকে এবং অসাধারণ (ও অধিকমাত্রায় বিপজ্জনক) ক্ষমতালোভী ব্যক্তিকে মহাপুরুষ-বর্ণিত নিষ্কাম মানুষে পরিণত করা যায়, একমাত্র যাঁরাই আমাদের চেয়ে সার্থক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম?" এই হল এ যুগের, সব যুগের Sphinxএর জিজ্ঞাসা, সাধূনাং রাজ্যম্। এর সমাধান বা সদুত্তর আজও পাওয়া যায় নি।

অন্য ভাবে বলতে গেলে হাকসলি মানবপ্রত্যয়েরও প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যেতে পারেন নি। "সঙ্গত চিন্তার ফলেই সঙ্গত আচার সম্ভব হয়ে ওঠে।" আমরা যা-কিছু হয়ে উঠেছি সে সবই আমাদের চিন্তার ফল, হাকসলি ধর্মপদের বয়েৎটি পুনঃপুনঃ উদ্ধৃত করেছেন। ক্রান্তির যুগে দর্শনের প্রয়োজনকে এই সিনিকটি এড়িয়ে যেতে চান নি বা পারেন নি। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন: "আশ্চর্য আমাদের এই পৃথিবী, যেখানে মানুষ কতবার শুভকামনা করে পেয়েছে কেবল অশুভকে। সমগ্র ঘটনাধারার কি কোনো তাৎপর্য আছে? এর মধ্যে কোথায় মানুষের স্থান, এবং তার আদর্শ ও মূল্যবোধের সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যোগাযোগের স্বরূপই বা কি?…'প্র্যাকটিকাল' বা বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের কাছে এ জাতীয় প্রশ্ন অবান্তর ঠেকতে পারে। কিন্তু সত্যিই তা নয়। ভালো-মন্দের সম্পর্কে আমাদের ধারণা আমাদের সমগ্র ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করে, কেবল ব্যক্তিগত জীবনের নানা সম্পর্কের ক্ষেত্রে নয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বটে।" মতবাদের ক্ষেত্র থেকে অভ্যাসের বা আচারের দিকে অগ্রসর হয়ে 'গ্রে এমিনেন্সেস'এ তিনি স্বীকার বা নির্দেশ করেছেন যে "কিছু লোকের কাছে প্রায়ই, সকলের কাছেই কখনো-সখনো এসে থাকে বোধির বিদ্যুৎপ্রভা— যার আলোকে ক্ষণিকের জন্য হলেও জানা যায় সংসারের সত্য স্বরূপ, কাল ও বাসনাবোধ হতে মুক্ত চেতনার কাছেই ধরা দেয়

সে-আলো, অহং'এর বেদিতে ঈশ্বরকে উৎসর্গ না করলেও তাকে আমরাও জানতে পারি। অসতর্ক মুহূর্তে আসে সেই হঠাৎ-আলোর-ঝলকানি, তার পরেই প্রবল বাসনা ও দুর্ভাবনা এসে তাকে দ্রুত নিরস্ত করে, আলোক পরাজিত হয় আমাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের অন্ধ নীতি ও শয়তানি মতলবের কাছে।" কিন্তু যদি—এবং হাকসলির মনে সে সন্দেহ বহুবার এসেছে—জীবনের কোনো অর্থ থেকে থাকে? তা হলে? তা হলে জীবনধারার আমূল পরিবর্তন—ধর্মসাধনায় যাকে কনভারশন্ বলে—ছাড়া আর কি গতি আছে? 'আইলেস ইন গাজা'র নায়ক, অ্যাণ্টনি বীভিস, লেখকের দ্বিতীয় সত্তা, ব্যাপারটিকে অল্প কথায় বলেছেন: "বেঁচে থাকার যদি কোনো সার্থকতা থাকে, তা হলে তার পক্ষে এই দায়িত্বহীন জীবনযাপন করা আর সম্ভব নয়।"

হাকসলির লেখায় ও জীবনের মূলে আছে এই দ্বন্দ্ব, আত্মজিজ্ঞাসা বা বেছে-নেওয়ার দায়। তাঁর প্রতিটি নায়ক, অনায়কোচিত নায়কেরাও বাদ যাবেন না, তত্ত্বজিজ্ঞাসাপীড়িত জীব। তাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ, ডেনিস ('ক্রোম ইয়েলো') "সংসারভারে পীড়িত"। 'অ্যাণ্টিক হে', যা যুদ্ধোত্তর শূন্যগর্ভ দুনিয়ার প্রতিচ্ছবি হিসাবে প্রসিদ্ধ, শেষ হয়েছে একটি মূল জিজ্ঞাসার রেশ নিয়ে। গামব্রিল জুনিয়ার আগাগোড়া ভাঁড়ামি করে কাটিয়েছে, কিন্তু বইয়ের শেষে সে যে ইঙ্গিত রেখে গিয়েছে তা অনেকের চোখে এড়িয়ে যায়। সে বলছে: "এক এক সময়ে আমার মনে হয়েছে আমি একদিন সাধু বনে যাব। ব্যর্থ সাধু, ক্ষীণ দীপশিখার মতোই, নিবে যাবার আগে।" 'ভোজ ব্যারেন লীভজ়'এ আত্মিক উদ্দেশ্য আরো স্পষ্ট, সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে। "তার নিজের জীবনধারা বদলানো দরকার," ক্যালামির স্বগতোক্তি চলছে, "সে কথা তার জানা ছিল। একটা অন্য-কিছু করা তার পক্ষে নিতান্ত দরকার। অথচ এই ব্যাপারটিতে তার তরফে ছিল প্রচুর আপত্তি। কিন্তু এই প্রয়োজনবোধ মোটেই বাইরে থেকে আসে নি, বরং তার ব্যক্তিত্বের সব চেয়ে বিচক্ষণ সত্তাই তাকে বুঝিয়েছিল সে কথা।" উপসংহারে দেখি ক্যালামির আধুনিক অভিনিষ্ক্রমণ, স্বেচ্ছায় আত্মনির্বাসন, পর্বতগুহায় ছ মাসের সাধনা বা 'একস্‌পেরিমেণ্ট উইথ ট্রুথ'। 'পয়েণ্ট কাউণ্টার পয়েণ্টে' তত্ত্বকে যথাসাধ্য পরিহার করে চললেও সংগীতের সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ হয়েছে একাধিকবার। আর এই বোধ এসেছে যাদের কাছে তাদের একজন স্প্যাণ্ড্রেল—ডস্টয়ভেস্কির পাতা থেকে উঠে আসা শয়তান চরিত্র—যার মতে "ঈশ্বরকে অস্বীকার করা তাঁকে জানবার আর-এক উপায়।" 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড'এর অসভ্য নায়ক, স্যাভেজ, যে ধরণের ভাবালু রহস্যবাদের কথা বলেছে তার সঙ্গে লেখকের সহানুভূতি অনুমান করা কঠিন নয়। 'আইলেস ইন গাজা'য় অ্যাণ্টনি বীভিস অধ্যাত্মবাদী ও অহিংসপন্থী এবং অতীত জীবনকে মুছে ফেলে, সেই সাধনায় ব্রতী হবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। 'আফটার মেনি এ সামার'এ প্রপ্টার তত্ত্বজ্ঞানবিভূষিত এবং ধর্মীয় জীবন যাপনে যথার্থ উৎসাহী। 'টাইম মাস্ট হ্যাভ এ স্টপ'এও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার প্রাচুর্য। 'আইল্যাণ্ড'এ তন্ত্র, মহাযান ও আধুনিকতার চমৎকার হাকসলীয় সংমিশ্রণ, বলতে গেলে 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড'এর উলটপুরাণ। আগাগোড়া আত্মানুসন্ধান বা সত্যানুসন্ধানের এক দীর্ঘ পত্রযাত্রা।

মোট কথা হাকসলি তাঁর পুরোনো মতবাদ বা রচনার ভোল পালটেছেন। প্রথমে দেখি জড়বাদী বা বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রভাব, কোনো রকম আদর্শবাদী সুর বা ব্যাখ্যাকে প্রশ্রয় না দেবার প্রগল্ভ

চেষ্টা। অভিজ্ঞতার কোনো রকম প্রকারভেদ মানতে রাজি নন তিনি: one fact is as good as another, এই ছিল তাঁর বক্তব্য। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি আমাদের বেশ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, সে সব 'ফ্যাক্টস' একজাতের হলেও ব্যাখ্যা হিসাবে জড়বাদী বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রতিই তাঁর সহজাত পক্ষপাত। এর পরে, কিছুটা লরেন্সের কিছুটা বিপরীতের আকর্ষণে, চলল প্রাণ ও বৈচিত্র্য -পূজার পর্ব। এই মেজাজের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যাবে 'ডু হোয়াট ইউ উইল' প্রবন্ধ-সংকলনে। এত সতেজ, যৌবনোচ্ছল বই তিনি আর কখনো লেখেন নি। কিন্তু তত্ত্বকে এড়ানো কঠিন, হালকা রচনা ও উপন্যাসের ফাঁকে ফাঁকে ধরা পড়েছে সে কথা, হাকসলির মনন চলেছে গভীরের দিকে।

ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিল বিশ্ব বা ইউরোপীয় পরিস্থিতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই তিনি সে কথার আভাস পেয়েছিলেন। 'এণ্ডস অ্যাণ্ড মীনস'এ আত্মকেন্দ্রিক ভাববিলাসের পরিবর্তে আধুনিক চিন্তা ও সমাজব্যবস্থা, বিশেষ করে যুদ্ধের প্রস্তুতির পটভূমিকায়, হাকসলি এক নূতন ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। বিশুদ্ধ সাহিত্যামোদীদের মধ্যে 'হায় হায়' রব উঠল! হাকসলি অসাহিত্যিক তত্ত্বের পথে পা বাড়িয়েছেন! এই সময়ে অহিংসনীতিতে তাঁর আস্থা হাকসলি খোলাখুলি ভাবে ব্যক্ত করেন তাঁর লেখা ও বক্তৃতার সাহায্যে। বলা বাহুল্য, দেশবাসীর কাছে সে বাণী শ্রুতিমধুর হয় নি। এবং কিছুকাল পরে তিনি আমেরিকা চলে যান এবং হলিউডবাসী হন। সেখানে থাকাকালীন রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা হয় ও তিনি স্বামী প্রভবানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরে মাদক বা ড্রাগ ব্যবহার নিয়ে মিশন-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য ঘটে, যার আভাস কর্তৃপক্ষ লেখককে দিয়েছিলেন। তাঁর পালাবদলের স্মারক হিসাবে ধরতে পারি 'ডু হোয়াট ইউ উইল', 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড', 'এণ্ডস অ্যাণ্ড মীনস', 'পেরেনিয়াল ফিলসফি' এবং 'ডোর্স অব পারসেপশন্',— প্রাণপূজারী, ব্যঙ্গবীর, সিরিয়াস, মরমীবাদী ও ড্রাগ-পৃষ্ঠপোষক হাকসলির পঞ্চমুখ।

হাকসলির বই, বলা হয়ে থাকে, মানবজীবনের চাইতে এনসাইক্লোপিডিয়ার কাছে অধিকতর ঋণী। কিন্তু 'এণ্ডস অ্যাণ্ড মীনস' ও 'পেরেনিয়াল ফিলসফি'তে সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে আধুনিক জীবন ও মননের সমস্যা উত্থাপিত করার কাজে তাঁর দক্ষতা ও আন্তরিকতা কেউই অস্বীকার করবেন না।

এই হল মোটামুটি অলডাস হাকসলির সর্বগৃধ্নু পল্লবগ্রাহী প্রতিভার পরিচয়; ভাবের দিক দিয়ে যাঁর স্বাজাত্য বানিয়ানের সঙ্গে ও বুদ্ধিবিচারে যিনি ভলটেয়ারের সহোদর। তাঁর নিজের কথাতে বলতে গেলে, "বর্তমানে সর্বত্র অশুভ ও নির্বুদ্ধিতার জয়জয়কার ঘটছে, এক পুরুষ ধরে সভ্য মানুষ নিজের হাতে কেবলই হেরে এসেছে।" এ যুগের শিল্পী ও চিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে খুব কম লোকেই তাঁর মত 'মানসিক যুদ্ধ' বা প্রতিবাদ চালিয়ে গেছেন। তাঁর মৌলিক সিরিয়াসনেস্, দৃষ্টিভঙ্গীর আবেগ ও গুরুত্ব অস্বীকৃত হবার নয়।

তিনি চেয়েছেন ইতিহাসের পাপচক্র থেকে শাশ্বতীতে সরে আসা এবং অপরকেও দিয়েছেন সেই প্রাচীন সুপরামর্শ; কালাতীতের সাহায্যে কালজয়ের প্রয়াস তাঁর অধিকাংশ শেষের লেখায়। সে দিক দিয়ে তাঁকে সাম্প্রতিক বলি কি করে? অথচ এ বিষয়ে কোনো অবকাশ নেই যে সভ্যতার সংকটের প্রধান তিনটি সমস্যা—যুদ্ধ, বিদ্রোহ ও ধর্মবোধ—নিয়ে হাকসলির মতো এত বেশি

ভেবেছেন কম লেখকেই। তিনটির উপযুক্ত সমাধান দিতেও চেষ্টা করেছেন হাকসলি, অবস্থাবিপাকে পরিহাসরসিককে তত্ত্বদর্শীর ভূমিকা নিতে হয়েছে।

হাকসলির বক্তব্য বেশ সরল এবং সে কথা তিনি বহুবার বলেছেন। "লড়াই কোনোদিন থামবে না," 'পেরেনিয়াল ফিলসফি'তে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল, "যতদিন পর্যন্ত না, প্রথমতঃ, আমরা সবাই এক সত্য জীবনদর্শনে বিশ্বাস করি; দ্বিতীয়তঃ, এই শাশ্বত দর্শনকে বিশ্বের নানা ধর্মের সার বলে স্বীকার করি; তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক ধর্মের লোকেরা তাঁদের বিশেষ ধর্মবোধ ও ধ্রুবচেতনাকে যে কালভাবনার দ্বারা আকীর্ণ হয়েছে তাকে পরিহার করেন; চতুর্থতঃ, যতদিন না সারা বিশ্ব প্রত্যাখ্যান করে রাষ্ট্রনৈতিক সেই নকল-ধর্ম, যাতে 'পুরুষার্থ ভবিষ্যতে চরিতার্থ হবে' এই ওজর দেখিয়ে বর্তমানের সর্বপ্রকার অন্যায় ও জুয়াচুরির সপক্ষাচরণ করা হয়ে থাকে। এই-সব শর্ত পালিত না হওয়া অবধি, যা-কিছু রাজনৈতিক প্ল্যানিং বা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, তা যত বিচক্ষণতার সঙ্গে সম্পাদিত হোক-না কেন, তাতে যুদ্ধ ও বিদ্রোহের পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব হবে না।" তাঁর নিজের প্রস্তাবগুলির ব্যাপারে তিনি দ্রুত, আশ্চর্যজনক বা দূরপ্রসারী ফল কিছু আশা করেন নি। "সফলতার স্বপ্ন আমার নেই। আমি ঠিকমত কাজ চালিয়ে যেতে পারলে আরো দু চার জন যোগ দিতে পারেন এই যা," প্রপ্টার বলছে নিজের জীবনদর্শন সম্বন্ধে।

শেষ পর্যন্ত হাকসলির মূল বক্তব্য বা বিষয় সহজ ও সনাতন; মুক্তি বা উদ্ধার লাভ এই তাঁর ব্রত। বুদ্ধের ক্ষুদ্র সংস্করণ বা গ্যেটের চেয়ে কম তুঙ্গী, তিনি কলিকালের পীড়িত বুদ্ধিজীবী; বুদ্ধি যাঁকে শান্তি বা সান্ত্বনা দেবার কাজে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, আধুনিক বিষবৃক্ষের ফলের চেহারা দেখেই তিনি সেই অজ্ঞান-মহীরুহের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। এই তত্ত্বপ্রবণতা বা নিস্পৃহ স্বর—তাঁর সমস্ত আধুনিকতাকে ছাপিয়ে এক বিশেষ দূরত্ব এনে দিয়েছে তাঁর বেশির ভাগ লেখায়। অনেকে মনে করেন মানবহৃদয়ের সঙ্গে বিযুক্ত এই মনীষীর রচনা এ যুগে বিদগ্ধ মহলে কিছুকালের জন্য আদৃত হলেও এর বিশুদ্ধ সাহিত্যমূল্য ধোপে টিঁকবে না। তিনি তাঁর নিজের বর্ণিত ব্রাহ্মণই বটে, "মানুষের মূল তাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাই যার অবলম্বন।" কিন্তু, অনেক সময় সন্দেহ হয়, ব্রাহ্মণটি যে কেবল বিবিক্ত তাই নয়, সমন্বয়ের চাইতে নেতির দিকেই তাঁর ঝোঁক বেশি। অন্যভাবে বলতে গেলে দার্শনিকদের যে চিরন্তন দুর্বলতার বিরুদ্ধে তিনি এককালে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন হাকসলি নিজে কি সেখানে কলঙ্কশূন্য? আজ যে মতবাদ তিনি নানা স্বরে ফিরি করে চলেছেন তা কি মুখ্যতঃ 'সন্ন্যাসীদের বন্ধ্যা মতবাদের'ই রকমফের নয়, যার বিরুদ্ধে এককালে উদ্ধত হয়েছিল সেই শাণিত লেখনী? মায়াবাদী অদ্বৈতের তরফে তিনি যে কথা বলেছেন তাতে তো সে সন্দেহ না হয়ে উপায় নেই। অপরের দর্শনকে ধূলিসাৎ করার উদ্দেশ্যে তিনি যে-জাতীয় কঠোর সমালোচনা প্রয়োগ করেছেন তাঁর নিজের এককালীন বৈচিত্র্যবোধ, লরেন্সীয় প্রাণপূজা ও পরবর্তী লেখার 'কালাতীত শিব' ও শান্তি, ধর্মবোধ, অহিংস নীতি ও সনাতনী দর্শনের বিরুদ্ধেও সে জাতীয় সমালোচনা হওয়া সম্ভব ও হয়েছে। যে অস্ত্র তিনি অপরের বিরুদ্ধে নিক্ষেপ করেছেন, সে অস্ত্রে তিনি নিজেই সহজে বিদ্ধ হতে পারেন। ভিন্ন মতাবলম্বীরা তাঁর পলায়নী মনোবৃত্তির সমালোচনা করতে দ্বিধা করেন নি।

এ কথা বোঝা সহজ যে হাকসলি যে সত্যের দিকে ফিরেছেন—বা পশ্চাদপসরণ করেছেন—তার

বেশ কিছুকেই ব্যাপ্ত করে আছে আত্মভীতি ও অস্বাচ্ছন্দ্য, বিশেষ করে এক অসহিষ্ণু ঘৃণাবোধ। কিন্তু যতক্ষণ কোনো-কিছুকে ঘৃণার চোখে দেখা যায় ততক্ষণ তাকে বোঝা বা তার প্রতি সুবিচারের আশা কম। এই বোধ হয় বুদ্ধিজীবীর ধর্মের প্রধান ত্রুটি বা অপরাধ— সেখানে প্রেমের স্থান নেই। প্রেমের মহিমা সম্পর্কে হাকসলি মাঝে মাঝে শাস্ত্রীয় ফতোয়া দিলেও এ বিষয়ে পাঠকের অবিশ্বাস থেকেই যায়। মানুষ সম্বন্ধে হাকসলির রয়েছে ভয় ও লজ্জা। কাল ও রক্তমাংসের মানুষ দুয়েতেই তাঁর ঘোর আপত্তি। এককালীন প্রাণ-পূজারী অবর্ণের বেদিতে লীলাবৈচিত্র্যকে নিঃশেষ করতে চান, বৈপরীত্যের এ এক আশ্চর্য নিদর্শন। পাস্কালকে মৃত্যু-উপাসক আখ্যা দিয়েছিলেন হাকসলি। তিনি নিজে কি? প্রেমই ঈশ্বরের স্ব-ভাব ও পরিমাপ বলেছেন জালালুদ্দীন রুমি, হাকসলি সে কথা অনুমোদন করেন। কিন্তু তাঁর নিজস্ব রচনার মূল সুরটি একেবারে ভিন্ন। ভালোবাসার সেই সত্য, কি মানবসম্পর্কে ও দিব্যবিভাবে, সে তাঁর আয়ত্তের বাইরে। এবং এই অভাবের ফলেই হাকসলীয় সাহিত্য, সেই উজ্জ্বল টীকাটিপ্পনী, শেষ পর্যন্ত এক নিষ্প্রভ, নঙর্থক দৃষ্টিভঙ্গীর সু-উচ্চ নমুনা, ব্যর্থতার দর্শনের পুনরাবৃত্তি। ভয় হয় এই আত্মবিরোধী লেখক সৃষ্টির চাইতে বুঝি ধ্বংস করেছেন বেশি। ব্যঙ্গলেখককে নিজের অস্ত্রে ঘায়েল করা মোটেই কঠিন নয়। সাধুমহাপুরুষদের মহিমা যাঁর জীবনদর্শনের অবলম্বন, তাঁর নিজের মুক্তি ছিল না কাম ক্লেদ ও বীভৎস ব্যর্থতা থেকে। পূর্ণ দৃষ্টির প্রয়াসী হতে পারেন তিনি, সুস্থ দৃষ্টির অধিকারী নন।

কিন্তু তাঁর ত্রুটির কথা না বললেও চলবে। তাঁর সঙ্গে মতের মিল না হলেও তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করায় বাধা নেই। আমরা এই নব্য-যোগীকে এবং রাসায়নিক মাদকদ্রব্যের সাহায্যে তাঁর কৃত্রিম স্বর্গ -সুখভোগের প্রবৃত্তিকে সহাস্যে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারি; তাঁর সংস্কারপাকপ্রণালী ("cook-book of reforms"), তাঁর যুগধর্মী ব্যাখ্যানের সঙ্গে একমত না হতে পারি— তবু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, হাকসলির সাহিত্য ও জীবনজিজ্ঞাসা সমরোত্তর যুগের এক চমকপ্রদ ও শিক্ষণীয় আলেখ্য। সমন্বয়ধর্মী দর্শন— যেমন হাকসলি চেয়েছিলেন ও শেষ অবধি সার্থক হন নি সে চেষ্টায়— পেশ করা শিল্পীর প্রধান কর্তব্য নাও হতে পারে। (খুব কম লেখকেই শেকসপীয়রের 'দর্শন' নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন।) 'ব্যক্তিসত্তার সামগ্রিক সুসঙ্গতি' সাধন তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি, যেমন হয় নি তাঁর মাতামহ ম্যাথু আর্নল্ডের পক্ষে, যিনি কথাটি প্রথম নতুন করে ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু হাকসলিকে তাঁর মতামত দিয়ে বিচার করতে যাওয়াই যথেষ্ট নয়। বরং দেখতে হবে তিনি আমাদের অনুভব ও মননে, সাহিত্যবোধে ও যুগচেতনায় কি কি বিশেষ রকমের ব্যাপ্তি এনে দিয়েছেন, আমাদের নিজেদের ও যুগকে বুঝতে কতটা সাহায্য করেছেন। সে দিক দিয়ে তাঁর কাছে আমাদের ঋণ অপরিসীম। যদিও অনেকে মনে করেন আজ আর তিনি শিল্পী ঔপন্যাসিক নন— হয় তো কোনো দিনই ছিলেন না— তবুও তাঁর মতো ব্যাপক বুদ্ধিসম্পন্ন লেখক এ যুগে কেন, যে-কোনো যুগেই বিরল। চরিত্রাঙ্কনে তাঁর কৃতিত্ব না থাকলেও একটি গোটা যুগ বা যুগসন্ধিক্ষণের ছবি তাঁর সমগ্র জীবনরচনায়। প্রত্যেক শিল্পী যদি হন কালের বিবেক তা হলে অলডাস হাকসলি আধুনিক-মানুষের বিবেক, সে বিবেক খুঁজছে আত্মস্বরূপকে, তা সে মাদকদ্রব্য বা মরমীবাদ যার সাহায্যেই হোক-না কেন। মাদকদ্রব্যের মারফত দিব্যানুভূতি সেই অসমসাহসী অ্যাডভেঞ্চারে তিনি নেমেছিলেন, বামাচারী আধুনিককালের এও একটি দিক। একেও বুঝতে হবে। আর এ কথাও যদি সত্য হয় যে হাকসলি-হৃদয়ে 'শিল্পী ও মরমীবাদীর সংগ্রাম অক্ষয়' তা হলে সে দিক

দিয়েও তাঁর গুরুত্ব বা নিজস্বতা ক্ষুণ্ণ হবার নয়। নানা আইডিয়া ও অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তিনি স্বধর্ম-পালনে পরাঙ্মুখ হন নি, সেই চিরজাগ্রত কৌতূহলী মন কোথাও কখনো— রসাতলের পথেও— থেমে যায় নি। 'সাধ সংগ্রাম হৈ রৈন দিন জুঝনা'!

তাঁর নিজের কথাতেই "এ যুগের যে একান্ত নিজস্ব ব্যাধি— দ্বৈধ সত্তা" (schizophrenia), তার ডাক্তার ও রোগী হলেন অলডাস হাকসলি। মানবীয় দুর্বুদ্ধি ও সমাধির প্রশান্তি, বিজ্ঞান ও যোগ, মরমীবাদ ও মাদকদ্রব্য ব্যবহারের তাত্ত্বিক দিক, এই সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে চলেছে হাকসলির বিচিত্র অন্তহীন অনুশীলন। আত্মবোধের উপায় বা সোপান হল শিল্প। অলডাস হাকসলি, জীবনের শেষক্ষণ অবধি, শিল্পের এই হারানো সূত্রটিকে খুঁজেছেন, নিরলস চেষ্টা করেছেন অভিশপ্ত শতাব্দীর শূন্য কলসির ছিদ্র বুজিয়ে দিতে সার্থকতার ব্যর্থ তীর্থযাত্রী। তিনি চিরদিনই থাকবেন চ্যালেঞ্জ ও সতর্কবাণীর মতো, সর্বপ্রকারের অসত্য ও অর্ধ-সত্য এবং 'এক ডোজ ক্যালোমেলের মতো বাইরে থেকে মুক্তির উপায়' বা বিশ্বসত্যকে, বা কর্মচক্রকে অগ্রাহ্য করে বেরিয়ে আসার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ হিসাবে।

অনেকের পক্ষে তাঁকে বাদ দিয়ে আধুনিক সাহিত্য কল্পনা করা কঠিন। একটি অভ্যস্ত কণ্ঠস্বর ও আস্বাদন থেকে বঞ্চিত হলাম আমরা। ভাবা কঠিন যে তিনি নেই— বিচিত্র ও বিরাট মনন ও শিল্প -চাতুর্যের অধীশ্বর, আত্মবিরোধে জর্জর, সব সময়ে চমক লাগাবার ক্ষমতা যাঁর অদ্বিতীয়, ইংরেজ লেখকদের মধ্যে উচ্চতায় দীর্ঘতম, যাঁর রচনায় ছিল সব সময়েই শ্যাম্পেনের স্বাদ, 'for ever champagne'; যিনি লোককে নতুন করে ভাবিয়ে তুলতে জানতেন, উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর যাঁর মনীষা, বিদগ্ধ ব্যথিত সেই শান্তিকামী লেখক যিনি নিজে কখনও শান্তি পান নি, বিদ্রূপসিদ্ধ বেদনাহত অলডাস হাকসলি : Born under one law, to another bound, বৈপরীত্যের সাধনায় যাঁর কেটেছে সারা জীবন। সে কি শুধু তাঁর?

রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃত গল্প

অশ্রুকুমার সিকদার

আমরা কবিজীবনী ও পরিজনবর্গের স্মৃতিকথার সাক্ষ্য থেকে অতিপ্রাকৃতে রবীন্দ্রনাথের যে বিশ্বাস ছিল তার বহু প্রমাণ পাই। রবীন্দ্রজীবনীকার উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে জানিয়েছেন, "বাল্যকালে ও যৌবনে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্লানচেট লইয়া বহুবার পরীক্ষা করিয়াছিলেন— কখনো কৌতুকছলে, কখনো কৌতূহলবশে।" রবীন্দ্রনাথ নিজেও জীবনস্মৃতির 'বিলাত' অধ্যায়ে ডাক্তার স্কটের গৃহে এক-এক দিন সন্ধ্যাবেলায় 'টেবিল-চালার' গল্প লিখে গেছেন। বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত একটি পত্রেও [চিঠিপত্র ৮ পত্রসংখ্যা ১৭৩] তাঁকে প্লানচেট সম্বন্ধে আলোচনা করতে দেখি। কৈশোর-যৌবনের সেই কৌতুককৌতূহলপূর্ণ ব্যাপারকে যদিও পরবর্তীকালে তিনি 'ছেলেমানুষি কাণ্ড' কিংবা 'অনাচার' বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন, তবু দেখা যায় পরিণত বয়সেও তিনি অতিপ্রাকৃত জগৎ সম্বন্ধে নূতন করে আগ্রহ অনুভব করেছিলেন। মোহিতচন্দ্র সেনের কন্যা উমা দেবী, বুলার মধ্যে অতিপ্রাকৃত মিডিয়ম শক্তি লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ সেই সুযোগ সাগ্রহে গ্রহণ করেন এবং বুলার মাধ্যমে অপরিদৃশ্যমান অতিলৌকিক জগতের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টায় তৎপর হন। বুলার অকাল-মৃত্যুর পর অমল হোম ও মৈত্রেয়ী দেবীর নিকট রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি লেখেন তাতে পরলোক ও মৃত্যুর পরপারের জগৎ সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাসের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বুলার শ্রাদ্ধবাসরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "তার [বুলার] আত্মিক শক্তি ইহলোক পরলোকের মাঝখানে আত্মীয়তার সেতু রচনা করে আছে।" মৈত্রেয়ী দেবীর নিকট লিখিত পত্রে তিনি দুই রকম অস্তিত্বে বিশ্বাসের কথা বলেছেন ; এক, 'মর্ত্যশরীরের অবস্থা', অপরটি, 'এ শরীরের অতীত অবস্থা'।

নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা 'পথে ও পথের প্রান্তে'র ৪৪ সংখ্যক পত্রে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ শুধু যে 'শরীরের অতীত অবস্থায়' বিশ্বাসী তাই নয়, তিনি সেই বিশ্বাসকে যথাসাধ্য যুক্তি দিয়ে সমর্থনের চেষ্টা করছেন। তিনি এই পত্রে বলেছেন, মিডিয়মের মাধ্যমে যে আসে সে সত্যই আসে কি না, তার সত্যই অস্তিত্ব আছে কি না তার 'অতি নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া সম্ভব নয়'। মিডিয়মের মাধ্যমে যে আসে তার ব্যক্তিত্বের ছবি থেকে তার অস্তিত্ব অনুমান করা যায় এবং "এই ব্যক্তিত্বের সাক্ষ্যই সব চেয়ে সত্য সাক্ষ্য, কেন না এটাকে কেউ বানাতে পারে না।···আত্মার চরম সত্য তথ্যে নয়, আত্মার আত্মকীয়তায়।" এই দেহাতীত অতিপ্রাকৃত অস্তিত্বের উদাহরণ তিনি ঐ চিঠিতে দিয়েছেন— "ইতিমধ্যে পর্শু বুলার হাতে একটা লেখা বেরিয়েছে তাতে নাম বেরোল না। বললে, নাম জিজ্ঞাসা কোরো না, তুমি মনে যা ভাবছ আমি তাই। তারপরে যেসব কথা বেরোল সে ভারি আশ্চর্য। তার সত্যতা আমি যেমন জানি আর দ্বিতীয় কেউ না।" রবীন্দ্রজীবনীকারের মতে 'কবির অদৃশ্যলোকের এই রহস্যময়ী তাঁহারই বৌঠাকুরানী কাদম্বরী দেবী'। 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ থেকে জানা যায় কবি মৈত্রেয়ী দেবীকে বলেছিলেন, কাদম্বরী দেবীর দেহাতীত সত্তা নাকি লিখেছিল, 'বোকা ছেলে, এখনো তোমার কিছু বুদ্ধি হয় নি'। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য— 'এ কথা এমনি করে তিনিই আমায় বলতে পারতেন'। নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত অপর একটি চিঠিরও (দেশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রিকার ২৭ মে ১৯৬১ সংখ্যায় প্রকাশিত ১৫৫ সংখ্যক পত্র) বিষয়বস্তু এক— বুলার মিডিয়মশক্তির সাহায্যে পরলোকবাসীদের সঙ্গে ভাব-বিনিময়। চিঠিতে দেখা যাচ্ছে, প্রথমে এলো মণিলালের দেহাতীত সত্তা, তার পর সত্যেন, তার পর অজিত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সর্বশেষে সাহানা ও বলু। নতুনদাদার অদৃশ্য সত্তা বলল আত্মসৃষ্টির কথা, শূন্য অসীম আকাশের কথা এবং শেষে অনিবার্যভাবে এলো বৌঠানের কথা, তাঁর পার্থিব আকর্ষণের কথা। এই পত্রেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসকে যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছেন, বিজ্ঞানের দোহাই তুলে মন্তব্য করেছেন, "দেহহীন আত্মা কি রকম এবং তার চিত্তবৃত্তি কি ভাবের, কল্পনা করা কঠিন। কিন্তু আজকালকার বিজ্ঞান মানলে দেহটাই যে কেন বস্তুর মতো প্রতীত হয় সে রহস্য ভেদ করা যায় না।— বস্তুর মূলে অবস্তু, অর্থাৎ সম্পূর্ণ অনির্বচনীয় পদার্থ; এই মায়াকে যদি জানতে পারি তবে দেহহীন সত্তাকেও মানতে দোষ নেই, অবশ্য যদি তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আজকাল প্রমাণ সংগ্রহ চলছে, এখনো সর্বসম্মত বিশ্বাসে পৌঁছোয় নি।"

পরিণত বার্ধক্যেও রবীন্দ্রনাথ অতিপ্রাকৃত রহস্যলোক সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাসকে নানা ভাবে সমর্থন করেছেন। 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের সাক্ষ্যে জানা যায় রবীন্দ্রনাথ লেখিকাকে মিডিয়ম-শক্তির মাধ্যমে কাদম্বরী দেবী ও শমীন্দ্রনাথের দেহাতীত সত্তার আবির্ভাবের কথা বলেছিলেন। নতুন বৌঠানের উক্তি আগেই উদ্ধার করেছি; শমীন্দ্রনাথ বলেছিল, 'আমি বৃক্ষলোকে আছি সেখানে, এক নতুন জগৎ সৃষ্টি করছি'। এই উদাহরণ দিয়ে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, পৃথিবীতে কত কিছু তুমি জানো না, তাই বলেই সেসব নেই? কতটুকু জানো? জানা এতটুকু, না-জানাটাই অসীম— সেই এতটুকুর উপর নির্ভর করে চোখ বন্ধ করে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া চলে না। আর তা ছাড়া এত লোক দল বেঁধে ক্রমাগত মিছে কথা বলে, এ আমি মনে করতে পারি নে। তবে অনেক গোলমাল হয় বৈকি। কিন্তু যে বিষয়ে প্রমাণও করা যায় না, অপ্রমাণও করা যায় না, সে সম্বন্ধে মন খোলা রাখাই উচিত। যে-কোনো এক দিকে ঝুঁকে পড়াটা গোঁড়ামি।" ক্ষুধিত পাষাণ গল্পের নবপরিচিত আলাপীটিও এই একই যুক্তি দিয়েছিল— 'There are more things in heaven and earth, Horatio, than are reported in your news papers'।

প্রবাসেও এই রহস্যময় চিন্তা তাঁকে যে বিভিন্ন সময় চিন্তিত করেছিল তার কিছু পরিচয় মৈত্রেয়ী দেবী 'বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। এডিসন-নির্মিত কোনো যন্ত্র মৃত্যুর পরে সত্তার অস্তিত্ব নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে শুনে তিনি মন্তব্য করেছিলেন— 'মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে আমার আশা ও বিশ্বাসের শেষ নেই— তবে মানুষের কাছে তার প্রমাণের জন্য আমি কোনো যন্ত্রের প্রয়োজন দেখি না'। জানতে পারি যে সমালোচক স্টপফোর্ড ব্রুকের সঙ্গেও এই বিষয়ে তাঁর আলোচনা হয়। পরলোকতত্ত্বে বিশ্বাসী বৈজ্ঞানিক অলিভার লজের সঙ্গে কবির যে সাক্ষাৎ হয় তার বিবরণ ১৯২৮ সালের straffordshire sentinel পত্রে নিবদ্ধ হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক লজ নাকি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনারা কি ভারতবর্ষে টেলিপ্যাথিতে বিশ্বাস করেন?" কবি নাকি বিস্মিত হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, "বিশ্বাস করি! আমরা প্র্যাকটিস করি।"

এই তথ্যাবলী থেকে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া বোধ হয় সম্ভব। প্রথমত, থিয়োসফি এবং অন্যান্য গুহ্যতত্ত্বের সংমিশ্রিত প্রভাবে ইয়েটস্ এর মধ্যে পূর্ব থেকে যে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস ছিল তা যেমন স্ত্রী

জর্জি হাইড-লীর মধ্যে মিডিয়ম-শক্তি আবিষ্কারের ফলে গাঢ়তর হয়, তেমনি 'ছেলেমানুষি' বলে উড়িয়ে দিলেও কৈশোরে ও যৌবনে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস ছিল তা উমাদেবীর মিডিয়ম-শক্তি আবিষ্কারের ফলে আরও প্রবলতর হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, মানুষের কোনো বিশ্বাসের ভিত্তি যখন যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয় তখন মানুষ সেই বিশ্বাসকে অতিরিক্ত জোরের সঙ্গে সমর্থন করে এবং এই পুনঃপুন আত্মপক্ষ সমর্থন তার বিশ্বাসের ভিত্তির দৌর্বল্যই প্রমাণ করে। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ও কথোপকথনের মাধ্যমে বারংবার যে অতিপ্রাকৃতলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাসের কথা জোর দিয়ে বলেছেন, কখনো বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে, কখনো অন্য যুক্তির অবতারণা করে তাতে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে কখনো নিঃসংশয় হতে পারেন নি— প্রবল বিশ্বাসকে মন থেকে দূর করতে পারছেন না। অথচ তাকে যুক্তিনিষ্ঠ বলে সম্পূর্ণ মেনে নিতেও পারছেন না। তাই কখনো বলছেন, প্ল্যানচেট ইত্যাদি 'ছেলেমানুষি কাণ্ড' 'অনাচার', আবার কখনো বুলার পেন্সিলের দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে রয়েছেন। তৃতীয়ত, এই অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের মানসিকতায় ছিল বলেই তিনি তার সঙ্গে, পো-র *Tales of Mystery and Imagination*-এর মতো দুর্মর রোম্যান্টিক কল্পনা— যা অপরিদৃশ্যমান, কালগত ও দেশগত সুদূর, অস্বাভাবিক ও রোমাঞ্চকরে উৎসাহ পায়— সেই রোম্যান্টিক কল্পনাকে যুক্ত করে গল্পগুচ্ছের আশ্চর্য সার্থক অতিপ্রাকৃত কাহিনীগুলি লিখতে পেরেছিলেন।

এই অতিপ্রাকৃত কাহিনীগুলির মাত্র দুইটি, কঙ্কাল এবং জীবিত ও মৃতের জন্মকাহিনী পাঠ করলে সহজে বোঝা যায় অতিপ্রাকৃত রহস্যলোকের কল্পনা কবিচিত্তকে কতদূর পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে রাখত। নিশ্চয় তাঁর মনের গঠন এমন ছিল যার ফলে যে-কোনো অনুকূল পরিবেশে কল্পনার আশ্রয়ে সেই দ্বিতীয় অস্তিত্বে বিশ্বাস জাগ্রত হয়ে উঠত, তাই এমন অদ্ভুত ভয়াবহ সব ভাবনা তাঁর মনে জাগত। কঙ্কাল গল্পের জন্মকথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলে গেছেন, সীতা দেবীর 'পুণ্যস্মৃতি' গ্রন্থে তার অনুলিপি আছে। "ছেলেবেলা আমরা যে ঘরে শুতুম তাতে একটা মেয়ের skeleton ঝুলনো ছিল।…এক দিন কয়েকজন আত্মীয়া এসেছেন, তারা আমার ঘরে শোবেন, আমার উপর হুকুম হয়েছে বাইরে শোবার। অনেক দিন পরে আমি আবার সেই ঘরে এসে শুয়েছি। শুয়ে চেয়ে দেখলুম, সেজের আলোটা ক্রমে কাঁপতে কাঁপতে নিবে গেল। আমার মাথায় বোধহয় তখন রক্ত বোঁ বোঁ করে ঘুরছিল, আমার মনে হতে লাগল কে যেন মশারির চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বলছে, 'আমার কঙ্কালটা কোথায় গেল? আমার কঙ্কালটা কোথায় গেল?' ক্রমে মনে হতে লাগল সে দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে বন্ বন্ করে ঘুরতে আরম্ভ করেছে।" জীবিত ও মৃত গল্পের উৎস সম্বন্ধে 'পুণ্যস্মৃতি' ও 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থদ্বয়ে সামান্য তারতম্য থাকলেও মূলত উক্ত গল্পের জন্মকাহিনী দুই গ্রন্থেই এক— "সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ, কোথায় ঢং ঢং করে দুটো বেজে গেল। আমি থমকে দাঁড়ালুম; ভাবলুম, তাই তো, এই গভীর রাত্রে আমি সারা বাড়িময় এমন করে ঘুরে বেড়াচ্ছি! হঠাৎ মনে হল আমি যেন প্রেতাত্মা, এ বাড়ি haunt করে বেড়াচ্ছি। আমি যেন মোটেই আমি নয়, আমি'র রূপ ধরে বেড়াচ্ছি মাত্র। যে-আমি ছিলুম সে-আমি নয়, যেন আমার বর্তমান-আমিতে আর আমার অতীতে একটা ভাগ হয়ে গেছে।…মনে হল যদি পা টিপে টিপে ফিরে গিয়ে ছোটো বৌকে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়ে বলি— দেখো এ-আমি কিন্তু আমি নয়, তোমার স্বামী নয়, তাহলে কি হয়।…যা হোক তা করি নি। কিন্তু ideaটা আমাকে পেয়ে বসল, যেন একজন জীবিত মানুষ সত্যসত্যই

নিজেকে মৃত বলে মনে করছে— যেন একজন কেউ দিশাহারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেও মনে করছে, অন্য সকলেও মনে করছে যে, সে সে নয়।"

যে লোকের মানসিক গঠনে অতিপ্রাকৃত-কল্পনার প্রাধান্য থাকে, বা অল্পবিস্তর অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস থাকে একমাত্র সেই ধরণের মানুষেরমধ্যে এমন বিস্ময়কর অদ্ভুত ভাবাভূতি সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ ভূতের গল্প শুনতে ও শোনাতে ভালোবাসতেন। যাঁর ভূতের গল্প শোনার অতৃপ্ত আগ্রহে অনেক সময় রবীন্দ্রনাথকে মুখে মুখে ভূতের গল্প বানিয়ে বলতে হত তিনি কুচবিহার রাজ্যের মহারানী সুনীতি দেবী। দুরাশা গল্পটি সুনীতি দেবীর সঙ্গে দার্জিলিঙে পদচারণকালে মুখে মুখে রচিত হয়, মণিহারা গল্প ও মাস্টারমশাই গল্পের প্রথমাংশও সুনীতি দেবীর আগ্রহাতিশয্যে তৎক্ষণাৎ তৈরি করে বলেছিলেন। মাস্টারমশাই গল্পের জন্মেতিহাস নির্মলকুমারী মহলানবিশ- রচিত 'কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে' গ্রন্থে আছে। মহারানী রবীন্দ্রনাথকে নৈশাহারের নিমন্ত্রণ করেছিলেন এবং ভোজের পর যথারীতি তিনি ভূতের গল্প দাবি করে বসলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন মাস্টারমশাই গল্পের প্রথমাংশ মুখে মুখে বানিয়ে বললেন। "আমি থামতেই [মহারানী] বললেন, 'রবিবাবু, সত্যি ?' আমি গম্ভীর মুখে উত্তর করলুম, 'না, সত্যি নয়।' ঘর শুদ্ধ সবাই হো হো করে হেসে উঠল। মহারানী ছেলেমানুষের মতো দুঃখিত হয়ে কেবলই বলতে লাগলেন, 'রবিবাবু, এ গল্পটা কেন সত্যি হল না? সত্যি হলে বেশ হত'।" রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃত গল্প বোঝার পক্ষে এই স্বল্পায়তন রবীন্দ্র-উপাখ্যানটি আমার কাছে মূল্যবান প্রতীয়মান হয়। রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস সম্বন্ধে তথ্যপঞ্জী দেবার সময় দেখিয়েছি এই বিশ্বাস কেমন দ্বিধায় কম্পমান। বিশ্বাস প্রবল, অথচ বিশ্বাসের যুক্তি ও তথ্য -সম্বলিত ভিত্তি না থাকায় এই বিশ্বাস সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব বড়ো বেশি আত্মরক্ষামূলক। রোম্যান্টিক মন এই বিশ্বাসকে আরও বেশি উৎসাহিত করে, অথচ যুক্তিবাদী মন তাকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিতে পারে না। তাই সুনীতি দেবীকে ভূতের গল্প বলতে গিয়ে আশ্চর্য ভৌতিক দুঃস্বপ্নের পরিবেশে বিশ্বাস জাগিয়ে তোলেন অথচ পর মুহূর্তে যুক্তিবাদী মনের প্ররোচনায় সেই ইন্দ্রজাল ছিন্ন করে বলেন, 'না, সত্যি নয়'। নিজের বিশ্বাসের মধ্যেই দ্বিধা ছিল, অপরপক্ষে যেসব সামাজিক মানুষ অতিপ্রাকৃতকে অলীক বলে উড়িয়ে দিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসে তাদের সামনে এই বিশ্বাসকে প্রকাশ করতেও বোধ হয় তিনি কুণ্ঠাবোধ করেছিলেন। অন্তরে যা সযত্নে লালিত তাকে কেউ অবিশ্বাসীর পরিহাসের সম্মুখীন করতে সহজে রাজি হয় না। বোধ হয় এই কারণেই নিশীথে গল্পের দক্ষিণাচরণবাবু 'রাত্রির কুহকে, কাল্পনিক শঙ্কার মত্ততায়' যে কথা বলতে পেরেছিলেন, দিনের স্পষ্ট আলোয় তার জন্য তিনি লজ্জিত ও নিজের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন ; বিশেত তিনি জানতেন, তাঁর কাছে যে মনস্তাত্ত্বিক ঘটনা যন্ত্রণাদায়ক সত্য, গল্পের অবিশ্বাসী ডাক্তার-শ্রোতার কাছে তা মদ্যপানের আতিশয্যের ফল মাত্র। যে কারণেই হোক, অতিপ্রাকৃতে নিজের বিশ্বাস-বিষয়ে দ্বিধার দরুণ হোক কিংবা অবিশ্বাসীর কাছে নিজের বিশ্বাস গোপন করার প্রয়োজনে হোক, তিনি রোমাঞ্চকর ভূতের গল্প বলেছেন এবং বলেই আবার জানিয়ে দিয়েছেন, 'না, সত্যি নয়'। 'ঘর শুদ্ধ সবাই হো হো করে হেসে' উঠলো— এরা সেই অবিশ্বাসীর দল যাদের কাছে নিজের গোপন বিশ্বাসকে গোপন রাখার জন্য গল্পকার পরিণামে পরিহাসের ভাষায় কল্পনার সাতরঙ মুছে দিয়ে গেছেন। নিজেই বিশ্বাস উৎপাদনের পর অবশেষে এই রকম অবিশ্বাসীর মতো মন্তব্য করায় বুদ্ধিসর্বস্ব সামাজিকেরা

মনে করতে পারে রবীন্দ্রনাথও বুঝি তাদের মতো বর্জিত-বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথ নিজের কৈশোর ও যৌবনের টেবিল-চালাকে যেমন 'ছেলেমানুষি' বলেছেন, তেমনি সুনীতি দেবীর অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসকে, রোমাঞ্চিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে 'ছেলেমানুষের মত' ব্যাপার বলে, আপাতদৃষ্টিতে, উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পরিণত বার্ধক্য পর্যন্ত অপরিদৃশ্যমান অতি লৌকিক দ্বিতীয় অস্তিত্বে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের প্রমাণপঞ্জী মনে রাখলে উপলব্ধি করব রবীন্দ্রনাথ পরিহাসপটু অবিশ্বাসীর দলের নন, তিনি আসলে সুনীতি দেবীর দলের লোক, তাঁরও মনোগত বাসনা— 'এ গল্পটা কেন সত্যি হল না? সত্যি হলে বেশ হত।'

অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস সম্বন্ধে যে দ্বিধা, যে দ্বিধার চমৎকার প্রকাশ রেখে গেছেন ভূতের গল্প বলার ভঙ্গিমার মধ্যে—বিশ্বাসে ও সংশয়ে কম্পিত যে দ্বিধা, তার অপূর্ব প্রকাশ পাই রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের অতিপ্রাকৃত কাহিনীগুলিতে। আগেই বলেছি, হয় নিজের মনে অপ্রাকৃত অতিলৌকিক সম্বন্ধে বিশ্বাসে-অবিশ্বাসে দ্বন্দ্ব ছিল, অথবা নিজের অন্তরের সুকুমার বিশ্বাসকে যুক্তিবাদী যুগের তীব্র আলোর সামনে উপস্থিত করতে সংকোচ বোধ করেছিলেন, যুক্তির বা তথ্যের সমর্থন নেই বলে এই বিশ্বাসকে তিনি প্রকাশ্যে প্রশ্রয় দিতে চান নি। তাই এই জাতীয় প্রতিটি গল্পের শেষে রবীন্দ্রনাথ অবিশ্বাস ও সংশয়ের সামান্য স্পর্শ দিয়ে হয় নিজের বিশ্বাসের দ্বিধাকে সাহিত্যরূপ দিয়েছেন, অথবা সামাজিকের অবিশ্বাসী বক্র হাসি থেকে আত্মরক্ষা করেছেন। তিনি বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব গল্পের অবয়বে রেখে গেছেন সেই জাতীয় কম্পমান দ্বিধা অন্য কারও লেখার মধ্যে আমরা পাই না। মণিহারা গল্পটি অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 'সংশয়ের বৃন্তে ফোটা অপরূপ বিশ্বাসের ফুল'। কিন্তু শুধু মণিহারা কেন, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত অতিপ্রাকৃত গল্প সম্বন্ধে এই মন্তব্য খাটে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মায়াবী কল্পনার সমস্ত ইন্দ্রজাল বিস্তার করে রহস্যলোকে, অতিলোকে, মৃত্যুর পরপারের অস্তিত্বে বিশ্বাস উৎপাদন করেন, কিন্তু শেষে এক অবিশ্বাসী উক্তির স্পর্শে সেই বর্ণিল জগৎকে মুছে দিয়ে যান; অথচ এমন আশ্চর্য কৌশলে যে, সেই অতিলৌকিক জগৎ সত্য না এই অবিশ্বাস সত্য সেই সম্বন্ধেই অপরূপ সন্দেহ থেকে যায়।

কঙ্কাল গল্পে রবীন্দ্রনাথ উষ্ণ মস্তিষ্কের কল্পনায় এক বৈদেহীর লাবণ্যমধুর ব্যর্থতা-বিষাক্ত নবযৌবন-কাহিনী রচনা করেছেন। কখনো কখনো জীবিত ব্যক্তি ও বিদেহিনীর মধ্যে কথোপকথনে পরিহাসের সুর এসে গেছে বটে কিন্তু সেই অনতিব্যক্ত সুর প্রেম ও মরণের এই কাহিনীকে কখনো বাধা দেয় নি— সরস করেছে মাত্র। কিন্তু পরিশেষে যখন শ্রোতা বলে 'গল্পটি বেশ প্রফুল্লকর' তখন একটিমাত্র 'প্রফুল্লকর' শব্দই সমস্ত কাহিনীটিকে নিতান্ত অবিশ্বাস্য একটি গল্পে পরিণত করে। 'এমন সময় প্রথম কাক ডাকিল'— যারা অবিশ্বাসী, যারা অতিপ্রাকৃত গল্প শুনে পরিহাসহাস্যে হো হো শব্দে ঘর ভরে দেয়, তাদেরই স্বর কি বক্রপরিহাসপটু কাকের তীক্ষ্ণ ডাকে রবীন্দ্রনাথ শুনতে পেয়েছিলেন? 'ঘরের মধ্যে ভোরের আলো প্রবেশ করিল'— যুক্তিবুদ্ধিকে চিরকাল আলোর সঙ্গে তুলনা করা হয়; ভোরের নগ্ন আলোয় বুদ্ধির জ্যোতিসম্পাতে রাত্রির অন্ধকাররহস্য, যা অবিশ্বাস্যকেও বিশ্বাস্য করে তোলে, তা ছিন্ন হয়ে গেল। জীবিত ও মৃত গল্পে, শ্মশানে প্রেতিনী বলে পরিত্যক্ত কাদম্বিনী চেতনা পেয়ে অনুভব করল— 'আমি অতি ভীষণ, অকল্যাণকারিণী; আমি আমার প্রেতাত্মা'। জীবন ও মরণের এই মধ্যবর্তিনী তার সখীকে বলে 'তোমরা মানুষ, আর আমি ছায়া'। এই ভয়াবহ অবস্থা, যখন কাদম্বিনীর 'ইহলোকেও স্থান নাই, পরলোকেও স্থান নাই', তার সমস্ত ভয়াবহতা রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়ে তুলেছেন, কিন্তু তার পর বাটির আঘাতে কপাল থেকে রক্ত বের

করে এবং জলমগ্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করে সে প্রমাণ করল 'সে মরে নাই'। কাদম্বিনী যখন অন্তঃপুরের পুষ্করিণীর জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল তখন 'শারদাশঙ্কর উপরের ঘর হইতে শুনিতে পাইলেন ঝপাস করিয়া একটি শব্দ হইল'। এই 'ঝপাস' শব্দটি যেমন কাদম্বিনীকে বিদেহিনী প্রেতিনীর অপবাদ থেকে মুক্ত করে তাকে শরীরী প্রমাণ করল, তেমনি সেই শব্দটি আমাদের জীবনমৃত্যুর মধ্যবর্তী ত্রিশঙ্কুলোক থেকে বাস্তব পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনল। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করা থেকে জমিদার দক্ষিণাচরণবাবু যে মনস্তাত্ত্বিক মায়ায় ও অধ্যাসে পীড়িত হচ্ছিলেন— যার ফলে চরবিহারী জলচর পাখিদের ডানার শব্দ শুনে মনে হত কে যেন 'ও কে? ও কে? ও কে?' প্রশ্ন করছে, মনে হত মশারির মধ্যে যেন কার অস্থিচর্মসার রুগ্‌ণ অঙ্গুলি দ্বিতীয়া স্ত্রীর দিকে নির্দেশ করছে, কে যেন পুনঃপুনঃ একই প্রশ্ন করে চলেছে— তার মর্মান্তিক যন্ত্রণার অলৌকিক কবিত্বপূর্ণ বিবরণ রবীন্দ্রনাথ নিশীথে গল্পে বিবৃত করেছেন। সেই বর্ণনার আশ্চর্য ক্ষমতায় যখন সেই অতিপ্রাকৃত প্রশ্ন কিছুতেই আমাদের 'মস্তিষ্কের সীমা ছাড়াইতে পারিতেছে না' তখনই রবীন্দ্রনাথ সেই মোহাচ্ছন্ন পরিবেশ ভেঙে দিলেন— এ ক্ষেত্রেও দেখতে পেলাম 'বাহিরে আলো হইয়াছে। কাক ডাকিয়া উঠিল!' কাদম্বিনী 'ঝপাস' শব্দে জলমগ্ন হয়ে আমাদের বাস্তব পৃথিবীতে ফিরিয়ে এনেছিল, নিশীথে গল্পের শ্রোতার 'বাড়ির সম্মুখবর্তী পথে একটি মহিষের গাড়ির ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ জাগিয়া উঠিল', আমরাও সেই দুঃস্বপ্নের তমসাচ্ছন্ন জগৎ থেকে পরিচিত আলোকিত পৃথিবীতে ফিরে এলাম।

ক্ষুধিত পাষাণের সূত্রপাতে অবিশ্বাসের ইশারা আছে। অতি-সপ্রতিভ বক্তার সবজান্তা ভাবটি ফুটিয়ে তুলে রবীন্দ্রনাথ তার গল্পে আমাদের মনে পূর্ব থেকে অবিশ্বাসের ভাব জাগিয়ে রেখেছেন। কিন্তু মুক্তকল্পনা সে অবিশ্বাসের নাগপাশ ছিন্ন করে অচিরেই রোম্যান্টিক অতীতলোকে প্রস্থান করেছে, অবলুপ্ত বিলাস, অবসিত সৌন্দর্য এবং মৃত কামনাকে সঞ্জীবিত করে তুলেছে। যে বরীচের হাটে তুলার মাশুল আদায় করে তার মধ্যে জন্মান্তরের দ্বিতীয় সত্তা জেগে উঠল যার 'মাথায় এক লাল মখমলের ফেজ' 'ঢিলা পায়জামা ফুলকাটা কাবা এবং রেশমের দীর্ঘ চোগা'। ইন্দ্রজালিক শব্দবিন্যাসে, অপরূপ বর্ণনায় আমাদের মনেও বিশ্বাস জাগ্রত হয়, আমাদের কাছে সেই রহস্যকল্পনালোক সত্য হয়ে ওঠে, আমরাও 'স্বপ্নের জটিলপথসংকুল মায়াপুরীর মধ্যে গলিতে গলিতে কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ' করে বেড়াই। মাথাঘসা ও মাদক সুগন্ধি ধূম, হাস্যকটাক্ষ ও ভূষণজ্যোতির স্ফুলিঙ্গ, সারঙ্গীর সংগীত, নূপুরের নিক্বণ, সিরাজের স্বর্ণমদিরা, বলয়ের হীরকে বিজুলি, জাফরান রঙের পায়জামা আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহকে অবশ করে দেয়, চেতনাবৃত্তিকে অসাড় করে দেয়। কিন্তু যে অবিশ্বাসের পরিবেশের মধ্যে গল্পের সূত্রপাত, পরিণামে শুধু যে সেই পরিবেশে লেখক আমাদের ফিরিয়ে আনলেন তাই নয়, যখন সুপ্তোত্থিত একজন ইংরেজ গাড়ির কামরা থেকে এই সবজান্তা বক্তাকে দেখে 'হ্যালো বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল' তখন এই 'হ্যালো' ইংরেজি শব্দের ধাক্কায় শুধু যে আমরা মোগল আমল থেকে ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করলাম তাই নয়, কল্পনা থেকে বাস্তবেও ফিরে এলাম। 'আমি' নামক শ্রোতা জন্ম-অবিশ্বাসীদের অন্যতম, সে মন্তব্য করল 'লোকটা আমাদিগকে বোকার মতো দেখিয়া কৌতুক করিয়া ঠকাইয়া গেল ; গল্পটা আগাগোড়া বানানো'।

দুরাশা গল্পে কুহকাচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করেছে রাত্রি নয়, কুয়াশা— আলোকে অন্ধ করে দেয় বলে সেও রাত্রির সমগোত্র। গল্পের আরম্ভে যে সামান্য পরিহাসের সুর ছিল, বদ্রাওনের নবাব গোলাম কাদের

খাঁ-র পুত্রীর কাহিনী ক্ষণকালের মধ্যে সেই পরিহাস-অবিশ্বাসের গণ্ডি অতিক্রম করে নিয়ে গেল দার্জিলিঙের ক্যালকাটা রোডের ধার থেকে একেবারে সিপাহী-বিদ্রোহের আমলে। বুট ও ম্যাকিণ্টশের জগৎ থেকে 'শ্বেতপ্রস্তররচিত বড়ো বড়ো অভ্রভেদী সৌধশ্রেণী, পথে লম্বপুচ্ছ অশ্বপৃষ্ঠে মছলন্দের সাজ, হস্তীপৃষ্ঠে স্বর্ণঝালর-খচিত হাওদা, পুরবাসিগণের মস্তকে বিচিত্রবর্ণের উষ্ণীষ, শালের রেশমের মসলিনের প্রচুরপ্রসর জামা পায়জামা, কোমরবন্ধে বক্র তরবারি, জরীর জুতার অগ্রভাগে বক্র শীর্ষ— সুদীর্ঘ অবসর, সুলম্ব পরিচ্ছদ, সুপ্রচুর শিষ্টাচার'-এর জগতে যাত্রা যেন এক স্বপ্নপ্রয়াণ, অবিশ্বাস্য অবলীলায় লেখক সম্ভব করেছেন। এই পশ্চাৎপটের সম্মুখে নবাবপুত্রী ও নবাবের হিন্দুব্রাহ্মণ সেনাপতি কেশরলালের প্রণয়কাহিনী অভিনীত হয়েছে, কী করে সংস্কারের বাধা সেই প্রেমকে ভ্রষ্টনষ্ট করে দিয়েছে তার ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। কিন্তু এক দিন যে কেশরলালকে দেখে নবাবপুত্রীর মনে হয়েছিল 'নির্মল আত্মমগ্ন পুরুষ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ' সেই কেশরলালকে অবশেষে দেখা গেল 'ভুটিয়া পল্লীতে ভুটিয়া স্ত্রী এবং তাহার গর্ভজাত পৌত্র-পৌত্রী লইয়া ম্লানবস্ত্রে মলিন অঙ্গনে ভুট্টা হইতে শস্য সংগ্রহ করিতেছে'। কোথায় কেশরলাল আবক্ষ যমুনার জলে নিমগ্ন হয়ে নবোদিত সূর্যের উদ্দেশে অঞ্জলি প্রদান করছে, আর কোথায় কেশরলাল ভুটিয়া পল্লীতে ভুট্টাসংগ্রহ করছে! রবীন্দ্রনাথ পুনরায় স্বপ্নলোক থেকে অপ্রাকৃত থেকে বাস্তবে আমাদের নিয়ে এলেন। জাদুকরী ভাষায় যে জগৎ রচনা করেছিলেন সেই জগৎ ভেঙে দিয়ে পুনরায় ইতর বর্তমানে প্রত্যাবর্তন করলেন। নিশীথে ও কঙ্কাল গল্পে রাত্রি অবসানে প্রভাত-আলোক দেখা দিয়েছিল, এখানে 'হঠাৎ মেঘ কাটিয়া গিয়া স্নিগ্ধ রৌদ্রে নির্মল আকাশ' ঝলমল করে উঠল এবং 'এই সূর্যালোকিত অনাবৃত জগৎ-দৃশ্যের মধ্যে সেই মেঘাচ্ছন্ন কাহিনীকে আর সত্য বলিয়া মনে হইল না', নবাবপুত্রীও 'কুজ্ঝটিকারাশির মধ্যে মেঘের মতো মিলাইয়া গেল'। নিশীথে গল্পে ডাক্তার-শ্রোতা দক্ষিণাচরণবাবুর 'উপদ্রবের' জন্য দায়ী করেছিল 'মদের মাত্রার' অধিক্যকে, দুরাশা গল্পের শ্রোতা দায়ী করেছে অপর এক নেশাকে— 'আমার বিশ্বাস, আমি পর্বতের কুয়াশার সহিত আমার সিগারেটের ধূম ভূরিপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া একটি কল্পনা খণ্ড রচনা করিয়াছিলাম' এবং 'সেই মুসলমানব্রাহ্মণী, সেই বিপ্রবীর, সেই যমুনাতীরের কেল্লা কিছুই হয়তো সত্য নহে'।

ইস্কুলমাস্টার জরাগ্রস্ত বৃহৎ অট্টালিকা পিছনে রেখে ঝিল্লিমুখর সন্ধ্যাবেলায় ফণিভূষণ ও মণিমালিকার গল্প বলেছে। মণিহারা গল্পের প্রথমেও দাম্পত্যসম্পর্ক সম্বন্ধে বক্তার পরিহাসপূর্ণ মন্তব্য আছে, সেইসব মন্তব্য শুনে কৌতুকপ্রিয় শৃগালসম্প্রদায়ের অট্টহাস্য আছে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে অতিপ্রাকৃত রহস্যময় জগতের জারকরস সমস্ত অবিশ্বাস ও পরিহাসকে অসাড় করে দেয়, চেতনাকে অবসন্ন করে দেয়। যে মণিমালিকার অক্ষয় যৌবন, অম্লান সৌন্দর্য ও বরফপিণ্ডের মতো হৃৎপিণ্ড ছিল, সে এক দিন শূন্যগৃহ কায়াহীন অস্তিত্বে অলঙ্কারশিঞ্জনে মুখরিত করে মৃত্যুনিকেতন থেকে ফিরে এল। তারপর এক দিন যখন 'আকাশ হইতে একখানা অন্ধকার নামিয়া এবং পৃথিবী হইতে একখানা অন্ধকার উঠিয়া চোখের উপরকার এবং নীচেকার পল্লবের মতো একত্র আসিয়া মিলিত হইল' তখন উৎকণ্ঠ ফণিভূষণের অভীষ্ট সিদ্ধ হল। সে শুধু ভূষণশিঞ্জন শুনতে পেল তা নয়, দেখতে পেল মণিমালিকার কঙ্কাল—'সেই কঙ্কালের আট আঙুলে আংটি, করতলে রতনচক্র, প্রকোষ্ঠে বালা, বাহুতে বাজুবন্ধ, গলায় কণ্ঠি, মাথায় সিঁথি, তাহার আপাদমস্তকে অস্থিতে অস্থিতে এক-একটি আভরণ সোনায় হীরায় ঝকঝক করিতেছে।' সেই কঙ্কাল-অঙ্গুলির ইঙ্গিতে

যেমন ফণিভূষণ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেল তেমনি আমারাও আচ্ছন্নের মতো অতিপ্রাকৃতলোককে সত্য বলে স্বীকৃতি দিতে উন্মুখ হলাম। কিন্তু একটিমাত্র চমকে আমরা সেই হিমরক্ত রোমহর্ষণ-জগৎ থেকে অচিরে ফিরে এলাম যখন জানতে পারলাম, যে নীরব শ্রোতাকে এতক্ষণ এই রোমাঞ্চকর কাহিনী বলা হচ্ছিল তিনিই আসলে গল্পের নায়ক ফণিভূষণ সাহা। রোমান্স-রাজ্য থেকে আমাদের পতন আরও নিশ্চিত হল যখন জানতে পারলাম ফণিভূষণের স্ত্রীর নাম মণিমালিকা ছিল না, ছিল নৃত্যকালী। 'নৃত্যকালী' নামের মধ্যে যেন অবিশ্বাসের পুঞ্জীভূত অট্টহাসি। যে কাকের ডাকে কঙ্কাল ও নিশীথে গল্পের অতিপ্রাকৃত পরিবেশ ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল তার সঙ্গে তুলনায় 'নৃত্যকালী' নাম কিছু কম কর্কশ বা বিদ্রূপপ্রখর নয়। কিন্তু একটি সংশয় শেষ পর্যন্ত থেকে যায়— শ্রোতা ফণিভূষণ যদি শরীরী হয় তাহলে গল্পটি নিতান্তই গল্প, আর গল্পটি যদি সত্য হয়, তাহলে এতক্ষণের নির্বাক শ্রোতা আসলে অশরীরী।

এক জীবিত ও মৃত গল্প, যার মধ্যে পূর্বাপর কোথায়ও পরিহাসস্পর্শ নেই, সেটি বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় সব কয়টি গল্প পরিহাসের সুরে আরম্ভ হয়, যার মধ্যে আবার অবিশ্বাসের সুর স্বতই মিশে থাকে। কিন্তু অকস্মাৎ এক মুহূর্তে পরিহাস-অবিশ্বাস পিছনে ফেলে অবলীলাক্রমে লেখক অপূর্ব মায়ামন্ত্রে পাঠককে অতিপ্রাকৃতলোকে উত্তীর্ণ করেন। স্বেচ্ছাবরুদ্ধ-অবিশ্বাসে আমরা রুদ্ধশ্বাসে কাহিনীর প্রতিটি গতিপরিবর্তন অনুসরণ করি। যদিও মণিহারা গল্পের স্বল্পাহারশীর্ণ কথকের বর্ণনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'ইংরাজ কবি কোলরিজ-সৃষ্ট প্রাচীন নাবিকের কথা' মনে পড়ে গেছে তথাপি রবীন্দ্রনাথ কোলরিজ-কথিত 'Willing suspension of disbelief' বা অবিশ্বাসের স্বেচ্ছানিরোধের আবশ্যিক শর্ত তাঁর অতিপ্রাকৃত গল্পে প্রায় শেষ পর্যন্ত পালন করলেও একেবারে শেষ পর্যন্ত পালন করেন নি। রুদ্ধশ্বাস রোমাঞ্চে সেই অতিপ্রাকৃতলোকে বহুকাল যাপন করার পর অন্তিমে অবিশ্বাসের চমকে আমরা যেন সম্বিৎ ফিরে পাই। সম্বিৎ ফিরে পেয়েও যেন হতচকিত হয়ে যায় পাঠক— কোন্‌টা সত্য, আর কোন্‌টা বা স্বপ্ন মায়া বা মতিভ্রম সে বুঝে উঠতে পারে না। বাস্তব-কল্পনার দ্বন্দ্বে এই হতবুদ্ধি দ্বিধাগ্রস্তভাব কোলরিজে নেই। সেইজন্যে রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় গল্পগুলি পড়ার সময় কোলরিজের প্রাচীন নাবিকের কথা মনে পড়ে না, বরং মনে পড়ে কীটস্‌-এর ওড্‌ টু নাইটিঙ্গেলের কথা। ক্ষয়রোগ-পাণ্ডুর ও জরাজর্জর দেহের বাস্তব বর্ণনার পর কল্পনার ডানায় কীটস্‌ পাঠককে নিয়ে গিয়েছিলেন অতিক্রান্ত শতাব্দীর সম্রাটের সভায়, শস্যক্ষেত্রে ক্রন্দনমুখী রুথের পার্শ্বে, 'ফেনায়িত সুনীল শূন্যতায় উজাড় পরীস্থানে।' কিন্তু 'forlon' শব্দটি বিষণ্ন ঘণ্টার ধ্বনির মতো কবিকল্পনার মৃত্যু ঘোষণা করেছিল এবং কবি সেই ঘণ্টার ধ্বনি শুনে স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থার থেকে ফিরে এসে হতচকিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি জাগ্রত কি নিদ্রাকুল? সত্য ও স্বপ্নের সীমানায় দাঁড়িয়ে কোন্‌টি জাগরণ কোন্‌টি নিদ্রা সে সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথও তেমনি পরিহাসের সুরে কাহিনীর অবতারণা করে কল্পনার অদম্য শক্তিতে অবিশ্বাসের কণ্ঠরোধ করে কখনো নিয়ে গেছেন স্বীয় কঙ্কাল-সন্ধানী আত্মহন্ত্রী রমণীর পাশে, কখনো বা জীবিত না মৃত এমন ভয়াবহ দ্বিধায় দ্বিধাগ্রস্ত রমণীর কাছে, কখনো মুসলমানী যুগে বা সিপাহী-বিদ্রোহের আমলে। কিন্তু পরিণামে অবিশ্বাসের ঘণ্টাধ্বনি সেই অতিপ্রাকৃত কল্পনাজগৎ থেকে আমাদের অচিরে ফিরিয়ে এনেছে ক্যালকাটা রোডের ধারে বা স্টেশনের বিশ্রামাগারে। কিন্তু ফিরে এসেও পূর্ব মোহাচ্ছন্ন মন্ত্রমুগ্ধ অবস্থা থেকে পাঠক সম্পূর্ণ মুক্তি পায় না। অপরিচিত জায়গায় অকস্মাৎ অচেতন ব্যক্তি জ্ঞান ফিরে পেলে যেমন জিজ্ঞাসা

করে, আমি কোথায়, তেমনি এই অস্তিমের চমকে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যে বারংবার আন্দোলিত হয়ে পাঠকও ভাবে, আমি কোথায়! কারণ রবীন্দ্রনাথ এই গল্পগুলিকে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যবর্তী এক অপরূপ অস্থির ভারসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিশ্বাস-সংশয়ের এই দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্তও কাটে না। পাগলা মেহের আলির মতো একদিকে বলা হয় 'তফাত যাও, তফাত যাও। সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়', কিন্তু অন্যদিকে এই সতর্কবাণী সত্ত্বেও সেই রহস্যময় অতিপ্রাকৃত পরিমণ্ডলের জারকরস থেকে আমরা কিছুতে সম্পূর্ণ মুক্তি পাই না— 'অজগরের কবলের চতুর্দিকে ঘূর্ণমাণ মোহাবিষ্ট পক্ষীর ন্যায়' আমরা সেই রহস্যবৃত্তের চারিদিকে ঘুরতে থাকি। এই প্রসঙ্গে মণিহারা গল্পের কয়েকটি বাক্য উদ্ধারযোগ্য— "কঙ্কাল নদীতে নামিল, অনুবর্তী ফণিভূষণ জলে পা দিল। জলস্পর্শ করিবামাত্র ফণিভূষণের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল।…যদিও সাঁতার জানিত কিন্তু স্নায়ু তাহার বশ মানিল না, স্বপ্নের মধ্য হইতে কেবল মুহূর্তমাত্র জাগরণের প্রান্তে আসিয়া পরক্ষণে অতলস্পর্শ সুপ্তির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেল।" ফণিভূষণ যেমন মণি-মালিকার সালঙ্কারা কঙ্কালের ইঙ্গিতে মন্ত্রমুগ্ধের মতো অগ্রসর হয়েছিল পাঠকও তেমনি কবির অতিপ্রাকৃত রোম্যান্টিক কল্পনা ও জাদুকরী ভাষার ইঙ্গিতে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো অগ্রসর হয়, যতক্ষণ ফণিভূষণের মতো, পরিণামের অবিশ্বাসী উক্তির শীতল জলস্পর্শ তাকে পুনরায় চেতন না করে। পরিহাসের স্পর্শ চৈতন্য ফিরিয়ে দিলেও ফণিভূষণের মতো আমাদের স্নায়ুও বশ মানে না, মুহূর্তকাল জাগরণের প্রান্তে এসে পুনরায় সুপ্তিকল্পনার মধ্যে আমরাও নিমগ্ন হয়ে যেতে চাই। মূল গল্পে যদিও ফণিভূষণ নিমগ্ন হয়ে গেল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জানা গেল গল্পের নায়ক ফণিভূষণ সাহা'ই গল্পের শ্রোতা। সে কি অশরীরী, না কি সে নিমগ্ন হয়ে যেতে যেতেও নিমগ্ন হতে পারে নি? আমরাও অবশ স্নায়ু নিয়ে সুপ্তিকল্পনার মধ্যে মগ্ন হয়ে যেতে চাই, অথচ বাস্তব জাগরণের প্রান্তে বারবার ফিরে আসতে হয় আমাদের। দুই পৃথিবীর মাঝখানে আমাদের দোদুল্যমান অবস্থার সুনিশ্চিত অবসান হয় না।

'আদিশূরের কাহিনী'

'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় (বর্ষ ২১ সংখ্যা ২. কার্তিক-পৌষ ১৩৭১) অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকারের 'আদিশূরের কাহিনী' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আদিশূরের কাহিনী যে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না এই সিদ্ধান্ত আমি বহু পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত *History of Bengal* VOL. I গ্রন্থে এবং অন্যান্য প্রবন্ধে যুক্তিসহ দেখাইয়াছি, দীনেশবাবু তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। অতিরিক্ত যেটুকু লিখিয়াছেন তথ্য হিসাবে তাহার মূল্য আছে; কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্ত অনুমান মাত্র, তাহার সম্বন্ধে কোনো আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক একটি বিষয়ের অবতারণা করিয়া তিনি প্রবন্ধ-শেষে লিখিয়াছেন: "আমরা প্রবন্ধান্তরে দেখাইতে চাহিয়াছি যে, দক্ষিণ-ভারতের ক্ষৌরকারগণ বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ নামে পরিচিত এবং আদি মধ্যযুগে তাহাদের বাংলাদেশে বসতি স্থাপনের সহিত এদেশে সঙ্ঘবদ্ধ বৈদ্যজাতি গড়িয়া উঠিবার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে।"

ইহার প্রতিবাদ করিবার উদ্দেশ্যেই এই সমালোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি।[১]

বাংলাদেশে বৈদ্যজাতি যে শিক্ষাদীক্ষায় খুবই উন্নত সে কথা দীনেশবাবুও তাঁহার একাধিক প্রবন্ধে স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং দীনেশবাবু উদ্ধৃত অংশে যে ইঙ্গিত করিয়াছেন কেহ কেহ তাহা নিতান্ত অশোভন বলিয়া মনে করিতে পারেন। অবশ্য, অপ্রিয় হইলেও সত্য কথা বলিতে কুণ্ঠার কোনো কারণ নাই, কিন্তু যাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার সপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ নাই এবং যাহা ব্যক্তিগত অনুমান মাত্র তাহার উপর নির্ভর করিয়া এরূপ ইঙ্গিত করা কতদূর সংগত পাঠকবর্গ তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন। দীনেশবাবুর উক্তি সম্বন্ধে আপত্তি করিবার আরও দুইটি গুরুতর কারণ আছে। প্রথমতঃ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়— আদিশূরের কাহিনীর সহিত এই উক্তির প্রয়োজনীয়তা বা প্রাসঙ্গিকতা সহজে বোধগম্য হয় না। দ্বিতীয়তঃ এইরূপ একটি সম্পূর্ণ অভিনব মন্তব্য করিতে হইলে সঙ্গেসঙ্গে তাহার সপক্ষে বিশিষ্ট প্রমাণ উল্লেখ করা আবশ্যক। দীনেশবাবু লিখিয়াছেন, "প্রবন্ধান্তরে দেখাইতে চাহিয়াছি··" কিন্তু সেটি কোন্ প্রবন্ধ তাহা বলেন নাই। আলোচ্য প্রবন্ধের শেষে পাদটীকায় তিনি পাঁচটি প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া ও পরে 'ইত্যাদি' লিখিয়া এ বিষয়ে তাঁহার কর্তব্য শেষ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার কোন্ প্রবন্ধে তিনি বৈদ্যজাতি ও ক্ষৌরকারের সম্বন্ধনির্ণয় করিয়াছেন তাহার কোনো উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং সাধারণ পাঠকের পক্ষে এই বিষয়ে তিনি কি প্রমাণ দেখাইয়াছেন তাহা জানা কষ্টকর। দীনেশবাবু তাঁহার স্বরচিত যেসকল প্রবন্ধ পাদটীকার প্রমাণপঞ্জীরূপে উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে অম্বষ্ঠজাতি নামক একটি ইংরেজি প্রবন্ধ আছে। সুতরাং স্বভাবতই মনে হইতে পারে যে, এই প্রবন্ধেই ক্ষৌরকার-বৈদ্য-অম্বষ্ঠ-সম্বন্ধে আলোচনা আছে। যে পত্রিকায় এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছিল—(Journal, U. P. Historical Society, Vol. XVIII) তাহা বাংলাদেশে সুলভ নহে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের, যেখানে দীনেশবাবু অধ্যাপক, সেই গ্রন্থাগারেও এই গ্রন্থ নাই।

সুতরাং যদি কোনো পাঠক দীনেশবাবুর প্রচারিত অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণ করিতে আগ্রহশীল

হন, তবে তাঁহাকে অনেক বেগ পাইতে হইবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উক্ত প্রবন্ধে ক্ষৌরকার হইতে বৈদ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোনো কথাই নাই। বরং ইহাতে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা আলোচ্য প্রবন্ধের বৈদ্য সম্বন্ধে উক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী। এই প্রবন্ধে দীনেশবাবু নিম্নলিখিত কয়েকটি মন্তব্য করিয়াছেন—

১. বাংলায় প্রচলিত কোনো কোনো কুলপঞ্জীতে বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ বলিয়া দাবী করিয়াছেন এবং বাংলা দেশের দুইজন প্রবীণ ঐতিহাসিক— দুইজনেই বৈদ্য[২]— ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন তোলেন নাই। কিন্তু আমার মনে হয় এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

২. অম্বষ্ঠ একটি প্রাচীন জাতির (tribe) নাম। কালক্রমে ইহারা ভারতের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। বাংলায় বৈদ্যেরা, বিহারে কায়স্থেরা এবং বর্তমান কালের তামিল দেশের ক্ষৌরকারগণ অম্বষ্ঠ জাতি বলিয়া দাবী করে। দাক্ষিণাত্যের অম্বষ্ঠগণ চিকিৎসা-ব্যবসায় করে বলিয়া 'বৈদ্যন্' নামেও অভিহিত হয়।

৩. বাংলার সেন রাজবংশ কর্ণাট (বর্তমান মহীশূর প্রদেশ) হইতে আগত এবং তাহাদের সঙ্গে সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্য হইতে অনেক লোক বাংলায় আসিয়াছিল। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের অম্বষ্ঠ-বৈদ্যগণ বাংলায় আসিয়াছিল কি না এবং বৈদ্যজাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল কি না তাহা জানা যায় না ('we do not know')। তবে এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বৈদ্য নামে একটি পৃথক্ জাতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বপ্রাচীন উল্লেখ দক্ষিণ-ভারতের তাম্রশাসনে পাওয়া যায়। সপ্তম ও অষ্টম খৃষ্টাব্দে এই বৈদ্যজাতির কোনো কোনো ব্যক্তি চালুক্য ও পাণ্ড্যরাজগণের অধীনে প্রধানমন্ত্রী সেনাপতি প্রভৃতি বহু উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।[৩]

উল্লিখিত মন্তব্যগুলি হইতে এরূপ কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে, তামিল-দেশীয় বর্তমান কালের ক্ষৌরকার ব্যবসায়ী অম্বষ্ঠগণের সহিত "বাংলার বৈদ্যজাতি গড়িয়া উঠিবার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে"। বরং ইহা স্পষ্টই স্বীকৃত হইয়াছে যে, তামিল-দেশীয় অম্বষ্ঠগণ যে বাংলায় আসিয়াছিল তাহার কোনো প্রমাণ নাই।

দীনেশবাবুর এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে। ইহার তিন বৎসর পরে প্রকাশিত আর-একটি প্রবন্ধের পাদটীকায়—নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর একটি আলোচনায়— দীনেশবাবু নূতন দুইটি মন্তব্য করেন (Journal, Royal Asiatic Society of Bengal XIV, p. 106)—

১. পূর্বোক্ত তৃতীয় মন্তব্যে উল্লিখিত খৃষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত (এবং পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের জন্য প্রসিদ্ধ) বৈদ্যগণ এবং বর্তমান কালের তামিল দেশের অম্বষ্ঠগণ অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। সেন-রাজগণ নিজেরা দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের রাজত্বকালেই সম্ভবতঃ অনেক তামিল অম্বষ্ঠ বাংলাদেশে আসিয়া বসবাস করে— যেমন মুসলমান রাজসভায় বিদেশী মুসলমানগণ আদৃত হইত।

২. সুতরাং ইহা খুবই সম্ভব যে এই অম্বষ্ঠগণের সহিত মিশ্রণের ফলেই বাংলাদেশের চিকিৎসা-ব্যবসায়িগণ বৈদ্যনামে এক বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

এই দুইটি মন্তব্যই যে কত অসার এবং দীনেশবাবুর নিজের পূর্বোক্ত মন্তব্যের বিরোধী একটু আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

প্রথমতঃ উনবিংশ শতাব্দীর তামিল ও মালাবারের অম্বষ্ঠগণই যে খৃষ্টীয় সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ লিপিতে বৈদ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন[৪] বিশিষ্ট কোনো প্রমাণ ব্যতীত এরূপ অনুমান অদ্ভুত ও অযৌক্তিক বলিয়াই মনে হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পাঁচ-ছয়খানি প্রাচীন লিপিতে উল্লিখিত এই বৈদ্যগণ কুত্রাপি অম্বষ্ঠ বলিয়া কথিত হন নাই।

দ্বিতীয়তঃ কর্ণাটের সেন-রাজগণ যদি দাক্ষিণাত্যের বৈদ্যগণকে রাজসভায় সম্মানিত করিতেন (দীনেশবাবুর দৃষ্টান্ত অনুযায়ী মধ্যযুগের মুসলমান-রাজগণ যেমন করিতেন) তবে তাঁহারা কবি পণ্ডিত সেনাপতি প্রধানমন্ত্রী প্রভৃতি পদের উপযুক্ত বৈদ্য থাকিতে ক্ষৌরকার-ব্যবসায়ী তামিল দেশের অম্বষ্ঠ-বৈদ্যগণকেই আদর করিয়া বাংলাদেশে বসতি করাইয়াছিলেন (যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে এই শ্রেণীর অম্বষ্ঠ সেন রাজাদের আমলে ছিল) ইহা অত্যন্ত উদ্ভট ও হাস্যকর। সে যুগে বাংলাদেশে ক্ষৌরকারের অভাব হইয়াছিল এরূপ কোনো প্রমাণ জানা নাই। আজ যদি উড়িষ্যা ও উত্তর-দেশবাসী কোনো ধনী ব্যক্তি (কারণ দেশে এখন রাজা নাই) বাংলাদেশ হইতে পাচক ব্রাহ্মণ এবং দোবে চোবে (অর্থাৎ দুই-বেদে অথবা চারি-বেদে অধিকারী) উপাধিধারী গোশকট-চালক এবং দ্বারবানগণকে সাদরে স্বদেশে নিয়া যান এবং দুই-তিন শত বৎসর পরে কেহ অনুমান করেন যে তাহাদের সহিত মিশ্রণের ফলেই উড়িষ্যা ও উত্তর-প্রদেশে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, তবে এইরূপ অনুমান ও দীনেশবাবুর অনুমানের মধ্যে বিশেষ কোনো প্রভেদ আছে বলিয়া মনে করিবার কোনো কারণ নাই।

তৃতীয়তঃ দীনেশবাবুর মতে বাংলার বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ বলিয়া যদি দাবি করেন তাহা বিশ্বাস না করার যথেষ্ট কারণ আছে এবং আমি ও স্বর্গত হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী বাংলার বৈদ্যবংশীয় এই দুই ঐতিহাসিক এই দাবির বিরুদ্ধে কিছু বলি নাই এই অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন।[৫] আমার যে গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া তিনি এই অভিযোগ করিয়াছেন তাহাতে আমি বাংলাদেশের প্রাচীন সমাজ সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করিয়াছি। নিজে বৈদ্য বলিয়া কেবল বৈদ্যজাতির সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা ঐতিহাসিক হিসাবে অসঙ্গত মনে করি, কারণ তাহা হইলে অন্য সকল জাতি সম্বন্ধেও ঐরূপ বিস্তৃত আলোচনা করা উচিত, কিন্তু তাহা সাধারণ ইতিহাসে সম্ভব নহে। তবে আমি এ কথা বলিয়াছি যে, বৃহদ্ধর্মপুরাণে অম্বষ্ঠকে বৈদ্য বলা হইয়াছে (কারণ তাঁহাদের বৃত্তি ছিল চিকিৎসা) কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ পৃথক জাতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (যদিও এই দুইটি পুস্তক অত্যন্ত অর্বাচীন), সুতরাং দীনেশবাবু যে বৈদ্য ও অম্বষ্ঠের অভিন্নতা স্বীকার করেন না, আমিও প্রকারান্তরে সেই মতই ব্যক্ত করিয়াছি। কিন্তু দীনেশবাবু যখন বাংলার বৈদ্যগণকে অম্বষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন না, তখন তামিল অম্বষ্ঠ-ক্ষৌরকারের সহিত বাংলার বৈদ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অনুমান করিবার হেতু কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

চতুর্থতঃ ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে রচিত প্রবন্ধে দীনেশবাবু লিখিয়াছেন যে, দাক্ষিণাত্যের কোনো কোনো অম্বষ্ঠ-বৈদ্য বাংলাদেশে আসিয়া বৈদ্যজাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছেন কি না তাহা জানা নাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাদটীকায় তিনি ইহা খুবই সম্ভব ('quite probable') বলিয়াছেন। কোন্ নূতন উপাদানের সাহায্যে 'জানা নাই' তথ্য 'খুবই সম্ভব'এ পরিণত হইল তাহা দীনেশবাবু জানান নাই।

দীনেশবাবু হয়তো বলিবেন তিনি অনুমান করিয়াছেন এবং 'খুবই সম্ভব' বলিয়াছেন, কিন্তু কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করেন নাই। কিন্তু সাধারণ লোকে স্বভাবতই মনে করিতে পারে যে, তাঁহার ন্যায় লব্ধ-

প্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক যে অনুমান করেন তাহার অবশ্যই কিছু ভিত্তি আছে এবং আমাদের হাতে এখন যেসব প্রমাণ আছে তাহাতে এইরূপ অনুমানই সর্বাপেক্ষা যুক্তিসংগত। বিশেষত: আলোচ্য প্রবন্ধে দীনেশবাবু আপ্তবাক্যের মতো দক্ষিণ-ভারতের ক্ষৌরকারের সহিত বাংলার বৈদ্যজাতি গঠনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা মাত্র একটি বাক্যে উল্লেখ করিয়াছেন।

ইতিহাসে অনেক সময় অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় কিন্তু তাহার মূলে কিছু যুক্তি ও প্রমাণ থাকা আবশ্যক। ইতিহাসে আপ্তবাক্যের স্থান নাই। সুতরাং বাংলার অম্বষ্ঠ বৈদ্যের সম্বন্ধে দীনেশবাবু যে অনুমান করিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে যতটুকু নিশ্চিত তথ্য জানা আছে তাহার উল্লেখ করিতেছি—

১. বৈদ্য বলিয়া পৃথক জাতি বর্তমান কালে বাংলায় আছে, অন্যত্র নাই।

২. অম্বষ্ঠ পঞ্জাবের একটি প্রাচীন জনপদবাসীর নাম, কালক্রমে ইহা সামাজিক জাতির সংজ্ঞাবাচক হইয়াছে এবং অম্বষ্ঠ নামক জাতি ভারতের বহুস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উল্লেখ বৌদ্ধধর্মগ্রন্থে আছে। সেখানে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ জাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। মনু এবং অন্যান্য স্মৃতিতে অম্বষ্ঠ, ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্য মাতা হইতে উৎপন্ন জাতি বলিয়া বর্ণিত।

৩. ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে রচিত 'চন্দ্রপ্রভা' এবং ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে রচিত 'সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা' বৈদ্যজাতির দুইখানি সুপরিচিত কুলপঞ্জিকা (যাহাতে বাংলার বৈদ্যগণের উৎপত্তি ও ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে)। ইহার প্রথমখানিতে বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ জাতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, কিন্তু ২২ বৎসর পূর্বে রচিত দ্বিতীয় গ্রন্থখানিতে এরূপ কোনো উল্লেখ নাই।

৪. বিশিষ্ট কোনো সামাজিক জাতির নাম হিসাবে বৈদ্যজাতির (বৈদ্যান্বয়) সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় কর্ণাট দেশে চালুক্য রাজার একখানি তাম্রশাসনে। ইহার তারিখ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী। পরবর্তী শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের আরও কয়েকখানি প্রাচীন রাজশাসনে বৈদ্যবংশীয় উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারীদের নাম পাওয়া যায়।

৫. কর্ণাটদেশ হইতে বাংলায় আগত সেন-রাজগণ কোনো কোনো কুলপঞ্জিকায় বৈদ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, কোনো পঞ্জিকায় কায়স্থ বলিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু পরবর্তী যুগে বাংলায় একটি বিশিষ্ট বৈদ্য জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। সেন-রাজগণের পূর্বে বাংলায় বৈদ্যজাতি ছিল এরূপ কোনো প্রমাণ নাই।

এই কয়েকটি সুপরিচিত ঐতিহাসিক তথ্য। দীনেশবাবুও এগুলির উল্লেখ করিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই কয়েকটি তথ্য হইতে বাংলায় বৈদ্যজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে কি অনুমান করা যায়? দীনেশবাবু অনুমান করিয়াছেন যে, কর্ণাট-বংশীয় সেন-রাজাদের আমলে বৈদ্যেরা সম্ভবতঃ বাংলায় আসিয়াছিলেন এবং বাংলার এক বা একাধিক সামাজিক গোষ্ঠীর সহিত তাঁহাদের সংমিশ্রণের ফলেই বৈদ্যনামক একটি বিশিষ্ট জাতি বাংলায় গড়িয়া উঠিয়াছে। এই অনুমান প্রমাণসহ না হইলেও সংগত ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে কোনো বাধা নাই। কিন্তু ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে ইহাই স্বাভাবিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে যে, যে সমুদয় বৈদ্য প্রাচীনকালে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে কর্ণাটে ও পাণ্ড্যদেশে বিদ্যাবত্তার জন্য প্রসিদ্ধ ও উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হইতেন কর্নাট হইতে সেন-রাজগণ আসিবার কালে সম্ভবতঃ তাঁহারাই সঙ্গে আসিয়াছিলেন।

কিন্তু দীনেশবাবু এই স্বাভাবিক অনুমান না করিয়া ধরিয়া লইয়াছেন যে, বর্তমান কালে তামিল দেশে যে ক্ষৌরকার জাতি অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচিত এবং গ্রাম্য চিকিৎসক হিসাবে বৈদ্য বলিয়া অভিহিত তাহাদের পূর্বপুরুষেরাই সেন-রাজাদের আনুকূল্যে বাংলায় আসিয়া বৈদ্যজাতি গঠন করিয়াছে। বর্তমানকালের তামিল দেশবাসী অম্বষ্ঠ ক্ষৌরকার সেন-রাজাদের সময়ে, অর্থাৎ প্রায় সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে, আদৌ ছিল কি না তাহা বিবেচ্য, কারণ ইহার কোনো প্রমাণ নাই। প্রমাণ থাকিলেও কর্ণাট দেশের সেন-বংশীয়েরা অভিজাত শ্রেণীর স্বদেশীয় বৈদ্যদের না আনিয়া ভিন্ন প্রদেশস্থ তামিল-ক্ষৌরকারদের সঙ্গে নিয়া আসিবেন কেন তাহা সহজে বোধগম্য হয় না। আর, বাংলার বৈদ্যেরা যে আদিতে অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচিত ছিল না, দীনেশবাবু নিজেই এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন*। কর্ণাটের বৈদ্যগণ কখনও অম্বষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হয় নাই— অথচ তামিল-ক্ষৌরকারগণ জাতি হিসাবে অম্বষ্ঠ এবং বৃত্তি হিসাবে বৈদ্য ইহাও দীনেশবাবু স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং পাঠকবর্গ অনায়াসেই বিচার করিতে পারেন যে, আমি যে স্বাভাবিক অনুমানের কথা বলিলাম এবং দীনেশবাবু যে অনুমান করিয়াছেন ইহার মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের 'আদিশূরের কাহিনী' প্রবন্ধটি প্রকাশের পর তার অন্তর্গত কয়েকটি অভিমত খণ্ডন ক'রে কিছু লেখা আমাদের হস্তগত হয়। লেখাগুলির প্রতিপাদ্য বিষয় প্রায় এক, সুতরাং তার মধ্যে একটি— ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের আলোচনাটি— এখানে পত্রস্থ করা গেল। এই লেখাটি দীনেশবাবু দেখেছেন; উত্তরে তিনি আরও কিছু অতিরিক্ত যুক্তি দেখিয়ে ও তথ্য সংযোগ করে নিজ অভিমত সমর্থন করেছেন। কোনো বিতর্কেরই শেষ নেই। সেইজন্য তাঁর রচনাটি আর প্রকাশ করা গেল না। এ বিষয়ে আলোচনা আমরা এখানেই সমাপ্ত করলাম।

সম্পাদক, বিশ্বভারতী পত্রিকা

---

১ পরবর্তী পাদটীকায় উদ্ধৃত দীনেশবাবুর উক্তি হইতে মনে হয় যে তাঁহার মতে কোনো বৈদ্যঐতিহাসিক যদি বৈদ্যজাতির সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত বা অনুমানের প্রতিবাদ না করেন তবে বুঝিতে হইবে তিনি ইহা সমর্থন করেন, সুতরাং আশা করি এই সমালোচনায় দীনেশবাবুর সম্পূর্ণ সমর্থন আছে।

পাদটীকায় পরলোকগত হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী ও আমার একখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। এ বিষয়ে আমার কৈফিয়ত আমি এই সমালোচনার পরবর্তী অংশে দিয়াছি। ৺রায়চৌধুরীর বক্তব্য সম্বন্ধে তৎপ্রণীত *Political History of Ancient India* পঞ্চম সংস্করণ (১৯৫০) ২৫৬ পৃষ্ঠায় ৪নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য। এ বিষয়ে তাঁহার মত আমি সমর্থন করি।

২ "The genuineness of these traditions has not been questioned by greatest Bengali historians of today who happen to be vaidyas by caste" (Jounrnal, U. P. Historical Society, Vol. xviii, p. 156.

* ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন এবং সংস্কৃত ভাষায় রাজপ্রশস্তি রচনা করিয়াছেন।

৪ "The present-day Ambasthas of the Tamil land and Malabar (their early distribution in South India may have been wider) appear to be referred to as *Vaidyas* in inscriptions dating from the seventh century".

৫ ২নং পাদটীকায় মূল উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে।

৬ "বাংলার বৈদ্যেরা চিকিৎসা-ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন—সুতরাং মনুস্মৃতিতে উল্লিখিত চিকিৎসা-ব্যবসায়ী অম্বষ্ঠের সহিত বাংলার বৈদ্যরা সম্পর্ক স্থাপন করিবেন ইহা খুবই স্বাভাবিক" (Journal U. P. Historical Society, Vol. xxviii, p. 158) —দীনেশবাবুর এই যুক্তি সঙ্গত মনে হয়।

রবীন্দ্র-সাহিত্য-পাঠ। প্রথম খণ্ড। হরপ্রসাদ মিত্র। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলিকাতা ৬। নয় টাকা।

রবীন্দ্রনাথের জীবনবেদ। সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৬। পাঁচ টাকা।

ফরাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ। সঙ্কলক ও অনুবাদক পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলিকাতা ১২। পাঁচ টাকা।

Can Grande-র নিকট লিখিত পত্রে দান্তে নিজেই তাঁর কোমেদিয়ার সুস্পষ্ট ও বিভিন্ন চারটি অর্থপর্যায় বিশ্লেষণ করে দিয়েছিলেন, প্রাচ্য ভূখণ্ডে যাঁর রচনাসমগ্র অন্তত হৃদয়ের দিক থেকে কোমেদিয়ার অন্যূন প্রতিকল্প সেই রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থপরিচয় লিখে যেতে কখনো শ্রান্তি মানেন নি। অথচ উচ্চাশী পাঠক, কথিত আছে, সর্ববিধ রচনা পড়ে থাকেন একমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থতৃপ্তির অভিলাষে, অতএব অবিনশ্বর রচয়িতার সঙ্গেও তাঁর একমত না হওয়া বিচিত্র নয়। যা-কিছু অনিঃশোষিত বহুব্যবহার্য বা বহুপঠিত রচনা যেহেতু তা কিছুতেই কোনো বিশ্লেষণেই সম্যগাচ্ছাদিত হয় না তাই দেখা যায় একজন নতুন পাঠক এসে নিজের উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়ে রচয়িতার উৎকীর্ণ অভিজ্ঞতা থেকে নতুন অর্থ নিষ্কাষণ করেন, কবি অডেন পাঠ-কার্যকে যে তর্জমার তুল্য বিবেচনা করেছেন তা প্রথমত ঐ রচনার গূঢ়ার্থপ্রতীতি এবং আত্মোপলব্ধির সহায়ক বলেই, কিন্তু অতঃপর দ্বিতীয় প্রসঙ্গও ওখানে উপস্থিত ; প্রত্যেকটি যুগজয়ী ও যুগন্ধর রচনাই যেকালে সম্মানিত প্রত্নলিপির তুল্য এবং সেখানে সমাবৃত থাকে নির্বচন, তার প্রত্যেকটি পাঠোদ্ধার পাঠকের স্বগতবলয় থেকে বিবৃত হতে চায়। প্রত্যেক রচনাপাঠই অত্যন্ত ব্যক্তিগত পূত ও নিভৃত, কিন্তু কোনো অস্তিত্ববহ পঠনই নিরুচ্চার নয়। প্রায়-অসাধ্য দান্তে অনুবাদে শ্রেষ্ঠ-ওয়ার্ডসোয়ার্থের সংহত ও প্রোজ্জ্বল শৈলী প্রয়োজন বলে আর্থার সাইমন্‌স্‌ যে উল্লেখ করেছিলেন, সেই পরিশীলন অতএব সকল সৎ পাঠক তথা নবীন ভাষ্যকারের পক্ষেই অতিপ্রয়োজন সন্দেহ নেই।

অডেন অবশ্য দেখিয়েছেন এই পরিশীলন পাণ্ডিত্য নয়, জাগর ইন্দ্রিয়ের অধিকার, কিন্তু যে-পাঠক ভাষ্যকারের ভূমিকায় সমর্পিত তাঁর পক্ষে প্রথমটি আদৌ অস্বীকার করা দুরূহ। শ্রেষ্ঠ সমালোচনায় পাণ্ডিত্য নিহ্নুত থাকে সন্দেহ নেই এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই তার দীপ্ত দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, কিন্তু উভয়ের সমাহারেই যে বিশ্বাসযোগ্যভাবে দায়িত্বশীল ভাষ্য রচিত হয়, সমালোচনার ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। এই ভূমিকা করতে হল তার কারণ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ মিত্র তাঁর সাহিত্যপাঠকের ডায়েরি থেকে আজ পর্যন্ত মূলত পাঠকের প্রতিক্রিয়া প্রণীয়নেই আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এই বইয়েরও গোড়াতেই তিনি বলে নিয়েছেন, 'রবীন্দ্র-সাহিত্য-পাঠ' 'পাঠকের আত্মচিন্তা', এবং সেই আত্মাভিসারের সপক্ষে যুক্তি লিখেছেন, 'যাঁর অনুভূতি নেই, তিনি সমস্ত খণ্ডবিদ্যায় বিদ্বান হয়েও রবীন্দ্র-সমালোচনার চাবিকাঠিটি খুঁজে পাবেন না।' শ্রীযুক্ত মিত্র নিজে কবি, পরন্তু রবীন্দ্রনাথ-কথিত 'সাহিত্য-ইন্দ্রিয়' বিষয়টির ব্যাখ্যাসূত্রে রবীন্দ্রনাথের যে উক্তিটি তিনি উদ্ধার করেছেন: 'সাহিত্য আমাদের নূতন একটি ইন্দ্রিয়ের মতো হইয়া জগৎকে আমাদের কাছে নূতন করিয়া দেখায়'— স্বকৃত আলোচনক্ষেত্রেও সেই ইন্দ্রিয় তিনি সমাহরণ করে আনতে যত্নবান,

এবং সাহিত্যের ইঙ্গিতধর্মে রবীন্দ্রনাথের যে আস্থা এই বইয়েরই কোনোখানে তিনি বিবৃত করেছেন সেই বিকিরণপ্রতিভা তাঁর নিজের আলোচনেও ইতিপূর্বেই স্বাক্ষরিত হয়েছে। অবশ্য এই বিকিরণপ্রতিভা তাঁর রচনাকে সঙ্কেতধর্মী করে নি, পরিবর্তে প্রসন্ন কিরণমণ্ডনে বরদা করে তুলেছে। দুরূহসরল-নির্বিশেষে সর্বক্ষেত্রেই তিনি রম্যবাক্, হয়তো এই কারণে তাঁর ভঙ্গিটি ঈষৎ ছড়ানো, তিনি একটি সূত্র থেকে বহুদূরে পক্ষবিস্তার করে যান, আবার উপসংহারে সমস্ত জাল গুটিয়ে আনেন।

রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক এই গ্রন্থেও মূলত তিনি রবীন্দ্র-সাহিত্য-পাঠের বিচিত্র আনন্দ লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছেন এবং সেই সূত্রেই রবীন্দ্রসত্তার নানামুখিতার কথা তাঁর মনে এসেছে। অবগাহনের আনন্দই তাঁর জ্ঞাপনীয়, কিন্তু সুদ্ধ আন্তরিকতার মধ্যে যে একধরণের মেঠো সরলতা থাকে সেই দারিদ্র্য স্বীকারে তাঁর রচনা কদাপি সম্মত নয়। বস্তুত এই বই বিশেষভাবেই বিষয়মনস্ক, প্রতিটি অমল অনুভবের পাশে এখানে প্রাসঙ্গিক জ্ঞানের বহুল আয়োজন ঘটানো হয়েছে, কিন্তু তথ্যের সমস্ত উচ্চশির শোভাযাত্রাই তাঁর আকর্ষণীয় রচনাভঙ্গিটির গুণে আলাপচারীর মতো মনোজ্ঞ মনে হয়। সাহিত্যপাঠকের যে চেহারা ক্ষিতিমোহন সেনের বলাকা-ভাষ্যে এবং মোহিতলাল মজুমদারের 'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য'-শীর্ষক টীকাসমুচ্চয়ে প্রতিভাসিত হয়ে ওঠে শ্রীযুক্ত মিত্র তার মধ্যবর্তী একটি স্বখাতসরণী বেছে নিয়েছেন, কবির ব্যক্তিত্ব কিংবা পাঠকের অহঙ্কার কোনোদিকেই চূড়ান্ত আমল না দিয়ে পরিবর্তে এতাবৎকাল পর্যন্ত রবীন্দ্রালোচনার একটি সুচারু সঙ্কলন তিনি প্রস্তুত করেছেন যার মধ্যে অধিকন্তু আস্বাদ্যমানতার স্বতোচ্ছল তরঙ্গপ্রণোদনা স্পষ্ট অনুভব করা যায়।

এই বই রবীন্দ্রসাহিত্যের কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস নয় যদিও 'আদিকথা'-নামক সূচনাংশটি সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যের সুলিখিত একটি ভূমিকা। অপরাপর নিবন্ধিকাগুলিতেও সামগ্রিক কবিজীবনের পটভূমিকায় খণ্ডরচনাগুলিকে প্রতিপাদিত করা হয়েছে। ঐ রচনাগুলি অবশ্য বিশেষভাবেই স্বয়ংসম্পূর্ণ, গ্রন্থাংশবিশেষ নয়। 'আকাশ ও রঙমহাল' এবং 'শৃঙ্গার ও রবীন্দ্রনাথ' দুটি কৌতূহলোদ্দীপক রচনা, লেখকের বৈচিত্র্য-সন্ধান সপ্রমাণ করে।

শ্রীযুক্ত মিত্র রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র ও সমাজ-চিন্তার অনুসন্ধানে তাঁর ধর্মচিন্তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বর্ণনা করেছেন। এই সূত্রই অনেক বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে 'রবীন্দ্রনাথের জীবনবেদ' নামক গ্রন্থে। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার দেখিয়েছেন, মানবপ্রেমই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টি ও জীবনদর্শনের মূল সুর এবং রবীন্দ্রনাথের সেই সামাজিক চরিত্রটিকে উপনিষদানুগ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। কিন্তু সেই সঙ্গেই তাঁকে দেখাতে হয়েছে বায়বীয় আধ্যাত্মিকতা থেকে বাস্তবধর্মানুসরণে কবির ক্রমপরিণাম। বস্তুত রবীন্দ্রজীবনে উপনিষদের প্রভাব-বিষয়টিকে তিনি সামাজিক প্রগতির দিক থেকে অধ্যয়ন করতে চেয়েছেন।

'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' নামক গর্কি-কথিত সেই শীর্ষকটি একসময়ে বাঙলাদেশে রবীন্দ্রনাথবিষয়েও বিশেষ ব্যাপৃত হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সেই প্রগতিবাদী ভাষ্যমালা অনেকদিন হল অপ্রাসঙ্গিক প্রমাণিত হয়ে গেছে। শ্রীযুক্ত মজুমদার এই ঈষৎ-প্রতন সূত্রটিকেই পুনর্বার পর্যালোচনার দায়িত্ব নিয়ে 'সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি'র মধ্যে যথোচিত সাম্প্রতিকতা এবং ঔদার্যের অবতারণা করতে পেরেছেন। আগাগোড়া বহুল-রবীন্দ্রোক্তিনির্ভর এই পর্যালোচনা যে পরিমাণে আত্মমৌলিকতায় বিশ্বাসী সম্ভবত ততদূর অভিনব নয়, কিন্তু

পূর্বভাষিত সূত্রগুলিকে এই গ্রন্থে লেখক একলক্ষ্যভাবে তাঁর নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পেরেছেন, সন্দেহ নেই।

অবশ্য এ কথা ঠিক যে প্রগতিবাদ ও মানবতাবাদ সমার্থক নয় এবং রবীন্দ্রনাথের উপনিষদানুপ্রেরিত লোকপ্রীতিই লেখকের অনুধাবনীয়। সে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের জীবনরতি কিংবা বিশ্বাত্মবোধ, অথবা বৌদ্ধ মহাযানধর্মের সর্বাস্তিবাদ নামে বিশ্বজনীন শ্রদ্ধাটির প্রতি তাঁর নিঃশেষ আনুগত্য এই গ্রন্থেরও আলোচ্য হয়ে পড়েছে। উপনিষদকে শাঙ্করভাষ্য থেকে মুক্ত করে রবীন্দ্রভাষ্যে যথাযথভাবে স্থাপন করতেও লেখক সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ এবং রবীন্দ্রনাথের সামাজিক সংগ্রামের পশ্চাতে উপনিষদের উপস্থিতিকে যে অখণ্ড নিষ্ঠায় লেখক প্রতিপাদন করেছেন ততদূর উপনিষদময়তা এই মুহূর্তে রবীন্দ্র-সমালোচনায় আর উচ্চারিত হয় কি না সন্দেহ। এমনকি শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর বিস্তারিত পুস্তকেও সম্ভবত উপনিষদকে ততখানি সম্মানিত করতে পারেন নি এবং রবীন্দ্রবিষয়ক একখানি ডি. লিট.-গবেষণা উপনিষদের তাত্ত্বিকতায় রবীন্দ্রসংরাগ স্পষ্টতই অস্বীকার করেছে। রবীন্দ্রনাথের আত্মীকরণ সামর্থ্যের কথাও লেখক বলতে ভোলেন নি সুনিশ্চিত, কিন্তু যে প্রত্যয়ে রবীন্দ্রনাথের উপনিষদনির্ভরতা ও উপনিষদের মানবতাবাদ প্রকটন করেছেন ততখানি অমোঘ সংকলন হয়তো এই গ্রন্থে নেই। উপরন্তু অধ্যাত্মবাদ ও বাস্তবতাবোধ ঠিক লেখক-কথিতমতো কোনো কবির জীবনেই এইভাবে সংস্থিত থাকে না বলে আমাদের বিশ্বাস।

অপিচ সূচনাতেই ঐতিহাসিকভাবে রচনাপাঠের যে প্রস্তাবনা রয়েছে সেই প্রস্তাবনাটিতে লেখকের সমালোচন-বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'রবীন্দ্রমানসের বিকাশের ধারা'-অধ্যায়টি যতদূর কৌতূহলী করে ততখানি পরিতৃপ্ত করে না বটে কিন্তু আগাগোড়া গ্রন্থটির মধ্যে একধরণের সাবলীলতা রয়েছে যার ফলে গ্রন্থটি মোটামুটি সুপাঠ্য।

'ফরাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কতিপয় উল্লেখযোগ্য ফরাসীভাষ্য সঙ্কলিত হয়েছে। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পাঠক স্যাঁ জন প্যার্স, প্রথম রবীন্দ্রানুবাদক আঁদ্রে জিদ, ভারতানুরাগী রোম্যাঁ রোলাঁ ও রবীন্দ্রনাথ'এর সম্পর্কবিষয়ে আঁদ্রে মোরোয়ার রচনাগুলি ঐতিহাসিকভাবে মূল্যবান। 'ঘরে বাইরে' বিষয়ে লুই জিলে এবং রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে ফিলিপ স্ত্যার্ন আর্নল্ড্ বাকে-র নিবন্ধদুটি অতি বিচক্ষণ পর্যালোচনা। অন্যান্য রচনাগুলি অধিকাংশই মোটামুটিভাবে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অভিভূত প্রতিবেদন, ফরাসীদেশে রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি অন্তরঙ্গ দিক এখানে উদ্ঘাটিত হয়েছে। এঁদের কয়েকজনকে রবীন্দ্রনাথের চেনা-শোনা মানুষের মধ্যে সুনিকট স্থান দিয়েছেন রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; পারীতে রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি মাদ্‌মোয়াজেল সুজান্ কার্পেলেস এবং রবীন্দ্রচিত্রপ্রদর্শনীর উদ্যোক্তা কঁতেস আনা দ্য নোয়াই-এর বিবরণদুটিতে এক দিকে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ জীবনের অনুচ্চারিতপূর্ব কয়েকটি রেখা স্থান পেয়েছে, অপর দিকে রবীন্দ্রজীবনে এঁদের অনায়ত ও অনিবার্য ভূমিকাকে স্পষ্ট করে তুলেছে।

শ্রীযুক্ত পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থে রবীন্দ্রজীবনীর কয়েকটি অপরিহার্য এবং মহার্ঘ্য উপাদান সঙ্কলন করে দিয়েছেন সন্দেহ নেই। তাঁর পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের সমগ্র ব্যক্তিত্ব পরিগৃহীত এবং তাঁর তর্জমাকার্য বিশ্বস্ত, উপরন্তু এই সঙ্কলনের অন্ত্য রচনাটির সঙ্গে তাঁর স্বলিখিত অবতরণিকা ফরাসীদেশ ও রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্যে ভরা।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। সুশীল রায়। জিজ্ঞাসা, কলকাতা ২৯। মূল্য দশ টাকা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন ও প্রতিভার সামগ্রিক পরিচয় উদ্ঘাটিত করে সুশীল রায় শুধু একজন প্রকৃত সম্মাননীয় পুরুষের প্রতিই কর্তব্য করলেন না, বাঙালি জাতির ঋণও অংশত পূরণ করলেন। বেশির ভাগ মানুষ জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে জানেন রবীন্দ্রাগ্রজ বলে, যিনি বাল্য-কৈশোরের অধ্যায়ে প্রতিভাধর অনুজের প্রধান পৃষ্টপোষক ছিলেন। আর জানেন সেই অত্যাশ্চর্য মহিলার স্বামী বলে, যিনি জীবন ও মৃত্যু দুইয়ের প্রভাবেই রবীন্দ্রকবিতার অরুণোদয় মুহূর্তকে উদ্ভাসিত করেছিলেন।

কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব রূপে যেমন, বহুবিচিত্র মেধা ও কর্মশক্তির অধিকারীরূপে তেমনি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেও যে একজন অনন্যসাধারণ মানুষ, এ অনেকেই জানেন না। রবীন্দ্রখ্যাতির অতিব্যাপ্তিই তাঁকে অনেকটা আড়াল করে ফেলেছে, যেমন ফেলেছে বরণীয় দ্বিজেন্দ্রনাথকে এবং মহীয়সী স্বর্ণকুমারীকেও। রবীন্দ্রনাথ যদি ওঁদের অনুজ না হতেন, যদি জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ির সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অন্যান্য কুশীলবের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে ওঁরা হতেন একক ব্যক্তিত্বে অধিষ্ঠিত, তাহলে নিশ্চয় ঢের বেশি বড় দেখাত ওঁদের। স্মরণীয় ভিক্টোরিয়ান মনীষীদের প্রসঙ্গে লীটন স্ট্র্যাচি এক জায়গায় বলেছেন, ফাঁকা মাঠে মাথা তুলে দাঁড়ালে যে-গাছকে মহামহীরুহ মনে হত, বৃহৎ বনস্পতির পাশে পড়লে তা হয়ে দাঁড়ায় সাধারণ একটা গাছ।

কথাটা খুব খাঁটি মনে হয় ঠাকুর ভ্রাতা-ভগিনীদের ক্ষেত্রে। বিশেষ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কথাটা খাটে সবচেয়ে বেশি। কবি, নাট্যকার, মঞ্চাধ্যক্ষ, গায়ক, সুরকার, সংস্কারক, সংগঠক, বিজ্ঞানবেত্তা— বিচিত্র ভূমিকায় জ্ঞান ও কর্মের সাধনা করেছেন তিনি এবং কোনো বিভাগেই তাঁর দক্ষতা নগণ্য নয়। পেশাদার রঙ্গমঞ্চ জন্মানোর আগেই শৌখিন মঞ্চে তিনি উন্নত অভিনয়শৈলী প্রবর্তন করেছিলেন। বাংলা স্বরলিপির যে-প্রচলিত রূপটা আজ আমরা দেখি, এর আদি উদ্ভাবকদের একজন তিনি। বাংলা ভাষায় শর্টহ্যাণ্ড বা লঘুলিপি প্রবর্তনের চিন্তাও প্রথম এসেছিল তাঁর মাথায়। শিক্ষিত বাঙালিকে রাজনীতিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহিত করতে অগ্রণী হয়েছিলেন যাঁরা, তিনি তাঁদেরও একজন।

একাধারে কতদিকে মাথা খেলত তাঁর উপরের তালিকাই তার প্রমাণ। বোধ হয় একসঙ্গে এতদিকে মন দিয়েছিলেন বলেই মননশীলতা তাঁর কোনো একটা ব্যাপারকে একাগ্র নিষ্ঠায় আঁকড়ে ধরে নি, আর তা ধরে নি বলেই তিনি হয়েছেন অনেক কিছুর সমাহার, বিশেষ একটা-কিছু বা বিশেষ-একজন-কেউ হন নি। অসাধারণতার মার্কা নিয়েও বহুমুখিতা অনেক সময় একমুখী সাধারণতার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারে না দেখা যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বোধ হয় এদিকের একটি সমুজ্জ্বল অথচ সকরুণ উদাহরণ। অবশ্য উল্টো দিকেরও দৃষ্টান্ত আছে: যেমন গ্যেটে, যেমন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। কিন্তু যুগন্ধর ব্যক্তিত্ব কোনোকালেই সুলভ নয়। প্রতিভার সর্বতোভদ্র স্বীকৃতি বা ব্যাপ্তি তাই চিরদিনই ইতিহাসের বিস্ময়।

তা ছাড়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনদর্শনে গ্রন্থনসূত্রের একটু ঢিলেমি কোথাও নিশ্চয় ছিল, যে-কারণেও হয়তো প্রচুর প্রতিশ্রুতি তাঁর সমুচিত সফলতার লক্ষ্যভেদ করতে পারে নি। অনেক কাজই তাঁর কাছে ছিল খেলার সামিল। অতি অনায়াসে আয়ত্তে এসেছিল বলে, ফেলে-ছেড়ে খেয়াল-খুশিতেই অনুশীলন করেছেন তিনি রকমারি বৃত্তি ও বিদ্যার। খেয়াল নিরস্ত হয়েছে যে-ই, অমনি এক বিষয় থেকে

বিষয়ান্তরে চলে গেছেন তিনি, একবারও পিছনে না তাকিয়ে। তাই দেখি কখনো করোটি-বিদ্যা নয়তো রত্নবিদ্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন তিনি। কখনো ব্যস্ত রয়েছেন আমাদের একটা সার্বজনীন জাতীয় পরিচ্ছদ উদ্ভাবন নিয়ে। কখনো নর-নারীর সমান সামাজিক অধিকার থাকা শ্রেয় কিনা, তা নিয়ে প্রভূত ভাবা-চিন্তা করছেন। কখনো বা বুঁদ হয়ে আছেন গান, নৃত্য ও নাটক নিয়ে। কখনো আবার ঝাঁপিয়ে পড়েছেন কর্মের তরঙ্গে। জাহাজের কারবার, কল-কারখানা, স্বদেশিয়ানা আকর্ষণ করেছে তাঁকে।

লক্ষণীয় যে সার্থক পরিসমাপ্তি বা পূর্ণ সাফল্য লাভ তাঁর হয় নি এর কোনোটাতেই। কিন্তু এই খণ্ড-খণ্ড প্রয়াস-প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়েই অভিব্যক্ত হয়েছে তাঁর স্বভাব-প্রকৃতিটা, যা মহৎ এবং সেই কারণেই প্রণিধানের বস্তু। বৈষয়িক বুদ্ধির নিরিখে হিসাব করে হয়তো বলব আমরা যে আপন স্বভাবসিদ্ধ প্রবণতাটুকু ধরতে না পারার ফলেই মন তাঁর এক-একবার এক-এক দিকে ছুটেছে, হাত ধরেছে এক-একবার এক-একটা জিনিস। কিন্তু কোনোটাই অন্তর্লোকে জাগাতে পারে নি সেই একাগ্র নিষ্ঠা, যা তপস্যার আকারে মূর্ত হয় মহান শিল্পী বা বৃহৎ কর্মীর জীবনে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এ-মাপকাঠি কিছু দূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারলেও, খুব বেশি দূর টানতে পারবে না আমাদের। শেষ পর্যন্ত আমাদের মেনেই নিতে হবে তাঁকে খেয়ালী প্রতিভা বলে এবং খেয়াল জিনিসটা যে অনির্বচনীয়, এ আর কে না জানেন?

সেই কারণেই এই অসাধারণ মানুষটিকে সমগ্র করে বোঝা ও বোঝানো কোনোটাই সোজা কাজ নয়। কিন্তু কঠিন বলেই এতে হাত দিয়েছেন সুশীল রায়, যিনি নিজেও সৃজনী ও বিশ্লেষী শক্তির বহুমুখিতায় খ্যাতিমান। তাঁর এই সযত্ন শ্রমে রচিত গ্রন্থে মানুষ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আলেখ্যটি যেমন অনবদ্য হয়ে ফুটেছে, তেমনি তাঁর অন্তের রূপটিও মূর্ত হয়েছে চমৎকার হয়ে। আর এ-দুইয়ের সমীকরণ হয়েছে যে-সাহিত্যসৃষ্টিতে, তার পরিচিতিও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে বিশদ ও বিস্তারিত আকারে। এক সঙ্গে তিনটি ধারাকে এনে মিলিয়েছেন তিনি ব্যক্তি-বিচারের এক মনোরম সাগর-সঙ্গমে। তিনি দেখিয়েছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রতিভা-ভাস্বর ভাসমান মনের অন্তরালেও স্থিতিশীল আশ্রয় দুটি, একটি হল ক্ল্যাসিক্স বা ধ্রুবপদী সাহিত্য, আর-একটি রেখাঙ্কন।

এ-দুইয়ের অনুধ্যান করেছেন তিনি সারা জীবনই গভীর ও অবিচ্ছিন্ন ঐকান্তিকতায়। প্রথমটির ফলে আমরা পেয়েছি সংস্কৃত ভাষার প্রায় সমস্ত নাটকের নিখুঁত মূলানুগামী অনুবাদ, আর পেয়েছি ফরাসি কবিতা, গল্প-উপন্যাস ও প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিশাল একাংশের অনুবাদ। বাঙালি পাঠকের হাতে মলেয়ার, জোলা, ব্যালজাক, মোপাসাঁ, গতিয়ে, দোদে ও হুগোকে তাঁর আগে পৌঁছে দেবার কোনো লক্ষণীয় চেষ্টা হয়েছে বলেই মনে করতে পারবেন না কেউ। তাঁর অনূদিত গল্পই বাংলা ছোটো গল্পের আদি পর্বকে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং সে অনুপ্রেরণায় কলম ধরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার ও প্রমথ চৌধুরী, যেমন তাঁর অনূদিত পীয়ের লোতির ইংরেজবর্জিত ভারতবর্ষই জাগিয়েছিল স্বদেশী আমলের ঐতিহাসিক সন্ধিৎসা। বঙ্গাক্ষরে স্বরলিপিকৃত লা-মার্সেই তাঁর অমিত কীর্তিরূপেই দূর পল্লীগ্রাম পর্যন্ত গিয়েছিল।

বাংলা সাহিত্যে ফরাসি মেজাজের প্রসঙ্গে আমরা প্রমথ চৌধুরীর নামই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। স্মরণীয় তিনি নিশ্চিতই, কিন্তু তাঁরও আগের কর্মী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, যিনি ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করে নয়, মূল সাহিত্যকেই বাঙালি রসনার যোগ্য করে পরিবেশন করে দিয়েছেন। বেশির ভাগই বস্তুনিষ্ঠ অনুবাদ

করেছেন, কিছু-কিছু করেছেন অনুসরণও, যার গণনীয় দৃষ্টান্ত হল তাঁর কৌতুকনাট্যগুলি। এদিকটার আলোচনা বইয়ে আর-একটু বিশদ হলে ভালো হত। কারণ অধিকাংশ লেখাই অদ্যাবধি সংগৃহীত হয় নি এবং অযত্ন ও অনবধানে অনেক কিছুই আস্তে আস্তে আজ জন-মন থেকে স্খলিত হয়ে যাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে আর হয়তো খুঁজেই পাওয়া যাবে না তাদের। আমাদের কর্তব্যবুদ্ধি হাতের কাছে পাকা ফল পেলে যদিবা জাগ্রত হয়, গাছ থেকে পেড়ে আনার পরিশ্রম সয় না আমাদের অনেকেরই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রেখাঙ্কনের আলোচনাটিও হয়েছে বইয়ের একটি মূল্যবান অধ্যায়। কত হারিয়ে-যাওয়া মানুষের মুখই ধরে রেখেছেন তিনি রেখার বন্ধনে! বিহারীলাল চক্রবর্তীকে দেখারই অবকাশ হত না আমাদের, যেমন হত না কিশোর রবীন্দ্রনাথকে, কোমলা কাদম্বরী ও বালিকা ইন্দিরাদেবীকে বা ছোকরা বারবলকে। ছবি আঁকার ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন সার্বভৌম মানুষের পূজারী। মানুষের মুখ মাত্রেই ছিল তাঁর কাছে সুন্দর, শাশ্বত সত্য, সে-মুখ যারই হোক। এই যে বিশ্ববিতত মানবপ্রীতি, এ-ই ছিল শিল্পীর আন্তর-স্বরূপ এবং এ-জায়গায় তিনি প্রকৃতই রবীন্দ্রাগ্রজ। ভিতরের এই সত্তা-পুরুষটিকে সুশীল রায় জীবন্ত করেছেন একই সঙ্গে কবির রসদৃষ্টি, দার্শনিকের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ও ইতিহাসকারের সত্যানুগামিতা আশ্রয় করে। বইটি পড়ে তাই মুগ্ধ হয়েছি, উপকৃতও হয়েছি।

একটা কথা শুধু উল্লেখ করব। কাদম্বরী প্রসঙ্গের উপর একটা অস্পষ্টতার যবনিকা প্রলম্বিত রয়েছে সুদীর্ঘকাল। সুনয়নীদেবী অল্প একটু উন্মোচিত করেছিলেন এই যবনিকা, কিন্তু তা নিতান্তই অল্প। সুশীল রায়ের হাত এখানে আর-একটু দৃঢ় দেখার ইচ্ছা ছিল, কারণ রবীন্দ্রজীবন-ব্যাখ্যানে তার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এ-ছাড়া কর্পূরমঞ্জুরী বইটির পরিচয় হিসাবে সংস্কৃত নাটক বলা হয়েছে, ওটা হবে প্রাকৃত, আর ডি-রোজিওর কাব্যগ্রন্থটি বোধ হয় লণ্ডনে নয়, কলকাতাতেই ছাপা হয়েছিল। কিন্তু এ-সবই উপেক্ষণীয় ত্রুটি। সমগ্রভাবে বইটি অপূর্ব এবং বাংলা ভাষার একটি অগ্রগণ্য সংযোজন হিসাবে এ-বই স্মরণীয় হবে।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

নৈরাজ্যবাদ। অতীন্দ্রনাথ বসু। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলিকাতা ১২। মূল্য দশ টাকা।

যাস্কের নিরুক্তে লিখিত আছে যে দেবতারা যখন ঋষিদের সাথে এই ধরণী পরিত্যাগ করে গেলেন তখন মনুষ্যসমাজে ক্রন্দনের রোল উঠল— কে আমাদের চালিত করবে? দৈববাণী হল— কেন তোমাদের নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি বিচার বিশ্লেষণ শক্তি মেধা। কিন্তু এই মনন নিদিধ্যাসনের পিছনে আছে এক স্বপ্নালু তন্ময়তা— সে জানে তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা তবু তার ভাবতে ভালো লাগে এক স্বর্ণযুগের কথা, যেখানে অভাব নেই, অনটন নেই, বন্ধন নেই, শাসন নেই। প্রত্যেক দেশের চিন্তাশীল লোকেরাই এইরকম এক ধরণের কল্পনার রাজ্যে ছুটেছেন যেখানে অবিচার নেই, অত্যাচার নেই, রাষ্ট্রের নাগপাশ নেই, কর্তৃত্ব মুক্ত জনসমাজ, স্বেচ্ছায় স্বাধীন অথচ স্বেচ্ছাচারী নয়। বৃহস্পতি বললেন— পুরাকালে মানুষ ছিল ধর্মপরায়ণ ও অহিংস, পরে তারা লোভ ও হিংসার বশবর্তী হল, তখন হল ব্যবহারের প্রবর্তন। মহাভারতের শান্তিপর্বে পড়ি, তখন না ছিল রাজ্য, না ছিল রাজা, না দণ্ড, না দাণ্ডিক, প্রজারা স্বভাবধর্মে পরস্পরকে রক্ষা করত।

আজকের দিনের কবিও কল্পনা করছেন যে ইতিহাসের আদিপর্বে দানবের প্রতাপ ছিল দুর্জয়, তার পর দানবদলনের মন্ত্র পড়লেন দেবতা। ইতিহাসে কোনোকালেই স্বর্ণ যুগের কাহিনী আমরা পাই নি, আমাদের পুরাকাহিনীর অতি শৈশবযুগেও দেখেছি যে, মানুষ চিরকালের সংগ্রামী, তাকে যুদ্ধ করতে হয়েছে প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে, সমাজ ও সঙ্গীদের বিরুদ্ধে, নিজের লোভলাভ মোহ-মাৎসর্যের বিরুদ্ধে। এরই মধ্য থেকে দানা বাঁধে গোষ্ঠী সমাজ শ্রেণী রাজা প্রজা, একজনের বা কয়েকজনের কর্তৃত্ব মেনে নিতে হয়। তবু এই কর্তৃত্বের বিরুদ্ধের মানুষের মন যখনই সচেতন হয়েছে তাকে তখনই ধরে নিয়েছি যে এটা নৈরাজ্যবাদের কথা— অর্থাৎ রাষ্ট্র নেই, রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব নেই, বজ্রমুষ্টি নেই, অথচ আছে সুষম সমাজব্যবস্থা। এর পথ কোন্‌দিকে তার নির্দেশ নানাজনে নানারূপ দিয়েছেন, নানা মুনির নানা মত। সমাজসৃষ্টির প্রথমযুগ থেকে, যখন মাৎস্যন্যায়ই প্রবল, তখনই এই দৃষ্টিবোধ এসেছিল। তখন রাষ্ট্র ছিল শিশু, তার আয়তন ছিল সীমিত, তবু রাষ্ট্রীয় বন্ধন, ধর্মীয় শাসন, আর্থিক অসাম্য, ভোগ্যবস্তুর প্রতি সহজাত লুব্ধতা চিরকালই মানুষের মনকে পীড়িত করেছে— সে চেয়েছে মুক্তি, বন্ধনমোচন। এরই ইতিহাসকে পণ্ডিতেরা নামকরণ করেছেন নৈরাজ্যবাদের ইতিহাস। আড়াই হাজার বছর পূর্বে চীনের 'তাওবাদী'রা (বুড়ো দার্শনিক লাওৎসে বা তাঁর ভক্ত শিষ্য চুয়াংৎসে) বলতে লাগলেন যে যা কিছু মূল্যবোধ, আচার বিচারের বিধান, সব অর্থহীন ও কৃত্রিম। রূপ নীতি বুদ্ধি ধর্ম এই সকল মিথ্যার মোহে মানুষের বোধ শক্তি আচ্ছন্ন হয়, ব্যক্তিত্ব খর্ব হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে, এই সেদিনও উইলিয়ম গড্‌উইন, পিয়ের জোসেফ প্রুঁদ, ম্যাক্সটার্নার, মাইকেল বাকুনিন বা পিটার আলেকজণ্ডার ক্রপটকিন্‌ একটু অদলবদল করে মূলে সেই কথাই পুনরাবৃত্তি করলেন। অবশ্য গ্রীস ও ভারতবর্ষের সুদূরপ্রসারী চিন্তার ধারা এই ধরণের নৈরাজ্যবাদকে প্রশ্রয় দেয় নি। এথেনীয়দের জুরিসভায় ডেমস্থিনিস 'আইনে'র যে মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন তার চেয়ে বিস্তৃত টীকা বা ভাষ্য আমাদের আজকের রাষ্ট্র বা সমাজতাত্ত্বিকরা দেন নি বা গতকালের হবস্‌ লক্‌ রুশোর মধ্যেও পাওয়া যায় না। তাঁর মতে "যাহা ন্যায্য মান্য ও কার্যকরী, আইন তাহাই চায়, তাহারই সন্ধান করে এবং তাহা পাইলে তাহাকে একটি সর্বজনীন নিয়মের আকার দেয় যাহা সকলের কাছে এক ও সমান।" তিনি আরও বলেন যে, আইন শুধু বিজ্ঞজনের প্রস্তাব বা ঈশ্বরের দান নয়, গোটা রাষ্ট্রের এক চুক্তি, যে চুক্তি অনুসারে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকের জীবনযাপন করা কর্তব্য। তিনি তাঁর সামনে ধরেছিলেন নগররাষ্ট্রের ইতিহাস। কিন্তু গ্রীক ও রোমান নগররাষ্ট্রে ছিল অবিরাম অন্তর্বিরোধ, শ্রেণীসংগ্রাম, অসাম্য, ধনবৈষম্য, দাস প্রভুর সংঘাত। এরই প্রতিক্রিয়া হিসাবে গড়ে উঠেছিল সিনিক্‌ ও স্টোইক্‌ মতবাদ, রাষ্ট্রবিরোধী ব্যবস্থা। সক্রেটিস্‌ প্লেটো আরিস্টটল ডায়োজিনিস সেনেকা ক্রোটসের মতবাদ, সমাজের চিন্তাশীল মানুষেরই বিক্ষোভ। তারও পরের যুগে হল খ্রীস্টীয় কল্পনা— সবই ঈশ্বরের রাজ্য— ভাগ করে নাও তোমার কর্মভার — সিভিটাস্‌ ডাই, সিভিটাস হিউমানা— থাকুন ধর্মাধিনায়ক, তাঁরা বলুন ভগবান্‌ কি চান, থাকুন রাজা মহারাজা বলদৃপ্ত সম্রাটরা, তাঁরা ন্যায় বিধান দিন দেশ-শাসন করুন দুজনে মিলে— কিন্তু এই সমাজ-ব্যবস্থাও সর্বজনীন নয়, কারণ দেবতার রাজ্যে দেববিরোধীদের স্থান নেই, তা ছাড়া আছে প্রকৃতির বিধান, বলদৃপ্তের বল, লিপিবদ্ধ আইন। মধ্যযুগ পেরিয়ে বর্তমান যুগের প্রথম এলাকায় হেগেল একটি আকাঙ্ক্ষিত ও বহু পরিচিত নাম। তিনি বললেন, রাষ্ট্র ইতিহাস বিশ্ব প্রজ্ঞানের ক্রমবিকাশ। হয়তো তাই। আমরা দেখি ইংলণ্ডে গড্‌উইন্‌ অরণ্যে রোদন করছেন, প্রুঁদর সংগ্রাম হচ্ছে বিফল, 'দর্শনের দারিদ্র্য' ঘোচে না,

'ফিল্ডস ফ্যাক্টরিস্ ওয়ার্কশপ' থেকে চিৎকার করছেন ক্রপট্‌কিন্— 'লা কঁকেং দ্যু প্যাঁ'— জয় রুটির জয়। বিংশশতাব্দীতে পৌঁছে আমরা দেখেছি দু দুটো বিশ্বযুদ্ধ, বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি, বিশেষ করে প্রয়োগবিস্তার— শুধু ভাবজগতে তন্দ্রাহতই নই, শীঘ্রই হব চন্দ্রাহত— শুধু চাঁদ-মামার দেশ কেন হয়তো আগামী শতাব্দীতেই মানুষের শূন্যে যাত্রা আরও অসীম রহস্য আবিষ্কার করবে, শতশতঘ্নীর চেয়েও ব্রহ্মাস্ত্র সে আবিষ্কার করবে, অণুর রহস্যকে লুটে নিয়ে মহতের দিকে এগুবে। তখন কোন্‌বাদ কোথায় থাকবে তার ইতিহাস কেউ অনুমানও করতে পারে না। সেই 'ব্রেভ নিউ ওর্য়াল্ড' বিজ্ঞান আনবে, না, মননের স্থৈর্যে তপস্যায় নিষ্ঠায় গড়ে উঠবে তার কথা জানি না— সেখানে নৈরাজ্যবাদ সর্বাস্তিবাদে পরিণত হবে কি না তাই বা কে জানে।

অনাগতদিনের কল্পনা থাক— অতীত থেকে বর্তমানে এসে মানুষ দেখছে যে রাষ্ট্রের বজ্রমুষ্টি আজও শিথিল নয়। শ্রেষ্ঠ সমাজব্যবস্থায় সরকার থাকবে না, কিন্তু থাকবে লোককর্ম, আইন থাকবে না কিন্তু থাকবে দায়িত্ব, শাস্তি থাকবে না কিন্তু থাকবে শোধনের উপায় এই হচ্ছে নৈরাজ্যবাদের নৈতিক ভিত্তি। নিহিলিজমের মন্ত্রগুরু বাকুনিন বলতেন স্বাধীন সমবায়ের মাধ্যমে নীচের দিক থেকে উপরের দিকে সমাজের ইমারত গড়ে উঠবে, উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হবে না কোনো কর্তৃত্বের শাসন। মনে রাখতে হবে এইযুগেই প্রকাশ পেয়েছে আরও কয়েকজন বিশিষ্ট মনীষীদের চিন্তাধারা, যেমন— ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি, কসাথ, প্রুঁদ, মার্ক্স। রুশ নিহিলিজমের বীজমন্ত্র ছিল 'জনতার সামিল হও'। নৈরাজ্যবাদী দর্শনে ক্রপটকিন আনলেন 'মিউচুয়াল এডে'র কথা, শুধু আর্থিক সমতার জন্য নয়, সামাজিক নীতিমূল্যের জন্যও। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এলো 'সাবতাজ' বা কাজপণ্ড করবার 'মিথ'। এই প্রসঙ্গে ফরাসী সিণ্ডিক্যালিস্ট সরলের নাম স্মরণীয়। অতলান্তিকের অপরপারে খাস মার্কিন মুলুকে ওয়ারেন, থুরো, টাকার বলতে লাগলেন আইন কদাপি মানুষকে মুক্তি দেয় না, মানুষকেই মুক্তি দিতে হয় আইনকে। রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র নতুন ধরণের স্বৈরাচার গড়ে তোলে এটা সত্য কিন্তু রাষ্ট্রহীন সমাজব্যবস্থার বিপদ যে আরও বেশি। বারট্রাণ্ড রাসেল ও বার্ণাড শ সেই কথাই বললেন। ফেবিয়ান ট্র্যাক্টসে (১৮৯৩) শ লিখলেন— রাষ্ট্র তুলে দাও বলা সহজ— কিন্তু তার আগেই রাষ্ট্র তোমায় বিক্রি করবে, তোমায় মারবে, তোমায় লুপ্ত করে দেবে। আবার কেউ কেউ বললেন যে নৈরাজ্যবাদ এমন সব প্রত্যয় নিয়ে এমন সব মীমাংসার দিকে চলেছে যা মানবপ্রকৃতির ও জীবনসত্যের পরিপন্থী।

ডক্টর অতীন্দ্র বসু এইসব কথাই চমৎকার ভাবে পরিবেশন করেছেন আমাদের সামনে। আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা বিশেষ ধরণের সমাজতত্ত্ববাদের বিবর্তনের ইতিহাস ও দর্শন ও সঙ্গে সঙ্গে একটা সুষ্ঠু ইঙ্গিতও। বাংলা ভাষায় এই ধরণের বই পড়তে পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। ডক্টর বসু শুধু শিক্ষাব্রতী বা পণ্ডিত ছিলেন না, তিনি প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগের একজন নিরলস নৈষ্ঠিক যোদ্ধাও, সেই জন্য তাঁর চিন্তায় ভাবী সমাজ-গঠনের একটা রূপও ফুটে উঠেছিল, যার সম্পূর্ণ চিত্র আমরা অবশ্য এই পুস্তকে পাই না কিন্তু ইঙ্গিত দেখি। সেই দিক থেকে বইটি যে অসম্পূর্ণ সে কথা ভূমিকাতেই বলা হয়েছে। নৈরাজ্যবাদ সম্বন্ধে শুধু একটি প্রামাণিক ইতিহাস রচনাই নয়, গণতন্ত্র ও সমাজব্যবস্থার একটা বাস্তব সমন্বয় সাধন সম্ভব কি না এরও বিচার তিনি করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর অকালমৃত্যুতে তা সম্ভব হয় নি। তবু নৈরাজ্যবাদের ইতিহাস হিসাবেই বইটির মূল্য যথেষ্ট— তাছাড়া এর বৈশিষ্ট্য যে এই ধরণের বই পণ্ডিতরা

লিখলেও প্রকাশক বা সাধারণ পাঠকের কাছে মূল্য বেশি পায় না। তবু বইটি সুখপাঠ্য হয়েছে, সরলভাবে লিখিত হয়েছে, মতবাদগুলি স্পষ্ট করেই উল্লিখিত হয়েছে তাঁদেরই কথা তুলে যাঁরা এর প্রবক্তা। প্রাচীন যুগ থেকে বিপ্লবযুগ পর্যন্ত ইতিহাসকে টেনে এনেছেন লেখক কিন্তু ইতিহাসকে বিশ্লেষণ ধর্মী না করে। অনেকে মনে করেন নৈরাজ্যবাদের সঙ্গে একদিকে অহিংসবাদের আর একদিকে সন্ত্রাসবাদের একটা জগাখিচুড়ি মিল আছে। ডক্টর বসু বলতে চেয়েছেন যে তা নয়, এর পিছনে আছে একটা সুষম সমাজ চিন্তা যার ঐতিহাসিকতার ধারাবাহিকতা সুবিদিত। কিন্তু এর পিছনে ইতিহাসাশ্রয়ী তথ্যগুলি তুলে দেন নি— হয়তো সম্ভব হয় নি অন্য কারণে। কোনো দেশেই শুধু রাষ্ট্র বা রাজবিধান দিয়েই সমাজব্যবস্থা বিবর্তিত হয় নি জীবনে প্রতি পদে শাস্ত্রবিধান এসেছে এবং অলিখিতি অনেক ভয়, সংস্কার, মন্ত্রের মতো কাজ করেছে অবচেতনে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপে এর চিহ্ন প্রতিফলিত। আজও আমাদের দেশে একাদশীতে বার্তাকুভক্ষণ নিষিদ্ধ। এর পিছনে আছে রাষ্ট্রের বিধান নয়, শাস্ত্রের বিধান নয় আচারের সংস্কার। অবশ্য আজ সমাজ ভাঙবে, রীতিনীতি বিধি ব্যবস্থা, তবু নিরাজবাদ যতই অবাস্তব হোক্ মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এ কথার মূল্য আছে! কিন্তু এর পন্থা শুধু রাজনৈতিক সংস্কারে নয়, বিপ্লববাদে নয়, সমাজনৈতিক অদলবদলে নয়, আত্মিক উদ্বোধনে ও উন্মোচনেও। এইখানেই ভারতবর্ষের কথা খুব সংগত ভাবে মনে পড়েছে লেখকের। টলস্টয়ের সঙ্গে তিনি স্মরণ করেছেন গান্ধী রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দকে। ভারতবর্ষের আত্মিক ইতিহাস সেই নৈরাজ্যবাদের কথাই বলে যেটার বিগলিত অর্থ হচ্ছে পরিপূর্ণ মানবত্বের কথা। The Ideal of Human Unityতে শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন Freedom, Equably, Unity are the essential attributes of the spirit— স্বাতন্ত্র্য, সমতা, একতা এসব হচ্ছে মানুষের আত্মিক গুণ— সেই জন্য the inadequacy of the State Idea সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করলেন— Subordination to a Colleclive egoism, political, military and economic which seeks to Satisfy Certain Collective aims and ambitions shaped and imposed on the great mass of the individuals by a smaller or larger number of ruling persons who are supposed in some way to represent the community···The organised state is niether the best mind of the nation nor the sum of··· energies—

তিনি বললেন— এর উপায় হচ্ছে বহিরঙ্গে বাস নয়, ঐক্য নয়, উন্নতি নয়, অন্তরঙ্গে রস-আস্বাদন— humanity united in the inner soul & not only in its outword life and body. রবীন্দ্রনাথেরও অনেকটা সেই কথা, নিজের কালকে অতিক্রম করে কালান্তরের স্বপ্ন দেখতেন তিনি, বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভের জন্য। অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতার মধ্যেই মানুষের আত্মপ্রকাশ সম্ভব। রাষ্ট্র বা সমাজ যদি সে আত্মপ্রকাশকে ক্ষুন্ন করে বা ব্যক্তিত্বের বিকাশ ব্যাহত হয় তা হলে সে ব্যবস্থার পরিবর্তন আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের সমাজচেতনা সেই পূর্ণ মানুষকেই শ্রদ্ধা জানায় কিন্তু সে মানুষ সাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। মনে হয়, যদিও রবীন্দ্রনাথ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না এবং মুক্তধারা বা রক্তকরবীতে সমাজচেতনার কয়েকটি বিশিষ্ট রূপকে ফুটিয়েছেন, আসলে তিনি অমিট্রায়ের মুখে সেই কথাই বলেছেন— মানুষের ইতিহাসটাই এইরকম— তাকে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক কিন্তু আসলে সে

আকস্মিকের মালাগাঁথা। সৃষ্টির গতি চলে সেই আকস্মিকের ধাক্কায় ধাক্কায় দমকে দমকে, যুগের পর যুগ এগিয়ে যায় ঝাঁপতালের লয়ে।

গান্ধীজির প্রথমযুগ টলস্টয়ের ভাবনায় ভাবিত, বিশেষ করে যখন তিনি দক্ষিণ-আফ্রিকায় এবং ফিনিক্স স্কুল চালাতেন। ভারতীয় এই তিন মহাজনকে ঠিক নৈরাজ্যবাদী বলা যায় কিনা জানি না, কিন্তু গ্রন্থকার যদি সেই বিচিত্র মনন শিল্পের বিশ্লেষণ করে যেতে পারতেন এঁদের চিন্তাধারার মাধ্যমে তা হলে আমরা যে এক অপূর্ব সম্পদ পেতাম সে কথা বলা বাহুল্য। ভারতবর্ষের সমাজচেতনা কল্পনা করেছে রাষ্ট্র, গণ বা গোষ্ঠীর উর্ধ্বে এক শক্তির কাছে নতি। সে শক্তি অন্তরের, তাকে এক কথায় বলা হয়েছে 'ধর্ম' যা আমার ধারক ও বাহক। রাজধর্ম প্রজাধর্ম সমাজধর্ম সেই বৃহৎ 'ধর্মে'র অঙ্গীভূত— এর জন্য ছিল গুণকর্ম বিভাগ; ধম্মপদে ঈশ্বর নিরপেক্ষ হয়ে আমাদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, বৈরীগণের মধ্যে আমরা যেন অবৈর হয়ে জীবন যাপন করি, আতুরগণের মধ্যে ক্লেশরহিত হয়ে থাকি। ব্যক্তিগত ভাবে প্রবুদ্ধ হয়ে এই আদর্শ বা ধর্মবোধকে সামাজিক সমবায়ে পরিণত করাই ভারতবর্ষের আত্মিক ইতিহাসের লক্ষ্য ছিল। গান্ধী অরবিন্দ রবীন্দ্রনাথ সেই কথাই বলেছেন।

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কাঠের কাজ। শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ। ওরিয়েণ্ট লংম্যান্স লিমিটেড্, কলিকাতা ১৩। মূল্য ৬·৭৫ পয়সা।

শিক্ষাজগতে কাঠের কাজের একটা স্থান করে দেওয়া এবং এই শিল্পের মধ্যে যে শিক্ষানৈতিক সম্ভাবনা ছিল তার পথ উন্মুক্ত করে দেওয়ার কাজে লক্ষ্মীশ্বরবাবুকে অগ্রণী বলা চলে। এই শিল্প তিনি শিখেছিলেন বিভিন্ন পরিবেশে, স্বদেশে ও ইউরোপে। জাপানী শিল্পীর কৌশলও তিনি যেমন পেয়েছেন সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার থেকে তেমনি সুইডিস্ Sloyd পদ্ধতিও আয়ত্ত করেছিলেন দীর্ঘকাল সে দেশে বাস করে। এই শিল্প শিক্ষাদানের প্রয়োজনে তাঁর যোগাযোগ ঘটে ওয়ার্ধায় গান্ধীজির সঙ্গে। শ্রীনিকেতনেরই ছাত্র ছিলেন তিনি বাল্যে, পরে শ্রীনিকেতনে এই কাঠের কাজ শিক্ষণের জন্য তিনি নিযুক্ত হন। বর্তমান গ্রন্থের একটি প্রাথমিক ক্ষুদ্র সংস্করণ প্রায় চল্লিশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর লক্ষ্মীশ্বরবাবুর কর্মজীবন বিভিন্ন জায়গায় অতিবাহিত হবার পর আবার তিনি বিশ্বভারতীতে এসে সম্প্রতি বৃহত্তরভাবে এই শিল্পশিক্ষার জন্য গঠিত প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত আছেন। এই ক্ষেত্রে তাঁর দান দেশের শিক্ষাবিৎ ও এই শিল্প বিষয়ে উৎসুক গুণীদের মধ্যে যথেষ্ট সমাদর ও স্বীকৃতিলাভ করেছে।

শুধু টেক্‌নিক্যাল শিক্ষায় নয়, সাধারণ শিক্ষার পাঠক্রমের মধ্যেও এই শিল্প এখন স্থান পেয়েছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় স্তরেই। এই শিল্পের নূতন শিক্ষক ও ছাত্রদের ব্যবহারোপযোগী বাংলা বইয়ের অভাব ছিল। 'কাঠের কাজ' বইখানি সেই অভাব দূর করবে। এর পরিকল্পনা, রচনা, চিত্র ও অন্যান্য চার্ট ডায়াগ্রাম, অঙ্গসৌষ্ঠব ইত্যাদি সবই সুন্দর। তার মধ্যে একদিকে যেমন আছে বৈজ্ঞানিক যাথার্থ্য ও স্পষ্টতা, অন্যদিকে আছে সুরুচির প্রমাণ। অধ্যায় সূচী থেকেই বোঝা যায় যে শুধু কোনোক্রমে

কাজটুকু চালিয়ে নেবার আয়োজন এ নয়, প্রতিটি প্রক্রিয়া বা পদ্ধতির পিছনে যে বিস্তৃততর জ্ঞানের ভূমিকা আছে তাও বিশদভাবে আলোচনা করার তিনি প্রয়োজন বোধ করেছেন। কাঠ শুকাইবার পদ্ধতি, কাঠের খুঁত, কাঠের সংরক্ষণ, কাঠ ও বনসম্পদ, কাঠের কাজ ও বিজ্ঞান ইত্যাদি অধ্যায় এই বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতের সূচনা করে। যন্ত্র ব্যবহার ও বিভিন্ন টেকনিকের বিবরণ সুষ্ঠু ও প্রাঞ্জল। পরিশিষ্ট কাঠের কাজের ক্লাসঘরের নক্সা ও শিক্ষার্থীর ক্লাসের কাজের রেকর্ড রাখিবার ফরম বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ এবং তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফলে লক্ষ্মীশ্বরবাবু কাঠের কাজের শিক্ষানৈতিক দিকগুলিতে উপযুক্ত দৃষ্টি দিতে পেরেছেন। আমাদের মনে হয় যে, স্তরে যে বা প্রতিষ্ঠানে কাঠের কাজ পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেই সব জায়গাতেই এই বইখানি বিশেষ সমাদর লাভ করবে।

সুনীলচন্দ্র সরকার

বিষয়-শিরোনাম। শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা ৬। মূল্য ৫.০০ টাকা।

পাঠক গ্রন্থাগারে বইয়ের সন্ধান করেন প্রধানতঃ দুই উপায়ে। কোনও বিশেষ লেখকের একটি বই পড়বার উদ্দেশ্য হলে লেখক-সূচী দেখে জেনে নেওয়া যেতে পারে বইটি আছে কি না। আবার অনেকে একটি বিষয়ের উপরে বই পড়তে আসেন। লেখকের নাম জানা থাকতেও পারে, নাও পারে। বিষয়টি এখানে পাঠকের কাছে প্রধান। এই ক্ষেত্রে পাঠককে গ্রন্থাগারের বিষয়-সূচী দেখতে হয়। গবেষকদের ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগারে বিষয়-সূচীর বিশেষ প্রয়োজন। লেখক-সূচী ও বিষয়-সূচী পৃথক-পৃথক থাকতে পারে, আবার দুটি একই সঙ্গে অক্ষরানুক্রমে বিন্যস্ত হতে পারে।

বাংলা বইয়ের বিষয়-সূচীর অভাব পাঠকদের একটি বহুদিনের অভিযোগ। এই অভিযোগ দূর করবার পথে যে-সব অন্তরায় তাদের মধ্যে প্রধান হল একটি সুষ্ঠুরূপে সংকলিত সাব্‌জেক্ট হেডিং বা বিষয়-শিরোনামের অভাব। বিদেশে সংকলিত এরূপ কয়েকটি সাবজেক্ট হেডিং আছে। স্বভাবতঃই সেখানে ভারতীয় বিষয়গুলি উপেক্ষিত। বিশেষ করে বাংলা বই সূচীকরণের ক্ষেত্রে তাদের উপযোগিতা খুবই কম।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য -সংকলিত 'বিষয়-শিরোনাম' গ্রন্থাগার-কর্মীদের মনে আশার সঞ্চার করবে।

'বিষয়-শিরোনাম' সংকলনের জন্য সূচীকরণে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা, বৃহৎ পুস্তকসংগ্রহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, প্রধান প্রধান গ্রন্থাগারের সহিত সহযোগিতা এবং জ্ঞানরাজ্যের মানচিত্র সম্বন্ধে অবহিত থাকা অত্যাবশ্যক। কৃষ্ণময়বাবু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত যুক্ত আছেন বলে সংকলনের কাজে কিছু সুবিধা পেয়েছেন।

জ্ঞানরাজ্যের বিস্তারের তুলনায় আলোচ্য 'বিষয়-শিরোনাম' খুবই সংক্ষিপ্ত। অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ই পাওয়া যাবে না। পূর্ব-পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; সেখানকার বাংলা বইও এখানে আসে। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের কোনো শিরোনাম নেই। উদ্বাস্তু সম্পর্কিত পুস্তকের জন্যও স্থান নির্দেশ করা হয় নি। ভারতের এবং বাংলা দেশের কালানুক্রমিক বিভাগগুলি দেখালে বইটির উপযোগিতা বাড়ত। এমনি আরো অনেক বিভাগেই বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা ছিল। ব্যক্তির জীবনীকে

'জীবনী' শিরোনামের অন্তর্গত করা হয়েছে। যেমন, জীবনী— মধুসূদন দত্ত। এটা প্রচলিত নিয়মের বিরোধী। মধুসূদন দত্তই এখানে বিষয়। মধুসূদনের সকল জীবনী মধুসূদন-শিরোনামের অন্তর্গত থাকলে পাঠক সহজে খুঁজে পাবেন।

বাংলা সাহিত্যের উপবিভাগ 'সেক্সপীয়র' 'পোয়েটিক্স্' ভাবানুবাদ কি করে হয় বোঝা গেল না।

কৃষ্ণময়বাবু যে বিষয়-শিরোনাম সংকলনে পথিকৃৎ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। আশা করি পরবর্তী সংস্করণ ত্রুটিমুক্ত হয়ে অধিকতর ব্যবহারোপযোগী হবে।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সংশোধন

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২১ সংখ্যা ৩

পৃ ১৮৯ ছত্র ১৭ "মধুসূদনের ইংরেজি উপন্যাস, বঙ্কিমচন্দ্রের" স্থলে
"মধুসূদনের ইংরেজি কাব্য, বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজি উপন্যাস ও"

পৃ ২০৫ ছত্র ১৮ lines স্থলে lives

ওগো কিশোর, আজি তোমার দ্বারে পরান মম জাগে।
নবীন করে করিবে তারে রঙিন তব রাগে ॥
ভাবনাগুলি বাঁধনখোলা রচিয়া দিবে তোমার দোলা,
দাঁড়িয়ো আসি হে ভাবে-ভোলা আমার আঁখি আগে ॥

দোলের নাচে বুঝি গো আছ অমরাবতীপুরে—
বাজাও বেণু বুকের কাছে, বাজাও বেণু দূরে।
শরম ভয় সকলি ত্যেজে মাধবী তাই আসিল সেজে—
শুধায় শুধু, 'বাজায় কে যে মধুর মধুস্বরে।'
গগনে শুনি একি এ কথা, কাননে কী যে দেখি।
একি মিলনচঞ্চলতা, বিরহব্যথা একি।
আঁচল কাঁপে ধরার বুকে, কী জানি তাহা সুখে না দুখে—
ধরিতে যারে না পারে তারে স্বপনে দেখিছে কি।

লাগিল দোল জলে স্থলে, জাগিল দোল বনে বনে—
সোহাগিনির হৃদয়তলে বিরহিণীর মনে মনে।
মধুর মোরে বিধুর করে সুদূর তার বেণুর স্বরে,
নিখিল হিয়া কিসের তরে দুলিছে অকারণে।

আনো গো আনো ভরিয়া ডালি করবীমালা লয়ে,
আনো গো আনো সাজায়ে থালি কোমল কিশলয়ে।
এসো গো পীত বসনে সাজি, কোলেতে বীণা উঠুক বাজি,
ধ্যানেতে আর গানেতে আজি যামিনী যাক বয়ে।

এসো গো এসো দোলবিলাসী বাণীতে মোর দোলো,
ছন্দে মোর চকিতে আসি মাতিয়ে তারে তোলো।
অনেক দিন বুকের কাছে রসের স্রোত থমকি আছে,
নাচিবে আজি তোমার নাচে সময় তারি হল ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

মধ্য লয়

পা -ধা । পা -র্সা II { ন র্সা র্সণা ণা ধ । প ধা -া প । পা -ধপা I মা মা মা । গা -মা । রা -গা I
ও ॰ গো ॰ কি শো ॰ র আ ॰ জি ॰ ॰ তো মা র দ্বা ॰ রে ॰

I সা গা গা । মা -া । পা -ধপা I মগা মা -া । (পা -ধা । পা -র্সা)} I -া -া । -া -া I
পরান ম • ম •• জা•গে • ও • গো • •• ••

I { মা মপা পা । পা -া । পা -ধা I পা ধা ণা । পধাঃ -পঃ । (মগা -মগা)} I পা -া
নবীন ক • বে • করিবে তা • রে• • রে •

I পা পধা ধপা । মাঃ -গঃ । গা -মগা I গা মা -াপ । পা -ধা । পা -র্সা ।
রঙি•ন ত • ব • রাগে • "ও • গো •"

-া -া । -া -া II মা মপা পা । পা -া । পা -া I পা পধা ধা । ধা -া । ধা -া
•• •• ভাব•না গু • লি • বাঁধ•ন খো • লা •

I ধা ধণা ণা । ণা -া । ণা -া I ণা ণধর্সা র্সা । র্সাঃ -নঃ । র্রসা -না
রচি•য়া দি • বে • তো মা•• র দো • লা •

I না -া না । না -া । না -া I নর্সা -া -পা । -া -া । -া -না
দাঁ • ড়ি য়ো • আ • সি• • • • • • •

I না -া না । না -া । না -া I নর্সা -া -া । -পা -া । -া -ধা
হে • ভা বে • ভো • লা • • • • • •

I ণা ণর্রা র্রর্সা । র্সা -ণা । ণা -ধা I পধা পা -া । পা -ধা । পা -র্সা
আমা• র• আঁ • খি • আ গে • "ও • গো •"

-া -া । -া -া II সা সপা পা । পা -া । পা -ধা I মপা মা মা । মজ্ঞা -রা । সা -না I
• • • • দো লে• র না • চে • বু• ঝি গো আ • ছ •

I সা সপা পা । পা -া । পা -ধা I মপঃমঃ মা -জ্ঞা । -া -া । -া -মা I
অ ম• রা ব • তী • পু•• রে • • • • •

I মা পা -া । -পা -মা । -জ্ঞা -মা I মা পা -া । পা -া । পা -ধা I
বা জা • • • • ও বা জা ও বে • ণু •

I মা পা -া । -া -া । -া -া I পণা ণা -া । ণা -ধা । ণা -া I
বা জা • • • • ও বা• জা ও বে • ণু •

I ণর্সা ণা ণা । পধা -াপ । পা -ধা I মা পা -া । -পা -মা । -জ্ঞা -মা I
বু• কে র কা • ছে • বা জা • • • • ও

I মা পা -া । পা -া । পা -ধা I মপঃমঃ মা -জ্ঞা । -া -া । -া -া I
বা জা ও বে • ণু • দূ•• রে • • • • •

I { পা পা পমা । পমা -জ্ঞা । জ্ঞা -মা I পা না না । না -র্সা । র্সা -া I
শ র ম• ভ • য় • স ক লি ত্যে • জে •

I র্সজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা । র্রা -জ্ঞা । -র্সা -র্রা I না না না । না -র্সা । র্সা (-পা)} I -া I
মা• ধ বী তা • • ই আ সি ল সে • জে • •

I র্সর্রা র্রর্সা -ণা । ণা -ধা । ণা -াধ I ধর্সা র্সণা -া । পধাঃ -পঃ । পা -ক্ষা I
শু• ধা র্ শু • ধু • বা• জা র্ কে • যে •

I পা -া -ধা । ধা -ণা । -া -া I ণধর্সা র্সণা ণা । পধা -াপ । পা -ধা I
বা • ∘ জা • • য়্ ম∘ ধু∘ র ম • ধু •

I মপঃমঃ মা-জ্ঞা । -া -া । -া -া I সমা মা মা । মা -া । মা -া I
স্ব∘∘ রে • ∘ ∘ • • গ∘ গ নে শু • নি •

I মা পা পধা । মপা -মা । মা -জ্ঞা I মা মণা ণধা । ধা -া । ধণা -ধণা I
এ কী এ∘ ক• • থা • কা ন∘ নে∘ কী • যে∘ ••

I ধপা পর্সা -া । -ণা -া । -ধা -না I না না না । না -া । র্সা -া I
দে খি∘ • • • ∘ • এ কি মি ল • ন •

I না -া র্সর্রা । নর্সা -ণা । র্সণা -ধা I ধা ধণধণা পা । পা -মা । মজ্ঞা -মা I
চ ন্ চ∘ ল ∘ তা ∘ বি র∘∘ হ ব্য • থা∘ ∘

I পা পর্সা -া । -ণা -া । -ধা -া I { ধা ধা ধা । ধা -া । ধা -না I
এ কি• • • • • • আঁ চ ল কাঁ • পে •

I না না না । র্সর্রা -র্রর্সনা । র্সা -া I র্সর্মা র্মা র্গর্মা । র্রা -র্জ্ঞা । র্সা -র্রা I
ধ রা র বু∘ ∘• কে • কী জা নি∘ তা • হা •

I না র্সা র্সর্রা । নর্সাঃ -ণঃ । র্সণা -ধা } I ধা ধণধণা পা । পা -মা । মা -া I
সু খে না∘ দু • খে • ধ রি∘∘ তে যা • রে •

I মা -পা -ধা । মপা -মা । মজ্ঞা -র্সা I র্সা র্সণা ণধা । ধণা -ধণা । পা -াধ I
না • • পা• • রে• • ধ রি• তে• যা• •• রে •

I মা পা পধা । মপা -মা । মা -জ্ঞা I মা মণা ণধা । ধা -া । ধণা -ধণা I
না পা রে॰ তা॰ ॰ রে ॰ স্ব প॰ নে॰ দে ॰ খি॰ ॰॰

I পা পর্সা -া । -ণা -া । -ধা -া I
ছে কি॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

দ্রুত লয়

I { সা সা সা । রা -া । -পা -া I মা মা -জ্ঞা । জ্ঞা -রা । মজ্ঞা -া[র] I
লা গি ল দো ॰ ॰ ল্ জ লে ॰ স্থ ॰ লে॰ ॰

I রা [র]সা সা । রা -া । -জ্ঞা -া I রা সা -রা । ন্‌া -া । সা -া } I
জা গি ল দো ॰ ॰ ল্ ব নে ॰ ব ॰ নে ॰

I মা মপা পা । পা -া । [ধ]পা -মা I পা ধা ণা । ণা -ধা । [র্স]ণা -ধা I
সো হা॰ গি নি ॰ র ॰ হৃ দ য় ত ॰ লে ॰

I পা পধা [ধ]পা । [প]মা -গা । গা -া I গা গা -মা । মা -া । গমা -পদা[২] I
বি র॰ হি ণী ॰ র ॰ ম নে ॰ ম ॰ নে॰ ॰॰

I পা মজ্ঞা রসা । রা -া । -পা -া I মা মা -জ্ঞা । জ্ঞা -রা । মজ্ঞা -া[র] I
লা গি॰ ল॰ দো ॰ ॰ ল্ জ লে ॰ স্থ ॰ লে॰ ॰

I রা [র]সা সা । রা -া । -জ্ঞা -া I রা সা -রা । ন্‌া -া । সা -া I
জা গি ল দো ॰ ॰ ল্ ব নে ॰ ব ॰ নে ॰

I পা পা পমা । [প]মা -জ্ঞা । জ্ঞা -মা I পা না না । না -া[র্স] । র্সা র্সনা I
ম ধু র॰ মো ॰ রে ॰ বি ধু র ক ॰ রে স্থ॰

I র্সা -া -র্জ্ঞা । র্রা -া । র্জ্ঞা -া I র্রা র্রা র্জ্ঞা । র্রা -া । র্জ্ঞা -া I
দূ • • র • কা র্ বে ণু র ঘ • রে •

I র্জ্ঞর্রা র্রর্সা র্জ্ঞা । র্রাঃ -র্সঃ । র্সা -া I র্সনা নর্রা র্রর্সা । র্সা -ণা । ণা -া I
নি • খি • ল হি • য়া • কি • সে • র • ত • রে •

I ণধা ধর্সা র্সণা । ণা -ধা । পা -ধণা I ণধা পা -া । -া -া । -া -া I
দু • লি • ছে অ • কা • • র ণে • • • • •

I পা পধা ধপা । মা -াগ । গা -া I গা গা গমা । গা -া । মা -া I
নি খি • ল হি • য়া • কি সে র ত • রে •

I মা মপা মা । জ্ঞা -রা । সা -রজ্ঞা I রা সা -া । -া -া । -া -া I
দু লি ছে অ • কা • • র ণে • • • • •

I সজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা । রা -া । জ্ঞা -া I রা রা জ্ঞা । রা -া । জ্ঞা -া I
আ নো গো আ • নো • ভ রি য়া ডা • লা •

I জ্ঞরা রমা মজ্ঞা । রা -সা । সা -রজ্ঞা I রা সা -া । -া -া । -া -া I
ক • র • বী মা • লা • • ল য়ে • • • • •

I সগা গা গা । গা -া । সগা -সা I সা গা গা । মা -া । পা -ধা I
আ নো গো আ • নো • সা জা য়ে থা • লি •

I মা মপা পমা । জ্ঞা -রা । সা -রজ্ঞা I রা সা -া । -া -া । -া -া I
কো ম • ল কি • শ • • ল য়ে • • • • •

I { মা পা পা । পা -ণা । ণা -ধা I ধা ধা ধপা । পা -া । পা -া I
এ সো গো পী • ত ০ ব স নে• সা • জি •

I পা ধা ণা । ণা -র্সা । র্সা -া I ণর্সা র্সণা ণা । পধা -াপ । পা (-ধা)} I -া I
কো লে তে বী • ণা • উ• ঠু ক বা • জি • •

I পা পধা পা । মা -া । -গা -া I সা গা গা । মা -া । পা -ধা I
ধ্যা নে• তে আ • • র্ গা নে তে আ • জি •

I মা মপা পমা । জ্ঞা -রা । -মজ্ঞা -রজ্ঞা I সরা সা -া । -া -া । -া -া I
যা মি• নী ঘা • •• •ক্ ব রে • • • • •

I মা পা পা । পা -না । না -া I না -া র্সা । না -া । র্সা -পা I
এ সো গো এ • সো • দো ল্ বি লা • সী •

I পা না না । র্সা -া । -া -র্রা I না র্সা -পা । না -া । র্সা -র্রা I
বা ণী তে মো • • র্ দো লো • দো • লো •

I না র্সা -া । -া -া । -া -া I গা -া গা । গা -া । -া -া I
দো লো • • • • • ছ ন্ দে মো • • র্

I সা গা গা । মা -া । পা -ধা I মা পা মা । জ্ঞা -রা । সা -রজ্ঞা I
চ কি তে আ • সি • মা তি রে তা • রে ••

I রা সা -া । -া -া । -সরা -ন্া I সা -া -রা । জ্ঞা -রা । -মজ্ঞা -রা I
তো লো • • • • ০ মা ০ ০ তি • •• •

I সা -া -া । -া -া । -া -া I মা পা পা । পা -া । -না -া I
য়ে • • • • • • অ নে ক দি • • ন্

I না না র্সা । না -া । র্সা -র্জ্জা I র্রা র্রা র্জ্জা । র্রা -া । র্জ্জা -া I
বু কে র কা • ছে • র সে র স্রো • ত •

I র্রা র্রা র্জ্জা । র্রা -া । র্জ্জা -া I র্জ্জর্রা র্রর্মা র্জ্জা । র্সর্রা -া । র্সা -া I
থ ম কি আ • ছে • না॰ চি॰ বে আ • জি •

I র্সনা নর্রা র্সা । র্সা -ণা । ণা -া I ণধা ধর্সা র্সণা । ধা -পা । পা -ধণা I
তো•মা•র না • চে ॰ স॰ ম॰ য় তা • রি ••

I ধা পা -া । পা -ধা । পা -র্সা II II
হ ল • "ও • গো •"

সম্পাদকের নিবেদন

১৩০৮ সালে (১৯০১) শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরেই, ১৩১১ সালের মাঘ মাসে (১৯০৫), বিধুশেখর শাস্ত্রী-মহাশয় (১৮৭৮-১৯৫৯) এই বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। সুদীর্ঘ কাল তিনি এই বিদ্যাপীঠের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যাঁরা নিয়ত নিকটেই থাকেন, তাঁদের সঙ্গে পত্রব্যবহারের সুযোগ খুব বেশি ঘটে না। শাস্ত্রী-মহাশয়ের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপ খুব বেশি হওয়ার সুযোগ ছিল না। বর্তমান সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক শাস্ত্রী-মহাশয়কে লিখিত দুটি পত্র মুদ্রিত হল— এই প্রসঙ্গে, শাস্ত্রী-মহাশয়ের মহামহোপাধ্যায় উপাধিলাভ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যে শুভেচ্ছাবাণী পাঠান, ১৩৪২ ফাল্গুন সংখ্যা প্রবাসী থেকে এখানে তা উদ্ধৃত হল—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য সুহৃদ্বরেষু

বিদ্যার তপস্বী তুমি। আজ তুমি যশস্বী ভারতে;
কবি তব জয়মাল্য সঁপি দিল তব জয়রথে।
এই আশীর্বাদ করি :— তব যাত্রা হোক অগ্রসর
অপূর্ব কীর্তির পথে উত্তরিয়া দেশদেশান্তর
দূর হতে দূরে। একদিন যবে অখ্যাত নিভৃতে
স্তব্ধ ছিলে, অন্তর্লীন আনন্দের অদৃশ্য রশ্মিতে
সিদ্ধি ছিল মহীয়সী; ভারতীর প্রসাদবৃষ্টিতে
ছিল তব পুরস্কৃতি, ছিল না তা লোকের দৃষ্টিতে।
জ্ঞানের প্রদীপ তব দীপ্ত ছিল ধ্যানের আড়ালে
নিষ্কম্প আলোকে। আজ জনারণ্যে চরণ বাড়ালে,
সেথা পরিচয় লাগি নাম মাগে উপাধির সীমা,
সেথা মহিমার চেয়ে মানে লোকে চিহ্নের গরিমা।
চিহ্ন না রহিতে তবু তোমারে চিনিয়াছিল যারা
তাদের সম্মানমাল্য জনতার কাছে মূল্যহারা।
যেথা যাহা প্রয়োজন তাই দিন্ সৌভাগ্য-বিধাতা,
পদবীর পরিমাপে হয় যদি হোক উচ্চ মাথা।
বিশ্বে তুমি দৃশ্য হও ভালে বহি রাজদত্ত টিকা
বন্ধুচিত্তে থাকো লয়ে নির্লাঞ্ছন আত্মালোকশিখা।

শান্তিনিকেতন
১২ মাঘ ১৩৪২

বন্ধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই সংখ্যায় প্রকাশিত পত্র দুটি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন বিদেশে অবস্থান-কালে।
অন্যান্য রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্য কয়েকটি চিঠিও এই সংখ্যায় মুদ্রিত হল।

স্বীকৃতি

বিধুশেখর শাস্ত্রী-মহাশয়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র ও রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চতুর্বর্ণ চিত্র শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত।

সুরীতি দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী ও রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত একবর্ণ চিত্র শ্রীরামকুমার কেজরিওয়ালের সৌজন্যে মুদ্রিত।

অলডাস হাকসলির আলোকচিত্র ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসেস -এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সহ-সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদক শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

সহ-সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

একবিংশ বর্ষ । শ্রাবণ ১৩৭১ - আষাঢ় ১৩৭২ · ১৮৮৬-৭ শক

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

বিশ্বভারতী পত্রিকা

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১. প্রকাশের স্থান : ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

২. প্রকাশের সময়-ব্যবধান : ত্রৈমাসিক

৩. মুদ্রক : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় (ভারতীয়)
৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯

৪. প্রকাশক : শ্রীসুশীল রায় (ভারতীয়)
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

৫. সম্পাদক : শ্রীসুধীরঞ্জন দাস (ভারতীয়)
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

৬. সত্বাধিকারী : বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
পোঃ শান্তিনিকেতন। বীরভূম। পশ্চিমবঙ্গ

আমি, শ্রীসুশীল রায়, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উল্লিখিত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য।

স্বাঃ সুশীল রায়

১ মার্চ ১৯৬৫

প্রকাশক শ্রীসুশীল রায় • বিশ্বভারতী • ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন • কলিকাতা ৭
মুদ্রক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় • শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড • ৫ চিন্তামণি দাস লেন • কলিকাতা ৯